বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

বগুড়া

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

বগুড়া

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
বেলাল হোসেন

সংগ্রাহক
আল জাবির
সেলিনা শিউলী
কৃষ্ণচন্দ্র সরকার
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
বগুড়া

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫৩২৯

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত বিশ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : BOGRA (Present state of Folklore in Bogra District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 320.00 only. US$: 6.00

ISBN-984-07-5338-X

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সংগতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নীচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

www.pathagar.com

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally”, ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-

www.pathagar.com

bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক

www.pathagar.com

ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন

www.pathagar.com

(বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু,. বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পত্থুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শ্লুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা

www.pathagar.com

কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

www.pathagar.com

ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শির্‌নি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নিদের্শনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের

www.pathagar.com

এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, গবেষণা অফিসার জনাব মোঃ আব্দুল মমিন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান বগুড়া জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বগুড়ার সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৭০

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ২৩
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৩
গ. বনভূমি, গাছপালা ও কৃষি ২৫
ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৬
ঙ. জনবসতির পরিচয় ২৯
চ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ৩৩
ছ. নদ-নদী ও খাল-বিল ৩৫
জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৬
ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৩৭
ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ৪৮
ট. মুক্তিযুদ্ধ ৬৩
ঠ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালদের পরিচয় ৬৭

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৭১-১৬৩

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্সা/রূপকথা/উপকথা ৭১
খ. কিংবদন্তি ৯৬
গ. পুরাকাহিনি ৯৯
ঘ. লোকপুরাণ ১১৫
ঙ. লোককবিতা ১২০
চ. লোকছড়া ১২৬

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৬৪-১৮২

লোকশিল্প
১. মৃৎশিল্প ১৬৪
২. তাঁতশিল্প ১৬৬
৩. তালপাখাশিল্প ১৬৮
৪. বাঁশ ও বেতশিল্প ১৭১
৫. টুপিশিল্প ১৭৫
৬. নকশিকাঁথা ১৭৮
৭. নকশিশিকা ১৭৯
৮. দেয়ালচিত্র ১৭৯
৯. হাতপাখা ১৮১

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৮৩-১৮৭

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ১৮৮-২২৩
১. বাউলগান ১৮৮
২. মাজারের গান ১৯২
৩. কর্মসংগীত ১৯২
৪. গাইনের গীত ১৯৩
৫. লোকগান ১৯৫
৬. মেয়েলি গীত ২০২
৭. বিয়ের গীত ২১৫
৮. বিরহগীত ২৩৪
৯. জারিগান ২৩৫
১০. সারিগান ২৩৯
১১. নারী ও পুরুষের পালাগান ২৪০

লোকউৎসব (folk festival) ২৪৪-২৫১
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব ২৪৪
২. নবান্ন ২৪৬
৩. পৌষপার্বণ ২৪৮
৪. চড়ক ২৪৯
৫. রথযাত্রা ২৫০
৬. ইছলে সওয়াব উৎসব ২৫১

লোকমেলা (folk fair) ২৫২-২৬৬

লোকাচার (ritual) ২৬৭-২৭১
১. খৎনা ২৬৭
২. চেহলাম ২৬৭
৩. গোছ আকা ২৬৭
৪. গোয়াল পূজা ২৬৮
৫. গাই দেওরান ২৬৯
৬. মনসা পূজা ২৬৯
৭. গোরক্ষনাথের পূজা ২৭০
৮. মুঠ আকা ২৭১

লোকখাদ্য (folk food) ২৭২-২৮২
১. আলুঘাটি ২৭২
২. বরির আচার ২৭২
৩. দুধপিঠা ২৭২
৪. রসবড়া ২৭২
৫. ছিন্নিপোড়া ২৭৩
৬. কুলসিপিঠা ২৭৩

www.pathagar.com

৭. ভুনা ২৭৩
৮. বগুড়ার দই ২৭৪
৯. লাচ্ছা ও চিকন সেমাই ২৭৬
১০. মহাস্থানের কটকটি ২৭৮
১১. কাউনের ভুরভুরি ২৮০
১২. কাউনের মলা ২৮০
১৩. হুড়াপুড়া খাওয়া ২৮০
১৪. বাদামের পায়েস ২৮১
১৫. ভুলক্যা খাওয়া ২৮১
১৬. তেলপিঠা ২৮১
১৭. বকনি/বগনি ২৮১
১৮. মুঠা ২৮২

লোকনাট্য (folk theatre) **২৮৩-৩১৮**
ক. বেহুলাপালা ২৮৩
খ. বউবন্ধকপালা ৩০৩
গ. লছিমনপালা ৩০৭

লোকক্রীড়া (folk games) **৩১৯-৩৩৬**
১. পাতা লুকালুকি খেলা ৩১৯
২. ইচিং বিচিং খেলা ৩১৯
৩. হা-ডু-ডু খেলা ৩২০
৪. লাফালাফি ৩২১
৫. পাতাখেলা ৩২২
৬. মাদারের লাঠিখেলা ৩২২
৭. গোল্লাছুট খেলা ৩২৩
৮. কানামাছি খেলা ৩২৩
৯. বউছি খেলা ৩২৪
১০. লুকোচুরি খেলা ৩২৪
১১. একে ঋতু খেলা ৩২৫
১২. বুড়োবু খেলা ৩২৬
১৩. বদন খেলা ৩২৬
১৪. আইস্কোপ বাইস্কোপ খেলা ৩২৭
১৫. এত্তকোণা ট্রেনের গাড়ি ৩২৮
১৬. আতাপাতা খেলা ৩২৯
১৭. এলাটিং বেলাটিং ৩৩০
১৮. নুনতা খেলা ৩৩০
১৯. খোলা চালা ৩৩১
২০. রং খেলা ৩৩১

www.pathagar.com

২১. লোকটিস ৩৩১
২২. কপালটিস ৩৩২
২৩. চেংটুপান্টি খেলা ৩৩২
২৪. গাড়াগাড়ি খেলা ৩৩২
২৫. নুনচুড়ি খেলা ৩৩৩
২৬. নৌকাবাইচ ৩৩৩
২৭. সাতচাড়া ৩৩৩
২৮. লাঠিখেলা ৩৩৩
২৯. অশকশ খেলা ৩৩৪
৩০. কুতকুত খেলা ৩৩৪
৩১. বাঘ বকরি খেলা ৩৩৫
৩২. ষোল গুটি/ঘুঁটি খেলা ৩৩৬
৩৩. পলান পলান ৩৩৬
৩৪. গোলাপ টগর খেলা ৩৩৬

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৩৩৯-৩৪১
১. মিস্ত্রি/ছুতার ৩৩৯
২. খুলু ৩৩৯
৩. তাঁতি ৩৩৯
৪. জেলে ৩৪০
৫. কামার ৩৪১
৬. কুমার ৩৪১
৭. মৌসুমি কামলা ৩৪১

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine & chant) ৩৪২-৩৪৭
ক. লোকচিকিৎসা ৩৪২

খ. তন্ত্রমন্ত্র ৩৪৭

ধাঁধা (riddle) ৩৫০-৩৮৬

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩৮৭-৪০৪

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (folk belief & superstition) ৪০৫-৪১৩

লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
ক. মাছ ধরার জাল ৪১৪
খ. মাছ ধরার যন্ত্র ৪১৬
গ. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি ৪১৭

লোকভাষা (folk language) ৪২০-৪২৪

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

সুলতানি আমলে দিল্লীর সম্রাট গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের পুত্র নাসির-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ (বগরা খাঁ বা ধর্মরক্ষক) ১২৭৯-৮২ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ৬৭৮-৮১) স্বাধীন বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি একজন প্রমোদপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে পুণ্ড্রনগরের দক্ষিণ পাশে ছোট একটি শহর নির্মাণ করা হয়। তাঁর নামানুসারে এই শহরের নামকরণ করা হয় 'বগরা'। অপভ্রংশে বোগরে> বগুড়া (বগুড়ার স্থানীয় জনগণ আজও 'বোগরে'ই বলে, কেউ 'বগুড়া' বলে না- 'আনা বোগরে টাউনেত যাওয়া লাগলোনি বা রে/ক্যারে তুই কি বোগরেত গ্যাচুলু')। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে এই বগ্রা (Bogra) শহরকে কেন্দ্র করে 'বগুড়া' জেলা গঠন করা হয়। সুলতানি যুগের পূর্বে এই ভূখণ্ড বরেন্দ্রীয় অন্তর্গত পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সভ্য নগরী হিসেবে এ অঞ্চলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'পুণ্ড্রবর্ধনপুর'।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমায় ২৪° ৩২´ উত্তর থেকে ২৫° ০৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ৫৮´ থেকে ৮৯° ৪৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বগুড়া জেলার অবস্থান। বগুড়ার উত্তর-পশ্চিমে জয়পুরহাট, উত্তরে গাইবান্ধা, পূর্বে জামালপুর, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ ও নাটোর এবং পশ্চিমে নওগাঁ জেলা অবস্থিত। সারিয়াকান্দি, গাবতলী, ধুনট, শেরপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, আদমদিঘি, দুপচাঁচিয়া, কাহালু, নন্দীগ্রাম, বগুড়া সদর ও নবগঠিত শাজাহানপুর এই মোট ১২টি উপজেলা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত। করতোয়া নদী বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। করতোয়ার পূর্বপারের ভূ-ভাগ যথা : সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, গাবতলী, ধুনট, শেরপুরের অংশবিশেষ, শাজাহানপুর ও বগুড়া সদর উপজেলার পূর্বাংশ পূর্ব বগুড়া নামে পরিচিত। আদমদিঘি, দুপচাঁচিয়া, নন্দীগ্রাম, কাহালু, শিবগঞ্জ, শেরপুর, শাজাহানপুর ও বগুড়া সদর উপজেলার পশ্চিমাংশ পশ্চিম বগুড়া নামে পরিচিত। বগুড়া জেলার মোট আয়তন ২৯১৯.৯০ বর্গ কি.মি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার লোকসংখ্যা ৭৫২১১৮ জন। জেলার ১২টি উপজেলায় ১০৮টি ইউনিয়ন এবং ১৩৯৯টি মৌজা রয়েছে।

ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত চারটি এলাকায় ভাগ করা যায়। যেমন–

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা।

২. প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান এলাকা।

www.pathagar.com

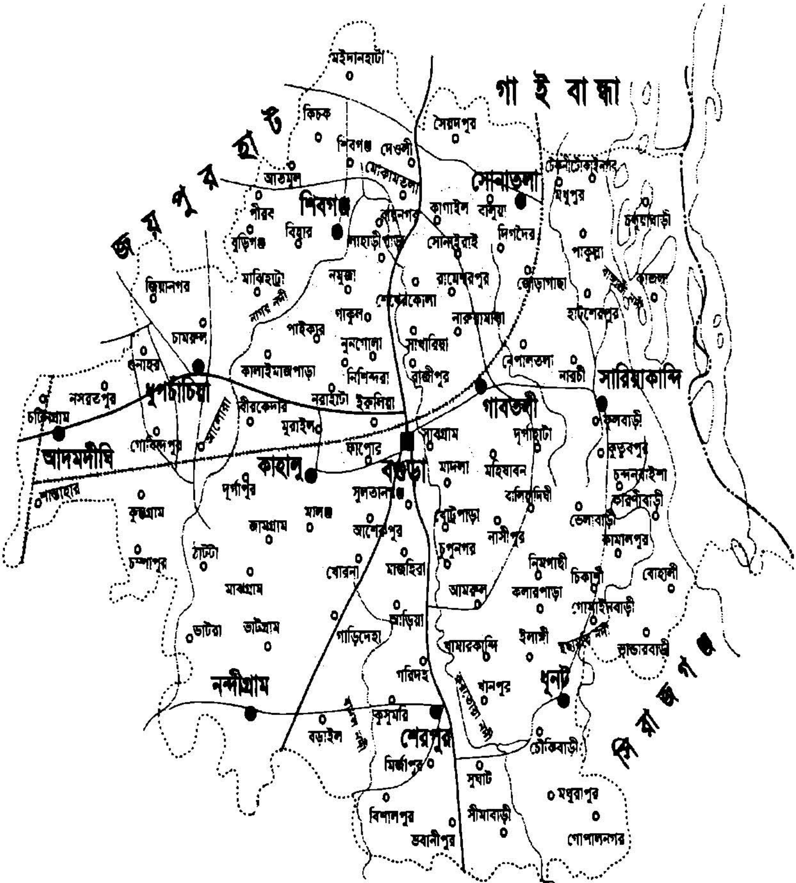

বগুড়া জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি এলাকা ও

৪. উপকূলীয় ব-দ্বীপ এলাকা।

এর মধ্যে প্লাইস্টোসিন যুগের এলাকা ও সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বগুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতির অন্তর্গত।

প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান : প্রায় ১০ লক্ষ বছর পূর্বে প্লাইস্টোসিন যুগের মহাদেশ গঠনকারী ভূ-আলোড়নের ফলে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের বিশাল বরেন্দ্রভূমি সোপানের সৃষ্টি হয়। এ বরেন্দ্র এলাকার মাটি ধূসর ও লালবর্ণের এবং কঙ্করযুক্ত। সমগ্র পশ্চিম বগুড়া এ ভূ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে তিস্তা, করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের নবীন ভূ-তাত্ত্বিক এলাকা গড়ে ওঠে। বরেন্দ্র ভূমির পূর্ব-দক্ষিণ এবং মধুপুর গড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ ভূ-ভাগ নব্য প্লাবন ভূমির অংশ হওয়ায় সমগ্র পূর্ব বগুড়া এই ভূ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব বগুড়ার প্লাবন সমভূমির—অংশ প্রাকৃতিকভাবে নিম্নভূমি যেখানে বিল ও অগভীর জলাভূমির প্রাধান্য রয়েছে।[৫]এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় খাল বা চ্যানেল। এগুলো জলাভূমি বা বিল নদীর পরিত্যাক্ত খাত থেকে সৃষ্টি হয়েছে। প্লাবন সমভূমি থেকে বরেন্দ্রভূমি ৩ থেকে ৪ মিটার উঁচু।

গ. বনভূমি, গাছপালা ও কৃষি

অতীতে জেলায় অনেক বড় বড় বনভূমি ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু কালক্রমে কৃষি সম্প্রসারণের জন্য এসব বন এলাকা ক্রমশ হ্রাস পায়। তবে এখনও সকল এলাকায় কমবেশি বিভিন্ন শ্রেণির গাছগাছড়া আছে। এদের মধ্যে কড়ই, শীলকড়ই, শাল, বট, পিপুল, পাকুড়, ছাতিয়ান, কদম, দেবদারু, কৃষ্ণচুড়া, সেগুন, মেহগনি, সোনালু, গাব, তেঁতুল, শিমুল, জারুল, শেফালিকা, গামার, মনবাহিয়া, পানছুরা, ফালছা, বাবলা, বাললা পুয়া, সাঁইবাবলা ইত্যাদির নাম করা যায়। এ ছাড়া জেলার সর্বত্র আম, জাম, লিচু, কলা, পেঁপে, আতা, সুপারি, বাতাবিলেবু, কাঁঠাল, আমরোজ, জামরুল, পেয়ারা, আমড়া, কলা, নারিকেল, বেল, ডালিম, খেঁজুর, ডুমুর, তাল প্রভৃতি ফলের গাছ জন্মে থাকে। এসব ফলের গাছের মধ্যে আম, কাঁঠাল ও কলাগাছের সংখ্যা খুবই বেশি।

উল্লিখিত গাছগাছড়া ছাড়াও বগুড়া জেলায় বিভিন্ন প্রকার ভেষজ বৃক্ষ ও লতা দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে : সজিনা, হরিদ্রা, তুলসী, বিশল্যকরণী, উলট-কম্বল, ভীমরাজ, মুথা, ভামুট বা ভাগী, শিমুল, বকুল, হস্তীকর্ণ পলাশ, হাতসুরা, বাঁশমর্দ, কুকুর মুথা, গুলঞ্চ, জাউন, অশোক, করবী, সাঁটি, ভাট, লাটা গোলক, আকন্দ, পলাশ, ধুতরা, আমলকী, অনন্তমূল, জামরুল, নীলকলমী, ব্যাঁকুর, সোমরাজ, কুটরাজ, শ্যামলতা, হুর, হরিয়া, টীকাপানা, লেবু, পুদিনা, কলম্বী, হেলেঞ্চা, তিল, হরিতকী, পিঠালী, কন্টিকারী, শতমূল, ভুঁইকুমড়া, ভূসামলকী, ক্ষেতপাঁপড়া, বাসক, ভেরেণ্ডা, জন্তি, পারুল, অপমার্গ, অশ্বগন্ধা, ইন্দুলকানি, আদ্রক, কাকঠুকরী, কালমেঘ, ওড়া, গোধাপদী, মসিনা, জয়ফুল, কচু, জয়ন্তিপল, শিয়ালকাঁটা, ছাতিম, অর্জুন, জগডুমুর, খোকসা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এ জেলার ভূ-প্রকৃতি ও মাটি কৃষির জন্য যথেষ্ট উপযোগী বিধায় প্রচুর কৃষি ফসলের চাষ হয়। করতোয়া নদী এ জেলাকে মূলত দু'টি ভূ-গঠনে ভাগ করেছে। করতোয়া নদীর পূর্ব ভাগে রয়েছে ৬০% কৃষি জমি যা বহুবিধ ফসল উৎপাদনের উপযোগী পলল এলাকা নামে পরিচিত এবং এখানে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ধান, পাট, আলু, গম, ভূট্টা, ডাল, সরিষা, মরিচ, কলা, পেঁপে, সবজি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশে রয়েছে ৪০% কৃষি জমি সমতল বরেন্দ্রভূমি হিসেবে খ্যাত যা এক সময়ে ধান উৎপাদনের এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং যমুনা বহুমুখী সেতু চালু হওয়ার ফলে এ জেলার প্রচলিত ফসল বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বরেন্দ্র এলাকায় বছরে কমপক্ষে দু'টি ধান উৎপাদনের মধ্যবর্তী সময়ে সরিষা, আলু এবং সীমিত আকারে শাক-সবজির চাষ হয়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ বগুড়া জেলা। বাংলাদেশের পৌরাণিক এবং প্রাচীন কালের ইতিহাসে বগুড়া এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন আমলে এ জেলা পৌণ্ড্র অথবা পুণ্ড্র রাজ্যের অংশ ছিল যা পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। মহাভারত, রামায়ণ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণে পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বর্তমানে মহাস্থান নামে পরিচিত একটি প্রাচীন সুরক্ষিত নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। এই মহাস্থানগড়ই ছিল পৌণ্ড্র দেশের মহাসমৃদ্ধশালী রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন নগর।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এ জেলাসহ সমস্ত উত্তর বাংলা অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাস্থানগড়ে অবস্থিত একটি পুরাকালের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে, এ জেলা মৌর্য শাসনাধীন ছিল। মৌর্য বংশ পতনের পর সম্ভবত : কুষাণ রাজারা পুণ্ড্রবর্ধনের কিয়দংশ অধিকার করেছিলেন। এ জেলায় কুষাণ বংশীয় প্রথম রাজা বাসুদেবের এক স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। শুঙ্গাযুগের পোড়ামাটির মূর্তি ও চিত্রফলক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে, মৌর্য বংশের পতনের পরেও পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুপ্তযুগ থেকে সেন আমল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-১২০০) পর্যন্ত প্রাচীন বাংলায় দুটি ভুক্তিই ছিল প্রধান। একটি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি এবং অপরটি বর্ধমানভুক্তি। সাধারণত প্রদেশ বা রাজ্য অর্থে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রমণ্ডল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির প্রধান এলাকা। পূর্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে পদ্মা ও উত্তরে হিমালয় পাদদেশ এই চতুঃসীমা ভূ-ভাগ বরেন্দ্রী নামে পরিচিত। বরেন্দ্র অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মূল এলাকা হলেও ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ ভুক্তির সীমানাও বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। গুপ্ত, পাল ও সেন আমল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি বরেন্দ্রঅঞ্চল ছাড়াও কামরূপ ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্টলিপি থেকে জানা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পশ্চিম দিকে খাড়িমণ্ডল (২৪ পরগণা), অন্যদিকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ গুপ্তাধিকার ভুক্ত ছিল এবং পুণ্ড্রবর্ধন ছিল এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। সপ্তম শতকের রাজা শশাঙ্কের সময় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ সর্বপ্রথম একক রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভ করে এবং কামরূপ পর্যন্ত তার সীমা বিস্তৃত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক যূয়ান চোয়াঙ এই সময় (৬৩৮ খ্রি.) সমগ্র বাংলাদেশকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত দেখেন– কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। একমাত্র সমতট ছাড়া বাকি চারটিই শশাঙ্কের রাজ্যান্তর্গত ছিল বলে তার বিবরণ থেকে জানা যায়। শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে কর্ণসুবর্ণে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেও পুণ্ড্রবর্ধন ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির রাজধানী। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের' মতে, এই সময় প্রাচ্যদেশের রাজা ছিলেন সোম; তার রাজধানী ছিল 'পুণ্ড্র'। শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণ জয় করেন। ভাস্কর বর্মা বেশিদিন এই বিজয় ধরে রাখতে না পারলেও তার রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্ধারিত হয় করতোয়া নদী। ধর্মপালের সময় (আঃ ৭৭৫-৮১০ খ্রি.) দেখা যায় কামরূপ পুনরায় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তার রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে উত্তরে হিমালয়ের সানুদেশ, কম্পোজ, উৎকল ও প্রাগত্যোতিষরাজ্য। রামপাল (আঃ ১০৭২-১১২৬ খ্রি.) পর্যন্ত পাল বংশের এই সাম্রাজ্য বজায় ছিল। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায়, বিজয় সেন (আঃ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রি.) এর শাসনামলে গৌড় (বরেন্দ্রী), পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ সেন শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা প্রায় সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০১ খ্রি.) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রভাসচন্দ্র সেন 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থে জানাচ্ছেন 'করতোয়া নদীর পূর্ব ধারে অবস্থিত বগুড়া জেলার অংশ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল' (প্রভাসচন্দ্র সেন)। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি নদীয়া জয়ের পর কামরূপ হয়ে তিব্বত অভিযানে অংশ নিলেও যতদূর জানা যায় তিনি কামরূপ দখল করেন নি। সেন শাসনের অবসানের পর থেকে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) কর্তৃক কামরূপ বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৩ শত খ্রি. কামরূপ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই দীর্ঘ সময় কামরূপের পশ্চিম সীমানা ছিল করতোয়া নদী। যোগিনীতিন্ত্রের মতে, কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমসীমা করতোয়া নদী। তাঞ্জুর বা তেঙ্গুরের মতে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের মধ্যে কলো-তু অর্থাৎ করতোয়া নদী অবস্থিত। সপ্তম শতকে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার সময়ও কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল করতোয়া নদী। ভাস্কর বর্মার (৬৪২ খ্রি.) সময় থেকে ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০ খ্রি.) কর্তৃক কামরূপ বিজয় পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর কামরূপ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময়েও কামরূপের পশ্চিমসীমা ছিল করতোয়া নদী। গেইটের 'আসামের ইতিহাস' হতে জানা যায়- চতুর্দশ শতাব্দীতে কোচবিহারকে রাজধানী করে কামতা রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন দুর্লভ নারায়ণ। কোনো কোনো ঐতিহাসকের মতে, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের কিয়ংদংশ নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নীলধ্বজের নেতৃত্বে কামতা রাজ্যে সেন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজ্য ৪টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল কামপীঠ, ভদ্রপীঠ, সৌমারপীঠ ও রত্নপীঠ। গেইটের ইতিহাসে বলা হয়েছে, করতোয়া নদী থেকে মানস নদী পর্যন্ত রত্নপীঠ; মানস নদী থেকে শীলঘাট পর্যন্ত কামপীঠ; ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীর ভদ্রপীঠ

www.pathagar.com

এবং ভারালী থেকে ডিকরং পর্যন্ত সৌমার পীঠ। করতোয়া নদী থেকে মানসনদী পর্যন্ত যে এলাকাটিকে আসামের ইতিহাসে রত্নপীঠ বলা হয়েছে, প্রায় সমগ্র পূর্ব বগুড়া তার মধ্যে পড়ে। সেনদের শেষ রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কামতা রাজ্য দখল করেন। ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ'র জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। নুসরাত শাহ ঢাকার সোনারগাঁ পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ১৫৮০ খ্রি. সমগ্র ভারতবর্ষকে ১২টি বিভাগে বিভক্ত করে সুবেবাংলা ১৮টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে (পরগণা) বিভক্ত করেন। এই ১৮টি সরকারের সরকার বার্ব্বকাবাদ, সরকার বাজুহা, সরকার ঘোড়াঘাট ও সরকার পিঞ্জরার কতকগুলো মহাল নিয়ে পরবর্তীকালে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে সুবেবাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও সারা বাংলায় পুরোপুরি মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ে এখানে পূর্ণাঙ্গ মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৭-১৬৫৯ খ্রি.) বাংলার সুবেদারী পেয়ে ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সুবেবাংলার নতুন জমাবন্দি করেন। এ সময় সমগ্র বাংলাকে ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি মহালে বিভক্ত করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৭-১৭০৭ খ্রি.) এর শাসনামলে ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বকীয় পৌত্র আজিম-উসসানকে সুবেবাংলার নবাবে নাজিম এবং মির্জা হাদি ওরফে মুর্শিদকুলী খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ানি লাভের পর ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্বের নতুন হিসাব প্রস্তুত করেন। এ হিসাবের নাম জমা কামেল তুমারী। এই নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে সুবেবাংলার সরকারগুলোকে ১৩টি চাকলায় এবং ২৫টি জমিদারিতে বিভক্ত করা হয়। এ সময় সমগ্র বগুড়া জেলা চাকলা ঘোড়াঘাট এবং রাজশাহী বা নাটোর ও শেলবর্ষ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ আমলে অধিকাংশ ভূ-ভাগ তিনটি প্রধান জমিদারি অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলার উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ পরগণা দিনাজপুর জমিদারির; দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগের পরগণা রাজশাহী জমিদারির এবং মধ্যভাগের শেলবর্ষ পরগণা শেলবর্ষ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গর্ভনর জেনারেল হয়ে এসে সমগ্র বাংলাদেশকে পূর্বোক্ত সরকার বা চাকলার পরিবর্তে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। এ সময় পশ্চিমে ভাগলপুর ও পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত এবং সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত হয়। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলা হতে আদমদিঘি, শেরপুর, নওখিলা ও বগুড়া থানা, রংপুর জেলা হতে দেওয়ানগঞ্জ ও গোবিন্দগঞ্জ থানা এবং দিনাজপুর জেলা হতে লালবাজার, ক্ষেতলাল ও বদলগাছি থানা এই মোট ৯টি থানা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে যমুনা নদীর আকার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দাওকোবা (যমুনা নদী) বগুড়া জেলার পূর্ব সীমা নির্ধারিত হয় এবং দেওয়ানগঞ্জ থানা ময়মনসিংহ (পরবর্তীতে জামালপুর) জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে লালবাজার পুলিশ থানা পাঁচবিবিতে এবং মানস নদী মরে যাওয়ায় ২০ মার্চ তারিখে নওখিলা পুলিশ থানা সারিয়াকান্দিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দগঞ্জ থানা পুনরায় জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও এ থানার ১০২টি গ্রাম সারিয়াকান্দি, ৪৭টি গ্রাম শিবগঞ্জ এবং ৯টি গ্রাম

www.pathagar.com

বগুড়া থানার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলা হতে ৩৯টি গ্রাম বিচ্ছিন্ন করে সারিয়াকান্দি থানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম থানাকে রাজশাহী জেলা হতে বিচ্ছিন্ন করে বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলার আয়তন প্রায় একইরূপ ছিল। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি বগুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের পাঁচবিবি, জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল ও কালাই থানা নিয়ে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়। বর্তমানে সারিয়াকান্দি, গাবতলী, ধুনট, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, আদমদিঘি, নন্দীগ্রাম, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া সদর ও নবগঠিত শাজাহানপুর উপজেলাসহ ১২টি উপজেলা নিয়ে বগুড়া জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ঙ. জনবসতির পরিচয়

ইতিহাস অনুসারে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, অ্যালপাইন প্রভৃতি নৃগোষ্ঠির সমন্বয়ে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত উৎস সম্ভবত আদি অস্ট্রালয়েড (Proto Asutroloid) জনধারা। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে দেখা যায়, আদি অস্ট্রালয়েড জনধারাই এ অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে এবং বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গঠন করে। এক সময় আদি অস্ট্রালয়েডদের ব্যাপ্তি উত্তর ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, আনুমানিক ৩০,০০০ বছর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ গিয়ে প্রথম পৌঁছায়। বাংলাদেশের ওরাও, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল, দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুড়ম্ব, পনিয়ান, উরুলু, মধ্য ভারতের ভীল, কারোয়া প্রভৃতি আদিবাসী আদি অস্ট্রালয়েড জনধারার উত্তরসূরি। পুণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে জানা যায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পার হয়ে উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে অস্ট্রিকভাষী আদি অস্ট্রালয়েডরা। তারপর এখানে তিস্তা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত অঞ্চলে তারা গড়ে তোলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা। এদেরকেই প্রাচীন বেদ-এ-নিষাদ, অনার্য বা অসুর বলা হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেই যে অস্ট্রিকরা প্রথম বসতি স্থাপন করে তার সত্যতা মিলে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিকদের উত্তরসূরি ওরাও, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতির বসতির দিকে তাকালে। আজো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গেই শুধু এদের বসতি দেখা যায়। বাঙালির ধান, ভাত, মাছ খাওয়া, লাঙ্গল ব্যবহার করা, কলা চাষ, তুকতাক, ঝাড়ফুক, সাপের বিষ নামানো, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, হিসেবে কুড়ি, গণ্ডা, পণ ইত্যাদির ব্যবহার এবং অনেক বিচিত্র শব্দসম্ভার অস্ট্রিক সংস্কৃতির দান। ধান-পান-কচু, আম, কাঁঠাল, কলা নানা প্রজাতির কন্দ যেমন মাচআলু, মিষ্টিআলু, কেশুরআলু, ইক্ষু, গোলমরিচ, এসব তাদেরই সাংস্কৃতিক উৎপাদন। ধানেরই প্রায় পাঁচশত প্রজাতি তারা সৃষ্টি করেছিলেন। ফলমূলের ক্ষেত্রে যেমন কলা, কন্দ, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি আরো আছে রবি শস্য, মাসকালাই, খেসারি কালাই, মুগ-মসুরি, সরিষা, হলুদ, বচ, পিপুল, মরিচ, ধনিয়া, আদা, পিয়াজ, রসুন এসব অস্ট্রিক মানব গোষ্ঠিরই সাংস্কৃতিক অবদান বা মহৎ সৃজন। মাটির ঘর তৈরি কিংবা বাঁশ-কাঠ দিয়ে ঘর তৈরি, ছন বা ধানের খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া এসব কিছুই উল্লিখিত মানব গোষ্ঠীরই অবদান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে অস্ট্রিক মানব ধারার সংস্কৃতির একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এরা এদের ভৌত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাঁশকেই প্রধান উপকরণ বা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিলেন। বাঁশের হাজারো বিচিত্র ব্যবহার অজস্র হাতিয়ার তির, ধনুক, বর্শা, সলঙ্গা, কোচা, বাটুল, ফুকোনল, সাতনল, লাঠি ইত্যাকার হাতিয়ার তো বানিয়েছেনই, শস্য রাখার পাত্র ডোল, বেড়, ঘরের বেড়া, খুঁটি, ঝুড়ি-ঝাকা মাছ ধরার অজস্র ফাঁদ ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছেন। এককথায় বাঁশ-ধান-রবিশস্য-মাছ অস্ট্রিক সভ্যতার প্রধান উপাদান, ভৌত উপাদান। অস্ট্রিকরা একাধিক জীবনে বিশ্বাস করতো। কারো মৃত্যু হলে তার আত্মা কোনো পাহাড় অথবা গাছ অথবা কোনো জন্তু বা পাখি বা অন্য কোনো জীবকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, এই ছিল তাদের ধারণা। এই ধারণাই পরবর্তীকালে হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে রূপান্তরিত হয়। এরা মৃতদেহ কাপড় অথবা গাছের ছালে জড়িয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতো বা মাটির নিচে কবর দিয়ে তার উপর বড় বড় পাথর সোজা করে পুতে দিতো, মৃত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে আহারও দান করতো। এ ধরনের রীতি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে পূর্ব বগুড়ার মুসলমান সমাজে আজো লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার পর কবরের ওপর মসুর, মাষ অথবা অড়হর জাতীয় কালাই বুনে দেয়া হয় এবং কবরের ওপর একটি বাঁশ মৃত ব্যক্তির সোজাসুজি শুয়ে রাখা হয়। এ ছাড়াও পূর্ব বগুড়ার কোথাও কোথাও কবরের ওপর তিনদিন, কোথাও বা সাতদিন সন্ধ্যাবেলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

অস্ট্রিকভাষীরা বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল, কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ পশুপাখি ইত্যাদির ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার পূজা করতো। বাংলাদেশে পাড়াগাঁয়ে বৃক্ষপূজা আজো বহুল প্রচলিত, বিশেষ করে শেওড়াগাছ ও বটগাছ। তুলসী গাছ তো হিন্দুদের দৈনন্দিন পূজারই একটি অংশ। পূর্ব বগুড়ার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই আজো বটগাছকে পূজা করতে দেখা যায়। আমাদের দেশে যে নবান্ন উৎসব এবং বাঙালির বিয়েতে ধান, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির প্রচলন দেখা যায় তাও অস্ট্রিকদেরই দান। পূর্ব বগুড়ায় মুসলমানদের বিয়েতেও সিঁদুর ও কলাগাছের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশের হোলি বা চড়ক উৎসব এবং পূর্ব বগুড়ায় প্রচলিত ভুল্যা খেদানোর উৎসব প্রভৃতির আদি উৎস আর্যপূর্ব আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠী।

'আর্যমঞ্জশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকদের বলা হয়েছে অসুরভাষী। অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা। আসামেও এই অসুরভাষী লোকের বিস্তৃতি ছিল। বাংলাদেশের কোল মুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠির অন্যতম বুলির নাম এখনও অসুর বুলি। কাজেই এক সময় গৌড় পুণ্ড্রে যে এই বুলিই প্রচলিত ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। এ সত্যতার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় কোল-মুণ্ডা ভাষার ব্যাপক প্রভাবের দিকে তাকালে। বাংলা ভাষার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো এর দ্বিস্বরধ্বনি। (Diphthongs) যেমন- ঐ, ঔ, অয়, ইই, ইউ, এই, এউ, এএ, এও, অ্যাএ, অ্যাও, ওএ, ওও ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলো শুধু বাংলা ভাষারই বৈশিষ্ট্য নয়, মুণ্ডা ভাষারও বৈশিষ্ট্যপূর্ব বগুড়ার ভাষায় এই দ্বিস্বরধ্বনির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

আসামে ও বাংলাদেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে এক পণ অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে পান, সুপারি, কলা, বাঁশ, এমনকি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্য এখানে এ ভাবেই গণনা করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং গণনা রীতি দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতাল ও মুণ্ডারী ভাষাতেও এই কুড়ি এবং একই গণনারীতি লক্ষ করা যায়। পূর্ব বগুড়ার জনসমাজেও এই একই গণনারীতি আজো প্রচলিত। এ অঞ্চলে ধানের বিছন (চারাগাছ), ধান, পাট, গম, প্রভৃতির আটি, পাট কাটা ও ধোয়ার হিসাব, বাঁশ, সুপারি, পান, কলা প্রভৃতির গণনা আজো গণ্ডা, কুড়ি ও পণের হিসাবে করা হয়। এ অঞ্চলে গণ্ডা, কুড়ি ও পণের হিসাব হলো ৪টি = ১ গণ্ডা, ৫ গণ্ডা = ১ কুড়ি, ৪ কুড়ি = ১ পণ। অস্ট্রিক ভাষীরাও ঠিক এভাবেই গণনা করতো। গণ্ডা এখানো কুড়ি বা পণ হিসাবের একক। পুণ্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানে প্রাপ্ত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শিলালিপিতে যে গণ্ডকমুদ্রার কথা বলা হয়েছে, এই গণ্ডা থেকেই সেই গণ্ডক মুদ্রার উৎপত্তি বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। অস্ট্রিক ভাষার কিছু শব্দ যেমন– ছোঞ্চা (বাড়ি ঘরের চিকন গলি অথবা, ঘরের বারান্দা), ঠ্যাং (গোড়ালি হতে হাঁটু পর্যন্ত), জং (জঙঘা), পাগার (পুকুর), বরজ (পানের), দও বা দহ (জলভরা গভীর গর্ত) প্রভৃতি শব্দ বগুড়ার জনসমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সম্ভবত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে অস্ট্রিকরাই প্রথম কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তন করে। এদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। কৃষি সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কৃষি কর্মের দেবতা পৃথিবীর সর্বত্রই নারী। নারীরাই প্রথম কৃষির উদ্ভাবন করে। পূর্ব বগুড়ার কৃষিভিত্তিক জনসমাজে এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ জীবনের কিছু ইঙ্গিত আজো লক্ষ করা যায়। এ অঞ্চলে ছেলের বিয়েতে অভিভাবক মহলে একটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো, কনে পক্ষের মাতৃকুল দেখা। এ অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো 'নানেন কুল দেখে বিয়ে কর' অর্থাৎ পাত্রীর মায়ের কুল- এর খোঁজ নিয়ে তারপর বিয়ে কর। এ সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস হলো যদি কনে বা পাত্রীর মায়ের কুল ভালো হয় বা বড় বংশের হয় তাহলে পাত্রীটিও ভালো হবে, আর যদি পাত্রীর মায়ের কুল খারাপ বা ছোট বংশের হয় তাহলে পাত্রীটিও খারাপ হতে বাধ্য। পূর্ব বগুড়ার আরেকটি লোকবিশ্বাস হলো 'মামা কর্তৃক ভাগ্নেকে মারা হয় না, মারলে মামার হাত কাঁপে;' অর্থাৎ যে হাত দিয়ে মামা ভাগ্নেকে মারে, মামার সেই হাত পঙ্গু হয়ে যায়। সে কারণে এ অঞ্চলের মামারা আজো পারতপক্ষে ভাগ্নের গায়ে হাত তোলে না। এই বিশ্বাস এবং প্রবাদটি যেন এ অঞ্চলের প্রাচীন আদি অস্ট্রালয়েড মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করছে।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিকদের পর দ্রাবিড় বা ভেড্ডিদের কথা বলা হলেও উত্তরবঙ্গ তথা বগুড়ায় এদের প্রভাব খুব একটা নেই। অস্ট্রিকদের পরেই এ অঞ্চলে যে জনধারার প্রভাব লক্ষ করা যায় তা হলো মঙ্গোলীয় জনধারা। মঙ্গোলীয়দের দৈহিক বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠনের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। চেপ্টা নাক, গালের উঁচু হাড়, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম, গোল বা মাঝারি মাথা, চোখের কোণে ভাঁজ, সাধারণভাবে এগুলোই হলো মঙ্গোলীয় চেহারার বৈশিষ্ট্য। উত্তরবঙ্গে মঙ্গোলীয় জনধারায় যে শাখার ছাপটি সবচেয়ে বেশি

www.pathagar.com

নৃবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন প্যারোইয়ান। প্যারোইয়ানদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কোচ ও রাজবংশীদের চেহারার সাদৃশ্য বেশি। বগুড়াতেও এই শাখাটির কিছুটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। পূর্ব বগুড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে দীর্ঘসময় কামরূপ রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসামের ইতিহাসে জানা যায় মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বোড়ো শাখা অতি প্রাচীনকালে (আর্য আগমনের পূর্বে) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সাম্রাজ্য আসামের পূর্ব সীমা থেকে পশ্চিমে করতোয়া নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীযুগে ইন্দো-মঙ্গোলীয় কিরাতজনের (কালিকাপুরাণ, অমরকোষ, যোগনীতন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত)। অন্যতম শাখা আহমদের সঙ্গে এরা মিলিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের কোচ-রাজবংশী প্রভৃতি এই বোড়ো ও আহমদেরই উত্তরসূরি। এ অঞ্চলে সংখ্যায় অল্প হলেও কোচ ও রাজবংশীর উপস্থিত প্যারোইয়ান মঙ্গোলীয় জনধারার প্রভাব প্রমাণ করে। কোচ, রাজবংশী প্রভৃতি দীর্ঘমুণ্ড প্যারোইয়ান মঙ্গোলীয় নৃবিজ্ঞানে চিহ্নিত হয়েছে long head Mongolotype বলে। পূর্ব বগুড়ায় আদি-অস্ট্রালয়েড জনধারার সঙ্গে প্যারোইয়ান বা long head Mongolotype এর একটি মিশ্রণ ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ার মানুষের নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে বগুড়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল মতিন আজকের বগুড়া (১৯৬৮) গ্রন্থে 'পৌণ্ড্রবর্ধনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' নামক প্রবন্ধে (পৃ. ৫৭) বলেছেন :

'পৌণ্ড্রবর্ধনের ক্ষেত্রে Mongolo Dravidian type এর চাইতে Mongolo Austric type'র প্রভাবটাই ব্যাপক। আমাদের বগুড়া জেলার ক্ষেত্রে পূর্ব বগুড়ায় Mongolo Dravidain type'র সাথে long head Mongolotype এর কিছুটা সংমিশ্রণ (intercource) হয়েছে; এবং সেও হাল জামানার কথা কুল্লে আড়াই থেকে তিন শতাব্দীর ব্যাপার মাত্র। পূর্ব বগুড়াকে বাদ দিলে গোটা পশ্চিম বগুড়া তথা পৌণ্ড্রবর্ধন ভূমির নরগোষ্ঠী Mongolo Austric type ধারার লোক।'

আবদুল মতিন পূর্ব বগুড়ার long head Mongolotype এর প্রভাবকে হাল জামানার কুল্লে আড়াই থেকে তিন শতাব্দীর ব্যাপার বললেও এ অঞ্চলের ইতিহাস পাঠে আমাদের কাছে ব্যাপারটি আরও একটু প্রাচীন বলেই মনে হয়। আমরা মনে করি পূর্ব বগুড়ায় আদি-অস্ট্রালয়েডদের সঙ্গে দীর্ঘমুণ্ডী মঙ্গোলদের সংমিশ্রণ ঘটে সপ্তম শতকের কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মার পরবর্তী সময়ে। কেননা ভাস্করবর্মার সময় থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত মাঝে পাল ও সেন আমল ব্যতীত দীর্ঘ প্রায় চারশত বছর পূর্ব বগুড়া ছিল মঙ্গোলীয়দের উত্তরসূরি কামরূপ শাসকদের অধীন। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ে পূর্ব বগুড়ায় মঙ্গোলীয় এবং তাদের উত্তরসূরিদের প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক।

পূর্ব বগুড়ার লোকসংস্কৃতির দিকে তাকালে এই সত্যতার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে প্রথমেই তন্ত্র-মন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। পূর্ব বগুড়ার লোকজীবনে আজও তন্ত্র-মন্ত্রের একটি ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আর এ তন্ত্র-মন্ত্রের উৎপত্তি ও কেন্দ্রস্থল হলো কামরূপ কামাখ্যা। মির্জা নাথন তাঁর 'বাহারিস্তান ই-গায়েবী' (১৬৩২ খ্রি.) গ্রন্থে কামরূপ কামাখ্যাকে জাদুবিদ্যার কেন্দ্রস্থল বলেছেন। কামরূপ রাজ্যের একজন অত্যাচারিত শাসকের মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, খন্তাঘা

www.pathagar.com

(কামরূপ) পরগণায় একজন ক্রোড়ী মুহম্মদ জামান তাবরিজী স্বীয় অত্যাচারিত প্রজাদের দ্বারা যাদুটোনার ফলে মৃত্যুবরণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন :

'আসল কথা হলো যে, কোনো ব্যক্তি (প্রজা) মুহম্মদ জামানকে যাদুটোনা করেছিল; ফলে দু'তিন দিন ধরে তিনি কুকুর, বিড়াল ও ঐ জাতীয় অন্যান্য জীবজন্তুর মতো শব্দ করেন এবং এভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।'

বাংলার গুণীরা গুণশিক্ষার জন্য কামাখ্যা গমন করতেন। কামাখ্যার রমণীরা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। লোকসমাজে এরা ডাকিনী নামে পরিচিত। পূর্ব বগুড়ায় এক সময় এই ডাকিনী বা নারী ওঝার ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল। আজো পূর্ব বগুড়ায় পাতাখেলা নামে একটি খেলা প্রচলিত আছে, যা সম্পূর্ণই মন্ত্রশক্তির খেলা। মন্ত্রশক্তিতে কে কতো বলীয়ান তারই পরীক্ষা হয় এ খেলায়। রংপুর অঞ্চলেও খেলাটির প্রচলন দেখা যায়। পূর্ব বগুড়ায় দেখা যায়, ফকিররা তুলারাশির লোকের ওপর মন্ত্র প্রয়োগ করে ভূতের 'আছর' ঘটায় এবং এদের সম্মোহিত করে রোগের কারণ ও চিকিৎসার উপায় জেনে নেয়।

পূজা পাতার অনুষ্ঠান কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যেও দেখা যায়। রাজবংশীদের লোকবিশ্বাসের সঙ্গে পূর্ব বগুড়ার মানুষের লোকবিশ্বাসের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই প্রতিষেধক রূপে লোহা ও ঝাঁটার ব্যবহার দেখা যায়। রাজবংশী মহিলারা রাতে বাইরে বেরুনোর সময় লোহা সঙ্গে রাখেন। শিশু জন্মের পর বিছানার নিচে এক টুকরো লোহা এবং পাশে ঝাঁটা রাখা হয়। পূর্ব বগুড়ার মানুষের মাঝেও অনুরূপ বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। রাজবংশী 'দ্যাওভূত' এবং পূর্ব বগুড়ার মানুষের 'দ্যাও' ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রংপুর কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত কৃষ্ণধামালী পূর্ব বগুড়ায় মালসী নামে পরিচিত। পূর্ব বগুড়ায় আজো মাদারের বাঁশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুরের কেল্লাকুশি এবং পূর্ব বগুড়ার প্রান্ত অঞ্চলে মাদারের বাঁশ উৎসবকে কেন্দ্র করে এখনো জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা বসে। 'নেপালে এবং তিব্বতেও ভিন্ন নামে এই বাঁশ উৎসব প্রচলিত আছে। নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কারণেই পূর্ব বগুড়ার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রংপুর এবং আসাম অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিরও কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

চ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

করতোয়া নদী বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জেলাকে শুধু দুটি প্রধান ভৌগোলিক ভাগেই বিভক্ত করেনি এ জেলার মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যও সূচিত করেছে। পূর্ব বগুড়া অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, নিচু জলাশয়ে বেষ্টিত এবং মৃত্তিকা পলি বা বেলে দো-আঁশ নির্ভর হওয়ায় এখানকার কৃষি, বাড়িঘর, আহার, জীবনাচার ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বগুড়া বরেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানকার কৃষি, বাড়িঘর, আহার এবং জীবনাচারে বরেন্দ্রী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ায় সাধারণত দু'ধরনের বাড়িঘর দেখা যায়। পূর্ব বগুড়ায় বাঁশ, ছন ও টিনের বাড়িঘর বেশি। এক্ষেত্রে বাঁশ, ছন, চাটাই, পাটখড়ি বা টিন দিয়ে দোচালা বা চারচালা বাড়িঘর চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বগুড়ায় অধিকাংশ বাড়িঘর মাটির। দোতলা মাটির ঘর এ অঞ্চলে বেশি চোখে পড়ে। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে মোটা করে মাটির দেয়াল নির্মাণ করে তার ওপর চারচালা টিন বা ছন ব্যবহার করা হয়।

শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয় বাড়িঘরের প্রতিবেশগত পার্থক্যও লক্ষ করা যায় বগুড়ার দু অঞ্চলে। পূর্ব বগুড়ার অধিকাংশ বাড়িঘর একটি বাড়ির সঙ্গে আরেকটি বাড়ি সংযুক্ত। এ ধরনের বাড়িকে যৌথবাড়ি বলে। এ অঞ্চলে এমন পাড়াও চোখে পড়ে, এক বাড়িতে পা দিলে পুরো পাড়া ঘুরে আসা যায়। যৌথবাড়িতে প্রতিটি বাড়ি একে অপরের সঙ্গে লাগোয়া হওয়ায় বাড়ির ভেতরে ও বাইরে থাকে দীর্ঘ উঠান। সংযুক্ত বাড়িগুলো সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে। পরিবারের বাড়তি সদস্যের আবাসন সমস্যা মোকাবেলায় অন্য কোন জায়গায় নতুন বসতি গড়ে ওঠলে সেখানে এককভাবে যে বাড়ি গড়ে ওঠে তাকে একক বাড়ি বা ফাট্যা বাড়ি বলে। যেখানেই বাড়িঘর নির্মাণ করা হোক না কেন এ অঞ্চলের যৌথ ও একক উভয় বাড়িঘরের বৈশিষ্ট্য হলো– প্রতিটি বাড়ি পূর্ব বা দক্ষিণমুখি। বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ হলো :

দক্ষিণ দিয়েরি ঘরের রাজা
পূর্ব দিয়েরি তাহার প্রজা
উত্তর দিয়েরির খাজনা নাই
পশ্চিম দিয়েরির মুখেত ছাই।

এ অঞ্চলে প্রতিটি বাড়ির ভেতরে ও বাইরে উঠোন থাকে এবং প্রতিটি ঘরের ভেতরে একটি মাঁচা থাকে। মাঁচায় ধান, চাল থেকে শুরু করে সবধরনের দ্রব্য রাখা হয়। বাইরের উঠোনের সঙ্গে সড়ক বা রাস্তা সংযুক্ত থাকে। উঠোনের এক পাশে গোয়ালঘর অন্যপাশে গরুর খাবার খড়ের পালা। কিছুটা জায়গায় ফলজ গাছপালা। সামর্থ্যবানের বেলায় বাইরের উঠোনের সামনে একটি পুকুর থাকে। প্রতিটি বাড়ির ভেতরের উঠোনের একপাশে রান্নাঘর (রান্নাঘরের ভেতরে থাকে ঢেঁকি, খড়ি ও চুলা) অন্য পাশে টিউবওয়েল, গোসলখানা ও পায়খানা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পায়খানা রান্নাঘরের পেছনে গোসলখানা থেকে একটু দূরে হয়ে থাকে। রান্নাঘরের পেছনে থাকে ডোবা, নালা যেখানে বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়। ডোবার আশেপাশে থাকে বাঁশ ঝাড় এবং বিভিন্ন বনজ ও ফলজ গাছপালা।

পশ্চিম বগুড়ার দ্বিতল মাটির বাড়িঘরগুলো পূর্ব বগুড়ার মতো আড়াআড়ি সংযুক্ত নয়। এ অঞ্চলের সব বাড়িতেই বাইরের উঠোন চোখে পড়ে না। তবে সব বাড়িতেই স্বল্প পরিসরে হলেও ভেতরে একটি উঠোন থাকে। উঠোনের এক পাশে, দুইপাশে, তিনপাশে কখনো বা চারপাশেই মাটির ঘর থাকে। আবাসন সমস্যার ক্ষেত্রে মূল বাড়ির পাশে, সামনে অথবা পেছনে জায়গা ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি বাড়ি মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকে।

www.pathagar.com

পোষাক-পরিচ্ছদ বা অলংকারের ক্ষেত্রে বগুড়ার দু'অঞ্চলের মানুষের তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব বগুড়ায় কাউন, খেরাচি, তিল, ছোলা, বাদাম এবং নানান ধরনের শাক সবজি উৎপাদিত হয় বলে এ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এ সবের ব্যবহার দেখা যায়।

পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন বলে এ দু'অঞ্চলের মানুষের আনন্দ উৎসবের মাত্রাটিও ভিন্ন রকমের। শীতের শুরুতেই পূর্ব বগুড়ার প্রায় সর্বত্রই যাত্রা, সার্কাস, গান বাজনা ইত্যাদির আসর বসে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বগুড়ার প্রায় সর্বত্রই এ সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আধিক্য দেখা যায়। পশ্চিম বগুড়ার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এ সময় 'ইছালে ছওয়াব' এর উৎসব চলে। এ উৎসব উপলক্ষ্যে জামাই-ঝি, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই দাওয়াত করা হয়। সারারাত ধরে চলে বয়ান তাফসীর। পূর্ব বগুড়ার মানুষের তুলনায় পশ্চিম বগুড়ার মানুষ তুলনামূলক বেশি ধর্মপ্রবণ। পশ্চিম বগুড়ার মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি সম্পর্কে কাজী মোহাম্মদ মিছের বগুড়ার ইতিকাহিনি (১৯৫৭) গ্রন্থে লেখেন :

'দাড়ি বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা উত্তর-পশ্চিম বগুড়ায় খুব বেশি। শতকরা ৯৯ জন মুসলমান এই অঞ্চলে দাড়ি রাখিয়া থাকেন। ধর্মাদির অনুষ্ঠান করুক বা না করুক পাকিস্তান সৃষ্টির পর দাড়ি রাখা ইহারা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে পশ্চিম বগুড়ায় ধর্ম এবং আধুনিক প্রথার 'ওরছ' পর্ব সম্পাদনের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। এই নিমিত্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম বগুড়ায় 'হাজী'র সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। বর্তমান যুগে পীর-মুরিদার সংখ্যা পশ্চিম বগুড়াতেই অধিক বিবেচিত হইয়া থাকে'।

পশ্চিম বগুড়ায় যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদি বিশেষ কোন উৎসব, বৃহৎ কোন মেলা ছাড়া অন্য কোন সময় খুব একটা হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে পূর্ব বগুড়ায় কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রায় প্রতিমাসেই কোথাও না কোথাও যাত্রা, সার্কাস, পালা বা কবি গানের আসর বসে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মানুষ যাত্রা, সার্কাস দেখে থাকে। তবে বর্তমানে যাত্রায় অশ্লীলতার উপকরণ বেড়ে যাওয়ায় নারী দর্শক অনেকটাই কমে গেছে। কৃষিভিত্তিক উৎসবের মধ্যে পূর্ব বগুড়ার প্রায় সর্বত্রই কার্তিক সংক্রান্তিতে 'ভূল্যাখানানো'র উৎসব এবং পৌষ মাসে 'মাগন তোলা' ও সংক্রান্তির দিন 'পুষণে উৎসব' হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে পশ্চিম বগুড়ায় এ ধরনের অনুষ্ঠান খুব একটা চোখে পড়ে না। পূর্ব বগুড়ায় নদী-নালা, খাল-বিল প্রচুর বলে এ অঞ্চলে প্রতি বছর নৌকা বাইচের উৎসব হয়। সেই সঙ্গে চলে লাঠিখেলা। এছাড়া জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গানের প্রচলন দেখা যায় পূর্ব বগুড়ায়। পশ্চিম বগুড়ায় গানের এতো বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় না।

ছ. নদ-নদী ও খাল-বিল

বগুড়া জেলায় ছোট বড় অনেক নদী রয়েছে। করতোয়া নদী এ জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ করেছে। পূর্বভাগের নদীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– যমুনা, বাঙ্গালি, ইছামতি, হলহলিয়া, মানস, সুখদহ,

www.pathagar.com

মহিষাবান ইত্যাদি। পশ্চিম ভাগের নদীগুলোর মধ্যে নাগর, চন্দ্রাবতী ও ভাদাই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক বিল ও দিঘি রয়েছে যেমন- বেতগাড়ী, সুবিল, এরুলিয়া, জিয়াদহ, পোড়াদহ বিল, নুরুলের বিল, কাচিয়ার বিল এবং দিঘি সমূহের মধ্যে আদমদিঘি, শহরদিঘি, বাদলা দিঘি, খেতার দিঘি ইত্যাদি।

জ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বগুড়া একটি অন্যতম শিক্ষানগরী। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্বে প্রাচীন জনপদ রূপে পুণ্ড্রখ্যাত বগুড়ার মহাস্থান গড়ের ভাসুবিহার প্রাচীনকালে দীর্ঘদিন বৌদ্ধশিক্ষালয় ছিল। পুণ্ড্রের অন্যতম শিক্ষালয় ছিল সোমপুর মহাবিহার। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষা ব্যবস্থা টোল ও মক্তব কেন্দ্রিক ছিল। আধুনিককালে ইংরেজ শাসনের মধ্যপর্বে বগুড়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এ লক্ষ্যে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া শহরে একটি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ স্কুলটি বাংলা স্কুল বা পৌর উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিতি। এরপর ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বগুড়া জিলা স্কুল।

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জেলায় একমাত্র মেয়েদের স্কুল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (ভিএম) স্কুল। বর্তমানে এই স্কুলটি সরকারি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। উনিশ শতকেই জেলায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় শেরপুর ডিজে হাইস্কুল এবং ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নওখিলা পিএন উচ্চ বিদ্যালয়। পরবর্তীকালে জেলায় আরও যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেগুলি হলো : বগুড়া করোনেশন ইন্সটিটিউট (১৯১২), বগুড়া সিটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯৬৫), বগুড়া ইয়াকুবিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, আর্মড পুলিশ স্কুল এন্ড কলেজ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, সারিয়াকান্দি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি।

উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বগুড়ায় কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজিজুল হক কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আজিজুল হকের নামানুসারে এই কলেজের নামকরণ করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুসাহিত্যিক- ড. সৈয়দ মুজতবা আলী'র মতো জ্ঞানতাপস এই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স ছাড়াও, ডিগ্রি পাস কোর্স, ২৪টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জেলার দ্বিতীয় কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় চন্দনবাইশা ডিগ্রি কলেজ। পূর্ব বগুড়ায় প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে এ কলেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পরবর্তীকালে জেলায় আরও যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হলো- সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ (১৯৬৪), সরকারি শাহ সুলতান কলেজ (১৯৬৭), শেরপুর কলেজ (১৯৬৮), গাবতলী সরকারি কলেজ, সৈয়দ আহমদ কলেজ প্রভৃতি। মাদ্রাসা

www.pathagar.com

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা এবং শেরপুর আলিয়া মাদ্রাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও জাতীয় কম্পিউটার গবেষণা একাডেমি (নেটকার) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঝ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

পুন্ড্রনগরী খ্যাত বগুড়ায় আধুনিক স্থাপত্যকলার তেমন কোনো বিকাশ না ঘটলেও প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে এ জেলা বিখ্যাত। পুন্ড্রনগরী এ জেলার অন্যতম প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ।

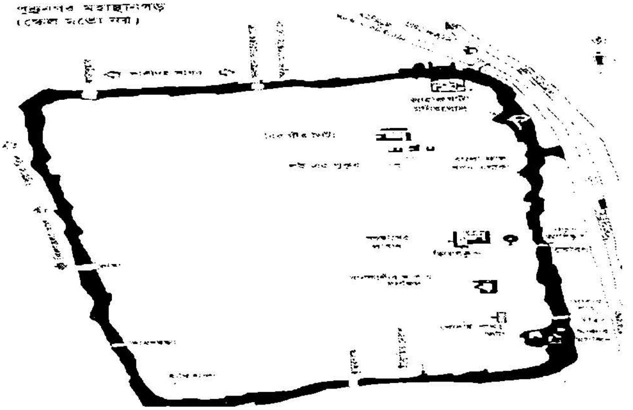

মহাস্থানগড়ের নকশা

বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পশ্চিম পাশে ও করতোয়া নদীর ডান তীরের বাঁকে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই যে বাংলার প্রাচীন পুন্ড্রনগরী এ ব্যাপারে দেশ-বিদেশের সকল ঐতিহাসিক একমত। প্রাচীন এ নগরী আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত। এর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রতিটি বাহু ১.৫২৫ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিটি ১.৩৬৫ কিলোমিটার লম্বা। প্রতিটি বাহুতে রয়েছে প্রশস্ত এবং উঁচু প্রাচীর। বর্তমানে এর প্রতিটি বাহুতে এক বা একাধিক ফাটল দেখা যায়। এর মধ্যে দক্ষিণ বাহুর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ফাটলটি 'বুড়ির দরজা' পশ্চিম বাহুর মাঝামাঝি স্থান 'তাম্র দরজা' উত্তর বাহুর মাঝামাঝি অংশেরটি 'সনাতনসাহেব গলি' এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণেরটি 'দোরাব শাহের তোরণ' নামে পরিচিতি। এছাড়া সনাতন সাহেবের গলির পূর্বদিকে একটি এবং পশ্চিম বাহুতে আরও দুটি ফাটল আছে। গড়ের উত্তর ও পূর্ব বাহুর সংযোগ স্থলটি প্রায় গোলায়িত বুরুজের মতো বাইরের দিকে প্রলম্বিত। এর প্রান্তের ৩০.৪৮ মিঃ অংশ অন্তপ্রবৃদ্ধ (re-entrant)

www.pathagar.com

গোলায়িতভাবে বুরুজের মতো বাইরের দিকে উদগত। এ অংশটি 'মনিরঘোন' নামে পরিচিত। এর পশ্চিমের অংশটি 'জাহাজঘাটা। গড়ের সম্পূর্ণ দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহুদ্বয় এবং উত্তর বাহুর কিছু অংশ বাইরের দিকে কৃত্রিম পরিখা দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ বাহুর পরিখাটি 'বানারসীর বিল', পশ্চিম বাহুটি 'মথুরা খাল' এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের পরিখাটি 'কালিদহ সাগর' নামে পরিচিত।

দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ভূমি পাশ্ববর্তী আবাদি জমি থেকে গড়ে ৪.৫৭ মিঃ উঁচু। তবে দক্ষিণ-পূর্বে কোণটি প্রায় ১২.১৯ মিঃ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি ১৩.৭২ মিটার উঁচু। প্রথমোক্ত কোণে বিখ্যাত শাহ সুলতান বলখী মাহিসওয়ারের রওজা মোবারক, আঠার শতকের একটি মসজিদ, সালামি দরজা ইত্যাদি ইমারতাদির অবস্থান। এ স্থান থেকে গড়ের ভূমিপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমেই হ্রাস পেয়ে উত্তর-পশ্চিম অংশে জলাভূমির আকার ধারণ করেছে। এ অংশে প্রাচীন কীর্তিসহ আধুনিক বাড়িঘরের কোন চিহ্ন নেই। তবে গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি এত উঁচু এবং মোচাকারে উত্থিত যে স্থানীয় জনগণ এর নাম দিয়েছে 'হাতিবান্দা'। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ক্রমে উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর অগ্রসর হলে বেশ কয়টি মাঝারি আকারের ঢিবির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। স্থানীয় জনগণের নিকট এগুলো খোদার (খোদাই) পাথর ভিটা, পরশুরামের বসতবাড়ি, মানকালীর ভিটা ও বৈরাগীর ভিটা নামে পরিচিত।

ব্রাহ্মলিপি উৎকীর্ণ পাথরপট্টি

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি শিলালিপি। এরমধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপিটি একটি ক্ষুদ্রাকার চুনাপাথরের পট্ট। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে আংশিক খননের ফলে এখানে ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ উক্ত শিলাখণ্ডটি আবিস্কৃত হয়। ক্ষুদ্রাকারের এ শিলালিপিটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল বলে বিবেচিত হয়। এই লিপির পাঠ থেকে জানা যায়, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা ঐ জাতীয় মহামারির সময় সম্রাট (অশোক) পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'প্রজাদেরকে রাজভাণ্ডার থেকে ধান্য এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা

www.pathagar.com

দিয়ে সাহায্য করার জন্য কিন্তু সুদিন ফিরে আসলে ধান্য ও মুদ্রা উভয়ই রাজভাণ্ডারে প্রত্যাপর্ণ করতে হবে' (বাঙালির ইতিহাস-আদিপর্ব)।

দ্বিতীয় লিপিটি আরবি ভাষা ও নাস্তালিক হরফে একটি কালো পাথর পট্টের এক পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ আছে। এ শিলালিপির পাঠ থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে মীর নমুর খান নামক এক ব্যক্তির একটি রওজা নির্মাণের বিবরণ পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা এ নামুর খান মীর-ই-বাহর বা রণতরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। শিলা লিপির এ পঠনের প্রেক্ষিতে অনুমতি হয় যে, বাংলায় মুসলিম বিজয় অনুষ্ঠিত হওয়ার (১২০৪-৫ খ্রি.) পর পরই মহাস্থানে একটি জলচোকি স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত এ জলচৌকিটির মূল অংশ জাহাজঘাটা বা তৎসংলগ্ন স্থানে অবস্থিত ছিল।

অপর একটি কালোপাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপি রয়েছে মহাস্থানগড়স্থ মসজিদের প্রবেশ পথের উপরের অংশে। ফারসি ভাষায় লিখিত এ শিলালিপির বিবরণ অনুযায়ী জনৈক খোদাদিল কর্তৃক মসজিদটি ১১৩০ হিজরিতে (১৭১৯ খ্রিঃ) সম্রাট ফররুখ শিয়রের শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া হযরত শাহ্ সুলতান মাহিসওয়ারের মাজারের দক্ষিণদিকস্থ তোরণের কালোপাথরের বাজুর একটি অংশে আদি বাংলা বর্ণমালায় 'শ্রীনরসিংহ দাসস্য' কথাটি উৎকীর্ণ আছে। রীতিবিন্যাস অনুযায়ী এ লিপি খ্রিষ্টিয় সতের শতকের ধারা বহন করছে। ১৯১৯ সালে গড়ের দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে মানকালীর কুণ্ডের বরাবর পূর্ব দিকে একটি পুকুরের অস্তিত্ব ছিল। ঐ বছর ঐ পুকুরের কিছু অংশে মাটি কাটার সময় একটি পাথর খণ্ড আবিস্কৃত হয়। এর উপর দেব-নাগরী রীতিবিন্যাসে এবং সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ কিছু লিপি ছিল। এর পাঠোদ্ধার থেকে নন্দী উপাধিধারী কিছু লোকের নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একজন গোপগৃহ নামক গ্রামে বাস করতেন বলেও উল্লিখিত আছে। পণ্ডিতদের ধারণা বর্তমানের গোকুল গ্রামই ছিল উক্ত গোপগৃহ।

গোবিন্দ ভিটার মন্দির

মহাস্থানে খননকৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গোবিন্দ ভিটার মন্দির আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য। ভগ্নাবশেষটি মহাস্থান দুর্গপ্রাচীরের বহির্দেশে উত্তরদিকে অবস্থিত। এটি গোবিন্দ বা বিষ্ণু মন্দির বলে পরিচিত। কিন্তু খননের ফলে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যার সাহায্যে এটাকে কোন বৈষ্ণব মন্দির বলা যেতে পারে।

ভগ্নাবশেষ যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা শেষ গুপ্তযুগ থেকে মুসলমান আমল পর্যন্ত চার পর্যায়ে বিভক্ত। ৬ ফুট চওড়া প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে দু'ধরনের যে স্থাপত্য দেখা যায় তাতে সহজেই পূর্ব ও পশ্চিম এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। খ্রিষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে নির্মিত বহিঃপ্রাচীরটি পশ্চিম দিকে ১১৪ ফুট লম্বা এবং কোথাও কোথাও সংরক্ষিত অবস্থায় ৮ ফুট থেকে ১১ ফুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণের দেয়াল দু'টি পশ্চিম দেয়াল থেকে ৮০২ ফুট পর্যন্ত যাবার পর বিলীন হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকে দেয়াল থেকে ৮০ ফুট পর্যন্ত যাবার পর বিলীন হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকে প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে প্রথম নির্মাণকালের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা ৬ষ্ঠ-৭ম খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।

www.pathagar.com

১৬টি উৎগত অংশযুক্ত এর ভিত্তি, পশ্চিমের বহিঃপ্রাচীর থেকেও ১১ ফুট গভীরে প্রবেশ করেছে। মন্দিরটির পশ্চিম বাহু বহিঃপ্রাচীরের সমান্তরালে ৬ ফুট দূরে অবস্থিত।

এর মধ্যে ৫ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট লম্বা একটা বারান্দার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। বারান্দাটি পরিত্যক্ত হবার পর বেষ্টনীপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়। ধরা যেতে পারে এগুলি পালযুগে নির্মিত হয়েছিল। ২য় নির্মাণ যুগে পূর্বোক্ত বারান্দার একই স্থানে একই মাপে আর একটি বারান্দা তৈরি করা হয়েছিল। ২য় পর্যায়ের দালানের ভিত্তিমূলকে কয়েক ফুট উঁচু করে মাঝখানে বহুতল বিশিষ্ট এক সুউচ্চ ইমারত তৈরি করা হয়েছিল। উপরতলার মধ্যবর্তী দেয়ালগুলোর বহির্ভাগকে কতগুলি সমান্তরাল দেয়ালের সঙ্গে ছোট ছোট আড়াআড়ি দেয়াল দিয়ে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যে, বহির্ভাগের ভিত্তি দেয়ালে ছোট ছোট কুঠুরির সৃষ্টি হয়েছে। একই পদ্ধতি কেন্দ্রস্থলে নেই। খুব সম্ভব বেদিটি উপরের সুউচ্চ গাঁথুনির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। উপরোক্ত কুঠুরি তিনটির মধ্যে পাতকূপ দেখা যায়। নির্মিত অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষবিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ পদ্ধতি প্রাচীন বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য কৌশল। কেন্দ্রীয় বেদির চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষগুলোকে নিরেট শক্ত মাটি ভর্তি করে ভূমিকে এমনভাবে দৃঢ় করা হয় যাতে তার উপর সুউচ্চ ইমরাত নির্মাণ করা যায়।

জীয়ত কুণ্ড

তথাকথিত পরশুরামের প্রাসাদের ঠিক পূর্বদিকে জীয়তকুণ্ড ও বা জীবনকূপ অবস্থিত। থাকে থাকে নিচের দিকে ক্রমহ্রাসমান এ কূপটির উপরিভাগের পরিধি ১২ ফুট ৮ ইঞ্চি। একটা গ্রানাইটার পাথর (৬ ফুট ১০ ইঞ্চি ×১ ফুট ৮ ইঞ্চি ×১ ফুট ৬ ইঞ্চি) কূপের পূর্বধারে রক্ষিত। পূর্ব প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত এ পাথরটি সম্ভবত গুপ্ত যুগের কোন এক হিন্দু মন্দিরের দরজার অংশবিশেষ ছিল। কূপটির তলদেশ পর্যন্ত দুই সারিতে আরও অনেকগুলো প্রস্তরখণ্ড আংশিক বাইরে রেখে দেয়ালের সাথে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের উপর থেকে তলদেশ পর্যন্ত সিমেন্ট দ্বারা প্লাস্টার করা। উপরে কিছু প্লাস্টার খসে পড়ায় দেখা যায় যে, মুসলমান যুগের ছোট ছোট ইট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ইট পাটকেল ও অন্যান্য আর্বজনা দ্বারা কূপটি ভরাট হয়ে গেছে।

কথিত আছে যে, শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পরশুরাম এই কূপের জলের সাহায্যে তাঁর মৃত সৈন্যদেরকে পুনর্জীবিত করতে পারতেন। শাহ সুলতান কূপটির জলের এ জীবনদানের ক্ষমতার কথা জানতে পেরে একটি চিলের সাহায্যে এর মধ্যে একটুকরা গোমাংস নিক্ষেপ করেন। এতে কূপটির অলৌকিক ক্ষমতা নষ্ট হয়, ফলে পরশুরাম পরাজিত হন।

বৈরাগীর ভিটা

বৈরাগীর ভিটা খননের ফলে প্রথম ও শেষ পালযুগের দু'টি বড় মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এ মন্দির দু'টির উত্তরদিকের খোলা অঙ্গনে আরও আনুষঙ্গিক

www.pathagar.com

ইমারতাদির ধ্বংসাবেশষ পাওয়া যায়। এ আয়তাকার ধ্বংসস্তূপটির নামই বৈরাগীর ভিটা। এটা ৩০০ ফুট দীর্ঘ, ২৬ ফুট প্রস্থ এবং চারিদিকে ভূমি হতে ১০ ফুট উঁচু। একমাত্র উত্তর-পশ্চিমের খাড়া অংশ ছাড়া এর চারদিকই বেশ ঢালু।

মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে ৯৮ ফুট লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪২ ফুট বিস্তৃত। এর শুধুমাত্র উত্তর ও পূর্বপার্শ্বের ভিত্তিভাগ পাওয়া গেছে এবং দক্ষিণে অর্ধাংশ চাপা পড়ে গেছে। পূর্বতন মন্দিরটির ভিত্তি চতুর্দিকেই নকশা করা ইট দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরের প্রধান উপাসনাগৃহ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মন্দিরটির নিকটেই আংশিকভাবে ইট দ্বারা নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে ৩৬ ফুট দীর্ঘ একটা কালো পাথরের নালা আবিষ্কৃত হয়। মন্দিরের ভিত্তি হতে মাত্র ৫ ফুট দূরে অবস্থিত একটা মাটির তৈরি পাত্রের সাহায্যে নর্দমার পানি ও আবর্জনা নিষ্কাশিত হতো। নর্দমাটির শেষ প্রান্তের দু'টি অলংকৃত স্তম্ভ প্রাচীনতম কোন ইমারত থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। চতুষ্কোণ এ স্ত স্তগুলো অর্ধবৃত্তাকার পদ্মের প্রতিকৃতি, কীর্তিমুখ ও অন্যান্য পুষ্পপ্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। অলংকরণ কৌশল সাধারণত গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ের বলে মনে হয়।

ভাসু বিহার

ভাসুবিহারের মাটির নিচ থেকে প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন একটা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ফলে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের উপর নতুন আলোকপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মহাস্থানগড়ের ৪ মাইল দূরে নাগর নদীর পশ্চিম পাড়ে ভাসুবিহার নামে এক বিস্তীর্ণ ধ্বংস্তূপ দেখা যায়। এর উত্তরে নরপতির ধাপ ও সন্ন্যাসীর ধাপ। বিহারের দক্ষিণে মঙ্গলনাথের ধাপ বিদ্যমান। মঙ্গলনাথের ধাপের পূর্বে যোগীর ধাপ, পশ্চিমে গোদার ধাপ। পূর্বে ভীমের জাঙ্গাল, সব্দল দিঘী, কাঞ্জিরহাড়ি, খুলনার ধাপ ও মাদারীর গড়। মহাস্থানগড়ের পশ্চিমে পরশুরামের বাড়ি। রাস্তার দক্ষিণে কানাই ধাপ ও তার দক্ষিণে ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি ও তার পূর্বে লক্ষিন্দরের মেধ অবস্থিত।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাং তার গ্রন্থে বলেন, বিরাট এক সংঘারাম। আয়তন, বুরুজ ও পটমণ্ডপের উচ্চতার জন্য এর খুব খ্যাতি ছিল। এখানে মহাযান মতাবলম্বী কমপক্ষে ৭০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন এবং পূর্বাঞ্চল থেকে এখানে সমবেত হতেন। এ সংঘারামের কিছু দূরেই যেখানে বুদ্ধ দেব-দেবতাদের নিকট তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেখানে সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত এক স্তূপ ছিল। তার নিকটেই একটি স্থানে যুদ্ধের আস্তানা ও বিশ্রামস্থল ছিল।

প্রায় বর্গাকার সংঘারাম দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটটি, উত্তর-দক্ষিণে ১৬২ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৫২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং চার বাহুতে ২৬ টি ছোট ছোট কুঠুরি আছে। সারিবদ্ধ কুঠুরিগুলির সামনে চতুষ্পার্শ্বে ঘোরানো একখালি বারান্দা ও পূর্ববাহুর কেন্দ্রস্থলে একটামাত্র তোরণের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনে দ্বিতীয় বিহারটি ভূমি পরিকল্পনা ও স্থাপত্য কৌশলে প্রায় অনুরূপ। বিহার সংলগ্ন মন্দিরটির আয়তন ১২৫ ফুট × ৮৭ ফুট। এর চারিদিকে ধাপে ধাপে উন্নীত একটা প্রদক্ষিণ পথও আছে। একটা ১৫ ফুট বর্গাকার মুণ্ডপ মন্দিরটির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

www.pathagar.com

ধাপে ধাপে তৈরি তিনটি প্রদক্ষিণ পথের ভিত্তিমূলে সারি সারি পোড়ামাটির মৃৎফলক দিয়ে সুন্দরভাবে অলংকৃত। এছাড়াও মন্দিরের ভিত্তিমূলে বহু অলংকৃত ইট ও খাঁজকাটা প্যানেল দিয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতগুলির সাথে উদ্ধারকৃত ৮০০টি মূল্যবান দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি থেকে দশম থেকে একাদশ শতকের শিল্পকলা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। উদ্ধারকৃত চিত্রিত পোড়ামাটির ফলকগুলির বিষয়বস্তু যেমন সজীব তেমনি বৈচিত্র্যময়। মূর্তিগুলি জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় পোষাক-পরিচ্ছেদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও বিভিন্ন অলংকার ভূষিত। প্রাণাবেগপূর্ণ ও সহজ প্রকাশ ভঙ্গিতে ফলকচিত্র গুলি বাংলার লোকায়িত শিল্পের উৎকর্ষতার এক অনন্য নজির।

ভাসুবিহারে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের ৮৬ টি ব্রোঞ্জের দ্রব্যাদির মধ্যে ৪০ টি বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি বিশেষ আকর্ষণীয়। অন্যান্য অসংখ্য আকর্ষণীয় প্রত্নবস্তুর মধ্যে প্রায় শতাধিক লিপিসম্বলিত মৃৎশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মানাকালীর কুণ্ড

খোদার পাথর ভিটা থেকে দু'শ হাত দূরে একটা প্রাচীন ধ্বংস্তূপ সংলগ্ন পশ্চিমে একটা গভীর পুকুর আছে। ভিটা ও পুকুরটিকে মানকালীর ভিটা ও কুণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। প্রবাদ আছে যে রাজা মানসিংহের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে মানকালী। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ঘোড়াঘাটের মানখালী বা মানখালীদের নামানুসারে এরূপ নামকরণ হয়েছে। মানখালীগণ বাংলার সুলতানি আমলে খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এ ভিটার নামের পিছনে আর একটা সম্ভাব্য অনুমান জৈনধর্ম প্রচারণ গোশালা মানখালিপুত্রের নামানুসারেই এর নামকরণ হয়েছে বলা যায়।

ঐতিহাসিক কানিংহাম এখান থেকে মন্দিরে ব্যবহৃত অলংকৃত ইট, কার্নিসের গোলাকৃত ইট, ঢেউ খেলানো ঘরের ছাঁচ, বর্গাকৃতির পোড়ামাটির অলংকৃত টুকরা রেলিং এর স্তম্ভ ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। এখানে প্রাপ্ত লাল ইটের উপরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে মনুষ্যমূর্তি, চক্র, মেষ, ষাঁড়, অশ্ব, সিংহ, প্রস্ফুটিত পদ্ম ইত্যাদি উৎকীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাক-মুঘল যুগের একটা জামে মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এ মসজিদের আয়তন ৮৬$\frac{১}{২}$ ফুট × ৫২ ফুট। দেয়াল ৪ থেকে ৫ ফুট চওড়া। অভ্যন্তরভাগে দু'সারি স্তম্ভ। এটাকে লম্বালম্বিভাবে তিনভাগে ও আড়াআড়িভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছে। পশ্চিম দিকে দেয়ালে পাঁচটি অর্ধগোলাকার মিহরাব আছে। তারমধ্যে মাঝেরটি সবচেয়ে বড় এবং সেটা নকশাকৃত ইট দ্বারা অলংকৃত। বড় মিহরাবের সংলগ্ন উত্তরদিকে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি × ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি মাপের মিম্বার আছে। এ মিম্বারের পাশেই একটা ক্ষুদ্র প্রাচীর-বেষ্টনী দিয়ে একটা স্থানকে উঁচু রাখা হয়েছে। নামাজের আগে ও পরে অধ্যয়নের আসন হিসেবে হয়তো ব্যবহৃত হতো। মসজিদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে বহু অলংকৃত ইট পাওয়া গেছে। ইটগুলি পুষ্প ও জ্যামিতিক প্রতিকৃতি, পদ্মের পাপড়ি ইত্যাদির দ্বারা নকশাকৃত অবস্থা পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

যোগীর ভবন

যোগীর ভবন বগুড়া শহর থেকে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং মহাস্থান থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ৮০ বিঘা ভূমির উপর নাথ সম্প্রদায়ের শৈব সন্ন্যাসীদের আবাসিক এলাকা ছিল। যোগীর ভবন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অর্থাৎ মাঠের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মন্দিরগুলির একটার নাম 'ধর্মডুঙ্গি'। এর ইটের উপরে একটি লিপিমালায় উৎকীর্ণ আছে-'সর্বসিদ্ধ সন ১১৪৮ শ্রী সুফলা (১৭৪১ খ্রি.)। এ মন্দিরের সামনে "গদীর ঘর" নামক একটা মন্দিরে রাখা হতো। মাঠের বাইরে বিভিন্ন দেবতার নামে চারটা মন্দির আছে, যথা : কাল ভৈরব, সর্বমঙ্গলা, দুর্গা এবং গোরক্ষনাথ। শেষোক্ত মন্দিরের সন্নিকটে ইট দ্বারা নির্মিত একটি সমাধি আছে। এখানে অনেক পুকুর আছে, তারমধ্যে ফুলদিঘি ও দধিসাগর বৃহত্তম।

যোগীর ভবন পদ্মা মন্দির

লক্ষিন্দরের বা গোকুলের মেধ

মহাস্থান থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও গোকুল গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা সমতল শিখর বিশিষ্ট উঁচু ঢিবির উপরে এ বিরাট মেধটি অবস্থিত। ১৯৩৪-১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে খননের ফলে নানা মাপের ১৭২টি কুঠুরি আবিষ্কৃত হয়। কুঠুরিগুলোকে বিভিন্ন সমতলে একসারিতে নির্মাণ করে মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করে দেয়া হয়েছিল যাতে এগুলো কোন এক সুউচ্চ মন্দির বা স্তূপের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। এ পদ্ধতিকে আমরা বর্তমানকালের পাইলিং সিসটেমের সাথে তুলনা করতে পারি।

রোমাঞ্চকর লোকগাথার নায়ক-নায়িকা বেহুলা-লক্ষীন্দরের নামানুসারে ধ্বংস-স্তূপটির নামকরণ হয়েছে লক্ষীন্দরের মেধ।

www.pathagar.com

মূলত এ বিরাট ধ্বংসাবশেষটি ক্রুশাকার ও বহুতলবিশিষ্ট ভিত্তি মণ্ডপের উপরে বৌদ্ধদের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় ছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটা ছোট কুঠুরি আবিষ্কৃত হয়। কুঠুরির মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। কক্ষটির নিচের ১২ ফুট ৮ ইঞ্চি পরিধির গোলাকার একটা পাথর উন্মুক্ত করা হয়। পাথরটির মাঝখানের একটা বড় গর্তের চারদিকে মোট বারটা অগভীর গর্ত ছিল। মাঝখানের গর্তটির ভিতরে প্রায় এক ইঞ্চি বর্গাকার স্বর্ণের একটা পত্র পাওয়া গেছে। স্বর্ণপত্রটিতে একটা উপবিষ্ট ষাঁড়ের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে যা দেখে মনে হয় মন্দিরটি সম্ভবত কোন এক শিবমন্দির ছিল।

খন্দকারটোলা মসজিদ

খন্দকার টোলা মসজিদ শেরপুরে অবস্থিত। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে গর্ভনর মুয়াজ্জম খান কর্তৃক নির্মিত। মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭৮ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট। এ মসজিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো– প্রায় অষ্টকোণী গম্বুজগুলো পূর্বদিকে কেন্দ্রীয় খিলানের প্রবেশদ্বারের উপর এবং পশ্চিমে কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপর স্থাপিত। এই গুরুত্বপূর্ণ মসজিদটি কোন ব্যক্তির একক খরচে তৈরি হয় নি। এটা তৈরি হয়েছিল জনগণের নিকট থেকে তোলা চাঁদা থেকে।

খেরুয়া মসজিদ

শেরপুরের এক মাইল দক্ষিণে খেরুয়া গ্রামে এই খেরুয়া মসজিদ অবস্থিত। শেরপুরের প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে এটিই অন্যতম। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে জওহর আলী খানের ছেলে মির্জা মুরাদ খান কর্তৃক এ মসজিদ নির্মিত হয়।

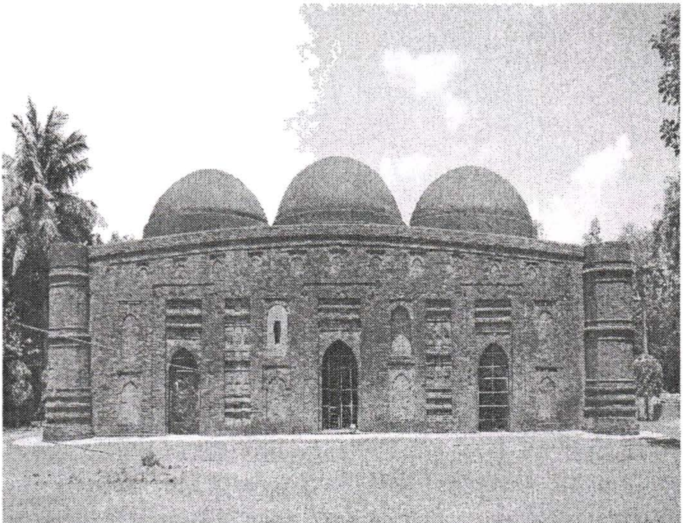

খেরুয়া মসজিদ

www.pathagar.com

খেরুয়া মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫৭ ফুট এবং প্রস্থ ২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। পনের শতকের অন্যান্য মসজিদের অনুকরণে চার কোণে চারটি প্রায় অষ্টকোণী স্তম্ভ দ্বারা শোভিত এ মসজিদ। বর্হিভাগে পূর্বদিকে ৩টি দরজা বিশিষ্ট এ মসজিদের ছাদ ও দেয়াল বক্রাকারে ইট দ্বারা সুচারুরূপে সুশোভিত করা হয়েছে। ভিতরের দিকে মসজিদটি ৩টি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির উপরে একটি করে গম্বুজ দেখা যায়। মসজিদের উত্তর এবং দক্ষিণে ১টি করে দরজা এবং পশ্চিম ধারের দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে। মিহরাবগুলোর গাত্রে লতাপাতার নকশা দেখা যায়। মসজিদ গাত্রে কিছু বাণী ফারসীতে উৎকীর্ণ করা ছিল যা এখন করাচী জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ফররুখ শিয়ারের মসজিদ

মহাস্থানে শাহ সুলতান মাহীসওয়ারের মাজারের কাছে এ মসজিদটি অবস্থিত। মাজার সংলগ্ন ২৩ ফুট ৩ ইঞ্চি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগে আয়তাকার খোপের মাঝে বহু খাঁজবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত একটা দরজা আছে। দরজার দু'পাশে একই রকম খাঁজবিশিষ্ট দুটি কৃত্রিম দরজা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে আরও দুটি দরজা ছিল। ভিতরের দিকে পশ্চিমের দেয়ালে খাঁজকাটা খিলানযুক্ত ৩টি মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আকারে বড়। খিলানের উপরিভাগ পলস্তারার উপর ফুল-লতাপাতার প্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত। পলস্তারা করা গম্বুজটি মৌচাকের খোপের মত খিলানের উপর সংস্থাপিত। এর শীর্ষ চাকচিক্যময় উজ্জ্বল পোড়ামাটির পাত্রখণ্ড দ্বারা শোভিত। গম্বুজের গোড়া চারদিকে আংশিক উন্নত ও মেরলনযুক্ত। উন্নত অংশের মাঝে সমান দূরত্বে একই প্রকার চাকচিক্যময় উজ্জ্বল পোড়ামাটির চূড়া আছে। চূড়াগুলো দেয়ালে প্রোথিত অষ্টকোণাকৃতি চারটি স্তম্ভের শিখরদেশে স্থাপিত। মসজিদের প্রবেশদ্বারের উপরের শিলালিপি থেকে জানা যায় দিল্লীর সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে ঈদের দিনে খোদাদেল কর্তৃক নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়।

বিবির মসজিদ

শেরপুর খন্দকারটোলা মসজিদের দক্ষিণে বিবির মসজিদ অবস্থিত। ছোট কিন্তু সৃষ্টিশৈলীতে অপরূপ এ মসজিদ ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের আমলে সাঈদ আলী মুতাওয়াল্লীর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। ২২ ফুট বর্গাকারের এই মসজিদের চার কোণে চারটি অষ্টকোণাকৃতির স্তম্ভ বিদ্যমান। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ তিন দিকে তিনটি দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। একমাত্র গম্বুজটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট দিয়ে তৈরি। পশ্চিম দেওয়ালের সাথে ৩টা মিহরাব দেখা যায়।

কথিত আছে যে- হিন্দু রাজা বলরামের কন্যা প্রেমে পড়েছিলেন গাজী শাহ মাদারের। কিন্তু মুসলমানের সাথে বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় রাজকন্যা আজীবন অবিবাহিতা থেকে যান।

সবাই তাকে বিবি বলে ডাকতো। তাঁর নাম অনুসারেই এ মসজিদের নাম হয় বিবির মসজিদ।

www.pathagar.com

তুর্কান শাহের মাজার

শেরপুরে করতোয়া নদীর তীরে তুর্কান শাহ নামে এক পীরের আস্তানা ছিল। তিনি বাবা আদমের সাথে ইসলাম প্রচারের জন্য এ স্থানে আসেন। মুষ্টিমেয় অনুচর ও শিষ্য নিয়ে তিনি বাংলার সে সময়ের হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি শহিদ হন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে তার মস্তক দেহচ্যুত হয়ে মাটি স্পর্শ করে সেখানে 'শির মোকাম' এবং যেখানে মাথাবিহীন ধড় পতিত হয়, সেখানে 'ধড় মোকাম' নামে দুটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ৮ ফুট উঁচু দরগা সৌধ নির্মাণ করা হয়।

শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের দরগা

মহাস্থানে ফররুখ শিয়রের মসজিদের ঠিক উত্তর দিকেই প্রাচীর ঘেরা উন্মুক্ত স্থানে শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের মাজার অবস্থিত। মাজারের প্রবেশ পথে পাথরের চৌকাঠ প্রাচীন বাংলায় 'শ্রী নরসিংহ দাস্য' লেখা আছে। অনেকে নরসিংহকে রাজা পরশুরাম বলে মনে করেন। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। কারণ এই বাংলা লিপি তখন প্রচলিত ছিল না। তাই মনে করা হয় এ মাজার নির্মাণ বা সংস্কারের সময় নিয়োজিত রাজমিস্ত্রির নাম ছিল নরসিংহ দাস।

সমাধিটির প্রাচীর বেষ্টনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ছাদবিহীন। প্রাঙ্গণটির নিকটেই চুনকাম করা চতুষ্কোণ একটা মঞ্চ দেখা যায়। কথিত আছে যে, রাজা পরশুরামকে পরাজিত করার পর শাহ সুলতান বলখী এ স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন। এ অঙ্গণে বহু কৃষ্ণপ্রস্তর খণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় পূর্বে এখানে কোন হিন্দু দেবালয় ছিল।

দরগার ৩৫ হাত পশ্চিমে একটা ১২ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা, ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া এবং ৪ ফুট উঁচু তোরণ দেখা যায়। এ রাস্তা তোরণটিকে মাজারের সাথে যুক্ত করেছে। এ সৌধটি চুন-সুরকির দ্বারা পলস্তারা করা এবং চৌকাঠে ও প্রবেশ পথের দু'ধারে ফুলের প্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত করা। তোরণটি স্থানীয়ভাবে সালামী দরজা বলে পরিচিত।

প্রতি বছর এ মাজারে বহু মুসলমান জিয়ারত উপলক্ষ্যে আগমন করে থাকেন।

গড় ফতেপুরের দুর্গ

সোনাতলা রেলস্টেশনের নিকট একটা প্রাচীন দূর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। গড় ফতেপুর কামরূপ রাজ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। সম্ভবত পাঠান রাজ হোসেন শাহ কর্তৃক রাজা নিলাম্বরের উচ্ছেদের পর এই গড়টিতে পাঠান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদবধি ইহা পাঠান রাজগণের একটা প্রত্যন্ত দুর্গে পরিণত হয়। ঐ সময়ই এই গ্রামের নাম গড় ফতেপুর হয় বলে কথিত আছে।

নশিপুর বাগবাড়ি

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির স্মৃতি রয়েছে। শাহবাজ খাঁর কন্যা পরীবিবি বীর হাদুশাহ গাজীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আনুমানিক ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দশকে হাদুশাহ গাজী নবপরিণীতাকে নিয়ে

www.pathagar.com

বাগবাড়িতে পৌঁছালে তাঁর মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের জন্য বাগবাড়ি হতে এক কি.মি. উত্তর পশ্চিমে নশিপুর দহের পূর্বতীরে বর্তমান নশিপুর হাটখোলায় একটা ছোট্ট সুন্দর অট্টালিকা তৈরি করে মধু যামিনী উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। কথিত আছে হাদুশাহ গাজী এখানে নিশি উদ্‌যাপন করেন বলে এ গ্রামের নাম হয় নশিপুর। পরবর্তীতে ইংরেজরা এখানে নীলকুঠি স্থাপন করে। নশিপুরে পরীবিবির মাজার এবং হাদুশাহ্‌র মাজার বিদ্যমান আছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই বাগবাড়ির সন্তান।

শেরপুরের জগন্নাথ দেবের মন্দির

শেরপুর শহরের একাংশের জমিদার মুন্সিবাড়ির সন্নিকটে, বর্তমান বসাক পাড়া নামে খ্যাত। সেখানেই প্রায় চারশত বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন স্থাপত্যকলা সম্বলিত চার চূড়া বিশিষ্ট শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির। সে মন্দিরটিতে বিগ্রহ ছিল শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব, শ্রী শ্রী বলরাম ও সুভদ্রা দেবী। ভারতের শ্রীক্ষেত্র (পুরীধাম) জগন্নাথ দেবের সুরম্য অট্টালিকা সমৃদ্ধ মন্দির যা বিশ্বখ্যাত। সেই মন্দিরের বিগ্রহের অনুকরণে শেরপুর মন্দিরের বিগ্রহ তৈরি করা হয়েছিল যা এখনো বিরাজমান। কথিত আছে শেরপুরের ইতিহাসে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে উক্ত মন্দিরটির চার চূড়া ধ্বসে পড়ে। সেই ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও শ্রী শ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ থাকে অক্ষত। সেই অক্ষত মূর্তিত্রয় তৎকালিন জোরদার স্বর্গীয় নরহরি সাহার পূর্ব পুরুষ বর্তমান স্থানে একটি চালাঘর নির্মাণ করে সেখানে সংস্থাপন করেন। ১৯৭১ সালে দেশে ভয়াবহ যুদ্ধে বিগ্রহ মন্দিরে রক্ষিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রা অবস্থিত মন্দিরটি পুড়িয়ে দিয়েছিল যুদ্ধচলাকালীন সময়ের রাজাকার, আলবদর, আলসামস এবং পাক হানাদার বাহিনী। ঠিক সেই সময়ে হিন্দু জনগোষ্ঠী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে যায় ভারতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসে দেখা গেল মন্দিরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। তখন পুনরায় সকল হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুসারী ও শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের ভক্তগণ একত্রিত হয়ে একটি মাটির মন্দির তৈরি করে এবং মাটি দ্বারা তিনটি বিগ্রহ তৈরি করে উক্ত মন্দিরটিতে পূজা অর্চনা শুরু করা হয়। কালের বিবর্তনে সেই মন্দিরটি বর্তমানে জনসাধারণের সহায়তায় মন্দিরটির পরিধিসহ আধুনিক স্থাপনায় একটি নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, সেই সময় জগন্নাথদেব মন্দিরের নাম অনুসারেই উক্ত পাড়ার নামকরণ করা হয়েছিল জগন্নাথ পাড়া। মন্দিরটি শেরপুর পৌর শহরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং হিন্দুধর্মালম্বীদের একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ও মিলন স্থানও বটে। উক্ত মন্দির একটি নামকরা ও জাগ্রত মন্দির হিসাবে দেশে এবং বহির্বিশ্বেও পরিচিত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে হিন্দুধর্মালম্বী ভক্তগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেখানে সমাগম হয়। এ মন্দিরে নিত্য পূজা অর্চনা, ভোগ রাগ, ভজন, কীর্তন, ধর্মালোচনা প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় ভাবে প্রচুর ভক্তগণের সমাগম হয়। এছাড়া বারো মাস ব্যাপী বিভিন্ন তিথিপর্বে যেমন– বাৎসরিক দুবার বর্ণাঢ্য রথযাত্রা এবং রথমেলা, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, পতিত পাবন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ধর্ম অনুষ্ঠান সমূহ আড়ম্বরে হয়ে থাকে। এছাড়াও মন্দিরটি সার্বজনিন বিধায় এখানে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা

www.pathagar.com

অন্নপ্রাসন, বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভোগের আয়োজন করে থাকে। মন্দিরটি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সদাশয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে মন্দির উন্নয়ন, সংস্কার, নিত্য পূজা অর্চনা ও ভোগ্‌রাগসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মাদিতে সাধ্যমত দান করে মন্দিরটি এই পর্যায়ে এনেছেন এবং মন্দিরটিতে দেশের বড় বড় সরকারি মন্ত্রী মহোদয়গণের আগমন ঘটে এবং তাঁরা বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা করে থাকেন। বর্তমান মন্দিরটিতে রয়েছে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি।

ঞ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি

ব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে বগুড়া। ব্রিটিশ আমলের প্রায় শুরুতেই তৎকালীন ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম ঘাঁটি ছিল বগুড়া। ফকির বিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহ তার অন্যতম ঘাঁটি স্থাপন করেন আদমদিঘিতে। এখান থেকেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ফকির বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। এ সময়ই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ভবানী পাঠক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে গাবতলীর পোড়াদাহ প্রতিষ্ঠা করেন সন্ন্যাসীর মেলা যা পরবর্তীতে পোড়াদহ মেলা নামে পরিচিতি পায়। গত শতকের বিশের দশকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে ক্ষুদিরামের সহযোগী রূপে বগুড়ার সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র চাকী শহিদ হন। ভাষা আন্দোলনেও বগুড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে মিছিল হয় এবং মিছিল শেষে জিলা স্কুল মাঠে সমাবেশের সভাপতি রূপে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের ফলেই সে দিন থেকে বগুড়ায় ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুদয়, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সর্বক্ষেত্রেই বগুড়ার রয়েছে গৌরবোজ্জল ভূমিকা।

বগুড়ার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী, নবাব আলতাফ আলী চৌধুরী, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, রজিবউদ্দিন তরফদার, হাবিবুর রহমান বুলু মিঞা, ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হক প্রমুখ।

বগুড়ার কবি-শিল্পী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, কবি জীবন কৃষ্ণ মৈত্র (আঠারশতক), বগুড়ার ইতিহাস (১৯১৯) প্রণেতা প্রভাসচন্দ্র সেন, হরগোপাল দাস কুণ্ডু, অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফীয়ান, সা'দত আলী আখন্দ, কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরী, অধ্যক্ষ খোদেজা খাতুন, অধ্যাপক মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, জেবউন নেছা জামাল ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ।

বগুড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় এখানে উপস্থাপিত হলো-

www.pathagar.com

আবদুস সোবহান চৌধুরী (১৮৪৫-১৯১৪) : নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী ১৮৪৫ খিষ্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মসনদ আলী ছিলেন টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট জমিদার। তিনি বগুড়ার বিশিষ্ট জমিদার মীর সরওয়ার আলীর ভগ্নি তহুরুন নেছাকে বিয়ে করে বগুড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মীর সরওয়ার আলী নিঃসন্তান হওয়ায় শেলবর্ষ পরগনায় তাঁর জমিদারী ভগ্নিপতি তহুরুন নেছা তথা আবদুস সোবহান চৌধুরী প্রাপ্ত হন। পিতৃ ও শ্বশুরকুলের সূত্রে তিনি শেলবর্ষ পরগনার বিশাল জমিদারি লাভ করেন। বগুড়ায় অসংখ্য সমাজসেবামূলক কাজের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা, উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, সান্তাহার থেকে বোনারপাড়া পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, তহুরুন নেছা হাসপাতাল, আলতাফুন নেছা খেলার মাঠ, ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনসহ বগুড়ার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় তিনি প্রভূত অবদান রাখেন।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর সঙ্গে তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা আলতাফুন নেছা চৌধুরীর বিয়ে দেন। আলতাফ আলী চৌধুরী ও লতিফুন্নেসা চৌধুরী নামে একপুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে আলতাফুন নেছা অকালে মৃত্যুবরণ করেন। নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরীর প্রপৌত্র আলতাফ আলী চৌধুরীর পুত্র মোহাম্মদ আলী পরবর্তীকালে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮১-১৯৬০) : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়ায় জন্মগহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ডাঃ অনন্ত কুমার দাশগুপ্ত। তিনি হোমিও ডাক্তার ছিলেন। সুরেশচন্দ্র ১৮৯৯ সালে মেট্রিক পাশ করেন। কলকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর ১৯০৮ সালে তিনি বগুড়া বারে আইন পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মহাত্মাগান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অল্পদিনেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। সুরেশচন্দ্র রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করতেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ সালের দিকে তিনি 'দেশের কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৪৬ সালে সুরেশচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থি হিসেবে জয়লাভ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও বগুড়ায় তিনি অন্যতম ভুমিকা পালন করেন। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষার সুবক্তা সুরেশচন্দ্র ১৯৬০ সালে বগুড়ায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) : ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে বগুড়ার প্রথম শহিদ প্রফুল্ল চাকীর জন্ম বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার গ্রামে। পিতা রাজ নারায়ণ চাকী। মাতা স্বর্ণময়ী চাকী। তিনি ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) জন্মগ্রহণ করেন। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। পিতা রাজনারায়ণ চাকী বগুড়ার নবাব এস্টেটে কর্মরত ছিলেন। মাত্র দুই বছর বয়সে প্রফুল্ল চাকীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় বগুড়ার নামুজা

www.pathagar.com

জ্ঞানদাপ্রসাদ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। এরপর ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুর জিলাস্কুলে পড়াশুনা করেন। এখানেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং গুপ্তসমিতির সদস্য হন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি বিপ্লবী বারীন ঘোষের সাথে কলকাতায় আসেন এবং এখানে ক্ষুদিরামের সাথে অত্যাচারী ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বিহারের মোজাফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করলে দুই ব্রিটিশ নারী নিহত হন। এতে ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও প্রফুল্ল চাকী পলায়ন করেন।

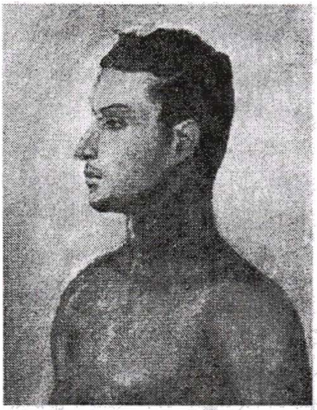

প্রফুল্ল চাকী

তাঁকে ধরার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পুলিশ। প্রফুল্ল চাকী পালিয়ে ট্রেনে চড়ে মোকামঘাট আসেন। এখানে একটি খাবার দোকানে দারগা নন্দলাল সন্দেহ বশত কয়েকজন কনস্টেবলসহ তাঁকে ধরতে গেলে প্রফুল্ল চাকী নিজের ব্যবহৃত রিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। প্রফুল্ল চাকীর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। মৃত প্রফুল্লর মাথা কেটে স্পিরিটে ডুবিয়ে বিভৎস চেহারা করে দেয়। এর কিছুদিন পর ক্ষুদিরামকেও ফাঁসি দেয়া হয়।

রজিবউদ্দিন তরফদার (১৮৯১-১৯৫৯) : রজিবউদ্দিন তরফদার প্রজাবন্ধু হিসাবে তাঁর কালের বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ১৮৯১ সালে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম : দারাছতুল্লাহ তরফদার। রজিবউদ্দিনের পূর্বপুরুষগণ দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনায় বসবাস করতেন। ১৮৯৬ সালে তিনি নিজগ্রাম নারচী এমভি. স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন এবং পরে হরিণা এমই.স্কুলে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০২ সালে বগুড়া জিলাস্কুলে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। পিতার অকাল মৃত্যু, নিজের বসন্তরোগ এবং আর্থিক সংকটের কারণে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি সামাজিক আন্দোলন

www.pathagar.com

এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সত্যিকার অর্থেই একজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশিদূর অগ্রসর না হলেও কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি রংপুরের বগুলাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন বছর শিক্ষকতা করেন। এর পরে সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে নিজগ্রামে ফিরে এসে শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে নিজগ্রাম নারচীতে একটি এমই. স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং উক্ত স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত পদে শিক্ষকতা করেন।

রজিবউদ্দিন তরফদার ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বাধীন স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করে বিট্রিশ সরকার বিরোধী দলে অবস্থান নেন।

১৯৩০ সালে রজিবউদ্দিন তরফদার দুর্বার প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময় তিনি 'নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহাম্মদ আকরম খাঁ। ১৯৩৫ সালে তিনি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় বগুড়া হতে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে (ভারত শাসন আইন-১৯৩৫) ভারত শাসন আইনের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রজা সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের নাম দেয়া হয় 'নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি'। এই সমিতির সভাপতি হক এবং সেক্রেটারি নির্বাচিত হন প্রজাবন্ধু রজিবউদ্দিন তরফদার। রজিবউদ্দিন তরফদার 'প্রজাবাহিনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রজা সাধারণের অভাব অভিযোগ সরকার ও জনগণের নিকট গোচরিভূত করাই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। বগুড়ার প্রাথমিক যুগের সংবাদপত্র হিসাবে এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। রজিবউদ্দিন তরফদার ছিলেন একজন মহান দেশপ্রমিক ও প্রতিভাধর প্রজাসংগঠক। তিনি প্রজাসাধরণের কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এই সংগঠক ও জননেতা ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ তারিখে শুক্রবার বেলা চার ঘটিকায় ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোহাম্মদ আলী (১৯০৯-১৯৬৩) : রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক ও প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক জীবনে তিনি পাকিস্তান আমলে বগুড়ার 'মোহাম্মদ আলী' নামে পরিচিত ছিলেন। বগুড়ার বিখ্যাত নবাব পরিবারে ১৯ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বগুড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলি চৌধুরী। পিতামহ ছিলেন ব্রিটিশ আমলে মুসলিম জাগরণের নেতা ধনবাড়ির বিখ্যাত নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর মাতার নাম বেগম জহুরা খাতুন। মোহাম্মদ আলী বাল্যকালে তাঁর পিতামহ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে বগুড়া শহরের করোনেশন ইনস্টিটিউটে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এরপর তাঁকে শিক্ষার জন্য

www.pathagar.com

কলকাতা পাঠানো হয়। ১৯২৬ সালে কলকাতা মাদ্রাসা হতে বৃত্তিলাভ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ. এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। স্নাতক সম্মান ডিগ্রি লাভের পরপরই পিতা নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরীর নির্দেশক্রমে বগুড়ায় ফিরে আসেন এবং পৈতৃক জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর এই সময় থেকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। পিতা আলতাফ আলী চৌধুরী ও আব্দুল বারী বিএল এর অনুপ্রেরণায় তিনি ১৯৩০ সালে বগুড়ার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩২ সালে বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মনোনীত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ১৯৩৪ সালেই বগুড়া জিলা স্কুলবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ সরকার তাকে 'খানবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৩৭ সালে তিনি বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভায় অর্থ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। এই সময় তিনি সাময়িকভাবে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন।

মোহাম্মদ আলী

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১৯৪৮ সালে বার্মায় (বর্তমানে মায়ানমার), ১৯৪৯-১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ে কানাডায় এবং ১৯৫২-১৯৫৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ দেশে সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল ঘোষণা এবং ৯৮(ক) ধারা জারি করে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন। ১৯৬২ সালের

www.pathagar.com

২৩ জুন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের আহ্বানে তাঁর মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের ২২ জানুয়ারি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং পরদিন ২৩ জানুয়ারি রাত ৯ টা ৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হাবিবুর রহমান চৌধুরী (১৯০৯-১৯৭৭) : রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিক। হাবিবুর রহমান চৌধুরী (বুলু মিয়া) ১৯০৯ সালে বগুড়ার বিখ্যাত সাতানি জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মতারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৯০৯। পিতার নাম খানবাহাদুর হাফিজুর রহমান চৌধুরী। তিনি বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কোলকাতা থেকেই 'ল' পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯৩২ সালে ওকালতি পাশ করে বগুড়া বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ঢাকা জজকোর্টের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বগুড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সেক্রেটারি ও চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতাস্থ 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'র ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বগুড়ায় পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সালে 'ঢাকার রায়টার্স মোকদ্দমা'য় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার 'আগস্ট হাঙ্গামা'র পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে মনোয়ন লাভ করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। তিনি এর পূর্বে বগুড়া জেলাবোর্ড, স্কুলবোর্ড ও পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিক অর্থকমিশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫০ সালে ইটালিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ছিলেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বেলজিয়ামে রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুব খানের অধীনে পাকিস্তানের শিক্ষা সম্প্রচার ও সংখ্যালঘু মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬২ সালে মন্ত্রী থেকে অব্যাহিত পান এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পুনরায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায় দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মজীবনে সর্বশেষ বার্মায় (বর্তমান মায়ানমায়) পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। বগুড়ায় সমবায় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। খেলাধূলা ও বগুড়ার স্কাউট আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গাজীউল হক (১৯২৯-২০০৯) : ভাষা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ, লেখক ও আইনজীবী। গাজীউল হক ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ফেনী শহরে জন্মগ্রহণ করলেও পরে তিনি

www.pathagar.com

বগুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হন। পুরো নাম : আবু নছর মুহাম্মদ গাজীউল হক। পিতার নাম : আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ছেরাজুল হক চিসতী (রঃ)। তাঁকে এককথায় বলা যায়, রাজনৈতিক নেতা বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন ভাষা সংগ্রামী, আর ১৯৭১ ছিলেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ব্রিটিশ যুগে নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের বগুড়া শাখার যুগ্মসম্পাদক। পরে সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি দিল্লীতে নিখিলরত ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করেন। ছাত্রনেতা হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন। দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সালে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে পূর্বপাকিস্তান যুবলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সে জনসভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যে ছাত্র সভা হয় সে সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। একুশের প্রথম গান-ভুলবো না, ভুলবো না একুশে ফেব্রুয়ারি তাঁর রচনা। ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০-১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সারা জীবন প্রগতিশীল রাজনীতি ও অসম্প্রদায়িক আন্দোলনের সব্যসাচীর মতো ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সক্রিয় নেতা ছিলেন। ভাষা সৈনিকের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকায় ধানমণ্ডিতে তাঁর নামে একটি সড়কের নামকরণ হয়।

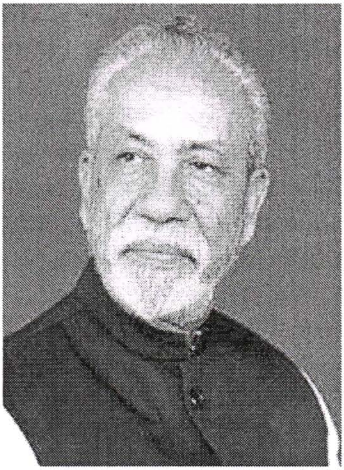

গাজীউল হক

১৭ জুন ২০০৯ তারিখে ঢাকায় পরলোকগমণ করেন। বগুড়ায় পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১) : একজন মুক্তিযোদ্ধা (বীরউত্তম) রাষ্ট্রপতি ও রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মনসুর রহমান ছিলেন একজন কেমিষ্ট। মা জাহানারা খাতুন ছিলেন করাচি বেতারকেন্দ্রের নজরুল সঙ্গীতশিল্পী। জিয়াউর রহমানের ডাক নাম কমল। পিতামহ মৌলভী কামাল উদ্দিন ছিলেন গাবতলীর মহিষাবান এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি শৈশবের অনেকগুলো দিন বগুড়ায় গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে পিতার কর্মস্থলে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন।

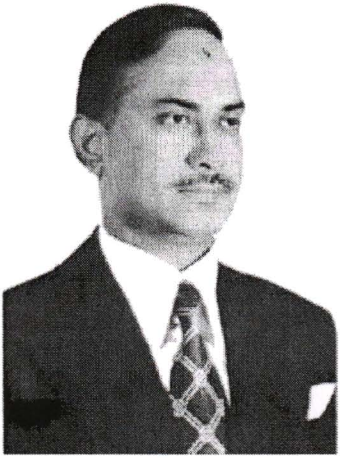

জিয়াউর রহমান

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের বোমা হামলাকালে তাঁর পিতা পরিবারকে নিয়ে বাগবাড়ি গ্রামে আসেন। তিনি তখন গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে পিতার পরবর্তী কর্মস্থল করাচির একাডেমি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে এই করাচি একাডেমি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে করাচি ডিজে কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন লাভ করেন। পাঞ্জাব রেজিমেন্টে দুই বছর চাকরি করার পর ১৯৫৭ তে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলি হন। বিশেষ গোয়েন্দা কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ তে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে খেমকারান সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিকে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৬ তে কাকুলস্থ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ এ জয়দেবপুর দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেণ্ড ইন কমান্ড হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। ১৯৭১ এর ২৭ মার্চ তারিখে চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে

www.pathagar.com

মুজিবনগর সরকার কর্তৃক অন্যতম সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। আগস্ট মাসে রাউমারীতে ১ম, ২য় ও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রথম ব্রিগেড গঠিত হয়। এই ব্রিগেড পরে তাঁর নামানুসারে জেড ফোর্স নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর কুমিল্লা ব্রিগেডের কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ এর জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারিতে কর্নেল, ১৯৭৩ এর মাঝামাঝিতে ব্রিগেডিয়ার এবং ১০ অক্টোবর ১৯৭৩ এ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ১৯৮১ সালে ৩০ মে রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বিদ্রোহী সেনাসদস্যের হাতে তিনি নিহত হন।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু (১২৮৫-১৩৩৩) : রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, সংকলক ও ইতিহাসবিদ হরগোপাল দাস কুণ্ডু ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র বগুড়া জেলার শেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় বগুড়ার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ফোকলোর ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়াও তিনি শেরপুরের ইতিহাস (১৩১৭) ও ভবানীপুরের ইতিহাসও রচনা করেন।

প্রভাসচন্দ্র সেন (১৮৭৭-১৯৮০) : বগুড়ার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯১৩; ২য় সংস্করণ ১৯২৯) প্রণেতা প্রভাসচন্দ্র সেন ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীনাথ সেন তৎকালীন বগুড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (বর্তমানে পৌর উচ্চ বিদ্যালয়) ও বগুড়া জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। মাতা গয়ামণি দেবী। তিনি শৈশব ও কৈশরে বগুড়ায় পড়ালেখা করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ, বি.এল পাশ করেন। কিছুদিন শিক্ষকতার পর তিনি বগুড়ায় আইন পেশায় যোগ দেন। দেশভাগের পর প্রভাসচন্দ্র সেন কলকাতায় চলে যান। ১৯৮০ সালের ১০ আগস্ট তিনি কলকাতার সার্কাস রেঞ্জের নিজ বাড়িতে ১০৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

বগুড়া, উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্র, প্রাচীন পুণ্ড্র ও বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রায় শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। 'বগুড়ার ইতিহাস' এর মতোই 'বাঙলার ইতিহাস' (১৯৬৫) তাঁর অন্যতম ইতিহাস গ্রন্থ।

সা'দত আলী আখন্দ (১৮৯৯-১৯৭১) : সা'দত আলী আখন্দ একজন মননশীল লেখক ও বৃটিশ সরকারের পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ১ জুলাই বগুড়া জেলার সদর উপজেলার চিঙ্গাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সানি উদ্দিন আখন্দ ছিলেন স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষক। মাতার নাম করিমুন্নেসা। পিতামহের নাম তিন কড়ি আখন্দ। প্র-পিতামহের নাম বিশ্বকড়ি আখন্দ। সা'দত আলী আখন্দের

www.pathagar.com

সহধর্মিনীর নাম রাবেয়া খাতুন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দুই কৃতি পুত্র হলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চরমপত্র খ্যাত এম আর আখতার মুকুল।

সা'দত আলী আখন্দ

সা'দত আলী আখন্দ নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি বগুড়া শহরের করোনেশন ইনস্টিটিউট থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯১৮ সালে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এফ.এ এবং ১৯২০ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ইতিহাসে বিএ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই দুই বছর তিনি নারচী, মহিমাগঞ্জ ও বাগবাড়ি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২২ সালে তিনি শিক্ষকতার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন এবং একটানা প্রায় ৩৩ বছর চাকুরি করেন। সা'দত আলী আখন্দ পুলিশের চাকুরির পাশাপাশি লেখালেখিও করতেন। 'সওগাত' পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁর লেখালেখির শুরু। তিনি 'সওগাত' ও 'শিখা' গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমকালীন মুসলমান লেখকের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। 'তেরো নম্বরে পাঁচ বছর' (১৯৬৭) ও 'অন্যদিন অন্য জীবন' (১৯৬৯) তাঁর আত্মকাহিনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর অন্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'তরুন মুসলিম' (১৯২৯), 'আওরাঙ্গজেব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালে ১২ মে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মমতাজুর রহমান তরফদার (১৯২৮-১৯৯৭) : অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. মমতাজুর রহমান তরফদার ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ আগস্ট বগুড়া জেলার মেঘাগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজ হতে আই.এ পাশের পর ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫১ সালে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং একটানা ৪৫ বছর এখানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

মমতাজুর রহমান তরফদার

ড. মমতাজুর রহমান তরফদার মূলত মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য গবেষণা গ্রন্থগুলো হচ্ছে– মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে আওয়াধী হিন্দি পটভূমি, মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, ইতিহাসের দর্শন, Husain Shahi Bengal a Socio-political 1494-1538 AD (পিএইচডি থিসিস), বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বরূপ ও সম্ভাবনা প্রভৃতি। তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ৩০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

এ.জে.এম. সামছুদ্দীন তরফদার (১৯১৪-১৯৮৯) : ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রজাবন্ধু রজিব উদ্দিন তরফদার ছিলেন ব্রিটিশ যুগের রাজনীতিবিদ ও বঙ্গ-আসামের নিপীড়িত বাঙালি প্রজা সাধারণের নেতা। মাতার নাম সাহেবজান নেছা। সামছুদ্দীন তরফদারের পিতা বিভাগ পূর্বকালে ২৩ বৎসর অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

এ.জে.এম. সামছুদ্দীন তরফদার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত নারচী হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। ব্রিটিশ যুগেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুলটি ভেঙ্গে যাওয়ায় সেখান হতে তিনি বগুড়া জিলা স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি নওগাঁ কেডি হাইস্কুলে পড়ালেখা করেন। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট পরিবারের সন্তান হবার কারণে তিনি রাজনীতির

www.pathagar.com

সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩০ সাল থেকে বগুড়ায় ছাত্র আন্দোলনের ধারার সাথে যুক্ত হয়ে এই বছর বগুড়ায় 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' এর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' এর কেন্দ্রীয় সদস্যপদ লাভ করেন। কৈশোর থেকেই কবিতা ও ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর অনেক কবিতা গল্প সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা নাটক 'পল্লীচিত্র' তৎকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি বগুড়ার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। ছোটদের জন্য 'প্রাথমিক বিদ্যালয় উপযোগী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ১.পল্লীচিত্র, ২. গল্পের লহরী (ছোটদের জন্য), ৩. বগুড়ার ভূগোল ও বিজ্ঞান, ৪. নতুন নিয়মে বাংলা ব্যাকরণ, ৫. দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়ার ইতিহাস)। এ.জে.এম. সামছুদ্দীন তরফদার ১৯৮৯ সালে বগুড়ায় পরলোকগমন করেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৫-) : অধ্যাপক ও গবেষক। ১৯২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কথাসাহিত্যিক সা'দাত আলী আখন্দ। তিনি শৈশব কৈশোরের অনেকগুলো দিন ময়মনসিংহ শহরে অতিবাহিত করেন। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশের পর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ দিনাজপুর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে স্নাতক এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

www.pathagar.com

ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তার অনবদ্য সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৮১ সালে একুশে পদক, ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭৯ সালে ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি রাজশাহী লেখক পরিষদ পুরস্কার, কুমিল্লা কালচারাল কমপ্লেক্স সম্মমাননা এবং ১৯৯৭ সালে দেওয়ান মোর্তজা পুরস্কারে ভূষিত হন। ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে- মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৬৮), নজরুল ইসলাম (১৯৬৯), বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (১৯৬৯), মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৯৭০), Bengali Muslim Public Opinion (১৯৭৬), উচ্চশিক্ষায় এবং ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ (১৯৭৬), সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯৭৭), সমকালে নজরুল ইসলাম (১৯৮৩), আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন (১৯৮৪), আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ (১৯৯৪), সময়ের মুখ, তাঁহাদের কথা (১৯৯৭)। সম্পাদনা : বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (১৯৯০), নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ (১৯৯১), আবহমান বাংলা (১৯৯৩)।

এম আর আখতার মুকুল (১৯২৯-২০০৪) : মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও গবেষক। ১৯২৯ সালে ৯ আগস্ট তারিখে বগুড়া জেলার মহাস্থান- এর অন্তর্গত চিংগাসপুর গ্রামে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : সা'দত আলী আখন্দ। মাতা: রাবেয়া খাতুন।

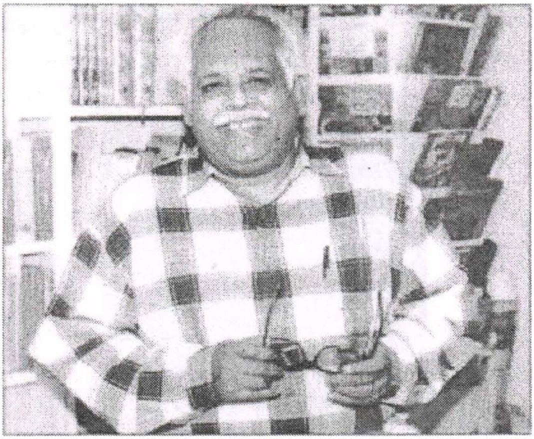

এম আর আখতার মুকুল

এম আর আখতার মুকুলের জীবন নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন এজি অফিসের সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগের চাকুরে, বীমা কোম্পানির কর্মকর্তা, অভিনেতা, গৃহশিক্ষক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞাপণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির (লন্ডন, ইংল্যান্ডে) কাটার, ছাপাখানার ব্যবসায়ী, প্রকাশক (সাগর পাবলিশার্স), চাল-আটা-কেরোসিন-সিগারেট ইত্যাদির

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী, পুরানো গাড়ি বা বাস-ট্রাকের ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি রাজনীতি করেছেন সমানে। ছাত্র রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সে কারণে ১৯৪৮-৪৯ সালে কারাবরণ করেন এবং কারাবাসে থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে একজন সক্রিয়কর্মী ছিলেন। রাজনীতির কারণে তাকে সাড়ে তিন বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়। তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগ। এ সময় কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশি-বিদেশি পত্র পত্রিকায় ও বার্তা সংস্থার বিভিন্ন পদে।

তিনি একজন কর্মঠ এবং সাহসী রিপোর্টার ছিলেন। সাংবাদিকতার সুবাদে সফরসঙ্গী হয়েছেন শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ইস্কান্দার মীর্জা, ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহম্মদ, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখের মতো রাষ্ট্র/সরকার প্রধান ও নেতাদের। গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হিসাবে ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অসংখ্য দেশ। চাক্ষুষ করেছেন বহু চাঞ্চল্যকর ও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্য ও স্নেহ-ভালোবাসা তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ভারতে অবস্থান করেন। কলকাতা থেকে 'স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে'র অন্যতম স্থপতি ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঐ বেতার থেকে নিয়মিত পাঠ করেন সাড়া জাগানো কথিকা 'চরমপত্র'। তিনি অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে– রূপালী বাতাস (১৯৭৩), রূপালী বাতাস সোনালী আকাশ (১৯৭৫), লন্ডনে ছক্কু মিয়া (১৯৮১), মুজিবের রক্ত লাল (১৯৭৬), ভাসানী-মুজিবের রাজনীতি (১৯৮৪), আমি বিজয় দেখেছি (১৯৮৫), চল্লিশ থেকে একাত্তর কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী (১৯৮৭), নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন (১৯৮৭), ওরা চারজন (১৯৮৭), একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (১৯৯৭), বঙ্গবন্ধু (১৯৯৭), চরমপত্র, পঞ্চাশের দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন (বাং ১৩৯১), বায়ান্নোর জবানবন্দী (বাং ১৩৯২)।

সম্পদনা : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র (একখণ্ডে সমাপ্ত, ১৯৮৮), আমিই খালেদ মোশাররফ (১৯৯০), বিজয় একাত্তর (১৯৯১), নকশালের শেষ সূর্য (১৯৮৯), বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন (বাং ১৩৯১),

তিনি ২০০৪ সালের ২৬ জুন তারিখে ঢাকায় পরলোকগমণ করেন। তাঁকে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) : আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পুরোধা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মাতুলালয় গাইবান্ধা জেলার পদুম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বগুড়া জেলার চন্দনবাইশায়। পিতা বি এম ইলিয়াস ছিলেন বগুড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সমাজসেবক। মাতা মরিয়ম বেগম। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৫৮ সালে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৬০ সালে

www.pathagar.com

ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ও ১৯৬৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সরকারি সঙ্গীত কলেজ ও ঢাকা কলেজে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

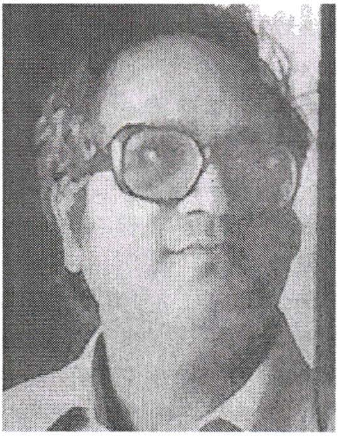

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ইলিয়াসের অন্যতম কীর্তি বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)। মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন– 'কি পশ্চিম বাংলা কি বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক'। এছাড়াও অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোয়াবনামা (১৯৮২), দুধ ভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের জন্যও তিনি বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯৮২ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

রোমেনা আফাজ (১৯২৬-২০০৩) : জন্ম. শেরপুর, বগুড়া, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬। কথাসাহিত্যিক। পিতা কাজেম উদ্‌দীন আহম্মদ ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর; মাতা বেগম আছিয়া খাতুন। বগুড়া সদর থানার ফুলকোট গ্রামের ডাক্তার মোঃ আফাজ উল্লাহ সরকারের সঙ্গে বিয়ে। লেখালেখি শুরু নয় বছর বয়স থেকে। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম লেখা ছড়া 'বাংলার চাষী" প্রকাশিত। রহস্য সিরিজ 'দস্যু বনহুর' ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। রচিত গ্রন্থ ২৫০টি। 'কাগজের নৌকা', 'মোমের আলো', 'মায়ার সংসার', 'মধুমিতা', 'মাটির মানুষ', 'দস্যু বনহুর' প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে। এছাড়া 'দেশের মেয়ে', 'জানি তুমি আসবে', 'রক্তে আঁকা ম্যাপ', 'মান্দিগোর বাড়ি' তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

www.pathagar.com

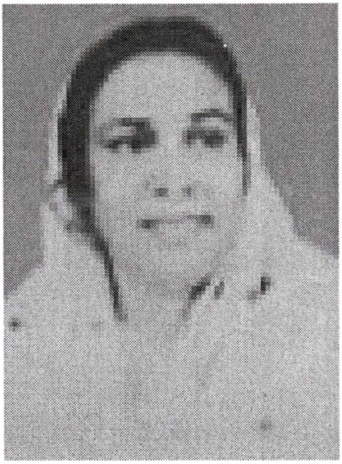

রোমেনা আফাজ

বগুড়ার জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ, বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, উদীচী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী; বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। পুরস্কার: স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ২০১০ (মরণোত্তর), গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার সম্মাননা পদক ২০০৬ (মরণোত্তর), বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম পদক ২০০৩, বগুড়া নারী বিকাশ সংস্থা প্রদত্ত বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক ২০০০, ঢাকার নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা গুণীজন সংবর্ধনা ১৯৯৯ প্রভৃতি। মৃত্যু. বগুড়া, ১২ জুন ২০০৩।

উপযুর্ক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও বগুড়ায় আরও অনেক লেখক-শিল্পী রয়েছেন যারা সারাদেশে বগুড়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন- অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সুফিয়ান, কবি রুস্তম আলী কর্ণপুরি, কবি কে এম শমসের আলী, কবি আতাউর রহমান, কাজী মোহাম্মদ মিছের, অধ্যক্ষ খোদেজা খাতুন, ইতিহাসবিদ ড. এনামুল হক ও ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, চলচ্চিত্রকার সুভাষ দত্ত, চিত্রশিল্পী আমিনুল করিম দুলাল, সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে খন্দকার ফারুক আহমেদ, আঞ্জুমান আরা, শওকত হায়াৎ খান, খুরশিদ আলম, তৌফিকুল আলম টিপু, ওস্তাদ খাজা গোলাম মঈন উদ্দিন প্রমুখ।

ট. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন, ১৯৭০ এর নির্বাচন প্রভৃতি প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বগুড়ার মানুষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে বগুড়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের ভূমিকা ছিল খুবই গৌরবময়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই স্থানীয়

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা বগুড়া শহরে একত্রিত হতে থাকেন। মার্চের প্রতিরোধ সংগ্রামে বগুড়ার ছাত্র-জনতা-নারীরা ব্যতিক্রমধর্মী ও সাহসী প্রয়াসে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করে। ২৫ মার্চ রাতে পাক আর্মির একটি গ্রুপ রংপুর থেকে বগুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে এ খবর বগুড়ায় পৌঁছিলে ২৬ মার্চ সকাল থেকে ছাত্র-জনতা ও পুলিশবাহিনী বগুড়া প্রবেশের সবগুলো পথে গাছ কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টির চেষ্টা করে। শহরস্থ রেললাইনের উপর তারা ক'টি মালগাড়ি এনে রেখে দেয়, যাতে পাকসেনাদের গাড়িবহর রাস্তা পার হতে না পারে। তৎকালীন বগুড়া কোতোয়ালী থানার দারোগা নিজাম উদ্দিন এবং নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে স্থানীয় কিছু পুলিশ এবং ছাত্র-জনতা শহরের বিভিন্ন স্থানে পাকসেনাদের প্রতিহত করার জন্য অবস্থান নেয়। তাঁদের হাতে ছিল থানার আগ্নেয়াস্ত্র, ব্যক্তিগত বন্দুক, তীরধনুক, বল্লম ইত্যাদি। রংপুর থেকে আগত পাকিস্তানী আর্মিরা বগুড়া শহরের অদূরে ঠেঙ্গামারা এলাকায় প্রথম বাধার মুখে পড়ে। তাদের একটি অগ্রগামী দল পায়ে হেঁটেই এগিয়ে আসে। পাকসেনারা ফুলবাড়ির সুবিল পুলের উপর এলেই আড়ালে অবস্থান নেয়া ছাত্র-জনতার আক্রমণের মুখে পড়ে। এতে তারা কিছুটা বিপর্যস্ত হলেও পরে পাকসেনারা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে শহরময় ভীতির সৃষ্টি করে এগোতে থাকে। বড়গোলার মোড়ে এলেই তারা আনসার, পুলিশ, ইপিআর এবং নবপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধাদলের প্রবল গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হয়। এখানে একজন কর্নেলসহ ১১ জন পাকসেনা নিহত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র নবম খণ্ড সূত্রে জানা যায়। এই যুদ্ধে দশম শ্রেণির ছাত্র টিটু গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। একইভাবে শত্রুসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আজাদুর রহমানের মাথার খুলি উড়ে যায়। পাকসেনারা সাতানী মসজিদের গম্বুজ ও পশু হাসপাতাল মোট্যালসেল মেরে উড়িয়ে দেয়। এতে বেশকিছু লোক হতাহত হয়।

এর অনতিদূরে হাবীব ম্যাচ ফ্যাক্টরির মধ্যে অবস্থান নিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার রহমান আলীর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলারা পাকবাহিনীর উপর হঠাৎ তীব্র আক্রমণ চালালে দু'জন শত্রুসেনা নিহত হয়। এখানে আক্রান্ত হয়ে তারা সাময়িক পিছু হটে। বগুড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম পর্বে আরও শহিদ হন তোতা মিয়া, হিরু, দোলন, হিটলু, ছুনু (মোস্তাফিজার রহমান), আনোয়ারুল হক (আর্জাদ), তারেক, করিম, আব্দুল হামিদ প্রমুখ। পাকসেনারা বিভিন্নস্থানে আরও অজানা প্রায় অর্ধশত মানুষকে হত্যা করে। ২৭ মার্চ পাকসেনারা বগুড়া কটন মিল, মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, নাইট কলেজ, আজিজুল হক কলেজের পুরাতন ভবন এবং বেতার ভবন দখল করে ঘাঁটি গেড়ে বসে। মার্চের প্রতিরোধ যুদ্ধে স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে অসীম সাহসিকতা নিয়ে যেসব ছাত্র সক্রিয় অবদান রাখেন তাঁরা হলেন– মাসুদার রহমান হেলাল, রফিকুল ইসলাম (লাল), শামসুর রহমান, নবেল, ফেরদৌস জামান মুকুল, তপন, সাইদুল ইসলাম, গোলাম মোহাম্মদ পাইকার খোকন, আব্দুস সালাম (বুলবুল), শোকরানা, মাহতাব, মিন্টু, রাজা, বাবলু, প্রমুখ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীবৃন্দ। এ ছাড়া শ্রমিক নেতা বকুল ও শেখ আয়নুলসহ সেকেন্দার আলী, অরুণ, পাশা প্রমুখ ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সদর থানা ও পুলিশ লাইন থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও

www.pathagar.com

গোলাবারুদ প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা প্রতিরোধ যুদ্ধে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সাথে পরে কয়েকটি অভিযানে অংশ নেন।

৩০ মার্চ নওগাঁ থেকে ইপিআর বাহিনী ৭নং উইং-এর বাঙালি কমান্ডার নাজমুল হকের পরিকল্পনায় ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে একটি ইপিআর দল বগুড়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়। তারা স্থানীয় পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সহায়তায় এদিন সন্ধ্যায় এক অপারেশন (এ্যামবুশ) পরিচালনা করে ২৩ জন পাকসেনাকে হত্যা করে। এতে তাদের ৩টি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং ওয়ারলেসসেটসহ বেশকিছু গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। অবশিষ্ট পাকসেনা রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়।

পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বাঙালি ইপিআর ও ছাত্র-জনতার পূর্ববর্তী অভিযানের সাফল্য এ অঞ্চলের মানুষের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ফলে পাকিস্তানী আর্মির দ্বিতীয় আক্রমণ ঠেকাতে শাজাহানপুর এলাকায় ঢাকা সড়কে গাছ দিয়ে বেশ ক'টি ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়। ১ এপ্রিল বগুড়া থেকে নায়েব সুবাদার আকবর আলীর নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্র-জনতা বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য প্রবল প্রস্তুতিসহ অগ্রসর হয়। জনশ্রুতি ছিল যে সেখানে বেশকিছু বাঙালি সেনাকে বন্দি করে রেখে পাক আর্মিরা নির্যাতন করছে। এ সময় সহস্রাধিক স্থানীয় মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন এবং ক্যান্টনমেন্টের চারদিকে অবস্থান নেন। ঐ দিন পাকসেনাদের সাথে প্রায় আড়াই ঘন্টা যুদ্ধ চলে মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকসেনাদের পক্ষে আকাশপথে জঙ্গি বিমানও আসে এবং বোমা আক্রমণ চালায়। তবু সেখানে থেকে পিছু হটে নি মুক্তিকামী জনতা।

তীব্র আক্রমণের মুখে ৩ জন পাকসেনা নিহত হয়। অতঃপর একজন ক্যাপ্টেনসহ ২৩ জন পাকসেনা ও তাদের পরিবার আত্মসমর্পণ করে। বহুলোক এ যুদ্ধে হতাহত হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শহিদ মাসুদ আহম্মেদ। তিনি বগুড়ার তৎকালীন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডা. টি, আহম্মেদের ছেলে। যুদ্ধশেষে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধদের হস্তগত হয়। (স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিল পত্র-৩য় খণ্ড)।

বগুড়ার মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মাহমুদুল হাসান খান ও এ.কে. মজিবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে এই কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন-গাজীউল হক, ডা. জাহেদুর রহমান, মকলেছুর রহমান, আব্দুল লতিফ প্রমুখ। এ সময় পাকসেনাদের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলার জন্য ছাত্র যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনা ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় প্রশিক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল স্কুল, মালতিনগর স্কুল, করোনেশন স্কুল, বোবা স্কুল, সেউজগাড়ী, গাবতলী, সুখানপুকুর, ভেলুরপাড়া, সারিয়াকান্দি, হাটশেরপুর, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, তালোড়া ও সান্তাহারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়।

পাকবাহিনীর পরবর্তী সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি বগুড়া থেকে নগরবাড়ি পর্যন্ত অপরটি রংপুরের কাটাখালি ব্রিজ পর্যন্ত অবস্থান নেয়। ৪ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা কাটাখালি ব্রিজের আংশিক ধ্বংসসাধন করে। ৯ এপ্রিল পাকবাহিনী ঢাকা থেকে যমুনা নদী পার হয়ে আসার খবর পৌঁছালে সুবেদার মতিউর রহমানের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে একটি দল নগরবাড়ি অভিমুখে রওনা হয়। তাঁরা পাবনার বেড়া নামক স্থানে সম্মুখ যুদ্ধে পাকসেনাদের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে বগুড়ায় ফিরে আসে। এ যুদ্ধে বেশ ক'জন ইপিআর সদস্য শহিদ হন। ১১ এপ্রিল দু'টি ট্রাক যোগে মুক্তিযোদ্ধারা আবার নগরবাড়ি সড়কে অগ্রসর হয়। পাইকারহাট নামক স্থানে পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য অতর্কিত আক্রমণ চালালে ২৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের ২০ জন শহিদ হন। পরদিন অপর একটি দল নগরবাড়ি সড়কে গেরিলা যুদ্ধে পাকসেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে, কিন্তু খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে না পেরে ১৬ এপ্রিল বগুড়ায় ফিরে আসে। অন্যদিকে রংপুর থেকে দ্বিতীয়বারের মত পাক সেনাদের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়ে ১৫ এপ্রিল মুক্তিসেনারা কাটাখালি ব্রিজটি সম্পর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ছাত্র-জনতার একটি অংশ বগুড়াস্থ স্টেট ব্যাংক ভেঙ্গে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শহর ত্যাগ করেন। এ বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে উঠলে যুদ্ধরত মানুষের মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে যায় এবং এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয় শহরময়।

২৩ এপ্রিল পাকসেনারা দক্ষিণদিক থেকে ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে আবার বগুড়া শহরে প্রবেশ করে। আকাশপথে পাক জঙ্গি বিমান বোমা নিক্ষেপ করলে স্থানীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এদিন পাকসেনাদের হাতে শহিদ হন জাহেদুর রহমান (রঞ্জু), এ, এস, এম রায়হান ও আকবর হোসেন (বকুল) প্রমুখ। স্থানীয় বিহারিদের সাহায়তায় সমগ্র শহরাঞ্চলে পাকসেনারা ত্রাস সৃষ্টি করে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। পাকসেনাদের হত্যা নির্যাতন ক্রমে বাড়তে থাকে। তারা ২৩ এপ্রিল সুলতানগঞ্জ পাড়ায় মোফাজ্জল বারীসহ বেশ ক'জন মানুষকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে। এরপর ফুলবাড়ি এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ৭০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন আজিজুল হক কলেজের লাইব্রেরিয়ান ফয়েজ আহম্মেদ, হেডক্লার্ক মমতাজ উদ্দিন, তমিজ উদ্দিন মণ্ডল, রোস্তম আলী প্রামানিক, শমসের আলী প্রমুখ। পরদিন স্থানীয় পাক দালালদের সহযোগিতায় পাকসেনারা শহরের চকলোকমান, চকফরিদ, লতিফপুর, ঠনঠনিয়া, মালতিনগর, মালগ্রাম, গণ্ডগ্রাম, প্রভৃতি স্থানে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় দেড়শতাধিক স্থানীয় নিরীহ মানুষ তাদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

এরপর বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধারা অধিকাংশই ভারতে চলে যান এবং সেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য এদের একটি অংশ দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে অবস্থান করে নানামাত্রায় মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তোলেন। বগুড়াঞ্চলে স্মরণীয় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল রাণিরহাটের অদূরে "বিবির পুকুরে"। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর (রমজান মাস), ভোর রাতে বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া, খান্দার এলাকা থেকে ২১ জন বাঙালিকে স্থানীয় রাজাকার ও পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনকে ঐ রাতেই বিবির পুকুর নামক স্থানে (নাটোর রোড সংলগ্ন) সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পরদিন স্থানীয় লোকজন সেখানেই তাঁদের পাশাপাশি কবরস্থ করেন। বিবির পুকুর হত্যাকাণ্ডের শহিদরা হলেন-

www.pathagar.com

ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মান্নান পশারী ও তাঁর ভাই হান্নান পশারী, মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম, ন্যাপ কর্মী ওয়াজেদুর রহমান টুকু, জালাল মণ্ডল ও তাঁর ভাই মন্টু মণ্ডল, আব্দুস সবুর (ভোলা), আলতাফ আলী, বাদশা শেখ, বাচ্চু শেখ, ফজলুল হক খান, আবুল হোসেন, টিএন্ডটি অপারেটর নূরজাহান বেগম (লক্ষ্মী) এবং অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশিয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-সাম্‌সরা. যেসব স্থানে বাঙালিদের ধরে নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায় তারমধ্যে বগুড়া স্টেশন অঞ্চল ছিল অন্যতম। এছাড়া সেউজগাড়ী আমবাগান, রেলের এস ডিও-র বাংলো, মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ প্রভৃতি ছিল স্বাধীনতাকামী মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধা নির্যাতনের কেন্দ্র।

নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে বগুড়া মুক্ত করার অভিযান আরম্ভ হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী বগুড়া অঞ্চলে বোমা আক্রমণ আরম্ভ করে। অন্যদিকে ভারতীয় বাহিনীর ৬৪ মাউন্ট রেজিমেন্টের সৈন্যরা ব্রিগেডিয়ার প্রোম সিং-এর নেতৃত্বে স্থল পথে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হয়। তাঁরা এক পর্যায় বগুড়া শহরের দুই মাইল উত্তরে নওদাপাড়া ও ঠেঙ্গামারার মধ্যবর্তী লাঠিগাড়ি মাঠসংলগ্ন বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে অবস্থান নেয়। সে সময় ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে নয় জন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়। ভারতীয় বাহিনীর গুর্খাসৈন্যের একটি দল ট্রাক বহর নিয়ে পূর্ব দিক দিয়ে করতোয়ার পূর্ব তীর ধরে মাদলা হয়ে শাজাহানপুরের দিকে অবস্থান নেয়। অপর একটি মিত্রবাহিনীর দল বগুড়া শহর অভিমুখে রওনা দেয়। ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৩ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার এলাহী বক্সের নেতৃত্বে বৃন্দাবনপাড়ার রংপুর সড়কের পার্শ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। এভাবে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ বগুড়া সদর হানাদার শত্রু মুক্ত হয়। বগুড়া মুক্ত করার যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেশ ক'জন সৈন্য শহিদ হন।[২]

ঠ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের পরিচয়

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই বগুড়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। চর্যাপদ ও নাথসাহিত্য ধারার কাহ্নপা, সরহপা এবং মনসামঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র'র ঐতিহ্য লালিত বগুড়া জেলায় দেশ বরেণ্য অসংখ্য কবি, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো :

বগুড়া জেলার উল্লেখযোগ্য গায়ক ও শিল্পীরা হলেন :

বেদার উদ্দিন আহম্মদ, আঞ্জুমান আর বেগম, শওকত হায়াৎ খান, খন্দকার ফারুক আহমেদ, খুরশিদ আলম প্রমুখ। জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখ্যযোগ্য গীতিকার হলেন-জেবউন-নেছা জামাল। জনাব তৌফিকুল আলম টিপু ইয়্যুথ স্কয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বগুড়ার কিছু আঞ্চলিক গান সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত শিল্পীরা ছাড়াও বর্তমানকালের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন :

ওস্তাদ দেলোয়ার হোসেন, ওস্তাদ নুরুল মোহসিন ছোচি, ওস্তাদ মৃনাল কান্তি, ওস্তাদ খাজা গোলাম মঈন উদ্দিন, ওস্তাদ আশরাফুল ইসলাম, ওস্তাদ স্বপন কুমার কুণ্ডু, ওস্তাদ স্বপন সিং, সেখ মোহাম্মাদ আসাদ হোসেন, জাকির হোসেন, আবদুল আউয়াল, এস এম বেলাল, হাসিনুর রহমান (হাসু), স্বপন মুখার্জি, শ্যামল বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম, রঞ্জু সেখ, নুরুল ইসলাম, মোজার হোসেন, জেবননেছা (পুতুল), বিমল কবিরাজ, আবদুস সালাম, মুনসুর আহমেদ, যারাবান জুহুরা, সঞ্চয়, আবদুল আলীম, ইভানা আক্তার, মাহফুজার রহমান প্রমুখ।

বগুড়া জেলার বাউল ও বয়াতি শিল্পীদের মধ্যে ছকমান বয়াতি, সেকান্দার বয়াতি, গেদা ফকির, রইসমুন্সি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে প্রণোব সান্যাল, বকুল কবিরাজ, আলমগীর ফকির, আশুতোষ দাস, তপন চন্দ্র প্রমুখ শিল্পী বাউল গান বা লোকসঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক ও বয়াতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো :

বেদার উদ্দিন আহমদ (১৯২৭-১৯৯৮) : সঙ্গীত শিল্পী। বেদার উদ্দিন আহমদ ১৯২৭ সালে বগুড়া জেলার শেরপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সহিরুউদ্দিন ও মাতার নাম নেকজাহান বেগম। শেরপুরে তৎকালীন সময়ে জমিদারদের তত্ত্বাবধানে সংগীত চর্চা হতো। এ পরিবেশই বেদার উদ্দিন আহমদকে শিল্পী করে তোলে। সঙ্গীতের প্রথম পাঠ নেন গৌরচন্দ্র ঘোষের নিকট। ১৯৪০ সালে উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ছোটদের মধ্যে প্রথম হন। পরে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য কলকাতা গমন করেন। এখানে ওস্তাদ ইউসুফ খান কোরায়েশীর কাছে তালিম নেন। এরপরে ঢাকায় ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু ও ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দিনের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন। তিনি কবি জসীম উদ্দীন এবং শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের সাহচর্য গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে 'সং পাবলিসিটি' বিভাগে চাকুরি নেন। কলম্বিয়া ও এইচএমভি. গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁর গানের রেকর্ড বের করে। তিনি কলকাতা বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা চলে আসেন এবং 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা' থেকে সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করেন। বেতারে জসীম উদ্দীনের 'মধুমালা' ও 'বেদের মেয়ে' নাটক পরিচালনা করে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠিতা সদস্য ও শিক্ষক ছিলেন। শিল্পী হিসাবে বার্মা, ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। সঙ্গীতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি 'একুশে পদক' ও ১৯৮৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ করেন। কর্মজীবনে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির (বাফা) অধ্যক্ষ হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব সম্পাদন করেন। ১৯৯৮ সালে ১৩ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

জেব-উন-নেসা জামাল (১৯২৬-১৯৯৫) : গীতিকবি ও কণ্ঠশিল্পী। বিখ্যাত গীতিকবি জেব-উন-নেসা জামাল ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বগুড়া। পিতা-ছিলেন বগুড়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সমাজকর্মী ডা.কছির উদ্দিন তালুকদার এমবি। তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বগুড়ায় নির্মমভাবে শহিদ হন। জেব-উন-নেসার মাতার নাম- জেয়াউন নাহার তালুকদার। তিনি ছিলেন বগুড়ার একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী। জেব-উন-নেসার স্বামীর নাম– সৈয়দ জামাল উদ্দিন। জেব-উন-নেসা জামাল বগুড়াতেই শৈশব অতিবাহিত করেন। তিনি বগুড়ার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা ভিএম. গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এই স্কুল থেকেই ১৯৪১ সালে মেট্রিক পাশ করে কলকাতায় লেডি বেবোর্ন কলেজে ভর্তি হন। লেডি বেবোর্ন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৪৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি পাশ করেন। এরপর কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন দেশের একজন খ্যাতনামা বেতার ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বেতার থেকে সঙ্গীত পরিবেশন, কথিকা পাঠ ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। ঢাকা বেতারে মহিলা মাহফিল, স্কুল ব্রডকাস্ট, বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর ইত্যাদি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসমূহের পরিচালক ছিলেন। প্রেমমূলক সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক ও মরমি গান রচনা করে একসময়ে সারা দেশে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। একজন সাহিত্যিক ও গল্পকার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯৯৫ সালের ১ এপ্রিল ঢাকায় ধানমণ্ডির বাসস্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছকমান বয়াতি : সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার বিশাল পূর্বাঞ্চল এবং যমুনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী জামালপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মারফতি, মুর্শিদী এবং ধুয়া ও জারিগানের এক কিংবদন্তিতুল্য জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ছিলেন ছকমান বয়াতি। বড় বড় আসর ও মজমাতে তিনি গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। তিনি কেবল অন্যের রচিত গানই গাইতেন না। অধিকাংশ সময় নিজেই গান বাঁধতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিবেশন করতেন। তাঁর পুরো নাম ছকমান আলী শেখ এবং পিতার নাম মালেক শেখ। আদি নিবাস ছিল সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রাম। নদী ভাঙ্গনের ফলে পরবর্তীতে একই উপজেলার মানিকদাইড় চরে স্থানান্তরিত হন। একনিষ্ঠ সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য জীবনের শেষ দিকে তিনি সুফী সাহেব নামে পরিচিতি লাভ করেন। জন্ম আনুমানিক ১৯০০ বা ১৯০১ এবং মৃত্যু ১৯৯৪ সালে। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে মানিক দাইড় গ্রামে। স্থানীয় প্রবীণ লোকদের ধারণা শহুরে জীবনের সুযোগ পেলে জাতীয় পর্যায়ের অনেক বড় মাপের একজন গায়কের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হতেন তিনি। তাঁর নাতি বগুড়ার বিশিষ্ট কবি খৈয়াম কাদের জানান, 'ছকমান বয়াতির অসংখ্য গান বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে স্থানীয় অনেক বাউল ও বয়াতি তাঁর গান নিজ নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো সংগৃহীত হয়ে একটি গানের সংকলন প্রকাশ হলে প্রকৃত ছকমান বয়াতিকে চেনা যাবে'। লালনের গানের মতোই ছকমান বয়াতির অধিকাংশ গান বাস্তববাদী এং মোল্লাতন্ত্র বিরোধী।

www.pathagar.com

সেকান্দার বয়াতি : বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার একজন অন্যতম বয়াতি হলেন সেকান্দার বয়াতি। তার নিজের লেখা অসংখ্য গান যেমন আছে তেমনি তিনি পাগলা কানাইয়ের গানসহ স্থানীয় অন্যান্য বয়াতিদের গানও করতেন। সেকান্দার বয়াতি ১৩৫০ সালে দুর্ভিক্ষের বছর জন্মগ্রহণ করেন উপজেলার ছাগলধারা গ্রামে। সারিয়াকান্দি ছাড়াও তিনি বগুড়া ধুনট, গাবতলী, সোনাতলা, গাইবান্ধার সাঘাটা, ফুলছড়ি, এবং জামালপুরের ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ি এলাকাতেও গান পরিবেশন করতেন। এ এলাকায় তিনি যমুনার বা গ্রোয়েন বাঁধের জারিগানের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আসরে গান পরিবেশনের সময় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মতি-গতি লক্ষ রেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করতেন। ২০০৫ সালে নিজ বাড়িতে গান পরিবেশনের সময় হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. বাবু শ্রী প্রকাশ কুমার সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক, শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির কমিটি শেরপুর, বগুড়া।

২. মুক্তিযুদ্ধের দলিল পত্র তৃতীয় ও নবম খণ্ড, মল্লিকা (বিশেষ সংখ্যা) বগুড়া ২০০৮ সম্পাদক-আজিজার রহমান তাজ।

৩. মোতাহার হোসেন (৫০), গ্রাম মহিষবাথান, গাবতলী, বগুড়া।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিসসা/রূপকথা/উপকথা

আদমদিঘির লোকগল্প

আমধন (রামধন) নামে একই গাঁয়ে দুই লোক আছিলো। একঝোন (একজন) ছোট আমধন আরেকঝোন বড় আমধন। একঝোন বড়লোক আর আরেকঝোন গরিব। দুইঝোনের কপালে আচলো দুডা আলু (টিউমার)। কিন্তু তারা একঝোন আরেকঝোনকে দেখপার পারে না। কারণ যে বড়লোক সে মনে করে হামি বড়লোক হামার নামও আমধন ঐ শালার কিছু নাই তাও ওর নামও আমধন। তাই দুই ঝোনের মনের মধ্যে হিংসা। একদিন শালা হচে কি ছোট আমধন গেচে ধাপের হাটত। ধাপের হাটত থাক্যা আসার সমায় ঘাঁটাত (রাস্তায়) একটা বট গাছের নিচে সুস্তাচ্ছে (বিশ্রাম)। এমন সমায় ঐ বট গাছে আচলো পরিরা। তখন আমধনকে দেখ্যা তারা কচ্চে আমধন তোর কপালের ওডা হামাগোরক (আমাদের) দুবু? তখন আমধন মনে মনে কলো এডা তো শালা হামার অসহ্য। তাই এডা নিলে তো ভালই হয়। তখন পরিরা তার কপাল থ্যাকা ওডা নিয়ে নিলো। পরের দিন বড় আমধনের সাথে ছোট আমধনের দেখা। তখন বড় আমধন তাকে দেখ্যা কচ্চে ক্যারে তোর কপালের আলু কী হলো। তখন ছোট আমধন তাকে সব খুলা কলো। তারপর পরের দিন আবার বড় আমধন ঐ বট গাছের নিচে গেলো। তখন পরিরা আস্যা কচ্চে আমধন তোর আলু হামাকেরে কোন কাজে লাগেনি। ধর তোর আলু তুই নিয়া যা। তখন বড় আমধনের কপালের দুইদিকে দুডা আলু হয়্যা গেল। এইনা দেখ্যা বড় আমধন তো ক্ষেপা ফয়ার। তখন সে করলো কি ছোট আমধনকে কিভাবে মারা যায় তার চিন্তা করতে লাগলো। তাকে মারার জন্য সে একটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বার করলো। সে একটা বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে বিষ ভরালো। আর ঐ বিষ সে ছোট আমধনের পুটকির মধ্যে দিয়া প্যাটের মধ্যে দিবে। যাতে ময়না তদন্ত করেও বের করা না যায় কিভাবে মারা হচে। একদিন আত্রে (রাতে) বড় আমধন দুইঝোন লোক ঠিক করলো তাকে মারার জন্য। ছোট আমধন ঘাঁটা দিয়ে যাচ্ছে। এমন সমায় তারা ঘচ করয়া তাকে ধরলো। তারপর দুইঝোনে দুই হাতপাও শক্ত করে ধরলো আর বড় আমধন চোঙ্গা তার (ছোট আমধন) পুটকি সোজা ধর‍্যা দিলো ফু। ঐ সমায় শালা ছোট আমধন করছে কি পাদ ছাড়ছে। আর বিষ গুলা তার প্যাটে না যাইয়্যা বড় আমধনের নিজের প্যাটত চল্যা গেল। তখন বড় আমধন কচ্ছে—

> মানুষে করিচে ফুক্কা মানুষো মারিবার
> বিধাতা করিচে ফুক্কা ফুক্কার উপর ফুক্কা।[১]

www.pathagar.com

নন্দীগ্রামের লোকগল্প

লোকগল্প-১

এক বোকা লোক ছিল। সে মাঝেমধ্যে তার শ্বশুর বাড়ি যায়। একদিন তার বাপ কচ্চে এতোদিন হলো বেটাক বিয়া দিনু শ্বশুর কি খিলাই না খিলাই (খাওয়ানো) বেটা বাড়িত আস্যা কয় না। আজ বেটা বাড়িত আলে শোনমো। সেদিন তার শ্বায়ুর (শ্বাশুড়ি) বোলের মাছ শলুকের শাক দিয়া রান্না করছে। তো খাইয়া দাইয়া বোকা বাড়িত আসিসচে আর মুখ দিয়া ঐ কতা কতে কতে আসিসচে 'বোলের মাছ শলুকের শাক...'। ঘেটার মধ্যে ডয়র (জমির আইল ভাঙ্গার ফলে যে পানি জমানো ছোট খালের সৃষ্টি হয়) পার হতেই ভুলা গেছে। কি দিয়া ভাত খাছে। তখন বোকা করছে কি পানির মধ্যে হাতাতে লাগছে। ঐ সমায় ঐ পথ দিয়া খুলু যাচ্চে। খুলু মনে করছে কোনো মূল্যবান জিনিস হার‍্যা গেছে বোধ হয়। তাই খুলু তার ত্যালের ঠিলা ভাঙা পানি ছিছপার ল্যাগিচে। ঐ সময় বোকা করছে কি পাদিচে। তখন খুলু কচ্চে ও কি গোন্দ (গন্ধ) রে...-শালা, বোলের মাছ আর শলুকের শাক দিয়া বোধ হয় ভাত খাইয়া আচ্চে। তখন বোকা কচ্চে পাইয়া গেচি। তখন খুলু কচ্চে হামাক আনা দে।[২]

লোকগল্প-২

হোপা আর হোপার মাও এক সাতে থাকে। একদিন হোপা কচ্চে মা হামি যাচ্চি হাল লিয়া তুই পান্তা লিয়া যাস। তো বেল (বেলা) হয়্যা গেছে তাই হোপার মাও হোপার নামে পান্তা লিয়া যাচ্চে। তখন ঘেটার মধ্যে এক শিয়াল কচ্চে ও হোপার মাও কোনটি যাচ্চু? হোপার মাও কচ্চে হোপা হাল বচ্চে তার নামে পান্তা লিয়া যাচ্চি। তখন শিয়াল কচ্চে, দের বাপু হোপা পান্তা খাছে। তুই হামার কাছে আয়। তখন হোপার মাও মনে করছে তার বেটা সত্যি সত্যি পান্তা খাছে। তাই শিয়ালের কাছে যখন গেছে তখন শিয়াল কচ্চে হামার হোল চুলকাচ্চে। তুই হামার হোল চুলকা দে আর হামি বস্যা থাক্যা পান্তা খাই। তখন হোপার মাও শিয়ালের দাউদ আলা হোল চুলকা দিচ্চে আর শিয়াল পান্তা খাচ্চে। পান্তা খাওয়া শ্যাষ আর শিয়ালের হোলের চুলকানিও শ্যাষ। তখন হোপার মাও খালি টিফিনগারি লিয়া বাড়িত আসে। হোপা হাল বয়্যা বাড়িত আসে। আস্যা কচ্চে মা তুই পান্তা লিয়া যাসনি কা? তখন হোপার মাও কচ্চে, বাপোরো হামি তোর নামে পান্তা লিয়া গেছনো। ঘেটার মধ্যে শিয়ালে খাছে। তাই খালি টিফিনগারি লিয়া বাড়িত আচ্চি। হামি তোর নামে পান্তা লিয়া যাচ্চি তখন শিয়াল কচ্চে হোপার মাও হোপা তো পান্তা খাছে, তুই এক কাম কর, হামার হোল চুলকা দে। তাই হামি শিয়ালের হোল চুলকা দিনু আর শিয়াল তোর পান্তা সব খাছে। তখন দুই মায়ে বেটায় মিলে বুদ্ধি করলো, হামি শুয়া থাকমো আর তুই ঘুটা কুড়াবার যাবু। শিয়ালের সাথে দেখা হলে কবু হোপা মরিচে তাই তার চাদ্দ (শ্রাদ্ধ)। হোপার মাও ঘুটা কুড়াবার গেছে। শিয়াল দেকা কচ্চে ক্যা হোপার মা ঘুটা কি করবু? হোপার মাও তখন কানতে কানতে কচ্চে হোপা মরিচে তাই ওর চাদ্দ করার জন্য ঘুটা কুড়াচ্চি। তাই তোদের নেমন্তন্য সোমবারে। এই কতা শুনা শিয়ালরা সকলে হোপার মায়ক ঘুটা কুড়া দিলো। এক শিয়াল হোপার মায়ক কলো হামরা বাড়ি চিনমো ক্যানকারা। হোপার মাও কলো যেই

www.pathagar.com

বাড়িত ধুমা উটপে সেই বাড়িত যাবু। সোমবার চালা আচ্চে। শিয়ালগুলা যখন হোপার বাড়িত আসে তখন হোপার মাও কচ্চে তোরাতো হিংসুরা জানার। তাই সবগুলাক ভিন্ন ভিন্ন খুটার সাতে বানদি (বাঁধা)। বান্দার পর হোপার মাও কচ্চে 'হোপারে পুত লাল লাঠি লিয়া উঠ,। হোপা তখন মোটা লাঠি দিয়া এমন বসান দিলো কারো দাঁত ভাঙা গেলো, কারো মুখ ফ্যাটা গেলো। শিয়ালগুলা ভয়ের ঠেলাত দড়ি ছিঁড়াছুটা চল্যা গেলো। যাওয়ার সময় দড়ি গলার সাতে চল্যা গেছে। আসার পর তারা কচ্চে শালা এ্যার এ্যাকশন যদি না লিবার পারছি তালে শালা হামরা বাপের বেটা লয়। তাই এক শিয়াল করচে কি তার নেজটা একটু কাটা গেচে। সেডা জুড়ানোর জন্য নেজ গোটা কাঁকড়ার খোঙ্গের (গর্ত) মধ্যে দিচে। তখন শালা কাঁকড়া করচে কি নেজত দিচে কামড়। তখন শিয়াল কচ্চে খোঙ্গের মধ্যেও শালা হোপার মাও। তারপর শিয়ালরা এ্যাকশন নেওয়ার জন্য মনে মনে খালি দেখে শালা হোপা কদ্দিন হাটত যায়। একদিন দেখে হোপা হাটত থাক্যা ঠিলা লিয়া আসিসচে। তখন শিয়ালরা কচ্চে এই চুদির বেটাক এখন বাঁকর দিমো। শিয়ালরা হোপাক ছানদিচে (ঘিরে নেওয়া)। তখন হোপা ভয়ে তালের গাছত উটিচে। শিয়ালরা করচে কি হোপাক ধরার জন্য একঝোনার ঘারের উপর আরেকঝোন উটিচে। তখন হোপা কচ্চে 'হাঁড়ি তুই ধর তলকার আড়ি,। এই কয়া ঠিলা দিচে ছাড়া। তখন ঠিলা মাটিত আসা থপাস কর‍্যা পড়িচে। শিয়ালরা মনে করিচে নিচে বোধহয় অন্য হোপা আচ্চে। তখন তারা ভয়ে পড়তে মরতে দৌড়। শিয়ালের মনে শিয়াল চল্যা গেল হোপার মনে হোপা চল্যা গেল। হামার গপ্প (গল্প) পগু হয়্যা গেল।

লোকগল্প-৩

এক আজা অশলীন (যে গল্প এর আগে শোনা হয়নি) গান শুনবে। তাই আজা মন্ত্রিক কচ্চে, যাই সেই গান শুনাবার পারবে তাক ১ লাক টেকা পরিস্কার (পুরস্কার) দেওয়া হবে। আজার মন্ত্রি চারদিকে ঢোল পিটা দিচে। তো একঝোন মানুষ লতুন বিয়া করিচে। তার লতুন বউ গুদির (ছোট পুকুর) পাড়ত থাল মাঝবার আচ্চে। তখন ঢোল শুনা মনে মনে কচ্চে হামার দামান তো সারা দিন হোঁ হোঁ কর‍্যা গান গায় তো বোধহয় ভালই গাবার পারে। তাই তার বউ বায়না লিচে। তখন ঐ লোক সন্ধ্যা সমায় বাড়িত আচ্চে। তারপর ওর বউ কচ্চে ওগো হামি যে একটা কাম কর‍্যা ফাল্যা দিচি। দামান কচ্চে কি কাম? বউ কচ্চে আজার মন্ত্রি ঢোল দিবার আচ্চিলো। যাই আজাক অশলীন গান শুনাবার পারবে আজা তাক ১ লাক টেকা পরিস্কার দিবে। হামি তো বায়না লিচি। দামান কচ্চে তুই কি জন্যে বায়না লিলু হামি তো গান গাবার পারি না। তখন লতুন বউ কচ্চে তুমি সারা দিন যে হোঁ হোঁ করো তাই হামি মনে করচি তুমি বোধহয় ভালো গান জানো। তখন দামান কচ্চে বায়না তো লিয়া ফাল্যা দিচু এখন কিছু করার নাই। তাই ঐ গাহ গান গাবার জন্য আজার বাড়িত যাচ্চে, যাওয়ার সমায় ঘেটার মধ্যে কিল্লাক (এক প্রকার পোকা) লাত্তি লাগিচে। তখন কিল্লা কোকড়ি মোকড়ি লাগা গ্যাছে। তখন গাহ মনে মনে কচ্চে এই গান গাওয়া যায়। 'কোঁকড়ি মোকড়ি লাগ্যা থাকে ওরে হামার মন'। তারপর আবার যাচ্চে যাওয়ার সমায় দেখে এক শিয়াল দৌড়া যাচ্চে আর ফিরা ফিরা চাচ্চে। ওডা দেকা আবার গাহ মনে মনে কচ্চে এই গান গাওয়া যায়। 'দৌড়া

www.pathagar.com

দৌড়া যায় ফিরা ফিরা চায় ওরে হামার মন'। তারপর আবার যাচ্চে যাওয়ার সমায় ঘেটাত দ্যাখে যে এক পোয়াতি প্যাটের বেদনায় একবার উটিচ্চে একবার বসিচ্চে। ওডা দেকা গাহ্ মনে মনে কচ্চে 'একবার ওটে একবার বসে ওরে হামার মন'। আজার বাড়িত গাহ্ চল্যা আচ্চে সবাই তখন দেকপার আসিচ্চে। গাহকে চা বিস্কুট খাবার দিচে। চা বিস্কুট খাওয়ার পর আজা কচ্চে এখন গান শুরু করো। তখন গাহ্ গান শুরু কর্যা দিচে। 'কোঁকড়ি মোকড়ি লাগ্যা থাকে ওরে হামার মন'। গান শুনা আজা বেহুঁস হয়্যা গ্যাছে। তখন আজার হুস ফিরা আনার পর আজা কচ্চে হায় সব্বোনাশ এ কি গান! হামরা যে মায়ের ওদরে থাকি তার কতা কচ্চে। তারপর আবার গাহকে বলা হলো গাও। গাহ্ আবার কচ্চে 'দৌড়া দৌড়া যায় ফিরা ফিরা চায় ওরে হামার মন'। আজা আবার বেহুঁস। তখন সকলে কচ্চে ক্যা আজা মশাই এই গানের মানে কি? তখন আজা কচ্চে হামার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন বাবার কবরে ছোট ছইল থাকতে বাবার কবরে বারবার কর্যা যায় আবার ফিরা ফিরা চায়। তখন সকলে শুনা কচ্চে বাহ্ ভাল গান তো। তারপর আবার গাহ্ কচ্চে 'একবার ওটে একবার বসে ওরে হামার মন'। আজা আবার ঠস কর্যা পর্যা যায়। হুঁস হলে আজা কচ্চে হামার মায়ের যখন প্যাটের বেদনা ওটে তখন বেদনায় ছটফট করতে থাকে আর একবার ওটে একবার বসে। তখন গান শুনা সবাই হাতত তালি দিবার লাগলো। আজা তখন গাহকে ১ লাক টেকা পরিষ্কার দিলো। ঐ দরবারে যত চোর ডাকাত আচলো তারা মনে মনে কচ্চে এই টেকা কিভাবে চুরি করা যায়। তখন তিনডা চোর ওর পাছ লিছে। গাহ টেকা লিয়া বাড়িত গ্যাছে। চোর তিনডা করচে কি ওর (গায়ক) ঘরের পাচে একসাতে বসা আছে। তখন গাহর (গায়ক) বউ কচ্চে কি গান গাচলা। গাহ্ তখন গানগুলার লাইন এ্যাকে এ্যাকে কচ্চে। তখন চোরেরা মনে মনে কচ্চে হামাগেরে কতাই বোধহয় কচ্চে। কারণ চোরেরা একবার উটিচ্চে আর একবার বসিচ্চে। আবার একজন কোঁকড়ি মোকড়ি লাগ্যা বস্যা আছে। ভয়ে দৌড়া যাওয়ার সমায় ফিরা ফিরা চাচ্চে। তখন তারা ঝাড়া দৌড়। গাহ তখন ছোটমোটো আজোত্রি (রাজত্ব) কর্যা খাবার লাগলো, হামার গপ্প ফুরা গেল।

লোকগল্প-৪

একটা কাটুরা (কাঠুরা) কাট কাট্যা খায়। ঐ কাটুরার বউয়ের একটা ভালোবাসা আছে মানে নাঙ্গ আছে। নাঙ্গের নাম আতপদি। কাটুরার নাম শরবদি। কাটুরা যখন কাট কাটপার যায় তখন নাঙ আসে বাড়িত। এক দিন কাটুরার বউ বুদ্ধি করলো শালা কাটুরাক যদি মার্যা ফাল্যা দেওয়া যায় আপদ বিদায় হয়্যা যাবে। তাই ১ তোলা বিষ, খুদ, গুড় দিয়া ৭টা লাড়ু বানাচে। কাটুরা কাট কাটপার যাবে। যাওয়ার আগে বউক কচ্চে পান্তাটান্তা সাজা দে। কাটুরার বউ গামছাত কর্যা ৭টা লাড়ু বান্দা দিলো। কাটুরা লাড়ু লিয়া বাড়ির বেঁড়া বলদ লিয়া চল্যা গেল। কাটুরা বনত যাইয়া গামছা গাচের সাতে বান্দা থুয়া কাট কাটিচ্চে। তখন ৭ ঝোন ডাকাত করচে কি ৭ বস্তা টেকা লিয়া যাচ্চে। ঘেটার মধ্যে তাদের খুব খিদা (ক্ষুদা) লাগচে। তাই একটা গাচের নিচে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে বচ্চে। দ্যাখে গাচের সাতে গামছাত করা কিবা বান্দা আছে। তখন একঝোন ওগলা লিয়া আচ্চে। তারপর ৭ ঝোনে ৭টা লাড়ু ভাগ কর্যা খাচে।

www.pathagar.com

খাইয়া কিছুক্ষণ পর সব ডাকাত মর‍্যা গ্যাছে। তখন কাটুরা ৭ বস্তা টেকা লিয়া বাড়িত আচ্চে। আস্যা দ্যাখে বউ নাঙ লিয়া সুতিচে। কাটুরা বাড়িত আসার কতা শুনা আতপদি গরুর গোয়ালের মধ্যে যাইয়া লুকাচে। তখন ঐ বেঁড়া বলদ করছে কি এক লাত্তি দিয়া নাঙগ মার‍্যা ফাল্যা দিচে। তখন কাটুরা কচ্চে,

কপাল ভাগ্য হলে পড়্যা পালো সোনা
ঘরের ইস্ত্রী খাতে দিলো চোর মলো ৭ ঝোনা।
বিড়া বলদের লাত্তি খাইয়া মলো আতপদি
মাগিডা যে ফেরফেরায় উপায় করি কি!

লোকগল্প-৫

এক রাজার বাড়িত একঝোন মালানি আচলো। রাজা ঐ মালানিক ১০০ডা বকরি চড়াবার দিলো। এর মধ্যে একদিন বগা আর বগি বাচ্চা লিয়া মারামারি লাগিচে। বগা বাচ্চা লিচে কাড়্যা। বগি রাজার কাছে বিচার দিলো। রাজা বিচার করলো। রাজা বগিকে কলো তুমি বাচ্চা পাবিন না। এদিকে মালানি করলো কি লিজের টেকা দিয়া একটা পাঁটা লিলো। লিয়া ঐ বকরির পালের মধ্যে ছাড়্যা দিলো। তারপর কিছুদিন পর সব বকরির দুডা কর‍্যা বাচ্চা হলো। বাচ্চা হলো মোট ২০০ ডা। আর সব বাচ্চা লিলো মালানি। রাজা মালানিক কলো তুমি সব বাচ্চা লিয়া গেলু কেন? তখন মালানি রাজার কাছে বগাবগির বিচারের কতা কলো। তারপর রাজা মালানিক কলো (বলা) তুমি বিনা পুরুষে বাচ্চা প্রসব করতে পারবে? মালানি কলো হামি বিনা পুরুষে প্রসব কর‍্যা পারমো। তখন রাজা মালানিক বিয়া করলো। রাজা মালানিক কলো বল বেশি না বুদ্ধি বেশি? মালানি কলো বুদ্ধি বেশি। তখন রাজা মালানিক একটা ভিন্ন বাড়িতে আটকা থোই। মালানি তখন বুদ্ধি কর‍্যা রাজ মিস্ত্রি ডাক দিয়া ঐ বাড়ির মধ্যে থাক্যা একটা সুড়ঙ্গ তৈরি কর‍্যা লেয়। মালানি মিস্ত্রিক ১ লাক টেকা পরিস্কার দিলো। মালানি ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া বাড় হয়্যা ছদ্মবেশ ধর‍্যা রাজার সামনে আম লিয়া যায়। রাজা মালানির উপ (রূপ) দেকা পাগল হয়্যা আংটি উপহার দেয়। তারপর একদিন আবার দই লিয়া যায় রাজা সেদিন লিজের মাতার মটুক (মুকুট) দেয়। আর মালানির সাতে সহবাস করে। তারপর আবার আসে ইলিশ মাছ লিয়া। সেদিন রাজা তার ঘড়ি খুলা দেয়। তারপর বারো বছর পর মালানি ঐ বাড়ি থাক্যা ১২ডা বেটা লিয়া বাড় হয়। বার হওয়ার পর মালানি লিজের পরিচয় দেয়। তখন আজা তাক মান্যা লেয়।[৩]

লোকগল্প-৬

হাসাল ধুমার গপ্প। হাসাল ধুমারা ৭ ভাই। তার মধ্যে ৬ ভাই বিয়া করিচে। ছোট হাসাল ধুমা বিয়া করে নি। তাই সে ভাইয়ের বউগুলাক পয়র (পাহারা) দেয়। আর বড় হাসাল ধুমাদের চুরাত (মাঠে) পান্তা খিলাই। একদিন ওর ভাইয়েরা কচ্চে তুই খালি বস্যা থাক্যা খাস। এভাবে খালে দিনপত যাবি? একদিন ছোট হাসাল ধুমা পান্তা নিয়া যাচ্চে। ঘেটার মধ্যে শিয়াল পণ্ডিতের সাতে দেখা। শিয়াল পণ্ডিত কচ্চে হাসাল ধুমা তোর করকুষ্টিক নাই সুক (সুখ)। হাসাল ধুমা চিন্তাত পড়্যা গেল। আরাক দিন পান্তা নিয়া যাচ্চে। সেদিন হাসাল ধুমার আমাশা (আমাশয়) হচে। পান্তা থুয়া খাড়ির (ছোট

www.pathagar.com

নদী) বাতাত হাগিচ্চে। হাগার সময় বিন্না ধর‍্যা হাগিচ্চে। হেন সময় বিন্না উগড়া ৭ ডাবর টেকা বাড়াচে। হাসাল ধুমা ৭ ডাবর টেকা নিয়া বাড়িত আচ্চে। তারপর বড়লোক হয়্যা গেচে। আরাক দিন শিয়ালের সাতে দেখা। শিয়াল আবার কচ্চে তোর করকুষ্টিক নাই সুখ, কিন্তু তোর পুটকিৎ আছে সুখ সেডা তো আর হামি গুনি নি।

লোকগল্প-৭

এক লোক নতুন বিয়া কর‍্যা গ্যাচে শ্বশুড় বাড়িত। যাওয়ার সময় এক খাবলা দই লিয়া গ্যাচে। যাওয়ার পরে শ্বাশুড়ি খাবার দিচে। জামায়ের খাওয়া পেরাই শ্যাষ। শ্বাউড়ের দই দেওয়ার কতা মনে নাই। তখন জামাই কচ্চে পাতের গোড়াত এক বিলি (বিড়াল) ঘুড়িচ্চে। জামাই কচ্চে তোক চিঙ্গা দিয়া এক্কেরে দইয়ের নাড়ির কাছে দিমো। তখন শ্বাউরের মনে হচে। তখন শ্বাউর (শ্বাশুড়ি) কচ্চে বাবা বাবা ভাল কতা মনে করচো। দই দেওয়ার কতা মনে নাই।

লোকগল্প-৮

আগেকার আমলে বাল্য বিয়া দিতো। ছোট বেলায় কোলে কোলে বিয়া দিত। তো এক বোকাক বিয়া দিচে ছোট বেলায়। যখন বড় হচে তখন বোকা মায়ক কচ্চে, মা অলেকেই শ্বশুড় বাড়ি যায়। হামিও যামো। মায়ে কচ্চে তোরও শ্বশুড় বাড়ি আচে বাবা। তখন বোকা কচ্চে হামি তালে শ্বশুড় বাড়ি যামো। মায়ে কচ্চে শ্বশুড় বাড়ি গেলে কিচুমিচু নিয়া যাস। বোকা তখন শ্বশুড় বাড়ি যাচ্চে। যাওয়ার সময় বাজারত থাক্যা কিচুমিচু কিনার জন্য গেচে। বোকা চায়ের দোকানত যায়্যা কচ্চে ভাই কিচুমিচু আছে? এরকম কর‍্যা প্রায় ৩-৪ দোকান ঘুরিচে। শ্যাষে এক কলার দোকানত যায়্যা কচ্চে ভাই কিচুমিচু আছে? ঐ দোকানদার আচলো চালাক। তখন ঐ দোকানদার কচ্চে আছে। বোকা তখন ১ ছড়ি কলা নিয়া যাচ্চে। যাওয়ার সময় দ্যাকে ওর শালারা খেলাচ্চে। তখন ওর মধ্যে থাক্যা একঝোন কচ্চে এ বারে ১টা কলা দিয়া যাও। বোকা তখন কচ্চে শালা তোর ইয়াত দোমোনি কলা। আর শ্বশুড় বাড়ি যাওয়ার সময় মায়ে কয়্যা দিচে বাবা 'উঁচা দোপা দেকা বসিস' আর ছোট বড় দেকা ভক্তি হস্। বোকা যখন শ্বশুড় বাড়িত গ্যাছে তখন বসার জন্য দিচে চেয়ার। বোকা চেয়ারত না বস্যা বচ্চে গরুর চারিত। আর ভক্তি হচ্চে শালা শালি সকলেক। ইতিমধ্যে ওর শালা খেল্যা বাড়িত আচ্চে। শালা মায়েক আস্যা কচ্চে মা হামি ঐ মানুষের থাক্যা কলা চাচোনু ঐ মানুষ কলা দেয় নি। তখন মায়ে কচ্চে ওডা তোর দাদাবাবু বাবা। শালা মনে মনে কচ্চে শালা তুই তখন কলা দেস নি এখন তো সবগুলাই খামুনি। এরমধ্যে আত্রে (রাতে) খাবার বচ্চে। খাবার শ্যাষে শ্বাশুড়ি সবার পাতত পায়েস দিচ্চে। তখন বোকা পায়েস নিবে না। হাতা ঘুড়াতেই একটু পড়িচে। খায়্যা দেকে শালা খুব স্বাদ। আত্রে জামাইকে থুচে পাকের ঘরের মধ্যে। আর পায়েস থুচে পাঁল্লাত (পাতিল) কর‍্যা ঘাঁটা। জামাই লক্কোরা (গোপনে) খাবার যায়্যা পাল্লার কান্দারসাতে মাতা আঁটকা গ্যাছে। পাল্লা মাতাত কর‍্যা ঘুরতে ঘুরতে পাল্লা দরজার চকাটেরসাতে বাড়ি খাছে। খায়েই পাল্লা গ্যাছে ভাঙ্গা। তখন শুধু কান্দা গলারসাতে আঁটকা গ্যাছে। অন্ধকারে হাতরাতে হাতরাতে আলকাতরার মধ্যে দিচে হাত। আর গোটা গাও গ্যাছে মাক্যা। ঘরের মধ্যে

www.pathagar.com

বস্তাত কর‍্যা আচলো তুলা। ওগলা তুলারসাতে মুছবার চাচ্চে। মুছা তো দূরেত থাক আরো বেশি তুলা গায়েরসাতে লাগ্যা যাচ্চে। শ্যাষে ভেড়ার গোলের (গোয়াল) মধ্যে ঢোকে। সকালে শালা গ্যাছে ভেড়া বার করবার। জামাই উপর হয়্যা আছে। সব ভেড়া বার হলেও ওই আর বাড়াচ্চে না। তে তখন শালা কচ্চে মা বড় ভেড়াটার মনে হয় অসুখ হছে। ওই আর বারাচ্চে না। শ্বাশুড়ি কচ্চে দেকি ভেড়ার আবার কি হলো। যায়্যা টিপতে টিপতে জামাইয়ের গোয়ার মধ্যে গ্যাচে হাত। ওই চিগড়িতে চিগড়িতে উঠা দৌড়। তখন শ্বাশুড়ি কচ্চে ইডা না জামাই।

লোকগল্প-৯

এক বোকা লোক গ্যাচে ধান কাটপার। ধানটান কাট্যা দম নিচ্চে কাচি (কাস্তে) আলের উপর র‍্যাখা। কাচি রোদে তাঁতা গরম হয়্যা গ্যাচে। তখন বোকা কচ্চে ক্যারে হামার কাচির গায়ত না জ্বর আচ্চে। মানুষক কচ্চে হামার কাচির গায়ত জ্বর আচ্চে। মানুষ কচ্চে পোকরের (পুকুর) মধ্যে ডুবাগা। পোকরত ডুবাচে কাচি ঠাণ্ডা হয়্যা গ্যাচে। তারপর বাড়িত আচ্চে। বাড়িত আস্যা দেকে মায়ের গায়ত আচ্চে জ্বর। মাও লেপটেপ গায়ত দিয়া শুয়া আছে। বোকা লোক কচ্চে মা হামি জ্বরের অষুধ জানি। তোর হাত পাও বান্দা লাগবি। তারপর হাতপাও বান্দা দামআলা (কচুরি পানা) পোকরের (পুকুর) দামের দলে দিচে ঢুকা। ঘন্টা দুইতিনেক পর যায়্যা দেকে মাও মর‍্যা সিটকা লাগ্যা আছে।

লোকগল্প-১০

এক কোণায় জ্যাতের (জাতি) বাবা মারা গ্যাচে। তার চান্দ (শ্রাদ্ধ)। তাই ঠাকুরের কাচে শুনবার গ্যাচে কি কি লাগবে। ঠাকুরে কচ্চে তোর বাপের চান্দে ৭টা কাছিম (কচ্ছপ) নাগবে। ঠাকুর মনে মনে কচ্চে এই জ্যাত বোকার জ্যাত। তাই যা কমো তাই শুনবে। চান্দের দিন ৭টা কাছিমত সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া থুচে। তারপর পূজার সমায় যা যা লাগে সবগুলান সামনে থুচে। সেই দিন ঐ আস্তা দিয়া যাচ্চে আরেক ঠাকুর সূর্যকি (নামকরণ অনুষ্ঠান) দিতে। বাড়ির দরজা দিয়া ঐ ঠাকুর কাছিম দেকপার পাচে। তখন ঐ ঠাকুর কচ্চে-একি অদভুতং চান্দের কেন দুরং (কচ্ছপ)। আরেক ঠাকুর কচ্চে-চুপং চুপং চুপং তোর অরধং মোর অরধং।

লোকগল্প-১১

বছরকা জামাইয়ের (যে জামাই শ্বশুড় বাড়িতে এসে যেতে চায় না) কিচ্চা। জামাই খুব আলসা কিচ্ছু কিনে না। একবার ঐ আলসা জামাই শ্বশুড় বাড়ি গ্যাছে। শ্বশুড় বাড়িত অনেক দিন থাকা হয়্যা গ্যাছে শালা যায় না। একদিন শালা করছে কি ডুপ ঢুবার বাড়াচে। তখন দেকে যে শুটকি মাছ লাড়া (শুকাতে দেওয়া) দেওয়া আচে। তারপর ডুপ ধুয়া বাড়িত আচ্চে। আসার পর জামাই ঘুম পারিচ্চে আর স্বপ্নে কচ্চে শুটকি খামো। তখন শ্বশুড় জামাইয়ের কতা শুনা কচ্চে হামার চ্যাঁট (পুরুষ লিঙ্গ) খা। শ্বাউর জামাইকে শুটকি আন্দা (রান্না করা) খাওয়ায়। তারপরও জামাই যায় না। এভাবে এ্যাকে এ্যাকে খাছড়া গুড়, মাচ, মাংস, দই, কাঁঠাল খাওয়া শ্যাষ। জামাই মনে মনে

www.pathagar.com

কচ্চে সব খাওয়া শ্যাষ একন (এখন) তো বাড়িত যাওয়া লাগবে। জামাই আত্রে (রাতে) করছে কি গুড় খাওয়ার জন্য গুড়ের পাল্লাত গুতা মারিচে। আর পাল্লাত (পাতিল) থাক্যা গুড় বার হয়্যা জামাইয়ের গাও মাক্যা গ্যাছে। তারপর ঘরের মধ্যে আচলো তুলার বস্তা তাত যায়্যা গাও মুছিচ্চে। আর গোটা গাওত তুলা ভর‍্যা ভেড়ার মতন হয়্যা গ্যাছে। তখন জামাই করছে কি শ্বশুড় বাড়ির ভেড়ার গলের মধ্যে ঢুকিচে। ঐ দিন আবার ৭ ঝোন চোর ভেড়া চুড়ি করবার আচ্চে ঐ বাড়িত। চোরের সরদার কয়্যা দিচে ম্যাড়া (পুরুষ ভেড়া) চুড়ি কর‍্যা আনবু। চোরেরা কচ্চে ম্যাড়া চিনমো কেনক্যারা। এখন চোরের সরদার কচ্চে যার হোল বড় সেডাই ম্যাড়া। তখন চোরেরা চুরি করবা আচ্চে। গলের (গোয়াল) মধ্যে ঢুকা দেকে ম্যাড়া একটা খুব বড়। তখন এক চোর তার হোল ধর‍্যা মারচে টান আর জামাই চিগরিতে চিগরিতে বাড়িত দৌড়।[৪]

কাহালুর লোককাহিনি

১৩-০১-১২ ইং তারিখে সিম্মির সাথে যোগাযোগ করে আবার ওদের বাড়ি গেলাম বিকেলবেলায়। পূর্বের পরিচয়ের সূত্র ধরে আজকে অনেকটা সহজেই বাড়ির লোকজনদের সাথে মিশেগেলাম। সন্ধ্যার পর ঘরের মধ্যে সিম্মিসহ ওর দাদি, মা, চাচি এবং ওদের বাড়ির এবং পাশের বাড়ির কয়েকজন ছোট ছেলে মেয়েসহ প্রায় ৮/১০ জন ঘরের মধ্যে বসলাম। তারপর রুবিয়া বেওয়া একে একে বন মানুষের গল্প, সুখুনি দুখুনীর গল্প, শিয়াল ও এক রাখালের গল্প বললেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। বন মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলার কথা শোনার সাথে সাথে অনেকেই খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠল এবং ওদেরকে তখন খুব খুশি দেখাচ্ছিল। বন মানুষের এমন পরিণতিতে ওরা খুব মজা পেল। 'ঠিক হচে শালাক। ঠিক হচে? বলে একটা গালিও দিল।

শিয়াল ও রাখালের গল্প শুনে তো মহাখুশি। লেজ কাটা শিয়ালগুলোর দৌড়ানো বালুতে বসা এবং খোঁচা খেয়ে হবার মায়ের কথা মনে হয়ে আবার দৌড়ানোর বিষয়টি শ্রোতাদের মধ্যে একটা মজার পরিবেশ তৈরি করল। একটা ছেলে তো লেজকাটা শিয়ালের মতো বসার ভঙ্গি করে 'ওরে শালা হবার মাও' বলে দৌড়ানোটা পর্যন্ত দেখিয়ে দিল।

আজকুমার বানর

এক দ্যাশোত আচিলো এক আজা। আজার আচিলো সাত আনি। ছয় আনিক বিয়া করার পরে ছোট আনিক বিয়া করে। ছোট আনি আচিলো খুব সোন্দরি। আজা তাই সব সময় ছোট আনির কাছোত থাকে। ছোট আনিক বেশি বেশি ভালোবাসে। এদিকে আগোর ছয় আনির কোন ছলপল হয় না আবার ছোট আনিরও কোন ছলপল হইচ্চে না। তাই সগ্‌লির মন খারাপ থাকে। এদিকে ছোট আনির দিকি আজার পেম বেশি হওয়ায় অন্য সগ্‌লি মানে অন্য ছয় আনি ছোট আনিক খুব হিংসে করে। তাক দেইকপ্যার পারে না। ছলপল হয় না আবার সতিনরাও দেকপ্যার পারে না তার জন্যি ছোট আনির মন সব সময় খারাপ থাকে। এই মন খারাপ থাকতি থাকতি একদিন এক দরবেশ বাবা আলো আজার বাড়ির দুয়ারে। দুয়ারে আসে দরবেশ বাবা হাক দিল- কেউ এটি আচেন গো আল্লার বান্দা আইচ্চে। কেউ এটি আচেন গো আনি মা সকল।

www.pathagar.com

দরবেশের ডাক শুনা আর সগ্‌লি আনিরা যে যেটি আচ্‌ল সেটিই বসা থাকলো। কেউ আগা আলো না। ছোট আনি ভালো করা মাতাত কাপড় দিয়া দরবেশের কাচে আলো আর কয়টা ট্যাক্যা কড়ি দরবেশেকে দিল। দরবেশ দোয়া কইরলো- তোর ছল এই দ্যাশোর আজা হবি। তকন আনি মার চোকের পানি পড়বা লাইগলো। দরবেশ বাবা সেডা দেকা কল, মা তুমি কান্দ ক্যা। আনিমা কলো হামার তো কুনু ছল পল হয় না বাবা। হামার কোন ছলই নাই সেটি আবার আজা হবি ক্যাঙ্কা করা। দরবেশ কল হামার কতা মিছ্যা হয় না।

এই কতা কয়া তার কান্দোত থাকা ঝোলা বার করা একখান সাদা ফুল বার করা দিল। আর কল এই ফুল লিয়া শিল পাটাত পিষা সাত সকালে ভেজা চুলে ভেজা কাপড়ে খাওয়া লাগবে।

এই ফুলের খবর ছোট আনির অন্য ছয় সতিনও টের পাচে। বড় আনি আসে চিলোর মতো ছোউ মারা ফুলটা লিয়া গেল। আর কল কাল সকালে ফুল পিষা লিয়া যাস। পরের দিন ব্যানা উটা ছয় আনি নদীর ঘাটত ডুব দিয়া ভেজাচুলে ভেজা কাপড়ে আগেই বাড়ি আস্যা ফুল পিষা ছয়জন ভাগ করা খালো। ছোট আনি ডুব দিয়া আসে বড় আনিক কলো বুজি, হামার ফুল পিষা কুটি। বড় আনি কলো হামাকেরই হয় না। তোর জন্যি শিল পাটা আচে সেটি ধূইয়া খা যায়া। ছোট আনি ভেজা চুলে ভেজা শাড়িতে আন্দোন ঘরোত গ্যালো। তার চোকত পানি পড়িচ্ছে। তার মনে খুউব দুক্‌কু। সতিনেরা তার জন্যি কিছুই থোয় নাই। বাধ্য হয়া ছোট আনি ফুল পিষা শিল পাটা মুচা মুচা চাট্যা চাট্যা খালো।

ইঙ্ক্যা করা দিন যায় মাস যায় যায় তিন মাস
আজার বাড়ির ঝাড়ের মোদে জালায় কুড়ল বাঁশ
মাসে মাসে ঝাড় বাড়ে বাড়ে আরো বাঁশ
এ্যাকে এ্যাকে চইল্যা গেলো আরো কটি মাস
মাসের শ্যাসে আজার মুকে ফুটলো খুশির হাসি।

সেই ফুল খায়্যা সকল আনির প্যাটোত ছল আলো। দশ মাসের ব্যালায় ছয় আনি ফুটফুটে ছয়টি আজকুমার জন্ম দিল। একেবারে দুধে আলতা অং ফুলের মতোন সোন্দর। আজাতো মহাখুশি। কিন্তুক ঐ যে ছোট আনি পাটা মুচা খাচিলো। তার জন্যি তার কোমা হলো একটা বানর। এইনা খবর পায়া আজা ছোট আনির উপুর খুউব আগ করলো। আর তাকে সোগ্‌লি মিল্যা নাক কান চুল কাটে মুকোত চুন কালি মাখা আজার বাড়ির বার করা দিল। থাকার জন্য পুরান একখান কুড়া ঘর দিলো। মনের দুককে চোকখের জলে আনি বানরকে বুকে লিয়া কুড়া ঘরোত যায়্যা বাস করতে লাগলো।

দিনে দিনে আর সকল আজকুমার বড় হতে লাগল। একদিন তারা বই খাতা হাতে লিয়া ইশকুলোতে যাওয়া আরাম্ব করলো। অন্য ভাইদের ইশকুলোতে যাওয়া দেকে বানর একদিন মায়ের কাচে বায়না ধরলো মা হামিও এ্যানা ইশকুলোত যামো। মা কলো তুইতো বানর তুই ইশকুলে যায়া কি করবু।

www.pathagar.com

বানর কলো না মা আর ভায়েরা পড়বার যায়, হামিও পড়বার যামো। তুমি হামাক বই খাতা আনে দাও। শ্যাষতক আনি বাধ্য হয়্যা ভয়ে ভয়ে আজাবাড়িতে গ্যালো আর আজাক যায়া কলো হামার বানর এ্যানা পড়বার যাবি। তাকো কয়টা বই দ্যান।

আজা হাসিচে আর কচে তোর পেটোত থেনে তো হচে একটা বানর। তোর বানরের আবার ইশকুলোত যাওয়ার সখ হলো। তুই যা হামাক আর জ্বলাস না।

এভাবে ছোট আনিক খুব অপমান করলো। তাও আনি আজার কাচে তার ছলের জন্যি বই চালো। শেষমেষ আজা আনিক পুরান কয়ডা বই লিবার কয়া আনিক বিদায় করা দিল।

আনি মনের দুককে চোকের জলে বুক ভাসা দিল। আনি ছেড়া কটা বই লিয়া আস্যা বানরোক দিল। বানর ঐ ছেড়া বইই খুশি মনোত লিয়া পরেরদিন ইশকুলোত গ্যালো।

এটি আবার অন্য আজকুমারেরা বানরোক বই লিয়া কেলাশোত আসা দেখা খুব হাসাহাসি করলো। মাস্টারোক যায়্যা কলো হামরা বানরোর সাতে পড়ব্যার পারমুনা। বানর কেলাশোত থাকলি হামরা থাকমু না। মাস্টার মস্ত এক ভ্যাজালে পড়া গেল। অনেক কতা কয়া বুজাসুজা আজকুমারগোরক আজি করালো। কয়্যাক দিনের মোদ্দে বানরোর ভালো পড়ার খরব সগ্‌লি জানতে পারিচে। আজকুমারেরা সবসমায় বানরোক জ্বলা খায়। কেলাশোর মদ্দে বই ফালা দ্যায়, লেকপ্যার দ্যায় না আরো অনেক কিচু। একদনি মাস্টার কেলাশোত আসে সগলিক পড়া ধরলো। কিন্তুক কুনু আজকুমার মাস্টারের পড়া কবার পারলো না। সবশ্যাষে মাস্টার বানরোক কলো বানর তুমি পড়া কও। বানর খুব সোন্দর করা পড়া কলো। মাস্টার পড়া না পাড়ার জন্য আজকুমারগোরক একখান শাস্তির কতা কল আর তাই হলো বানর যারা পড়া পারে নাই তাগোরোক সগ্‌লির কান মলা দিবি। আজকুমারেরা মাস্টারের উপর ক্ষেপ্যা গেল। আর বানরোক পারলি তো তকনই মারে। বানর ফ্যাসাদে পড়া গেল। কিন্তুক মাস্টারের কতা শুনতি হবে। তাই আজকুমার গোরক কানে হাত দিল তবে খুব আস্তে। যাতে তারা আগ না করে খুব আস্তে করা বানর তাগোরেক কান মলা দিল। আজকুমাররা তো আগকরে একেবারে আগুন হয়া গেল। ওরা সবাই বুদ্ধি করলো আজক্যা কেলাসোত থেনে বানর বার হলিই বানরোক ধরি সাটাবি (মারবি)।

যেমন কতা তেমনি কাজ। আজকুমারা বার হয়া ঘাঁটার মোদে বানরোক ধরা আচ্চামত মারলো। কেলাসোত মাস্টারোর কতাত কান মলার পতিশোদ লিয়া তারা খুশি মনে আজবাড়ি ফির‍্যা গ্যালো। এদিকে ভায়েকেরে হাতে মার খায়া বানর কানতে কানতে বাড়ি চলা গেল। বানরোর মাও ছোট আনি বানরোর এই অবস্তা দেকার পরে মনে খুব কষ্ট পালো। চোকের জলে বুক ভাসা ফেলল। বানরোক যত্ন আত্তি করা সুস্থ করা তুললো। তারপর কলো বাবা তোর ইশকুলোত যাওয়া লাগবি না। তুই দুকি মায়ের ছল তোর লেকা পড়ার দরকার নাই। বানর তবু কলো না হামি পড়া ছাড়িচ্চি না। হামি পড়মো অরকোরোক ছাড়্যা যামো। কিন্তুক আজার ছোলেরা বানরোর হাতোত

www.pathagar.com

কান মলা খায়া ঐ ইশকুলোতই যাবি না বলে ঠিক করলো। ওরা আজাক যায়া কলো হামরা আর পড়মো না। পড়াশোনা করা কুনু ট্যাকা হবি না। তাই হামরা সগ্‌লি বাণিজ্যেত যামো। তুমি হামাগোরক এ্যানা ময়ূরপঙ্খি নাও সাজা দ্যাও। আজা কুনু কতা না কয়া খুশি মনোত ছয় কুমারোর জন্যে ছয়টা সোন্দর ময়ূরপঙ্খি নাও বানা দিল। নাওত মনিমুকতা সোনারূপা ভরা দিল। নাওর তাকালিই চোক ঝলসা যায়। এত সোন্দর ময়ূরপঙ্খি নাও লিয়া ছয় আজকুমার বাণিজ্যেত যাবার জন্যে এডি হয়া গেল।

আজকুমাগোরের বাণিজ্যে যাবার কতা বানর শুনবা পালো। সেও তার দুকি মায়ের কাছে যায়া কলো মা ভায়েকেরে সাথে হামিও এ্যানা বাণিজ্যে যামো। তুমি এ্যানা আজাক কয়া হামার জন্যে একখান নায়ের ব্যবস্থা করা দ্যাও। মা কলো তুইতো বানর তুই আবার বাণিজ্য করবি কুনটি। তুই ঘরোত থাক বাবা। তোর বাণিজ্যত যায়া কাম নাই। বানর কিন্তুক নাছোড় বান্দা। সে মাওক আজার কাছে পাঠালো। ছোট আনি আজাক যায়া ভয়ে ভয়ে কলো হামার বানর এ্যানা বাণিজ্যত যাবার চাইচ্ছে। ওর জন্যি একখান নায়ের ব্যবস্থা কর‍্যা দ্যান। আজাতো আগে একেবারে ফায়ার হয়া গ্যালো। বানর যাবি বাণিজ্যত। আনিক আজপাসাদ থেনে বার করা দিবার কল। কিন্তু আনি বহু কাকুতি মিনতি করে চোকের জলে বুক ভাসা আজার কাছে একখান যে কোন ভাঙ্গাচোরা নাও চালো। আজা তখন কলো ঐ পুকুরের মোদে একটা নাও ডুবানো আচে ওটি তুল্যা তোর বানরোক বাণিজ্যে পাটা যায়া। আনি মনের দুঃকে পুকুরোর কাছে আসে বানরোক সাথে লিয়া বহুত কষ্টে পুকুর থিনি তকন একখান ভাঙ্গাচুর‍্যা নাও পালো। কোনমতে জোড়াতালি দিয়া নাও লিয়া নদীর ঘাটোত বাণিজ্য যাওয়ার জন্যি হাজির হল। দূরে শানবান্দা ঘাটে আজকুমারেরা ময়ূরপঙ্খি নাও সাজায়া বাণিজ্যে যাওয়ার জন্যি এডি হয়া গ্যাছে। এমন সমায় ঘাটোর এ্যানা দূরে বানরোর ভাঙ্গাচুর‍্যা নাও দেখা সগ্‌লি হাসির ফুয়ারা ছুটালো। অন্য আনিরা বানরোর নাওর কথা বলে ছোট আনি কত যে কটু কথা কল আর হাসাহাসি করলো তার শ্যাষ নাই। সব কথা সব দক্‌কু বুকেত চাপা দিয়া মুখ বুজা চুপ করা থাকল। গোপনে আনির চোখের জলে শাড়ির আঁচল ভিজা গেল। তবে নাওখান ভাঙ্গা হলে কি হবে, ওটি আছিল আজার দাদার আমলের নাও। ওটি আচিল আজার বংশের নাও। ঐ নাও দিয়াই আজকের আজাগিরি সূচনা হচিল একদিন। তাই যত পুরানই হোক বানোরোর নাওখান ছিল আজাবংশের নাও।

যাই হোক, পুরান মলিন নাওয়েই বানরোক ছোট আনি তুল্যা দিল। যাবার সময় আনি কল বাবা হামারতো ওরকেরে মতো ট্যাকা পসা কোনকিচুই নাই। হামি তোমার জন্যি আল্লার কাছে দোয়া করমো। তারপর মলিন ছেড়া আচলের গাটোত থেনে কয়াকটা কদরের বিচি বার করা বানরোর হাতত দিয়া কণ এই হামার বড় দোয়া। কুনু জাগাত যায়া এটি লাগায়া বাজারে বেচ্যা বাণিজ্য করো। বেচার সময় কয়ো- ইটি হামার জনম দুকি মায়ের দোয়ার কদর। বানর মাথা পাত্যা কদরের বিচিগুলান লিল। মায়ের পাওত হাত দিয়া সেলাম করলো আর হাতোত চুমা দিয়া বিসমিল্লা বলা পূর্ব পুরুষের ভাঙ্গা নৌকায় ওট্যাপল। আল্লার নাম লিয়া নাও খুটা খুলা দিল। অন্য দিকে আজকুমারেরা ময়ূরপঙ্খি নাও লিয়া আগেই চল্যা গ্যাচে। ঝকঝকা চকচকা ময়ূরপঙ্খির

www.pathagar.com

দিকে যেন তাকানো যায় না। চোক ঝলসা যায়। ছয় ভায়ের ছয় নৌকা পাল্লা দিয়ে মহা ধুমধামের সাথে আজ বাড়ি ঘাট ছাড়্যা গ্যালো। আনিরা খুশিতে ডগমগ করতে লাগল। একে অন্যের উপুর হাসতি হাসতি ঢলা পড়তে লাগলো। ছোট আনিক দেখ্যা দেখ্যা আরো বেশি করা হাসলো। বানরোর পুরাতন নাও ছেড়া পালে আস্তে আস্তে ঘাট ছাড়্যা চলাগ্যাল। জনম দুকিনি মাও চোকের জলে কইলজ্যার টুকরা বানরোক বিদায় জানালো।

বানর দুকি মায়ের দোয়া মাথাত লিয়া নদী বয়া পাল তোলা নৌকা লিয়া বহুদুরের দ্যাশোত চলাগ্যাল। সেটি যায়া একটা দ্বীপের মতো জাগা পালো। জাগা দেখ্যা বাননোর পছন্দ হলো। সেটি বানর নাওয়ের খুঁটি ফালালো। মাটিত নাম্যা বানর মায়ের কতা মতো মাটি খুড়া কদরের বিচিগুলান গাড়্যা দিল। দেকতি দেকতি কয়াক দিনের মোদে বিচি থাক্যা চারা হলো। বানর সোন্দর করা জ্যাংলা বানা দিল। জাংলা ভরা কদর ফুলে ফুলে ভরা গেল। এত কদর ধরলে য্যান কদরের ভারে জাংল ভাঙ্গ্যা পড়ে।

বানর গাছোত থেনে কদর পাড়্যা হাটোত লিয়া গেল। বানর মায়ের দোয়া করা কদরের দাম চালো কিন্তুক কেউ তার কদর কিনলো না। বানর মনে মনে চিন্তা করত লাগল মায়ের দোয়া কি তাহলে কাজ হবি না? হামার দুকি মায়ের দোয়া কি কবুল হবি না? বানরোর চোকে পানি আসে। কদরের ডালি লিয়া বানর মনের দুঃকে কানতে লাগলো।

এমন সময় এক জাল্যা বানরোর এই কান্দা দেকপার পালো। বানরোর কাছোত গ্যালো। বানরোর সকল কতা শুনবার পর জাল্যা কলো হামি তোমার সব কদর কিনিচ্চি। তুমি কাদো না। গরিব জাল্যা মাচ বেচা যত ট্যাকা পাচলো সব ট্যাকা দিয়া কদর কিনা লিয়া বাড়িত গ্যালো।

জালার ঘরোত চাল নাই তরি তরকারিও নাই। জালার বৌ বাজারোর ব্যাগ খুলা রাগে জ্বলা গেল। খালি কটা কদর দেখা জালাক ঝাটা লিয়া মারবা গেল। জাল্যা দৌড়া যায়া বারান্দাত চুপ কর্যা বসা থাকলো। এদিকে বৌ আগে গজ গজ কত্তে কত্তে দাও বটি লিয়া কদর কাটতে বসল। কদর বটিতে ঠাসি দেওয়ার সাথে সাথে খট করা এ্যানা আওয়াজ হল। এটি আবার ক্যাঙ্কা কতা খট করে। জাল্যার বৌ অবাক হয়া গেল। সে জাল্যাক ডাক দিল ওগো এটি দেকা যাও। কদর কোমা শক্ত বটিত কাটে না। জাল্যা ভয়ে ভয়ে কাছে আলো। তার বৌয়ের কাছে থেনি বটি আর কদর লিয়া নিজে একখান ফ্যাস দিল। তারপর কদরের উপর থেনে ছাল ওঠা গেল। সেটি দেকা গেল সোনার মত কি য্যান চকটক করিচ্চে। পুরা ছাল তোলার পর দেকা গেল সেটির মোদ্দে পুরা সোনা। জাল্যা আর জাল্যার বৌ বেজায় খুশি। ওদের সবগুলান কদরোর মোদ্দে খালি সোনা আর সোনা। পরে একথা জানা জানি হয়া গ্যাল। দ্যাশের লোকজন বেবাক ছুটা গেল বানরোর জাংলার কদর কিনতে। অল্প দিনের মোদ্দে কদর বেচা বানর বিরাট বড়লোক হয়া গ্যাল। ঐ দ্যাশের আজা বানরোক আজ বাড়িতে লিয়া আজা নিজে বানরোর সব কতা শুনল। মায়ের দোয়ার কদরের কতাও শুনল। বানর আর বানরোর মায়ের দুঃকের কতা শুনা আজা খুব কষ্ট পালো। পাশের ঘরোত বসা ছিল আজার একনা মিয়া। আজার মিয়া আজকুমারি ছিল খুব সোন্দর। আজকুমারি দেকতে এক্কেরে

www.pathagar.com

পরির লাকান আর গুণে য্যান সতী। স্যাও বানরোর দুঃকের কতা শুনা চোকের পানিতে বুক ভাসা দিল। আজা বানরোর কাছে আজকুমারির বিয়ার কতা কল। বানর আজি হল না। বানর হয়া সে মানুষোক বিয়া করবি কিসক। তাই বানর আজাক না করা দিল। কিন্তুক আজকুমারি নিজে আসে বানরোক কলো তাকে বিয়া করতে তার কোন আপত্তি নাই। তবুও বানর বিয়া করল না। বানর নিজের দ্যাশোত ফিরব্যার জন্য সবকিছু গোছগাছ কত্তে লাগল।

এদিকে বানরোর আর ছয় ভাই আজকুমারো আসার সমায় যা কিছু লিয়া আচ্চিল তার সব কিচু খোয়া ফালাছে। বাণিজ্য তো দূরের কতা মদ খায়া বেটি ছোলক লিয়া ফুর্ত্তি করা সব কিছু এক্কেরে শ্যাষ করা দিচে। ময়ূরপঙ্খি নাওয়ে যত হীরা-জহরত সোনা-দানা ছিল তার সব শ্যাষ করা শেষ পর্যন্ত নাওয়ের তক্তা পর্যন্ত বেচা খাইচে তারা। ভাঙ্গা গোলওই আর ভাঙ্গা নাওয়ে ঢুক ঢুক কত্তে কত্তে আজকুমারেরা দ্যাশের দিকে অওনা দিল।

বানর আজবাড়ি থেকে বিদায় লিয়া বাপ দাদার আমলের নাও ঠিকঠাক কত্তে লাগল। পুরান নাও এক্কেরে লুতনের লাকান ঝগঝগা করা ফালালো। হিরা, মনিমুক্তা জহরতে নাও সাজা একেবারে ময়ূরপঙ্খি নাও বানা ফালালো। নাও ভরা ধন রত্ন লিয়া আল্লার নামে অওনা হলো বাড়ির দিকে।

আজার বাড়ির শানবাদা ঘাটোত বসা ছয় আনি সাজাগুজা করা নিজোগারো মোদে গাল গপ্প করিচ্চে। ম্যালা দূরে নদীর মোদ্দে নৌকার সারি দেকা ছয় আনি মহাখুশি। তারকেরে আজকুমারা বাড়ি আসিচ্চে। আস্তে আস্তে নাওগুলান ঘাটের কাছে আসতে লাগলো। ভাঙ্গা চুরা নাও দেকা আনিকেরে মুখে হাসি কমতি থাকলো। আনিরা সগ্‌লি চিন্তাত পড়াগেল ছেড়া পাল ভাঙ্গা নাও তো একটা হবি। সেটি বানরের। তালি এতগুলান ক্যাঙ্কা কর্যা হল? এমন সমায় আরো দূরে একটা ঝগঝগা ময়ূরপঙ্খি নাও দেকা গ্যাল। আনিরা সব বলাবলি কত্তে লাগলো ওটি হামার ছলের নাও। আবার অন্য কেউ বলে না ওটি হামার ছলের নাও। এভাবে আনিরা নিজেকেরে মোদ্দে নিজের ছোলেক লিয়া আর ময়ূরপঙ্খি নাও লিয়া ঠেলাঠেলি শুরু কর্যা দিলো।

এদিকে বানরোর মাও ভাবে হামার ছলতো বানর সে কি আর ময়ূরপঙ্খি নাওয়ে আসপ্যার পারবি? ঐ ভাঙ্গাচোরা নাওই হামার ছলের হবি। বানরোর মাও চিন্তা করে আর আজবাড়ির ঘাটোত থেনে অনেক দূরে নদীর কুলোত পুরানা বটগাছের গোড়ায় বস্যা গাছোত হেলান দিয়া চোকের জলে বুক ভাস্যা দিল।

ঘাটের দিকে ময়ূরপঙ্খি নাও আসতে লাগলো। যে নাও বহু পাছে পড়া সেটি সব নাও ছাড়্যা আগে চল্যা আলো। ঘাটের যত কাছে আসে আনিরা তত খুশি হয়, আর হামার ছল, হামার ছল বল্যা ঠেলাঠিলি করে। নাও ঘাটের কাছে আসতে আসতে আজবাড়িরর শান বান্দা ঘাটের কাছে ভিড়লো নাও। আনিরা দেকলো নাওয়ের খুঁটার উপুর বানর বস্যা আচে। বানর নিজের মায়ের দিকে হাত নারিচ্চে আর হাসিচ্চে। আনিকেরে মুকচোখ শুক্যা গ্যাল। বানরের মাও খুশিতে চোক মুছতে লাগল। ময়ূরপঙ্খি নাও পুরানা বট গাছের কাছে যায়া দাঁড়ালো। আর আজার ঘাটোত আস্যা দাড়ালো

www.pathagar.com

ছয়খান ভাঙ্গাচুরা নাও। সে গুলান ভরা আচে নানান খোলা খাবড়া দিয়া। বানর সোনা দানাভরা হীরে-জহরত ভরা নাও থেনে নাম্যা এক দৌড়ে মায়ের কোলত ওঠ্যা পল। ছোট আনি খুশি হয়া বানরোক চুমা খাতে লাগলো।

আজা খবর পায়া ঘাটোত আস্যা দ্যাকে আজকুমারেরা সবকিছু ধ্বংস কর্যা খোলা খাবড়া লিয়া আচ্চে। আর বানর লিয়া আচ্চে সোনা দানা হীরা জহরত ভরা ময়ূরপঙ্খি নাও। আজা আজকুমারকেরে উপুর খুব ক্ষেপ্যাগ্যাল। সগ্‌লিক আর বাড়িত উটপ্যার দিল না। বাড়ি থেক্যা বার করা দিল। আজা ছুট্যা গেল বটগাছের কাচে যেটি বানর ময়ূরপঙ্খি নাও লিয়া আসিচে।

এমন সমায় ঝোলা কাঁধে সেই দরবেশ বাবা সেটি আস্যা হাজির হল। ছোট আনি দরবেশ বাবাকে চিনবার পালো। খুশিমনোত বাবাকে সালাম দিয়া বসবার কল। বাবা ছলের কতা যখন শুনবার চালো তখুন আনি চোকের পানি ফালা বানরোক দেখ্যা দিল। দরবেশ বাবা তখন তার পেটের ছল ক্যাঙ্কা কর্যা বানর হল জানতে চালো। তখন ছোট আনি সেই ফুল পিষা খাওয়ার সব কতা খুল্যা কল। আজাও সব কতা শুনবার পালো। আনিকেরে উপুর সে খুব ক্ষেপ্যা গ্যাল। দরবেশ বাবা তখন 'হক মওলা' কয়া তার ঝলার মোদ্দে থেনে একটা ফুল বার কর্যা আনির হাতে দিয়া কলো এটি তোমার বানরোক এখনি খাওয়া দ্যাও। দরবেশ বাবার কতামতো বানরোক ফুল খাওয়া দিল। এক পলকে বানর সুন্দর আজকুমার হয়া গেল। আজা খুশি হয়া আজকুমারোক বুকে জড়া ধরলো। আজকুমার আর ছোট আনিক আজবাড়িতে লিয়া গেল। দরবেশ বাবা চলা গ্যাল। আজামশাই বাকি ছয় আনির নাক আর চুল কাট্যা দিল, মুখে চুনকালি মাখ্যা আজবাড়ি থেনে বার কর্যা দিল।

তারপর বানরের মুখে সবকতা শুন্যা বাণিজ্যের দ্যাশোত আজা ঘটক পাঠ্যা দিল। ঐ দ্যাশোর আজকুমারির সাথে আজকুমার বানরোর বিয়া হল। আজা নিজের সিঙ্গাসন ছাড়্যা দিল। বানরকুমার আর আজকুমারিকে দ্যাশের আজা ঘোষণা দিল। আজা আনি বানর কুমার আর আজকুমারি মহাসুখে দিন কাটাতে লাগল।

সারসংক্ষেপ : একদেশে ছিল এক রাজা। রাজার ছিল সাত রানি। কিন্তু কোন রানিরই সন্তান হয় না। এ জন্য রানিদের সবসময় মন খারাপ থাকে। ছোট রানি বেশি সুন্দরী হওয়ায় রাজা ছোট রানিকে একটু বেশি ভালোবাসে। এজন্য অন্য রানিরা ছোট রানিকে হিংসা করে। সন্তান না হওয়ার জন্য ছোট রানিরও মন খারাপ থাকে। এমন সময় একদিন এক দরবেশ রাজ প্রাসাদে এসে ছোট রানির মন খারাপ দেখে তার সব কথা শুনে ঝোলার ভিতর থেকে একটা ফুল বের করে দিয়ে ভেজা চুলে ভেজা কাপড়ে সকাল বেলা শিল পাটায় বেটে খাওয়ার কথা বলে চলে গেল।

এই ফুলের কথা রানির অন্য সতীনরা জানতে পেরে ছোট রানির কাছ থেকে ফুলটি কেড়ে নিল এবং পরের দিন সকাল বেলা ছয় রানি ভাগ বাটোয়ারা করে ফুল বাটা খেয়ে ফেলল। ছোট রানি বাধ্য হয়ে শিলপাটা ধুয়ে সেই ফুলবাটা জল খেয়ে নিল। যথাসময়ে ছয় রানির একটি করে সুন্দর পুত্র সন্তান জন্ম নিল। কিন্তু ছোট রানির পেট থেকে হল

www.pathagar.com

একটা বানর। রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে বানরসহ ছোট রানিকে রাজ প্রাসাদ থেকে বের করে দিল।

বানর পড়াশোনা, বুদ্ধিমত্তা, আদব-কায়দায় তার রাজকুমার ভাইদের চেয়ে বেশি ভালো হয়ে গড়ে উঠতে লাগল।

রাজা একদিন ছয় রাজকুমারকে ময়ূরপঙ্খি নৌকা সাজিয়ে বাণিজ্য করার জন্য পাঠিয়ে দিল। বানরের পীড়াপীড়িতে রাজা তাদের ঘাটে ডুবানো একটি ভাঙ্গা নৌকা দিল বানরকে। বানর সেই ভাঙ্গা নৌকা নিয়ে বাণিজ্যে গিয়ে বাণিজ্য করে সুন্দর ময়ূরপঙ্খি নৌকা সাজিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু অন্য রাজকুমারেরা তাদের সাথে দেওয়া ময়ূরপঙ্খি নষ্ট করে ভাঙ্গাচোরা নৌকায় খোলা খাবড়া ভরে বাড়ি ফিরে এলো। এতে রাজা তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলো এবং বানরের উপর খুশি হল। ছোট রানির কাছে সবকিছু জানতে পেরে ছয় রানি এবং রাজকুমাদের রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিল। এমন সময় দরবেশ এসে ছোট রানির সন্তানকে বানর দেখে খুব মন খারাপ হলো। সবকিছু শুনে ঝোলা থেকে আরেকটি ফুল বের করে বানরকে খাওয়ানোর সাথে সাথে বানর এক সুন্দর রাজকুমারে পরিণত হয়ে গেল। রাজা রাজকুমার বানরকে বিয়ে দিয়ে তার হাতে রাজ্য সমর্পণ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।[৫]

বন মানুষের গল্প

এক ভাই এক বোন : ছোট কালে মা-বাপ মরা গেছে। ভাই বড় আর বোন ছোট। ভাই বোনক পালাপুষা বড় করছে। ভাইও বিয়া করছে। বোনকও বিয়া দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করিচ্ছে। এমন সময় একটা বন মানুষ আস্যা বিয়ার প্রস্তাব দিলো। কলো যে তোমার বোনক হামি বিয়া করমু। হামার একনা বেটা ছল আছে আর বিয়ার বউ মরা গেছে। ভাই গরিব মানুষ তো তাই বাড়ি ঘরের ঠিকানা না লিয়াই বন মানুষের সাথে বোনক বিয়া দিছে। বন মানুষ বোনক বিয়া কর‍্যা নদীর ঘাত লিয়া যায়া নৌকাত তুলিছে। নদীর মদ্দে দিয়া আন্ধার রাতে যাতে যাতে যাতে অনেক দূর লিয়া গেছে। বৌ তখন কচ্ছে আরো কতদূর। এতখনো যে হামাকেরে বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বন মানুষ কেলো- ঐ যে বনের অন্ধকারের মধ্যে ছোট বাতি টিম টিম করা জলিচ্ছে ঐটাই হামার বাড়ি। তার পরে যায়া দেকে একটা ব্যাটা ছল কুড়াঘরের মদ্দে বাতির পাশে বসা আছে। তখন ছলে কচ্ছে- উডা কে আব্বা? তখন বন মানুষ কচ্ছে- ওডা তোমার নতুন মাও। বিয়া করা লিয়া আচ্ছি। খাওয়া দাওয়ার পরে দুই মানুষ এক বিছানাত শোবার গেছে। তখন কাপড় খুলা বউ দেখে গায়ে কাটা আর লেজ আছে। বউটা ভয়ে ভয়ে বন মানুষের সাথে রাত কাটালো। তখন বন মানুষ সকালে উটে ছলক কলো বাবা তোর ছোট মাকে দেখিস হামি বনের মদ্দে শিকার করা দুই একটা পশু-পাখি ধরা আনি। সেই কথা কয়া বন মানুষ দিনের মনে শিকারে চলা গেছে। রাত পোহালে বৌয়ের ভাসতে (ভাইয়ের ছেলে) ফুফুমাকে দেখবার আসছে। তখন ফুফু কলো বাবা তোমার আব্বা হামাক বন মানুষের সাথে বিয়া দিছে। পশুপাখি শিকার করা আনলে সেগুলো ঝলসা খাওয়া হবি। তুকি দেখা পেলে তোক খায়ে ফেলবি। তুকি হামি ঘরের পাছে মাটির গত্তে লুকা থুই। কাল সকালে বন মানুষ শিকারে গেলে হামরা চলা যামু। এই কয়া বৌ

www.pathagar.com

ওর ভাসতাকে ঘরের পাছে মাটির গত্তে লুকা থুলো। তারপর যখন রাতে বন মানুষ আসলো তখন ঐ ছলকনা কয়-

বাপোরো বাপো ঘরের পাছে মাটির তলে
আমচুনা চুন তোলতো বাপো খাই।

তখন বন মানুষ বৌকে কচ্ছে এই মাগি, ছল ওলা কি কয়? তখন বৌ স্বামীক কলো ওলা ছলের বুলি ছল কচ্চে। তুমি হাত মুখ ধুয়া খাও। ওর ওলা কথা শুনো না। এইভাবে কোন রকমে আর এক রাত কাটায়। এভাবে সকাল হলে বন মানুষ শিকারে গেলে বৌ বন মানুষের ছলক বটি দিয়া জবাই করা একটা বস্তায় তুল্যা চাঙ্গের উপর থুয়া একটা কলা গাছ কাটা ঘরের মাঝাতে লেপ দিয়া ঢাকা থুয়া ভাসতাকে লিয়া পিরান বাঁচানের জন্য নদীর কূল দিয়া বাপের বাড়ি চলা যায়। এরিমধ্যে বন মানুষ আস্যা দেখে ঘরের দুয়ার বন্দ। বন মানুষ তখন ডাকা ডাকি শুরু করলো। এই দুয়োর খোল আজগা.ভালো শিকার পাছি। ডাকাডাকির পরে যখন দুয়ার খুলল না তকন বন মানুষ দুয়োর ভাঙ্গা ঘরে ঢুকা দেকে ওর বৌ লেপ মুড়া শুয়া আছে। তখন বন মানুষ রেগে গিয়ে বলল- মাগি কেংকা নিন পাড়িস এত ডাক শুনা পাসনা। তখন বন মানুষ লাটি দিয়া লেপের উপর পিটন শুরু করলো। কলার গাছ থিতলা হয়া রস বার হয়া লেপ মাখা গেছে। বন মানুষ কলো- তোর গায়ের রক্ত বের করছি ত এই বলা যেই লেপ তুলছে আর দেখে কলার গাছ। তখন বন মানুষ হতাশ হয়া ছলের খোঁজ করে। দেখে চাঙ্গের তলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িছে। রক্তের গন্ধ দেখে বন মানুষ খুব কষ্ট পেলো। আর ছলের এরকম মৃত্যুতে সে বললো- যে ভাবেই হোক বৌকে লিয়া আসা উচিৎ সাজা দিমু। তখন বন মানুষ ভদ্র পোশাক পড়া ছাতা লিয়া শুশুর বাড়ি গিয়ে ঝোপের মধ্যে বসা আছে। বৌ বার হলেই ধরা লিয়া যাওয়ার জন্যি। বৌ এদিকে ভাইকে সব কথা কছে। তখন ভাই বাহিরে আসা দেখে বন মানুষ ঝোপের মধ্যে। তখন ভাই কলো- ভাই সাহেব তুমি ওদিকে কেন? বাড়িতে আসো। তুমি জামাই মানুষ। সম্মানের সাথে খাওয়ানোর পরে বাঁশের একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলো। যখন রাত গভীর হলো তখন বউ বের হয়ে ঘরে শিকল দিলো। তারপর ঘরে আগুন দিয়ে সবাই মিলে বন মানুষকে পুড়ে ফেলল।

সারসংক্ষেপ

বাপ-মা মরা দুই ভাই বোন। ছোট বেলা থেকে তারা একসাথে বেড়ে উঠেছে। ভাই বড়। সে বিয়ে করে সংসার শুরু করেছে। ছোট বোন বড় হয়ে উঠলে তাকে বিয়ে দেয় এক বনমানুষের সাথে। ভাই গরিব তাই কোন খোঁজ খবর নেয় নি। বোন তার স্বামীর সাথে বহু দূরের জঙ্গলে গিয়ে স্বামীর বাড়ি উঠল। রাতে স্বামী খালি গা হলে বনমানুষকে দেখে বোন খুব ভয় পেল। কোন রকমে রাতটা কাটালো। পরের দিন বনমানুষ তার মা মরা ছেলের উপর সৎমায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গভীর জঙ্গলে শিকার করতে গেল। ভাইয়ের ছেলে ফুপুকে দেখতে আসে। ভাইপোকে নিয়ে আর এক নতুন বিপদে পড়ল। বনমানুষ যদি টের পায় তাহলে ছেলেটিকে মেরে ফেলবে। তাই ভাইপোকে একটা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। অনেক ভয়ে ভয়ে সেদিনের রাতটিও কাটিয়ে দিল।

www.pathagar.com

পরের দিন সকাল বেলা বনমানুষ শিকারে গেলে বোন আর ভাইপো মিলে বনমানুষের ছেলেকে মেরে অন্য ঘরে ফেলে রাখে এবং বিছানার উপর কলা গাছ কাঁথা দিয়ে ঢেকে তারা দুজন বাড়ি ফিরে এলো। বনমানুষ বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় বউকে ঘুমোতে দেখে তাকে আচ্ছামত লাঠি পেটা করলো। তারপর দেখতে পেল ঘরে বউ নেই। এতক্ষণ সে কলা গাছকে পিটিয়েছে। পাশের ঘরে ছেলের রক্তাক্ত লাশ দেখে খুব কষ্ট পেল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বনমানুষ তার শ্বশুর বাড়ি গেল। বোনের কাছ থেকে ভাই আগেই সব কিছু শুনেছিল। তাই বনমানুষকে খুব আদর যত্ন করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। খুব ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করিয়ে রাতে একটি বাঁশের ঘরে শুতে দিল। তারপর বনমানুষ ঘুমিয়ে পড়লে সবাই মিলে বাঁশের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। বনমানুষ পুড়ে ছাঁই হয়ে গেল। এভাবেই ভয়ঙ্কর বনমানুষের হাত থেকে দুই ভাই-বোন রক্ষা পেল।

দুখুনী-সুখুনীর গল্প

এক গ্রামে বাস করতিছিলো এক কৃষাণ। তার আছিলো দুই বেটি। দুখুনী আর সুখুনী। দুই বোনের মাও ছোট কালে মরা গেছিলো। সেই কৃষাণ আবার একটা বিয়া করা আনলো। সৎমা দুই চোখে দেকপার পারে না। সারাদিন গোরুর পেছনে ঘুরা ঘুরা গোবর কুড়া আনলে রাত্রে একটু ভাত দেয়। এই ভাবে চলতে চলতে একদিন কৃষাণ মানুষের বাড়ি কামলা দিয়া আসার পরে সৎমা কলো- শোনো তোমার দুই বেটি সারাদিন কাজ করে না কাম করে না খালি বসা বসা খায়। তোমার এই ছোট ব্যাটাকে দেকপ্যার পারে না। ওদেরকে বনোবাসে দাও আর তা না হলে হামি তোমার সংসারে থাকমুনা। হামার ব্যাটাক লিয়া বাপের বাড়ি চল্যা যামু। এই কথা শোনার পরে কৃষাণ তার দুই বেটিক বনোবাসে দেওয়ার কতা ভাবল। সে দুখুনী আর সুখুনীকে ডাকা কলো- তোরা আগামীকাল কাপড় চোপর লিয়া ঠিক হয়া থাকিস। হামি তোদের অনেক দূরের গাঁয়ে মেলা দেখবার লিয়া যামু।

এ কতা শুনে দুখুনী আর সুখুনী খুব খুশি হলো। পরেদিন সকালে কৃষাণ দুই বেটিক লিয়া বনোবাস দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছাড়া চলা গেলো। যাতে যাতে যাতে অনেক দূর যাওয়ার পরে দুখুনী কইলো- বাবা মেলা আরো কতদুর? কৃষাণ কলো- আরো কিছু দূর। সুখুনী কলো- বাবা আর যে হাটতে পারিনা আমার খুব পানির তেয়াস লাগছে। একটু পানি দাও। তখন কৃষাণ পাশের গ্রামের এক বড় বাড়ি দেখা দিয়া কলো- ঐডা তোর নানীর বাড়ি। ঐখানে তোরা যায়া নানী বা মামীর মতো কাকো দেখলে পানি চাস। এই বলে কৃষাণ দুই বোনকে মান্ষের বাড়ির দিয়া পাঠা বাড়িত আসলো।

এদিকে দুখুনী আর সুখুনী ঐ বাড়িত যায়া এক বুড়ি মানুষকে দেকা কলো- ও নানী একটু পানি দাওনা। তখন বুড়ি কলো- তোরা কে তোদের ত চিনিনা। বাড়ি থেকে বার হয়া যা। তারপর তারা মামির মত এক মহিলাক দেখা কলো- ও মামি একটু পানি দাও গো বড় তেয়াস লাগছে। ঐ মহিলা কলো- কে তোর মামি? এই বলে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বার করা দিলো। এবার দুই বোন বাহিরে আসা দেখে তাদের বাবা নাই।

www.pathagar.com

তখন তারা কাঁনতে কাঁনতে এক রাস্তা দিয়া যাচ্চিলো। কিছু দূরে একটা পুকুর দেক্যা সুখুনী বড় বোনকে কলো- বুবু তুমি হামাক পানি দাও। তখন দুখুনী পুকুরের কাছে বোনকে লিয়া যায়া দেকলো রাজার বিশাল পুকরে কোন পানি নাই। পুকুরের তলা ফেটে চৌচির। তখন সুখুনীর কান্না দেক্যা দুখুনীর মায়ের দেয়া একটা যে কাকন ছিল তা পুকুরে নামা তলায় ফেলা পানি চালো। তখন পুকুরের তলা হতে পানি উঠে পুকুর ভরে গেলো আর দুখুনী জলকণ্যা হয়ে পুকুরে পাতাল পুরীতে গেলো।

সুখুনী ঘাটে বসা পানি পান করা দুঃখে কান্না করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা লাগলো। বনের বাঘ ভালুকের ভয়ে সে পুকুরের পাশে একটা গাছের ডালে বসে থাকলো। পরের দিন সকালে এক রাজপুত্র শিকার করার জন্য বনে আসলো। তারপর পানির তেয়াস পায়া পানি পান করার জন্য এই পুকুরের পাশে এসে পানি পান করলো। পানি পান করা বিশ্রাম নেয়ার জন্য গাছের নিচে শুয্যা পড়লো। এমন সময় সুখুনীর চোখের জল রাজকুমারের মুখের উপর পড়ল। তারপর জলের নোনা স্বাদে সে বুঝতে পারলো গাছের উপরে কোন মানুষ আছে। তারপর রাজপুত্রের পেয়াদা সুখুনীকে নামা নিয়া আসলো। রাজপুত্র সুখুনীর রূপ দেখে সুখুনীর সকল দুঃকের কাহিনি শোনার পর রাজপুরিতে নিয়ে মহাধুমধামে সুখুনীকে বিয়ে করলো।

সারসংক্ষেপ

একছিল কৃষক। তার ছিল দুটি মেয়ে দুখুনী আর সুখুনী। দুখুনী সুখুনীর মা ছিল না। সৎমায়ের অত্যাচার আর ষড়যন্ত্রে জীবন অতিষ্ঠ। কৃষক তার স্ত্রীর কুপরামর্শে মেলা দেখানোর নাম করে দুখুনী সুখুনীকে বহু দূরের গাঁয়ে বনবাস দিয়ে আসে। নানি মামির কথা বলে যে বাড়িতে গিয়েছিল সে বাড়ির লোকজন দুখুনী সুখুনীকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। সুখুনী পানি পিপাসায় অস্থির হয়ে বড় বোন দুখুনীর কাছে পানি চায়। দুখুনী একটি পুকুরের পারে গিয়ে দেখে পুকুরে একফোঁটা পানি নাই। তখন মায়ের দেয়া একটা কাকন পুকুরের তলায় ফেলে দিয়ে পানি চাওয়ার সাথে সাথে পুকুর ভরে গেল। আর দুখুনী জলকন্যা হয়ে পাতাল পুরীতে চলে গেল। সুখুনী পানি পান করে পুকুর পাড়ে বসে বোনের জন্য কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে এলে বাঘ, ভাল্লুকের ভয়ে পুকুরের পাশে একটা গাছের ডালে বসে থাকলো। পরের দিন এক রাজকুমার শিকার করতে বেরিয়ে জল তেষ্টায় এই পুকুর পাড়ে এসে জল পান করে এবং বিশ্রাম নেয়ার জন্য গাছের তলে গিয়ে শুয়ে পড়ে। গাছের উপর থেকে সুখুনীর চোখের জল রাজকুমারের মুখের উপর পড়ে। রাজকুমার টেরপেয়ে সুখুনীকে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। সুখুনীর সব দুঃখের কথা শুনে রাজকুমার তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। সুখুনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমার তাকে বিয়ে করল এবং সুখে সংসার করে খেতে লাগল।

শিয়াল ও এক রাখাল

এক গাঁয়ে আছলো এক আখাল (রাখাল)। তার নাম আছলো হবা। হবার বাপ নাই। মা আর ব্যাটা মিলে দুই জনের সংসার। প্রতিদিন সকালে হবা ঘুম থাকা উঠা এক জোড়া বলদ লিয়া পাতারত (জমিতে) হাল ববার জন্য যায়। আর হবার মাও সকালে খাওয়ার সময় হলে পানতা সাজা লিয়া হবার কাছে যায়। এভাবে হবা আর হবার

www.pathagar.com

মায়ের দিন কাটে। একদিন হবা খুব সকালে ঘুম থাকা উঠা কিছু মুখে না দিয়াই বলদ জোড়া লিয়া পাতারত গেছে। হবার মাও খাওয়ার সময় হলে পানতা সাজা লিয়া যাচ্ছে। যাতে যাতে এক সাঁকোর উপর যখন গেল তখন সাঁকোর নিচে থেকে পাঁচটা শ্যাল (শিয়াল) বার হয়া হবার মায়ের মুখের আগে যায়া খাড়া হল (দাঁড়াল)। শ্যালেরা কলো হবার মাও তুমি পানতা সাজা লিয়া কুটি যাচ্চিন, তোমার হবা ব্যাটা মরিচে। পানতা হামাকরক দেও। তখন হবার মাও শ্যালেকেরে অত্যাচার না সবার পারা পানতা শ্যালেকেরক খাওয়ালো। এদিকে পানতার বেল পার হয়া যায় তাও হবার মাও পানতা লিয়া আসে না। হবা দেকতে দেকতে অনেক্ষণ পরেও যকন দেকল ওর মা পানতা আনলো না তখন হবা গরু লিয়া বাড়িতে আসলো। বাড়িত আসা হবা ওর মাওক কলো- মা তুই আজগা পানতা লিয়া যাসনি কি জন্যি। তখন হবার মাও শ্যালেকেরে অত্যাচারের কথা হবাক কলো। হবা তখন ভাবল শ্যালেকেরক একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। তখন হবা আর হবার মাও শ্যালেকেরেক শিক্ষা দেওয়ার এক ফন্দি আটলো। পরের দিন হবার মাও আবার পানতা সাজা লিয়া যাওয়ার সময় সাঁকোর উপর যায়া থামলো। তখন শ্যালেরা বার হলো হবার মায়ের কাছে আসলে হবার মাও কলো- হামার হবা ব্যাটা যে মরো গেছে হামি মজলিস করমু। তোদের সবার দাওয়াত থাকলো। যে দিন দেখবি হামার বাড়ির উপর দিয়া ধুমা বার হচ্চে। সেদিন তোরা সবগুলোই যাবি।

শ্যায়ালেরা দাওয়াত পায়া ত মহাখুশি। এর কয়েক দিন পরে হবার মাও চুলার ভেতর ভেজা খড়ি দিয়া তাতে আগুন দিয়া পাখার বাতাস করতে লাগল। তখন বাড়ির উপর দিয়া ধুমা উঠল। শ্যালেরা ধুমা দেকা তাড়াতাড়ি হবার মায়ের বাড়িতে গেল। হবার মাও তখন তাদেরকে এক ঘরের মধ্যে বসবার দিয়া ঘরে শিকল দিলো। তখন শ্যালেরা কলো- হবার মাও তুমি দুয়ার লাগা দিলিন কি জন্য? তখন হবার মাও কলো- তোরা খাবার বসা মারামারি করবু তো তাই।

এদিকে যায়া মা ছলেক ডাক দিল- হবারে পুত/লাঠি লিয়া উঠ। হবা তখন একটা দাও আর একটা খাটা লিয়া আসা ঘরের দুয়ারের কাছে বসলো। তারপর একে একে শ্যায়ালদের বের করা লেজ কাটা দিল। তখন শ্যায়ালেরা দৌড়াতে দৌড়াতে বালুর মদ্দে যখন বসে তখন বালু ফোটে লেজে। শ্যায়ালেরা তখন কয়- শালা হবার মাও এটিও আছে। এভাবে শিয়ালেরা দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো।

সারসংক্ষেপ

এক গাঁয়ে এক রাখাল। নাম তার হবা। সে প্রতিদিন গোরু নিয়ে মাঠে যায় হালা বাওয়ার জন্য। খাওয়ার সময় হলে হবার মা ছেলের জন্য বাড়ি থেকে খাবার সাজিয়ে মাঠে নিয়ে যায়। একদিন খালের পাড়ে পাঁচটা শিয়াল হবার মায়ের কাছে এসে হবার মৃত্যু সংবাদ দিল এবং তার কাছে থাকে খাবারগুলো তারা নিয়ে খেয়ে ফেলল। এদিকে হবা না খেয়ে ক্ষুধায় কষ্ট পেয়ে বাড়ি ফিরে এলো। হবার মা ছেলের মৃত্যু সংবাদে মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এলো। বাড়িতে হবাক দেখে শিয়ালগুলোর প্রতারণার বিষয়টি তারা বুঝতে পারে। মায়ে ছেলে মিলে ফন্দি আটে শিয়ালগুলোকে কীভাবে শায়েস্তা করা

www.pathagar.com

যায়। ফন্দি মোতাবেক হবার মা হবার মৃত্যুর পরবর্তী মজলিশ খাওয়ানোর জন্য শিয়ালগুলোকে দাওয়াত করে আসে। শিয়ালেরা খুশি হয়ে হবার মায়ের বাড়ি দাওয়াত খেতে আসে। কৌশলে শিয়ালগুলোকে একটি ঘরের মধ্যে বন্দি করে সবগুলোর লেজ কেটে দেয় হবা আর তার মা। লেজকাটার পর শিয়ালগুলো দৌড়ে পালাতে থাকে এবং যেখানে গিয়ে বসে সেখানেই কাটা লেজে বালু ফোঁটায় কষ্ট পেয়ে মনে করে এখানোও হবার মা। এভাবেই হবার মায়ের ভয়ে শিয়ালেরা গ্রাম ছেড়ে বহুদূরে পালিয়ে গেল।[৬]

নারুয়ামালা হাট সংলগ্ন স্লুইসগেট সংক্রান্ত কিস্‌সা

এই স্লুইসগেট এলাকায় ইছুব পাগলা নামে এক পাগল থাকত। এই পাগল মানুষের ভালো-মন্দ ভূত-ভবিষ্যত অনেক কিছু বলতে পারত। সে কারো কাছ থেকে হাত পেতে কোন দান বা ভিক্ষা গ্রহণ করত না। এই স্লুইসগেটের কাছ দিয়ে কোন গাড়ি চলাচল করতে গেলে মাঝে মধ্যে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যেত। কোন মেকানিক গিয়ে গাড়ির কোন ত্রুটি ধরতে পারত না। গাড়ির সব পার্টসপাতি ভালোই থাকত। তারপরেও গাড়ি থেমে যেত। আবার হঠাৎ করেই গাড়ি চলতে আরম্ভ করত বিনা স্টার্টেই। লোকজন মনে করত এগুলো সব এই স্লুইসগেটে লুকিয়ে থাকা পান্যাদেওয়ের কাণ্ড। দূর থেকে ইছুব পাগল সবার অজান্তে ধমক দিয়ে এদের তাড়িয়ে দিত। আর তখনই গাড়ি চলতে শুরু করত। পান্যাদেওদের উৎপাত দিনকে দিন বাড়তে থাকায় স্থানীয় লোকজন সবাই মিলে ইছুব পাগলার কাছে গেল এবং এর একটা বিহিত করতে বলল। এর কয়েক দিন পরে একদিন রাতের বেলা ইছুব পাগলা স্লুইসগেটের নিচের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পান্যাদেওদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ইছুব পাগলা আর ফিরে আসেনি। লোকজন মনে করে সে এক ডুবে দেওকে তাড়িয়ে ভারতের দিকে চলে গেছে। এরপর থেকে ঐ এলাকায় দেওয়ের উৎপাত বন্ধ হয়ে যায়।

মানুষের গন্ধ

এক দ্যাশোতে আচিল এক হাল্যা। হাল্যার একনা বৌ আর দুকনা ছ'ল। ভালোই সুখোত ঘর করিচ্চিল। একদিন হাল্যার বৌ পানি আনবার জন্যি পুকরত গেল। পুকুরত যায়্যা যকুনি ঠিল্যা ডুবাচে তকুনি এক দ্যাও আস্যা হাল্যার বৌওক পানিতে লিয়া গেল। ছ'ল দুকনা লিয়া হাল্যা বড় বিপদে পড়ল। দিন কতক পরে হাল্যা আর একখান বিয়া করলো। সগলি ক'লো মাও মরলি বাপ হয় তাউই। সেটিই হলো। নতুন বৌওক লিয়া বাপ ছ'লেগোরক ভুল্যা গেল। এদিকে নতুন মাও ছ'লেগোরক ভাত দ্যায় না। খালি ধর্যা ধর্যা মারে। নতুন মাওয়ের মার সবার না পার্যা দুই ভাই বুদ্দি কর্যা বাড়ি ছাড়্যা চল্যা গেল। ছ'ল দুকনা খুব ভালো ছিল। রাস্তা দিয়া যাতে যাতে বহুদূর যায়্যা এক মাঠের মদ্দে দেকলো একজন বুড়া মানুষ নাঙ্গল জুয়াল আর নাংল্যা লিয়া ঘাটার মোদ্দে বস্যা আচে। বুড়ার চোকত পানি আর বুকের মোদ্দে দপদপাচে। ছ'লে গোরক দেক্যা বুড়্যা কলো- বাবা হামি এগল্যা টানতে পারিচ্চি না। তোমরা এ্যানা হামাক এগল্যা লিয়া বাড়িত দিয়া আসো। বুড়াক দেক্যা ছ'লেকেরে খুব মায়া হল। তারা দুনো ভাই নাঙ্গল জুয়াল আর নাংল্যা ভাগ কর্যা কাদে কর্যা লিয়া বুড়াকে বাড়িত দিয়া আলো। আসার সমায় বুড়া নাংল্যার একনা খিল খুল্যা বড় ছ'লের হাতোত দিয়া কলো- হামার

www.pathagar.com

আর কিছুই নাই। এটি লিয়া যাও। তোমাগোরক কোন কাজে লাগবি। বড় ছ'লের একটু মন খারাপ হল। প্যাটোত খিদ্যা। ভাত তরকারি না দিয়া দিলো কিনা একনা নাংল্যার খিল? ছোট ছ'ল ক'লো লে বাই বুড়া মানুষ দিচে। লিচ্চয় কোন কাজে লাগবি।

তারপর যাতে যাতে বহুদূর চল্যা গেল। খিদ্যা আর পানির ঠিস্যায় বুকোর ছাতি ফাট্যা যাচ্চে। ছ'ল দুকনা চোকত আন্দার দেকিচ্চে। এমন সময় একজন লোক দেকলো। পতের মদ্দে দড়ির বস্তা লিয়া হাঁপাচ্চে। সে আর বস্তা লিয়া যাতে পারিচ্চে না। লোকটি ছ'লগোরক ক'ল- বাবা তোমরা হামার বস্তা খান এ্যানা বয়্যা দ্যাও। হামি আর ববার পারিচ্চি না। বড় ছ'ল খুব খেপ্যা গেল। খিদ্যায় জান যায় আর ওনাক বস্তা টান্যা দ্যাও? হামরা পারমো না? অন্য লোকক দিয়া তোমার বস্তা টানাও। তকুন ছোট ছ'ল বড় ভায়ের হাত চাপ্যা ধরলো। ভায়েক রাগ করব্যার না করলো। তারপর ছোট ভাই বড় ভায়েক ক'ল- লে বাই, বস্তা খান দিয়া আসি। এরপর দুনোভাই মিল্যা ওই লোকের দড়ির বস্তা বহুত কষ্ট কর্যা তাঁর বাড়িত পৌছা দিল। বস্তা দেয়ার পর বাড়ি থেনে ফেরার সময় লোকটা ছ'ল গোরক একগাছা দড়ি দিয়া ক'ল- এগল্যা লিয়া যাও। তোমাগোরে কামে লাগবি। বড় ভায়ের রাগ হল। দড়ি আর কী কামে লাগবি? ছোট ভাই ক'ল- লিয়া লে বাই কামে লাগবি। এরপর দুইভাই খুব দুর্বল হয়্যা গেল। কোন মতে টলতি টলতি এক মাঠের মদ্দেদিয়া যাবার শুরু করলো। হঠাৎ একনা খুটির সাথোত গুতা খায়্যা বড় ভাই মাটিত পড়্যা গেল। বড় ভাই লাত্তি মার্যা খুটিটাক ফাল্যা দিল। তকুন ছোটভাই ক'ল- ফালাস না বাই খুটি খান লিয়া লে। কামে লাগবি। দেকপ্যার পালো ওটি চুনের খুটি। দুনো ভাই নাংল্যার খিল, দড়ি আর চুনের খুটি লিয়া আবার হাটা শুরু করলো। ওরা যাতে যাতে যাতে একখান মস্তবড় মাঠ পালো, মাঠের মদ্দে একখান বিরাট বটগাছ দেক্যা সেই গাছের কাচে গেল। গাছের নিচে বস্যা দুনো ভাই চিন্তা করলো এত্তু এ্যানা জিরায়্যা নিই। পাও আর চলিচ্চে না। জিরাব্যার যায়্যা দুইভাই ঘুমায়্যা পড়িচে। সেখুন ফুটিক দুপুর। চারমুড়া কেউ নাই। লিজ্জন মাট। ঐ বটের গাচে আঁচিল রাককোশের আস্তানা। রাককোশরা ফুটিলব্যানা বাড়ায়্যা যায়। আর সাজের বেলা ফির্যা আসে। ফির্যা আস্যা নিজেরা যে জীব জানোয়ার পায় তাই ভাগযোক কর্যা খায়। সেদিন রাককোশেরা দিনশেষে আগে আগেই চল্যা আলো। দুনো ভাই রাককোশগোরক আস্যা দেক্যা বটের গাচের উপুর উট্যাপলো। গাচে উট্যা একখান ডালের উপুর লুকালো। রাককোশের দল আস্যা বট গাচের নিচে দাড়্যা থমক্যা গেল। রাককোশের সদ্দার কি জানি ভাব্যা লিল। তারপর ক'ল- এটি মানাই মানাই গন্দ। সগলি তকুন নাক ফাল্যা শুক্যা দেকলো-হ ঠিকিতো মানাই মানাই গন্দ। এরপর রাককোশেরা লাফালাফি শুরু করতে লাগল। খুব মজা পালো। মানুষ ধর্যা খাবি সেই মোজে এক্কেবারে মচ্চবের লাফ শুরু কর্যাচে। এইন্যা লাফ দেক্যা দুনো ভাই ভয়ে থরথর কর্যা কাঁপতে লাগলো। বড় ভাই কাপতে কাপতে য্যান ডালোর উপুর থেক্যা পড়ো পড়ো হয়্যা গেল। ছোট ভাই বড় ভায়ের হাত ধর্যা সাউস দিয়্যা ক'লো- ভাই পড়িসন্যা। বুদ্দি একখান আচে। তুই ডাল ধর্যা চুপ কর্যা থাক। এরপর রাককোশেরা জোরে জোরে ক'ল- তোরা কারা? লিচে নাম্যা আয় তোগোরেক হামরা খামো। দুনো ভাই ভয়ে বটগাছের ডাল চাপ্যা ধরলো। তারপর ছোটভাই মনোত সাউস লিয়া ক'ল-

www.pathagar.com

হামরা তোরকের যম। রাককোশের যম খোককোশ তোরকের হামরা মারব্যার আচি। রাককোশের সদ্দার ক'লো- রাককোশের যম খোককোশ হস তো দম লিয়্যা ফালা মাতার চুল? হামরা দেকমো ক্যাংকা তোরকের মাতার চুল।

ছোট ভাই তকুন লোম্বা একখান দম দিয়া হাতের কাচে থাকা দড়ি কাছি ফেল্যা দিল। রাককোশেরা দড়িকাছি দেক্যা খুব ভয় পালো। চুল যদি এম্বা হয় তালি রাককোশের যম খোককোশ বুজি ক্যাম্বা। সদ্দার আবার ক'ল মানাই মানাই গন্দ তবু তোরা রাককোশের যম খোককোশ এবার তবে ফাল্যা তোরকের ছ্যাপ? দুনো ভাই তকুন অপ্প এ্যানা চিন্তায় পড়ল। তারপর চুনের খুটির কতা মনে হল। তারপর চুনের খুটির মোদে মুত্যা দিয়্যা চুন গুল্যা নিচে ফাল্যা দিল। রাককোশেরা চুন গোলা মোত মুকে দিয়্যা দ্যাকে জিব্যা পুড়্যা যায়। তকুন আরো ভয় পালো। এবার সদ্দার ক'লো- চুল দেকনু, ছ্যাপ দেকনু এবার দেকমো তোরকের দাঁত? দুনো ভাই এন্যা ভাব্যা লিল। তারপর বুড়ার দেওয়া নাংল্যার খিলের কতা মনে হল। সাথে থাকা নাংল্যার খিল মাটিত ফেল্যা ক'ল- এবার শালার দ্যাখ তোরা হামাকের দাঁত। খিল যায়্যা পলো সদ্দারের মাতার উপুর। মাতা কাট্যা রক্ত পড়তে লাগল। খিলের মতোন লোম্বা নোয়ার দাঁত দেক্যা সদ্দার ভয়ে চিৎকার দিল- যম আচ্‌চে পালাও পালাও, যম আচ্‌চে বাঁচাও বাঁচাও। বলে এক দৌড়ে পলা গেল।

এর পর দুনোভাই বটগাছ থেক্যা নামা আসিচ্চে তকুন শুনব্যা পালো গাচের খোড়লের মোদে দুকনা বিটি ছ'ল কাদিচ্চে। ঐ বিটি ছ'লের কান্দন শুন্যা দুই ভাই থাম্যা গেল। আগা যায়্যা দ্যাকে খোড়লের দুয়ারে পাতর চাপা দেয়া। পাতর সর্যা দ্যাকে খুব সুন্দরী দুকনা বিটি ছ'ল। ঝর ঝর কর্যা কান্দিচ্চে। প্রতমে এরকের দেক্যা একটু ভয় পালো। তারপর বুজব্যা পালো এরা রাককোশ না মানুষ। তকুন দুইভাই বেটি ছ'লকেরে বার হয়্যা আসপ্যা ক'লো। বার হয়্যা আলি পারে ওরা জিজ্ঞাস করলো এটি কেন পড়্যা আচে? তকুন ওরা ক'লো- ওরা সাপাহার আজ্যের আজা সোনাহার বাশশার দুই কন্যা হিরা আর মতি। একদিন বিকাল বেলা দুই বোন বাগানের মদ্দে দিয়া হাটিচ্চিল। হাটতে হাটতে বাগানের এক কোণাত আস্যা পড়ে। তকুন কোন পউরি ছিল না। সেই সুযোগে শয়তান রাককোশের সদ্দার দুনো বোনক জোর কর্যা ধর্যা লিয়া আস্যা এই বটগাচের মদ্দে খোড়লে বন্দি কর্যা থুচে। ওদের দুককের কথা শুন্যা দুনো ভায়ের খারাপ লাগলো। তারা ওটি থেক্যা আজ কুমারি গোরক বার কর্যা আন্যা সোনাহার বাশশার দ্যাশের দিকেত রওনা হল।

সোনাহার বাশশার দ্যাশে যাতে যাতে সামনে একখান লদী প'লো। লদীর ঘাটোত ঘাট্যাল লৌকা লিয়া বস্যা আচে। কিন্তক এদের কাছোত কোন পস্যা নাই। ঘাট্যাল পার করে না। দুই বোনের গলাত একখান কর্যা মালা ছিল। সেই মালা ঘাট্যালের হাতোত দিয়া ক'লো- এই যে দুইখান হার এগল্যা লিয়া হামাগোরক পার কর্যা দ্যাও। ঘাট্যাল ক'লো- হামি হার লিব না। হামার লৌকার ভাড়া এত লয়। হামাক ট্যাকা দ্যাও। ট্যাকাতো নাই। বাধ্য হয়্যা ঘাট্যাল হার লিয়া পার কর্যা দিতে রাজি হল। কিন্তু ওপারের ঘাটোত নাম্যা দেওয়ার সময় ঘাট্যাল এক খান মাটির বাটি দুই ভাইয়ের হাতোত দিয়া ক'লো- হারের বদলি এটি লিয়া যাও। কামোত লাগবি। বড় ভাই

www.pathagar.com

ক'লো- এই মাট্যা বাটি দিয়া কী হবি? তকুন ঘাট্যাল ক'লো- এই বাটির মদে একখান মিষ্টি রাখ্যা সেটি থেক্যা সাত গাঁওয়ের মানুষকেরে মিষ্টি খাওয়ান যাবি। তাও মিষ্টি ফুরাবি না। মাট্যাবাটি সাথোত লিয়া রওনা দিল।

তারপর যাতে যাতে বহুদূর চল্যা গেল। সেটি যায়্যা বিরাট এক মাটের মদ্দে একখান অচিন গাছ দেকপ্যার পালো। হিরা আর মতি দুনো ভায়েক ক'পেলা- হামরা হাটপ্যার পারিচ্চি না। এটি এন্যা জিরয়া লেই। অচিন গাচের তলে যায়্যা বসল সগলি। এমন সময় একবুড়ি হাতোত লাটি লিয়া তার উপুর ভর দিয়া কাচে আলো। বুড়ির সব্বন শরীল ধুদধুরা হয়্যা গ্যাচে। মাথার চুলো জটা ধর্যা যাচ্চে। আলাঝালা চুলে জটাআলা জটা বুড়ি সুমকে আসলি সগলি ভয় পালো। সগলি ভয়ে কাঁপতে লাগলো। জটা বুড়ি সুমকে আস্যা ক'লো- তোরা হামার মাতার উকুন বাছ্যা দে। এ কতা শুন্যা সগলি অবাক হয়্যা গেল। তারপর হিরা আর মতি মিল্যা উকুন বাছ্যা দিল। বুড়ির জটা খুল্যা দিল। বুড়ি খুব হারাম পালো। খুশি হয়্যা জটা বুড়ি ওর হাতোত থাক্যা লাঠিখান ওরকের হাতোত দিয়া ক'লো- এটি তোরা লিয়া যা। বড়ভাই ক'লো- লাটি দিয়া কি হবি? এটি আমরা নেমো না। ছোট ভাই বড় ভায়ের হাত চ্যাপ্যা ধরলো। তারপর ক'লো- লে ভাই, কামে লাগবি। জটা বুড়ি খুশি হল। তারপর ক'লো- এই লাঠি লিয়া মাটিত গাড়্যা দিলি মরা লাঠি থেক্যা গাচ হবি, ফুল হবি, ফল হবি সে ফল সগলি খাতে পারবে। বিশ্বাস কর্যা লাঠিখান লিয়া আবার রওনা দিল সোনাহার বাশশার আজ্যের দিকে। অনেক দূরে পথ হাট্যা হাট্যা সাজের বেলা আস্যা সাপাহার আজ্যের আজা সোনাহার বাশশার আজবাড়িত পৌছা গেল। আজকুমারি হিরা আর মতিক ফির্যা পায়্যা রাজা খুব খুশি হল। আজ্যের মদ্দে আনন্দের জোয়ার বয়্যা গেল। আজকুমারিগোরক ফির্যা পায়্যা আজবাড়ি য্যান ঝলমল কর্যা উঠলো।

আতের বেলা খাওয়া দাওয়া শ্যাষ কর্যা আজা দুনো ভায়েক ডাক দিয়া কাচে ডাক্যা আনলো। তারপর আজা কুমারিগের উদ্ধারের কাহিনি শুন্যা ভাইদের উপুর খুব খুশি হয়্যা ক'লো- তোমরা আমার কাচে কী চাও? তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। আজ আমি তোমাগোরক সব দিয়া দেমো। কোন কিচু না করমো না। তকুন ছোট ভাই খুব ভয়ে ভয়ে ক'লো- আমরা আজকুমারি গোরক বিয়া করমো। আর কিচু চাই না। এই চাওয়ার কতা শুন্যা আজা আগে ফায়ার হয়্যা গেল। তকুনি পউরি ডাক্যা গুদাম ঘরোত আটকা থুব্যার ক'লো। একন্যা গরীবের ছ'ল কিনা আজকুমারিক বিয়া করব্যার চায়? সোনা না রূপা না এক্কেরে হিরা আর মতিক বিয়া করব্যা চায়? আরো বেশি রাগ হয়্যা আজা দুনোভায়েক মার্যাফাল দিব্যার ক'লো। এই খবর হিরা আর মতি শুনব্যা পালো। তারা আস্যা আজার পাও ধর্যা ক'লো- যারা হামাকের জীবন বাঁচাছে তাগোরোক মারো না বাবা। ওরকের জীবন ভিক্ষা দ্যাও। ওরা ভুল কর্যাছে আর ইংকা ভুল হবি না। ওরকের ছাড়্যা দ্যাও। কিন্ত তাও আজার মন গলে না। হিরা আর মতির করুণ আকুতি শুন্যা অবশেষে আজার মন গললো। তকুন আজা হিরা আর মতিকে কাচে ডাক্যা ক'লো- ওরকের কাচে এমন কি আচে যার জন্য ওরা তোমাদের বিয়া কর্যা লিয়্যা যাবি। তখন মতি ক'লো- ওরকের কাচে একখান মাট্যা বাটি আচে এর একখান মরা গাছের ডালের লাঠি আচে। তারপর মাট্যা বাটি আর লাঠির কেরামতির কতা ক'লো।

www.pathagar.com

শুন্যা আজা আগামীকাল আজ্যে ঢোল দিবার ক'লো। সগলির সুমকে বাটি লাঠির পরীক্ষা কর‍্যা দেখা হবে। যুদি ওরকের এই কেরামতি ঠিক না হয় তাহলে ওরকের শুলে চড়্যা মারা হবি।

আজ্যে ঢোল পিট্যা দিল। আস্তে আস্তে আজবাড়ির সুমকে লোকজন জড়ো হতে লাগল। এমন সময়ে দুনো ভায়েক লিয়্যা আস্যা বাটি আর লাঠির কেরামতি দেখাবার ক'লো। আল্লাহ রসুলের নাম লিয়া বিসমিল্লা কয়্যা বাটির মদ্দে একখান মিষ্টি রাখ্যা দুনো ভাই উপুস্থিত সগলিক মিষ্টি বিলান শুরু কর‍্যা দিলো। আশপাশের সাত গাঁওয়ের লোক মিষ্টি খায়্যা প্যাট ভর‍্যা ফাল্যা দিল। তবু মিষ্টি ফুর‍্যা গেল না। উপুস্থিত সগলি খুব খুশি হল। এরপর দুনোভাই মিল্যা আল্লাহ রসুলের নাম লিয়্যা বিসমিল্লাহ কয়্যা হাতের লাঠি মাটিত গাড়্যা দিল। চোকের পলকে লাঠি থেক্যা গাচ হল, ফুল ফুটলো ফল ধরলো, ফল পাক্যা গেল। সেটি থেক্যা ফল তুল্যা দুনো ভাই সাত গাঁওয়ের সগলিক খাওয়ালো। খাওয়া শেষে গাচের গোড়ায় হাত দেওয়ার সাতে সাতে চোকের পলকে গাচ লাঠি হয়্যা গেল। ফল খায়্যা সগলি খুশি হল। রাজাও খুশি হয়্যা হিরা আর মতিক দুনো ভায়ের সাথে বিয়্যা দিল। আজকুমারি গোরক বিয়া কর‍্যা সাপাহার আজ্যে দুনো ভাই সুকে বসবাস করব্যার লাগলো।

সারসংক্ষেপ

এক হাল্যা বা কৃষকের মা মরা দুটি এতিম ছেলে সৎমায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বাড়ি থেকে বের হয়েই তারা নানা ঘটনার শিকার হয়। পথিমধ্যে নিজেদের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও মানুষের উপকার করে। উপকৃত লোকেরা খাবার পানি কিছু না দিয়ে বরঞ্চ কেউ দড়ি, কেউ নাংল্যার খিল, কেউ চুনের খুটি দেয়। ক্ষুধার্ত বড় ভাই এগুলো সঙ্গে নিতে বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু ছোট ভাইটি বড় ভাইকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগুলো সাথে নিয়ে যায়। অবশ্যই কোন না কাজে লাগবে উপকারে আসবে। এভাবে যেতে যেতে বিস্তীর্ণ এক মাঠের মধ্যে বিশাল এক বটগাছের তলায় গিয়ে পৌঁছায়। কিন্ত সেখানে গিয়ে এক মহাবিপদে পড়ে গেল। গাছটি ছিল রাক্ষসদের আস্তানা। দুই ভাই রাক্ষসের ভয়ে বটগাছের উপরে উঠে লুকায়। রাক্ষসেরা নীচে এসেই মানুষের গন্ধ টের পায় এবং মানুষ মানুষ গন্ধ বলে অনুসন্ধান চালায়। তারপর ওরা দুই ভাই নিজেদেরকে রাক্ষসের যম খোক্ষস বলে পরিচয় দেয়। রাক্ষসেরা খোক্ষসের প্রমাণ হিসেবে চুল, থুথু, দাঁত ইত্যাদি দেখতে চায়। তখন ওদের সাথে থাকা দড়িকে চুল হিসেবে দেখায়। চুন গোলা পানিকে থুথু হিসেবে এবং নাংল্যার খিলকে দাঁত হিসেবে দেখায়। এতো মোটা চুল, এতো লম্বা দাঁত এবং এতো ঝাঁঝালো থুথু দেখে রাক্ষসেরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলো যে বটগাছের উপরে রাক্ষসের যম খোক্ষস এসেছে। ওরা ভয় পেয়ে দেড়ে পালালো। তারপর এরা দুইভাই বটগাছ থেকে নেমে আসার সময় গাছের ভিতরে খোড়লের মধ্যে কান্না শুনতে পেয়ে খোড়লের মুখে চাপা দেওয়া পাথর সরিয়ে দেখতে পায় অপরূপ সুন্দরী দুটি মেয়ে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ওরা সাপাহার রাজ্যের রাজা সোনাহার বাদশার দুইকন্যা হিরা আর মতি। একদিন বাগানে বেড়াতে বের হলে শয়তান রাক্ষসেরা তাদের অপহরণ করে নিয়ে আসে। এরপর দুই ভাই মিলে হিরা আর মতিকে উদ্ধার করে সাপাহার রাজ্যের দিকে রওনা

www.pathagar.com

দেয়। সেখানে যাওয়ার পথে নৌকায় ঘাট পার হয়ে টাকা দিতে না পেরে হিরা আর মতির গলার হার মাঝিকে দেওয়ায় মাঝি তার ভাড়ার চেয়ে হারের দাম বেশি হওয়ায় একটি মাটির বাটি দুই ভাইয়ের হাতে দিয়ে বাটির কেরামতির কথা বলল। এই বাটির ভিতর একটা মিষ্টি রেখে সেখান থেকে সাত গ্রামের মানুষকে খাওয়ানো যাবে। কিন্তু মিষ্টি ফুরাবে না। মাটির বাটিটা সাথে নিয়ে রাজকুমারী হিরা আর মতিকে সঙ্গে নিয়ে চলল সাপাহার রাজ্যের দিকে। যেতে যেতে এক অচিন বৃক্ষের নিচে বসে বিশ্রাম নেওয়ার সময় এক জটা বুড়ি তার মাথা থেকে হিরা আর মতিকে উকুন বেছে দিতে বলে। হিরা আর মতি সেই উকুন বেছে দেওয়ায় জটাবুড়ির খুশি হয়ে একখান মরা গাছের ডালের লাঠি দেয়। আর এর কেরামতির কথা বলে। এই ডাল মাটিতে পুঁতে দিলে তাৎক্ষণিক ভাবে গাছ হবে, ফুলফল সবই হবে। সেখান থেকে সাত গ্রামের মানুষকে খাওয়ালেও ফল শেষ হবে না। মাটির বাটি আর মরা ডালের লাঠি নিয়ে ওরা যেতে যেতে সোনাহার বাদশার রাজবাড়ি পৌঁছে গেল। রাজা এতদিন পর তাঁর দুই মেয়ে হিরা-মতিকে খুঁজে পেয়ে মহাখুশি। যে দুই ভাই উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে উদ্ধারের কাহিনি শুনে রাজা খুশি হয়ে তাঁর কাছ থেকে যে কোন জিনিস চাইতে বলল। এই সুযোগ পেয়ে দুইভাই রাজকন্যাদের বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। রাজা এহেন প্রস্তাবে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের গুদাম ঘরে বন্দি করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘোষণা দিল। মেয়েদের অনুরোধে দুই ভাইয়ের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে বাটি আর লাঠির কেরামতি দেখানোর বিনিময়ে একদিন সময় পেল। পরের দিন সকাল বেলা রাজ্যের অসংখ্য লোকের সামনে দুই ভাই নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে বাটি থেকে সাত গ্রামের মানুষকে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়ালো। আবার লাঠি থেকে গাছ বানিয়ে পাকা ফল খাইয়ে সাত গ্রামের মানুষকে খুশি করে দিল। বাটি-লাঠির কেরামতি দেখে রাজ্যের সকল মানুষের মতো রাজাও খুব খুশি হল এবং দুই ভাইয়ের সাথে দুই রাজকুমারী হিরা আর মতিকে বিয়ে দিল। দুই ভাই দুই রাজকুমারীকে বিয়ে করে ঐ রাজ্যেই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

কাহিনি বর্ণনার পটভূমি

মেটে রাস্তার ধারে গাছের নিচে পাতা বাঁশের তৈরি মাচানের উপর ৬/৭ জন লোককে বসে থাকতে দেখে আমি ওদের কাছে গিয়ে বসি। তখন পড়ন্ত বিকেল। পাশে একটা বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের শেষদিন। মাচানে বসা প্রায় সবাই ডেকোরেশন কর্মি। বিয়ের গেট তাবু ইত্যাদি সব প্রায় খোলা শেষ হয়ে গেছে। ভ্যান কিংবা পিকআপ এলেই মালপত্র তুলে দিয়ে একদম ফ্রি হয়ে যাবে। ওদের সাথে কথা বলার সময় আমার কথা শুনে একজন কথক সম্পর্কে বলে উঠল- ভালো জাগাতি আচেন। ও শালা কতার আজা। এগল্যা চুটকি শাস্তর শিল্লক লিয়াই পড়্যা থাকে। ক্যারে এ তুই ঐ চুটকি খান ক। না না তুই রাককোশের গল্প খান ভায়েক কয়্যা দে। কথক অনেকটা উৎসাহ পেল এবং আগ্রহও দেখাল। তারপর একটু সময় চিন্তা করে শুরু করল কাহিনি বলা। খুব স্বাদ নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে মজা করে কাহিনিটি বলতে লাগল। মাঝে মাঝে ওর সহকর্মিরা বিড়ি ধরিয়ে দিচ্ছে। বিড়িতে টান মেরে আরো মৌজ করে গল্প বলতে লাগল। এর মধ্যে আশপাশ থেকে আরো ক'জন ছেলে মেয়ে এসে মাচানের উপর

www.pathagar.com

আমাদের গা ঘেষে বসে মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনতে লাগল। সকলে মিলে রীতিমত আসর জমিয়ে গল্প বলা শুরু হয়ে গেল। গল্পের শুরুতে সৎমায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দুইভায়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা শুনে সৎমায়ের উদ্দেশ্যে একটা গালি দিল- এই শাওয়্যাই মাগিরা খুব খারাপ। লোকটার গালি শুনে বললাম- ভাই আপনেরও কী সৎ মাও আছে? লোকটি তখন বলল- এটি আর কি ক'মো শাওয়্যাই বাপ বুড়াকালে এক ডেমনি লিয়া আচ্চে। মাগি সংসারটা জ্বলা খালো। তারপর গল্প চলতে থাকল। রাক্ষসরা যখন বটগাছের কাছে তখন সবার চোখে মুখে একটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ দেখা গেল। কথক নিজের সেই সুযোগটা নিয়ে কথার মাঝে ছোট ছোট বিরতি নিয়ে একটা সুপার ক্লাইমেক্স তৈরি করে শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তৃপ্তি সহকারে মুখের থুথু গিলে ঢোক চিপে গলা পরিষ্কার করে বলতে থাকে। চুনের খুটিতে প্রস্রাব করে সেগুলো রাক্ষসদের ধোকা দেওয়ার জায়গায় উপস্থিত ছেলেরা- খা শালা, খা শালা বলে পাঁচ দোয়ারি ধরার মতো করে উঠলো। তারপর যখন চুন খেয়ে মুখ পুড়ে খোক্কসের ভয়ে রাক্ষসের দল দৌড়ে পালাল তখন- ঠিক হচে শালাগোরক, এখুন দৌড় দিস ক্যা? মর শালা শাওয়্যার ব্যাট্যা ইত্যাদি বলে কথকের সাথে সাথে শ্রোতারাও তাদের ভালোলাগার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ধৈর্য সহকারে মজা করে গল্পটি শেষ পর্যন্ত শুনে গেল। তবে মাঝে মধ্যে ছোট খাট বিরতির মত করে এই গল্পটি সম্পর্কেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলে গল্পটিকে মূলধারা থেকে বিকল্প ধারায় নেওয়ার অজ্ঞ আলোচনাও হয়েছে। যেমন– ক্যারা শালা তুই যে এত গল্প মারিচ্চু? তুই কতো দেকি আকখোস তুই দেকচু? খোককোশ কি সত্যিই না কিরে? ঠিক কর‍্যা কতা কস। তুই খোককোশ দেখিচু? অন্যজন প্রশ্নকারিকে মৃদু ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। ওক কব্যার দেতো তুই। এটি কতা কয়্যা ঝামেলা করিস না। হামাকেরে শুনব্যা দে। ভালো না লাগলি তুই চল্যা যা। এভাবেই কাহিনিটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্তির দিকে আসে। হাল্যার ছেলেদের সততা আর মানুষের উপকার করার ফল হিসেবে রাজকন্যাদের সাথে বিয়ে হওয়ায় সবাই খুব খুশি হয়। বিশেষ করে নিজেরা মাঠে খেটে খাওয়া হাল্যা, কৃষক বা কামলা শ্রেণির মানুষ হওয়ায় যেন নিজেরাই এমন অসাধ্য সাধন করেছে এমন একটা ভাব পরিলক্ষিত হল সকলের চোখে মুখে। ছোট যারা ছিল তাদের মধ্যে ভবিষ্যতে এমন করে বাড়ি ছেড়ে দূর দেশের কোন রাজকুমারীকে বিয়ে করে সুখে থাকার স্বপ্ন কল্পনার রঙিন মুখ ভেসে উঠল। উপস্থিত সকলেই গল্প শোনার ভালোলাগায় নিজেদের মতো করে কল্পনার রাজ্যে পাড়ি জমালো। কথক সবার সাথে হাত মিলিয়ে সে নিজেও একধরণের তৃপ্তি নিয়ে কাজ আছে বলে চলে গেল।[৭]

খ. কিংবদন্তি

১. গাবতলীর নামকরণ

পূর্বনাম গোবিন্দনগর। শ্রীমান শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ রায় বাহাদুর মহাশয় সাহেবের জমিদারি অঞ্চল ছিল। তদানিন্তন পোলাদশী পরগনার অন্তর্গত দিনাজপুরের ফুলবাড়ি এস্টেটের অধীন এই গোবিন্দনগর। দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের চৌধুরী বাড়ির দুই সন্তান কালে চৌধুরী ও ফতেহ চৌধুরী ব্যবসার উদ্দেশ্যে সওদাগরি করতে দুধকোমর

www.pathagar.com

নদীর পাশে বর্তমান সর্দার পুকুর নামক স্থানে নৌকা ভিড়ায়। তখন এই অঞ্চলে তেমন কোন জনবসতি ছিল না। সুতরাং রাত্রিযাপনের জন্য কোন জায়গা বা আবাসস্থল না পেয়ে দুধকোমর নদীর উপকূলে গাবগাছের নিচে শীতলপাটি বিছিয়ে রাত্রি যাপন করেন। দুধকোমর নদী বিধৌত গোবিন্দনগরসহ পুরো অঞ্চলটি ছিল ইছামতি ও গজারিয়া নদী বিধৌত এলাকা। ফলে নদী বিধৌত পলিমাটির উর্বর এ অঞ্চলটি কালে চৌধুরী এবং ফতেহ চৌধুরীর ভালো লেগে যায়। আর এই ভালোলাগা থেকে তরুণ যুবক দুই ভাই স্থানীয় দুটি মেয়েকে বিয়ে করে গাবগাছের কাছে বাড়ি করে নতুন বসতি স্থাপন করে। কালে চৌধুরী সওদাগরি বাদ দিয়ে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে শিক্ষকতা পেশায় চলে আসেন এবং ফতেহ চৌধুরী বিচার কাজে নিয়োজিত হন। ফলে তাদের বংশীয় চৌধুরী উপাধি পরিবর্তিত হয়ে আকন্দ এবং কাজী উপাধিতে পরিণত হয়। এদের কাছে শিক্ষা এবং বিচারের জন্য লোকজন আসা যাওয়া শুরু করলে আগতদের জন্য গাবগাছের তলায় পাতা মাচানের উপর বসতে দেওয়া হত। এছাড়া মাঠে কাজ করার সময় ক্লান্ত শ্রান্ত লোকজন গাবগাছের তলায় বসে ক্লান্তি দূর করত। অবসর সময়েও লোকজন এই গাবতলাতে এসে বসে থাকত। মাঠের কৃষকদের খাবার নিয়ে এলে হাত পা ধুয়ে এই গাবতলায় বসেই খাবার খেত। এভাবেই ধীরে ধীরে গোবিন্দনগর গাবতলীতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তিতে রেল লাইন করার জন্য রেল কোম্পানির লোকজন এসে এই গাবতলাতেই তাবু গাড়ে। স্থানীয় লোকজনের দাবির মুখে এই স্থানটিকে গাবতলী নামে নথিভুক্ত করে। সেই থেকে আজকের গাবতলী উপজেলা।[৮]

২. গাবতলীর গাবগাছ সংক্রান্ত কাহিনি

বর্তমানে গাবগাছের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হতে চলেছে। একসময় বিশালাকৃতির এই গাবগাছ বজ্রপাতসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গাছটি ফেটে যায়। কখনো কখনো পারিবারিক প্রয়োজনে গাছটির উত্তরাধিকারীরা এর ডালপালা কেটে ফেলেছে। গাছটি ফেটে যাওয়ার সুবাদে গাছের উপর একটি পাকুড় গাছ জন্ম নিয়েছে। পাকুড় গাছটি বর্তমানে গাবগাছটিকে অনেকটা অক্টোপাসের মতো গিলে ফেলেছে প্রায়। পাকুড় গাছের আশপাশ দিয়ে দুই একটি ডাল বের হয়ে আছে। যেন বাঁচার জন্য করুণ আকুতি জানাচ্ছে। এখানে বাংলার লোক ঐতিহ্য বট-পাকুড়ের বিবাহিত জুটির মতো গাব-পাকুড়ের সম্মিলন ঘটেছে। বহুপূর্ব থেকেই এই গাছটিকে ঘিরে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে নানান রকম বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। বিশেষকরে জ্বিন দেখা। অর্থাৎ পুরাতন এই গাছটিকে ঘিরে জ্বিনের বসতি রয়েছে। রাতের বেলা বাইরে বের হলে ধবধবে সাদা কাপড় পরা জ্বিনদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছে অনেকে। তথ্যদাতা জনাব হিটলু কাজী নিজেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেন। এছাড়াও আগে স্থানীয় লোকেরা এই গাবগাছের নামে মানত করত। কার্তিক মাসের অমাবশ্যা রাতে ধুপশলা জ্বালানো, দিয়ার বাতি দেওয়া, মোমবাতি জ্বালানো, গাছের ডালে লাল গামছা বেঁধে দেওয়া, পাতা কুঁড়িয়ে ঘরে রাখা যাতে কোন প্রকার বিপদ আপদ না হয় ইত্যাদি লোকবিশ্বাসগুলো এখনো প্রচলিত রয়েছে। তবে প্রকাশ্যে এ কাজগুলো এখন আর

www.pathagar.com

কেউ করে না। জ্বিনের আছর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন লোকজন আড়ালে আবডালে করে থাকে। এছাড়া গাছটির ফাঁকফোকরে নানা রকম বিষধর সাপ থাকায় দেবী মনসার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলেও অনেকে মনে করে থাকে।

গাবতলীর গাবগাছ, গাবতলী।

৩. গাবতলী বাজারের মাদার গাছ

বর্তমান ফুড অফিসের সামনে একটা বিশাল মাদার গাছ ছিল। এমনিতেই মাদার গাছ নিয়ে মানুষের মধ্যে জ্বিন ভূতের নানা ঘটনা রটনার অন্ত নেই। তার উপর গাবতলীর এই মাদার গাছের নিচে দীর্ঘদিন এক লেংটা পাগল বাস করত। আর থাকত একজোড়া সাপ। এই সাপ কারো ক্ষতি করত না। স্থানীয় লোকেরা মনে করত সাপ এবং লেংটা পাগলের মধ্যে অনেক খানি সখ্যতা রয়েছে। স্থানীয়দের অনেকেই সাপ এবং পাগলকে জ্বিন বলে মনে করত। গাবতলী থানা ঘোষণা হওয়ার দশ-বার বছর আগে থেকে লেংটা পাগল বর্তমান থানা অফিসের দিকে কোন ব্যক্তিকে প্রস্রাব পায়খানা করতে সে যেতে দিত না। তখন ঐ জায়গাগুলোর বেশিরভাগই পাটক্ষেত ছিল। ঐ দিকে কেউ প্রস্রাব পায়খানা করতে গেলে পাগল ধমকাত এবং নিষেধ করত। সে বলত ও দিকে কেউ যাসনে। ওখানে একটা কিছু হবে। এভাবেই লেংটা পাগল মানুষের কাছে স্থানটি সম্পর্কে দীর্ঘ দিন ধরে ভিন্ন রকম আবহ ও বিশ্বাস তৈরি করে। পরবর্তিতে পাটক্ষেতের মাঠেই গাবতলী থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭]

৪. নন্দীগ্রামের দুখুসুখু পুকুর

এই পুকুরটি নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটরা নামক ইউনিয়নের বামন গ্রাম এবং দামগারা গ্রামের মাঝে অবস্থিত। নন্দীগ্রাম উপজেলা সদর থেকে ভাটরার দূরত্ব প্রায় ৫-৬ কিলোমিটার। ভাটরা বাজারের হাফ কিলোমিটার ঠিক পশ্চিমে যে গ্রাম দেখা যায় ঐ গ্রামের নামই দামগারা। দামগারা গ্রামে প্রবেশ করতেই প্রথমে যে বিশাল পুকুর চোখে

www.pathagar.com

পড়বে সেটিই সুখু পুকুর। এলাকার মানুষ অবশ্য এই পুকুরকে 'সসো' পুকুর বলে। আর 'সসো' পুকুরের উত্তর পাশে প্রায় কাছাকাছি আরেকটি বিশাল যে পুকুরটি সেটি দুখু বা 'দসো' পুকুর। পুকুর দুটো যে অনেক যুগ আগের তা এর আকার আকৃতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ এর জলাশয় এতো বিশাল যে বর্তমানে বা দু-এক দশক আগে এরকম পুকুর খনন করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। পুকুর দুটোর আকৃতি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে বর্তমানের চাইতে আগে এই পুকুর দুটো দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগতো। কারণ তখন এই পুকুরের পাড়ে কোন বসত ভিটা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পুকুরের চারপাশে গ্রাম হয়ে গেছে। যার জন্য এর বিশালাকৃতি খানিকটা হলেও ম্লান হয়ে গেছে। তবুও পুকুর দুটোর যে গাম্ভীর্য আছে তা এর পাড়ে গেলেই বোঝা যায়। পুকুর দুটোর মালিক বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার। পুকুরের স্থায়ীত্বকাল বা এর সম্পর্কে জানতে চাইলে এলাকাবাসী কয়েকটি তথ্য দিলেন। তা নিম্নে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

স্থানীয় একজন মহিলা বললেন, 'এই পকর (পুকুর) আগে বিয়ার সমায় (সময়) সোনা দানা পাওয়া যাতো। গরিব মানুষ মেয়েক বিয়া দেওয়ার সমায় এই সোনা দানা এই পকরে মানা মানসত করতো। কিন্তু একন (বর্তমান) এগুলা গোপ্ত হয়্যা গেছে।' আবার অনেকে বলেন, এই দুই পুকুরের মাঝখান দিয়ে সাকো ছিল। আর তা বোঝা যাইতে যখন এক পুকুরে জাল নামানো হতো তখন পুকুরের মাছ সবগুলো আরেক পুকুরে চলে আসতো। ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয় একবার এক লোক বর্শি দিয়ে মাছ ধরার সময় তার বর্শিসহ মাছ অন্য পুকুরে ভেসে উঠেছিল।

এছাড়াও এই পুকুর আগে জাইর (জাগ্রত) ছিল। পুকুর অনেক বড় একটা গজার মাছ ছিল। সেই মাছ খুলুর ঘান ভাঙ্গা জাঁটের মতো পুকুরে ভেসে বেড়াতো। যখন এই মাছ কেউ ধরতে যেতো, ধরতে পারতো না। এর গায়ে কেউ আঘাত করলে তার জন্য নিজের গায়ে সেই আঘাতে চিহ্ন বা ঘা হতো। এজন্য এই পুকুরে মাছ ধরতে চাইলে আগে লবন ফেলে দিতে হতো। আবার কেউ কেউ পাঠা (ছাগল) বা চিনি বাতাসা মানত করতো। পুকুরের পশ্চিম পাড়ের বামন গ্রামের বাসিন্দা বীপিন চন্দ্র বলেন, এই পকর (পুকুর) এই এলাকার জমিদার তার দুই মিয়াকে (মেয়ে) খুরা (খনন) দিসলো (দিয়েছিলো) ডুব (গোসল) দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, এই পুকুর থাক্যা ১৯৭১ সালে যে কোদালের ঘাড়ি পাওয়া তার ওজন প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার কেজির মতো হবে।'[১-৩]

গ. পুরাকাহিনি

১. বেহুলার বাসরঘর

বগুড়া শহর থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে এবং মহাস্থানগড় থেকে দুই কিলোমিটার দক্ষিণে গোকুল গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যে ঢিবিটি আছে তাকেই বেহুলার বাসর ঘর বলে অভিহিত করা হয়। স্থানীয়ভাবে একে 'গোকুলের মেড়'ও বলা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে এটি একটি। বেহুলার বাসরঘরকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন, কৌতুহল দিনদিন বেড়েই চলছে। এই স্থানকে নিয়ে অনেকে মানত করেন। কেউ বা এখানে এসে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে এ স্থানে বসে।

www.pathagar.com

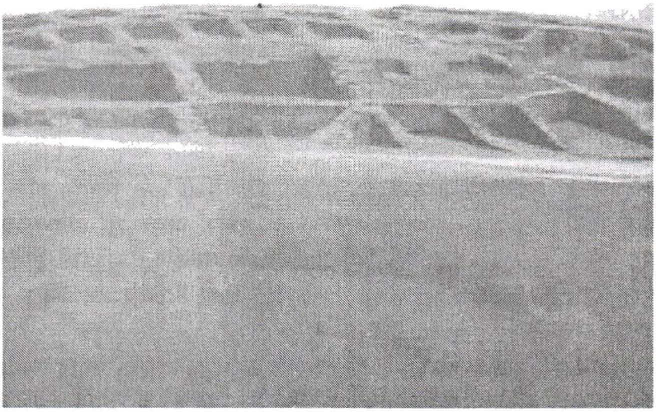

বেহুলার বাসর ঘর

হিন্দু সম্প্রদায়ের মনসা ভক্ত নারী পুরুষ এখানে পূজা দিয়ে থাকে। স্থল পদ্ম, দুধ, কলা, বেলপাতা পুষ্পপত্র দিয়ে পূজা দিয়ে থাকে। আবার অনেকে বেহুলার বাসর ঘরের স্থান থেকে উদ্ধার করা প্রস্তরখণ্ডের কাছে এসে শিবপূজাও করে থাকে। প্রস্তরখণ্ডে (বট গাছের নিচে) সরিষার তেল, ঘি, মধু, দুধ, সাদা ফুল, সিন্দুর, তুলসী পাতা, মোমবাতি, দেশলা (ধূপশলা) দিয়ে বিভিন্ন মানতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে পূজা দিয়ে যায়। এছাড়া প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা রাতে দুধ কলা দিয়ে অনেকে মনসা পূজা করে থাকে।

নব দম্পতিরা বেহুলা বাসরঘরকে একত্রে দর্শন করতে আসে না। আলাদাভাবে এখানে আসেন। তাদের ধারণা, বেহুলা লক্ষিন্দরের বিচ্ছেদ হয়েছিল, তাই একত্রে গেলে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল বেহুলা লক্ষিন্দরের জীবনে। ইটের তৈরি স্তূপকে দেখে বুঝতে পারা দুস্কর যে এটিই বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসরঘর। কোন যুগে কি উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল, না কি আদৌও এটি বেহুলা লক্ষিন্দরের এমন ঘটনা তা নিয়েও রয়েছে দ্বিধা। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী থেকে বার'শ শতাব্দীর মধ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। ইটের তৈরি বর্তমানের এই স্তূপটি নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ ও প্রেমিক যুগলের কাছে এই স্থান তীর্থস্থান।

অনেকে মনে করে এটি সম্রাট অশোকের নির্মিত একটি বৌদ্ধ মঠ এই বাসর ঘর। কেউবা মনে করে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করার একটি স্থান এটি। তবে এসব অনুমান দেশ ও দেশের বাইরের অনেকের। কিন্তু বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের মানুষের গভীর বিশ্বাস এটি বেহুলা লক্ষিন্দরেরই বাসর ঘর এবং বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে মনে করে এরা স্বর্গের দেবতা। স্বর্গ থেকে পৃথিবীকে প্রেম-ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীর মানুষকে সুপথে আনার জন্য বেহুলা লক্ষিন্দর মর্ত্যে এসেছিল।

www.pathagar.com

স্থানীয় লেখক তবিবর রহমানের 'বেহুলার বাসরঘর' পুস্তিকা থেকে জানা যায়, বেহুলার বাসরঘরের উচ্চতা প্রাথমিক অবস্থায় আরও বেশি ছিল। কারণ এর প্রতিটি কক্ষই এক সময় আরো আলগা ইট এবং মাটিতে পরিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে চূড়ায় থাকা ইটগুলো ধ্বসে পড়ে।

এই বইয়ের অন্যস্থানে লেখা রয়েছে, সে সময় বাসর ঘরের সংস্কারের অভাবে এর উপরিভাগে একসময় খড়ে আচ্ছাদিত ছিল। এর উপরে বাম পাশে একটি ইটের কক্ষে একটি শিমুল এবং উপরের বাম দিকে একটি বরই গাছ ছিল। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার বাসর ঘরটি সংস্কার করে। গাছদুটো কেটে ফেলে। বইটি থেকে আরও জানা যায় সে সময় বাসর ঘরটি সংস্কারের সময় একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই কাঙ্কালটি সন্ন্যাসীর বলে মনে করে। এই কক্ষের মধ্যে ভাগের তলদেশে ১৩টি গর্ত বিশিষ্ট একটি প্রস্তর খণ্ড পাওয়া যায়। প্রস্তর খণ্ডের মধ্যকার·গর্ত থেকে এক ইঞ্চি বর্গাকার এক ছোট স্বর্ণের পাত্র উদ্ধার করা হয়। স্বর্ণের পাত্রটিতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের প্রতিকৃতি খোদাই করা ছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটি কোন শিবমন্দির ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ২৪ কোণা বিশিষ্ট চৌবাচ্চার মত একটি কূপ আবিষ্কার করে। যা ৮ ফুট গভীর ছিল। স্থানীয়দের বিশ্বাস এটি বেহুলা লক্ষিন্দরেরবাসর যাপনের পর কৃত্রিম কূপে রক্ষিত জলে স্নান করে যাতে পবিত্রতা লাভ করতে পারে তা মনে করা হয়। এই কূপটি নিরাপত্তার জন্য ভরাট করে দেয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তার প্রচেষ্টায় এশিয়া, বার্মা ও জাপানের মত এ দেশেও বহুস্থানে বৌদ্ধমঠ স্থাপন করা হয়েছিল। ধারণা করা হয় এই বাসর ঘরটি সেই বৌদ্ধমঠেরই একটি।

কোনো কোনো গবেষকদের মতে এটি ৮০৯-৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেবপাল কর্তৃক নির্মিত একটি বৌদ্ধমঠ।

২. নেতাই ধোপানীর ধাপ বা পাট

বেহুলার বাসর ঘর থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পূর্বে এবং রংপুর বগুড়া মহাসড়ক থেকে প্রায় ৩০০ মিটার পশ্চিমে একটি বিরাট ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়, বগুড়া বাসীর কাছে এটিই নেতাই ধোপানীর ধাপ বা পাট নামে পরিচিত। এলাকার জনগণ জানান, এই ধাপের নিচ দিয়ে এক সময় নদী প্রবাহিত ছিল এবং এই নদীগোকুল মেড় এর অদূরবর্তী কাকিলাদিঘী বারানশী ও কালিদহ বিল (সাগর) কে অবিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বর্তমানে এ নদী পথ ভরাট হয়ে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এককালে যে এখানে নদী ছিল তা চেনার কোন উপায় নেই। এই ধাপে কাপড় কাঁচার সানবাঁধা বৃহদাকৃতির একটি চাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই এই ধাপের নামকরণ হয়েছে নেতাই ধোপানীর ধাপ।

৩. পদ্মার বাড়ি

মহাস্থান গড়ের পশ্চিমে সীমানা থেকে প্রায় ৫০০ মি. পশ্চিম চিংগাসপুর মৌজায় কালিদহ সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যে উঁচু ঢিবিটি দেখতে পাওয়া যায়, স্থানীয়

www.pathagar.com

জনমত-সেটিই মনসা দেবী পদ্মার বাড়ি। এই টিবির আয়তন উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৯০ মিটার, পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। এই ঢিবি উৎখননের ফলে এখানে ফণা তোলা অবস্থায় প্রচুর পোড়া মাটির সর্পমূর্তি এবং একটি কষ্টি পাথরের সর্পমূতি পাওয়া যায়। পাথরের মূর্তিটিতে দেবীর মাথায় আটটি সাপ ফণা তোলা অবস্থায় রয়েছে। একটি সাপ দেবীর স্তন পানরত। প্রচলিত লোক বিশ্বাস মনসা দেবীর আটটি সন্তান রয়েছে। মাসহ সন্তানের এসব মূর্তিগুলো মহাস্থান যাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে। এক সময় নাকি পদ্মার বাড়িতে প্রচুর কলাগাছ ছিল। এসব কলাগাছে প্রচুর কলা ধরতো। কিন্তু বিষাক্ত বলে কেউ তা মুখে দিতে পারতো না। পদ্মার বাড়িতে নানা ধরণের সাপের আস্তানা ছিল। এখানে এত বেশি সাপ ছিল যে কোন মানুষ এখানে আসে না বা আসতে সাহস পায় না। আজও অনেকে রোগ মুক্তির জন্য এখানে দেবীর নামে মানত করে এবং টিবির ওপরে দেবীর আসনে দুধ কলা দিয়ে থাকে।

৪. কালিদহ্ সাগর

মহাস্থান গড়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গড়ের বাইরের সীমানা ঘেষে যে নিচু জলা ভূমি বা বিলটি এখন চোখে পড়ে সেটিই স্থানীয় জনমতে কালিদহ সাগর। এক সময় এটি অনেক গভীর ছিল। ৪০/৫০ বছর আগেও নাকি এর পানি এতো কালো ছিল যে, হাতের অজলায় সে পানি তুললে তার কালো রং ধরা পড়তো। চিংগাসপুর গ্রামের বৃদ্ধ আজিমুদ্দি (৮০) জানান, ছোট বেলা তারা কালিদহ্ সাগরের আশেপাশে দিয়ে হাটতেন না, পানিতে নামার তো প্রশ্নই ওঠে না পারলে অ্যার ধারেকাচ দিয়েও হাটতাম না। অ্যাকুন অ্যার কিছু নাই। আগে খুব ধার আচিলে।

বর্তমানে মহাস্থান গড়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিলটি একটু প্রশস্ত হলেও গড়ের উত্তর প্রান্তের বাইরে দিয়ে একটি সরু খালের রূপ নিয়ে পূর্বদিকে প্রায় ৫০০ মিটার প্রবাহিত হয়ে মহাস্থান যাদুঘরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যাদুঘর রেস্ট হাউসের কাছে, এটি করতোয়া নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই কালিদহ্ সাগর সম্পর্কে প্রচলিত জনমত হচ্ছে :

এই সেই কালিদহ সাগর, যেটি শিবের বীর্যত থাক্যা দেবী পদ্মার জরমো হচিলো। চান্দু সদাগর তার ছয়পুত্রসহ চৌদ্দডিঙ্গে মধুকর হারাচিলো। শ্রীরামচন্দ্র এতথাক্যা ১০১টি নীলপদ্ম তুলে ন্যায়া সীতা উদ্ধার করচিলো।

৫. চাঁদসদাগরের বাড়ি

মহাস্থান গড় থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বেহুলার বাসরঘর থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার পশ্চিমে নূনগোলা-নামুজা সড়কের পাশে চাঁদমুহা বা চম্পাই নগর গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীন বাড়ি'নাকি চাঁদসদাগরের বাড়ি ছিল। স্থানীয় জনমত, চাঁদসদাগরের নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে চাঁদমুহা বা চম্পাইনগর।

এই বাড়ির পাশ দিয়ে একসময় আটোনদী প্রবাহিত ছিল। নদীর কিনারায় বহুদূর পর্যন্ত একটি পাকা বাঁধানো ঘাট ছিল। স্থানীয় ভাষায় এটি গঞ্জুরিয়ার ঘাট। বর্তমানে ঘাটটি পরিদৃষ্ট না হলেও এর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনো চোখে পড়ে।

www.pathagar.com

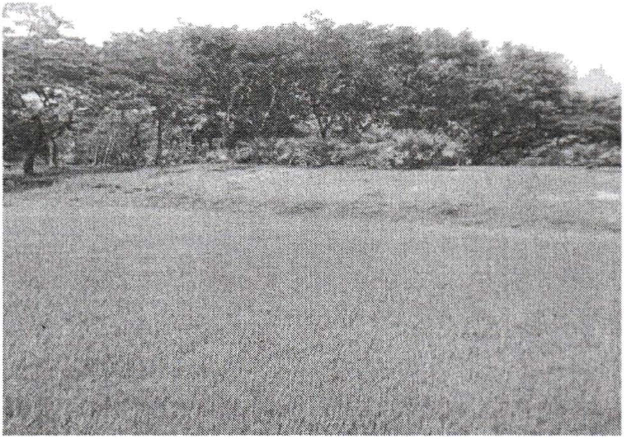

চাঁদসদাগরের বাড়ির ভিটা

৬. ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি

বেহুলার বাসরঘর থেকে প্রায় ১.৫ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে হরিপুর হাজরাদিঘী ও রামশহর গ্রামের সঙ্গমস্থলে একটি প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ সমেত মাটির ঢিবি বা স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় জনমত এটিই ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি। বাড়িটি বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। বাড়ির উত্তরে দারুঘড়া নামক ঔষধালয়। স্থানীয় জনসমাজে এটি 'ওষুধের আড়া' নামে পরিচিত। দারুঘরার পরেই পূজার স্থান। এই পূজার স্থানে মাটির নিচ থেকে অনেক দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। বাড়ির দক্ষিণে বড় একটি পুকুর। পুকুর পাড়ে ধন্বন্তরীর হাট। পুকুরে একটি পাকা বাঁধা ঘাট আছে। পুকুরের মধ্যে একটি বৃহদায়তন শাল কাঠের তক্তা পাওয়া গিয়েছিল। তক্তাটি ওঝা ধন্বন্তরীর রথের তক্তা বলে স্থানীয় লোকজন মনে করেন।

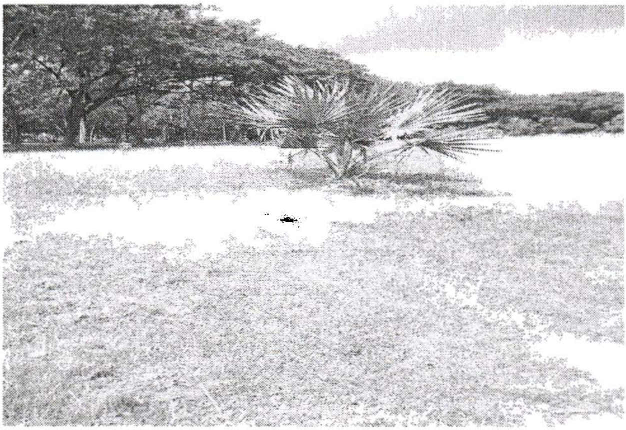

ওঝা ধন্বন্তরির ভিটা

www.pathagar.com

৭. উজানী নগর

বেহুলার বাসরঘর থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দক্ষিণে রামশহর গ্রামে একটি প্রাচীন ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়। এটিই বেহুলার বাবা বাসো বানিয়ার ভিটা বলে স্থানীয় জনসমজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস। এই ভিটা যে জায়গায় অবস্থিত তার নাম উজানী নগর। এই স্থানটির নাম উজানী নগর হওয়ার বিশেষ কারণ হলো, এখানে 'আটো নামে একটি নদী ছিলো, সেই নদীর স্রোত উজান (উত্তর) দিকে প্রবাহিত হতো'। বর্তমানে এটি একটি ক্ষীণতর খালে রূপ নিয়েছে এবং এখনও এর স্রোত উজান দিকে প্রবাহিত। আটো খালটি বর্তমানে রামশহরের পাশে শাওড়ার বিলে পতিত হয়েছে। পূর্বে এটি কালিদহ সাগরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

৮. যোগীর ভবন

বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং বেহুলার বাসরঘর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাহালু উপজেলার পাইকর ইউনিয়নে যোগীর ভবন অবস্থিত। এই যোগীর ভবন সম্পর্কে স্থানীয় জনমত হচ্ছে, এখানে এসেই বেহুলা তার মৃত স্বামী লক্ষিন্দরের জীবন ফিরে পেয়েছিল। কলার ভেলায় চড়ে বেহুলা এখানে এসে নেতাই ধোপানীর সাহায্যে এখানকার মন্দিরে আরাধনা করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন। দেবতাদের নির্দেশ মতো ধোপানী যোগীর ভবনের কানছ কূপের পাশের জঙ্গল থেকে মতান্তরে ওঝা ধন্বন্তরীর 'ওষুধের আড়া' থেকে ঔষধি গাছ এনে ঐ কূপের পানি দিয়ে বেহুলাকে দিয়ে ঔষধ পাটায় বেটে লক্ষিন্দরকে খাওয়ালে সে জীবন ফিরে পায়। যে পাটায় বেহুলা ঔষধ বেটেছিল সেটি মহাস্থান জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে বলে এলাকার লোকজন জানান। স্বামী-সন্তানের অসুখ হলে দূর দূরান্ত থেকে মহিলারা আসে এখানে মানত করতে। মানতের নিদর্শন স্বরূপ তারা কানছ কূপের মাঝে এক জোড়া তাজা শিং মাছ ছেড়ে দেন। এতে অসুস্থ স্বামী-সন্তানের অসুখ ভালো হয় বলে তাদের বিশ্বাস।

যোগীর ভবন মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত স্থানের নাম গুলোকে সংশিষ্ট এলাকার অধিকাংশ জনগণ কোন কাল্পনিক নাম বলে স্বীকার করে না। তাদের ধারণা, 'গোকুলের মেড়' সত্যি সত্যিই 'বেহুলার বাসরঘর'। এটি যে সত্যিই বেহুলার বাসরঘর এ সম্পর্কে বাসরঘরের পাশের গ্রাম পলাশবাড়ি গ্রামের বৃদ্ধ আব্দুল গফুর বলেন :

'আলা য্যাক্কা সত্য, আলার কুরান য্যাক্কা সত্য, ইডে যে বেওলার বাসরঘর, ইডেও স্যাক্কা সত্য।'

এখানকার লোকজনের আরও ধারণা চাঁদমুহা বা চম্পাইনগরই যে চাঁদসদাগরের বাড়ি, গ্রামের নামকরণেই তার প্রমাণ। 'পদ্মার বাড়ি' যদি এখানে না হবে, তো সেখান থেকে এতো সর্পমূর্তি উদ্ধার হলো কী করে? নেতাই ধোপানির ধাপ যে সত্যিই নেতাই ধোপানীর ধাপ তার প্রমাণ অতবড় একটি কাপড় কাঁচার চাড়ি! 'ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি'ই যদি এটি না হবে, তো এখানে সাপে কাটা মৃত রোগী ভালো হয় কী করে? এ বাড়ির মাটি সাপের গর্তে দিলে সাপ সে গর্ত ছেড়ে দৌড়ে পালায় কেন? 'উজানীনগর' যে সত্যিই উজানীনগর, আটো নদী এখন খাল হলেও, উজান দিকে এর পানি প্রবাহের ধারাই তার প্রমাণ। আর 'কালিদহ সাগর' সেটি না হয় আজ বিলে পরিণত হয়েছে কিন্তু একদিন যে, এটি সাগর ছিল পুরনো লোকেরা সে তো তাদের নিজ চোখেই দেখেছেন।

৯. মহাস্থানগড়

মহাস্থানকে কেন্দ্র করে বেশ আকর্ষণীয় একটি কাহিনি বহুদিন ধরে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। এ গল্পের মুখ্য প্রবাদ পুরুষ শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আছে পরশুরাম ও শিলাদেবী।

প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, মাহীসওয়ারের প্রকৃত নাম ইব্রাহীম ইবনে আদহাম। তাঁর নিবাস ছিল বলখ। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ সুফি-সাধক। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এদেশে আগমন করেন। মৎসাকৃতির একটি নৌকা যোগে তিনি আগমন করেছিলেন বলেই ক্রমে ক্রমে তিনি মাহীসওয়ার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। সে সময় মহাস্থানে পরশুরাম নামে একজন ক্ষত্রীয় রাজা রাজত্ব করতেন। জনশ্রুতি অনুসারে পরশুরাম ছিলেন মুঘল সেনাপতি মানসিংহের ভাই। 'পরশুরামের প্রাসাদ' নামে পরিচিত গড়ের ভেতর একটি বাড়িতে তিনি বসবাস করতেন। আর 'তাম্র দরজার' অনতিদূরে মথুরা গ্রামের 'পরশুরামের সভাবাটি' বলে পরিচিত স্থানে বসতো তাঁর রাজসভা। পাঁচিলঘেরা শহরের ভেতর অবস্থিত 'পরশুরামের প্রাসাদে' ছিল তার বাসস্থান।

শাহ সুলতান মাহীসওয়ার মহাস্থান এসে পরশুরামের অনুমতিক্রমে গড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বসবাস শুরু করেছিলেন। প্রথম এসে তিনি যে স্থানটিতে ছাউনি পাতেন সে স্থানটি আজও তাঁর রওজা সংলগ্ন স্থানে বাঁধান অবস্থায় আছে। যাহোক, ক্রমে ক্রমে এই সুফি-সাধক তাঁর জীবনের মহত্ত্ব ও দর্শনের প্রভাবে বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আকৃষ্ট করেন। এদের মধ্যে চিলহন নামে একজন সেনাপতিসহ পরশুরামের কয়েকজন রাজকর্মচারীও ছিলেন। ফলত, পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। অচিরেই তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

সংঘর্ষের সুত্রপাত হলো। কিন্তু পরশুরামের ছিল অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন একটি কূপ। জনগণের বিশ্বাস বর্তমানে 'জীয়ৎকুণ্ড' নামে পরিচিত কূপটিই সে কূপ।

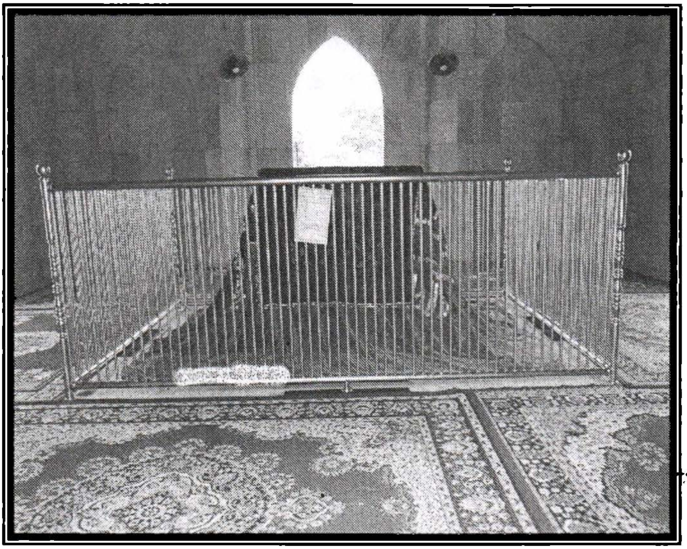

মহাস্থান মাজার

কথিত আছে যে, মাহীসওয়ারের সৈন্যদের হাতে নিহত সৈনিকদের মৃতদেহ এ কূপে নিক্ষেপ করা হলে তারা আবার জীবন্ত হয়ে যুদ্ধের মাঠে ফিরে যেত। হযরত মাহীসওয়ার এ সংবাদ অবগত হওয়ার সাথে সাথে জীয়ৎকুণ্ডের অলৌকিক শক্তি নষ্ট করতে ব্রতী হলেন। তিনি একটি চিলের মাধ্যমে গোমাংস কূপটিতে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে জীয়ৎকুণ্ডের অলৌকিক শক্তি বিনষ্ট হলো। অতঃপর পরশুরাম যুদ্ধে পরাজিত হয়। অপর এক সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ যুদ্ধে পরশুরামের হরপাল নামে একজন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে হিন্দু সৈন্যদের পরাজয় ঘটে।

যুদ্ধ বিজয়ের পর শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের হাতে পরশুরামের অবশিষ্ট সৈন্য ও পরিবারবর্গ বন্দি হন। এদের মধ্যে শিলাদেবী নামে পরশুরামের একজন ভগিনী (মতান্তরে কন্যা) ছিল। তিনি পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে অতর্কিতভাবে ছুরিকাঘাত করে বিজয়ী মুসলিম সাধককে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে নিজে করতোয়া নদীতে আত্মবিসর্জন দেন। তিনি যে স্থানে আত্মবিসর্জন করেন সে স্থানটি আজও 'শিলাদেবীর ঘাট' নামে পরিচিত। এ স্থানে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা প্রতিবার বছর পর একবার আজও পবিত্র স্নান সমাপন করে কিংবদন্তীর বিশ্বাসটিকে জীবন্ত করে রেখেছে।[১০]

মহাস্থানকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয়া এসব গল্প-কাহিনির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি এ যাবৎ পাওয়া যায় নি। পরশুরাম বলতে কোন রাজার অস্তিত্ব ইতিহাসের কোন সূত্রে

www.pathagar.com

উল্লেখ নেই। তবে রওজার অস্তিত্ব থেকে এটা নিশ্চিত যে, এস্থানে এক সময় একজন সাধক পুরুষ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগমনকাল ও পরিচয় বাংলার অধিকাংশ সুফি-সাধকদের ইতিহাসের মতো রহস্যাবৃত। আর তাই এসব নাম, উৎপত্তির ইতিহাস ও মুখরোচক বর্ণনা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। এ পর্যন্ত সম্পাদিত প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের ফলাফল থেকেও এসবের কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি।

উপর্যুক্ত কিংবদন্তি ছাড়াও মহাস্থান গড়ের প্রত্ননিদর্শন নিয়ে স্থানীয় জনগণের মাঝে নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার বা মিথ প্রচলিত রয়েছে। এগুলো হলো :

১. স্থানীয় জনগণ এবং মহাস্থানে বেড়াতে অনেকেই বিশ্বাস করেন- মহাস্থানের মাটির নিচে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের সাড়ে তিন দিনের খাবার সংরক্ষিত আছে। তাই এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান।

২. সমগ্র মহাস্থান গড়টি হলো মহাস্থানের রাজা পরশুরামের গড়। আর গড়ের বাইরের প্রাচীরটি হলো-ভীমের জাঙ্গাল। ভীমের জাঙ্গালের মাটির নিচে সারা পৃথিবীর মানুষের দেড় দিনের খাবার আছে।[১১]

১০. খেরুয়া মসজিদ

খেরুয়া মসজিদটি শেরপুর উপজেলার দুই-তিন কিলোমিটার পশ্চিমে কুসুম্বী ইউনিয়নের টোলা নামক স্থানে অবস্থিত। বর্তমানে এই স্থাপত্যটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধিভুক্ত এবং রক্ষণাবেক্ষনাকৃত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়াতাকার এই মসজিদের পরিমাপ ১৭.৩৭ মি. ও ৭.৪৬ মি. এবং মসজিদের ৪ কোণায় রয়েছে ৪টি মজবুত টাওয়ার। প্রবেশের জন্য পূর্ব প্রান্তে রয়েছে খাড়া প্যানেলের ৩টি আয়াতাকার ফ্রেমের খিলানকৃত প্রবেশ পথ। প্রত্নফলকে লিখিত বিবরণ অনুযায়ী মসজিদটি ৯৮৯ হিজরী/১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে জনৈক মির্জা মুরাদ খান কাকশাল কর্তৃক নির্মিত লেখা থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে উক্ত ব্যক্তি তৎকালীন শাসক শ্রেণির লোক হওয়ায় তিনি নিজেকে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা রূপে নামফলক মসজিদে স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য ভিন্ন। তাদের ভাষ্যমতে, দীর্ঘকাল পূর্বে এ অঞ্চলে মুসলিম ধর্মসাধকদের বিচরণ ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক। তাঁদের পদচারণায় এ অঞ্চল ছিলো ধন্য, পরিণত হয়েছিলো পূণ্য ভূমিতে। ধর্মপ্রচার করতে এসে তাঁরা দেখেন উক্ত স্থানে নেই কোনো মসজিদ। তাই তাঁরা তাদের আর্জি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন এবং অলৌকিক শক্তি বলে এক রাতের মধ্যে এই স্থানে মসজিদ গড়ে ওঠে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাগণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং নিয়মিত ইবাদতে অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন তাদের আপদে বিপদে কিম্বা মনকাঙ্ক্ষা পূরণে এই মসজিদে নামাজ আদায় করলে বিপদ কেটে সুদিন আসে, এমনকি পূরণ হয় মনকাঙ্ক্ষাও এবং পরে মানত করা সিন্নি (রান্না করা বিশেষ খাবার) ও তবারক মুসল্লিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

www.pathagar.com

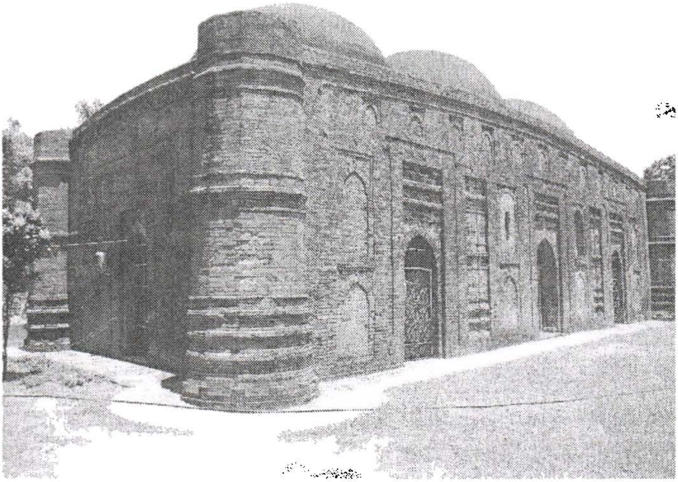

খেরুয়া মসজিদ

মসজিদটি নির্মাণের সময় এক ফকির এর তত্ত্বাবধান করতেন। একদিন আকাশ থেকে 'রকর্স ও কলত' নামে দুটো কবুতর উড়তে উড়তে এই ফকিরকে এসে বলে, 'আমরা পবিত্র মক্কা নগরী থেকে এখানে এসেছি থাকার জন্যে। আমাদের থাকার জায়গা এখানে হবে কি না তা আমরা জানতে চাই।' ফকির তখন কবুতরের সঙ্গে কথা বলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করার কথা দেন। ফকিরের প্রতিশ্রুতি পেয়ে কবুতর দুটি আবার উড়তে উড়তে চলে যায়। মসজিদটি নির্মাণ শেষ হলে এর কার্ণিশে (কবুতরের থাকার ঘর) দুই জোড়া কবুতর বাসা বাঁধে। এখনো এখানে কয়েক জোড়া কবুতর আছে।[১২]

১১. বিবির মসজিদ

খেরুয়া মসজিদের পশ্চিমে এবং গাজীর মাযারের দক্ষিণে বিবির মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদের উৎপত্তি সংক্রান্ত স্থানীয় মিথ বা কিংবদন্তি হলো :

শেরপুরের রাজা বলরামের ভগিনী গাজী শাহ মাদারের প্রতি প্রেমাসক্ত হন। কিন্তু রাজা বলরাম এটি মেনে নেন নি দেখে তার ভগিনী চিরকুমারী থেকে যান এবং মাদারের দরগার পাশে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এটিই বিবির মসজিদ। শাহ মাদার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নিজেও আজীবন চিরকুমার থাকেন।

এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কিংবদন্তিটি হলো :

শেরপুরের অদূরে কেল্লা পোষী নামক স্থানে গাজী কালুর সঙ্গে মুকুট রাজার যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মুকুট রাজা পরাজিত হয়। মুকুট রাজার মেয়ে চম্পাবতী যিনি গাজীকে ভালোবেসে ছিলেন এবং সেই ভালোবাসার যুদ্ধে গাজী জয়ী হলে যুদ্ধস্থলেই তাদের বিয়ে হয়। গাজী মারা গেলে গাজীর স্ত্রী চম্পাবতী তার দরগার দক্ষিণ পাশে এই মসজিদ নির্মাণ করে এখানে বসবাস করতে থাকেন।[১৩]

www.pathagar.com

১২. গাজী কালুর মাযার

শেরপুর শহরের অদূরে টোলা নামকস্থানে রয়েছে গাজী-কালুর মাযার। অনেকে এ মাযার কে শাহবেন্দগীর মাযারও বলে থাকে। এ মাযারকে কেন্দ্র করে অত্র এলাকায় প্রচলিত রয়েছে গাজী-কালু চম্পাবতীর কাহিনি। তাছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় রবিবার শেরপুরের অদুরে কেল্লা পোষী নামক গ্রামে গাজীর নামে তিন দিনব্যাপী বিরাট মেলা বসে। গাজীর বিয়ে উপলক্ষ্যে এ মেলা বসে বলে লোকপ্রবাদ। সে কারণে এ মেলাকে জামাই আদরের মেলা বলা হয়। প্রতিমাসের শেষ বৃহস্পতিবার গাজীর দরগা বা মাযার প্রাঙ্গণে মিলাদ ও ওরস হয়। সে সময় অনেকেই দরগায় মানত করে এবং সিন্নি দেয়।

গম্বুজাকৃতির গাজীর মাযারের ভেতরে দুটি কবর- একটি গাজীর এবং অপরটি গাজীর ভাই কালুর। গাজীর কবরের উত্তর শিথানে একটি লোহার থাম্বা আকৃতির পাথর বসানো আছে। অনেকেই বলে থাকেন এটি গাজীর হাতের লাঠি বা আশা। হাতি দিয়ে টেনেও এই আশা মাটি থেকে টেনে তোলা যায় নি। যে হাতিকে দিয়ে এই আশা টানানো হয়েছিল সেই হাতি নাকি এখানেই মারা গিয়েছিল। ঘটনাটি ৬০ থেকে ৭০ বছর আগের। যা হোক মাযার জিয়ারতে এসে অনেকেই এই আশা স্পর্শ করে চুমু খায়। এতে অনেক আশা পূরণ হয় এবং রোগ বালাই শুর হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

এদেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে সকল পরম পূজ্য হিসেবে সপ্তদশ শতক থেকে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে তাদের মধ্যে গাজী পীর উল্লেখযোগ্য। এই পীর কখনো গাজী জিন্দাপীর, কখনো বড় খাঁ বা গাজী সাহেব হিসেবে বিভিন্ন স্থানে পরিচিতি পেয়েছে। তবে বাঘের দেবতা হিসেবে এই গাজী পীর হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের লোকের কাছেই সমানভাবে পূজ্য। আর গাজী পীরের আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে- তার নামে পাশাপাশি একই সঙ্গে কালু এবং চম্পাবতীর নামটি জড়িত রয়েছে। বাংলার অন্য কোনো পীরের দোসর হিসেবে দু'একজন পুরুষের নাম যুক্ত থাকলেও কোনো নারী চরিত্রের নাম তেমনভাবে যুক্ত থাকতে দেখা যায় না। গাজী পীরের আখ্যানটি সে দিক দিয়ে ব্যতিক্রম। বৈরাট নগরের রাজা সেকেন্দার যুদ্ধে বলিবাজকে হারিয়ে কন্যা অজুপাকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে জন্ম নেয় সন্তান জুলহাস। জুলহাস চলে যায় পাতালপুরে। অজুপা আর এক পুত্রের জন্য আল্লার দরবারে কাঁদতে থাকেন এবং আল্লাহ কবুল করেন। জন্ম হয় গাজীর। গাজীর রূপ দেখে প্রথম পুত্রের শোক ভুলে যান তাঁরা। গাজীর বয়স দশ বছর হলে পিতা সেকেন্দার তাকে রাজ্যভার নিতে বলেন। কিন্তু গাজী অস্বীকার হলে ক্রুদ্ধ পিতা গাজীকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেয়। গাজী শরণাপন্ন হয় কোরআন শিক্ষাগুরুর কাছে। অতি অলৌকিক ক্ষমতার বলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পরও গাজীর সামান্য ক্ষতি হয় না। রাজা অবশেষে স্ব-স্বাক্ষরিত 'সুই' দরিয়ার পানিতে ফেলে দিয়ে গাজীকে সেই 'সুই' খুঁজে রাখার নির্দেশ দেয়। গাজী খোয়াজ খিজিরের সাহায্যে তাও এনে দেন। গাজী এক রাত্রে গোপনে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ভাই কালুসহ ফকির হয়ে যায়।

www.pathagar.com

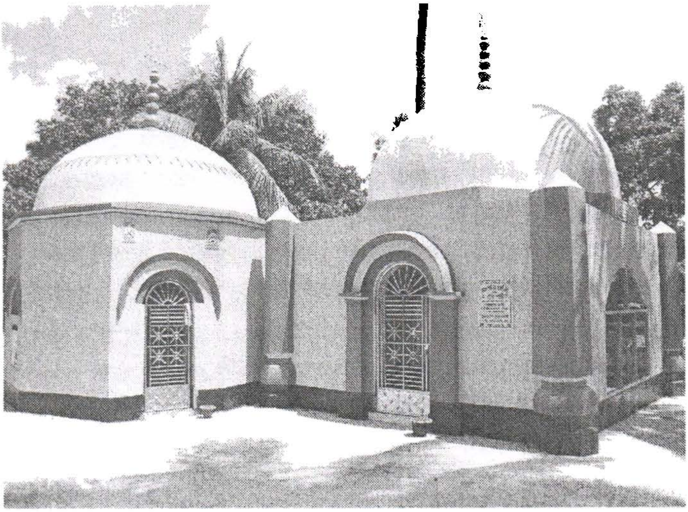

গাজী কালুর মাযার

নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরে গাজী কালু সুন্দরবনে এসে উপস্থিত হন। এখানে সুন্দরবনের বাঘ গাজীর মুরিদ হয়ে যায়। তারপর গাজী ও কালু 'আশা' ভর করে নদী পারে হয়ে আসে শ্রীরামপুরে। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দুই ভাই অন্ন লাভের আশায় শ্রীরাম রাজার দরবারে উপস্থিত হলেন। রাজা মুসলমানের হাক শুনে তাদেরকে রাজ্য থেকে বের করে দেন। কালুর অলৌকিক ইচ্ছা শক্তিতে রাজপুরীতে আগুন লাগে। দিশেহারা শ্রীরাম রাজা গত্যন্তর না পেয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

ভক্তগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাজী কালু চলে আসেন সাত কাঠুরিয়ার বনে। গরিব কাঠুরিয়াদের দুর্দশা মুক্ত করার জন্য গাজী ও কালু গঙ্গীর কাছে স্বর্ণের আবেদন জানায়। স্বর্ণ পেলে শাহ পীর ও বাহান্ন হাজার পরিকে দিয়ে বনের মধ্যে বন কেটে সহস্র দালান ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নাম রাখেন সোনাপুর। পরিরা চলে যায়। দুই ভাই পুরীটা ঘুরে ঘুরে এর নাম রাখেন সোনাপুর শহর।

এই সোনাপুর (শেরপুরের পূর্ব নাম) শহরে মসজিদে দুই ভাই পালঙ্কে ঘুমাচ্ছিলেন। 'কুকাফ' থেকে ছয় পরি ঘুরতে আসে সোনাপুর শহরে। গাজীর রূপ দেখে তারা মোহিত হয়। পরিগণ বহু বাগ-বিতর্কের পর গাজীর জন্য যোগ্য নারী হিসেবে মনোনীত করল ব্রাহ্মণ্য নগরের মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীকে। কথা মতো কাজও হলো- পরিরা গাজীর পালঙ্ক নিয়ে উড়াল দিল ব্রাহ্মণ্যনগরে। চম্পাবতীর পাশে গাজীকে ঘুমিয়ে রাখল। ঘুমের ঘোরে গাজীর হাত পড়ে চম্পাবতীর বুকে। চম্পাবতীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রথম দর্শনেই গাজীর রূপ দেখে চম্পাবতী বিমোহিত হয়ে যায়। পরিচয় হয় তাদের দুজনের। চম্পাবতী, তাঁর কুষ্টি দেখে নিশ্চিত হলো– গাজীই তার স্বামী হবেন। মুখের পান ও হাতের আংটি বদল করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দু'জনে আবার নিদ্রায় গেলে পরিরা গাজীকে নিয়ে সোনাপুর চলে আসে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে

www.pathagar.com

গাজী চম্পাকে তার পাশে না দেখতে পেয়ে সমগ্র অঞ্চলে খোঁজা-খুঁজি করতে থাকে। সময় পেরোয় এক পর্যায়ে কোথাও খুঁজে না পেয়ে গাজী পাগল হয়ে যায়। অবশেষে সন্ধান মেলে চম্পার। সন্ধান পাওয়া মাত্রই ভাই কালুকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠায় চম্পার পিতার নিকট। কিন্তু চম্পাবতীর পিতা মুকুট রাজ কালুর এহেন দুঃসাহসিক প্রস্তাবে রুষ্ঠ হয়ে ওঠে। কালু বন্দি হয় মুকুট রাজার হাতে। গাজী জানতে পেয়ে বনের বাঘ নিয়ে যুদ্ধে নেমে যায় মুকুট রাজ দক্ষিণ রায়ের সাথে।

শুরু হয় পীর আর দেবতার লড়াই। বাঘ ও কুমিরের লড়াইয়ে মুকুট রাজের শক্তির কাছে গাজীর প্রায় সর্বশক্তি হেরে যায়। গাজী গো-মাংস দিয়ে মুকুট রাজার মৃত্যুজীব কুপ ধ্বংস করে। আর আশা ও খড়ম দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গাজী মুকুট রাজাকে পরাজিত করে। পরাজিত রাজা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে এবং গাজী চম্পাবতীর বিয়ে দেয়। রাজপুরীতে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর গাজী, কালু ও চম্পাবতী পাতালপুরে জুলহাসকে নিয়ে বৈরাট নগরে চলে আসে পিতা মাতার কাছে। তাদের সুখের মিলন হয়।

উপর্যুক্ত কিংবদন্তি মতে- প্রতিশ্রুতি অনুসারে বছরে মাত্র একবার চম্পাবতী নিজ পিতৃগৃহে নাইওরে আসেন, সাথে আসেন তাঁর পতি গাজী পীর। শশুরালয়ে গাজীর জামাই আদরের কমতি থাকতো না, তেমনি কমতি থাকতো না কোনো প্রকার যত্ন-আদ্দির, ভোজন-রসনে সর্বাত্ম তুষ্ট করাই ছিলো মূল আরাধ্য। গাজীর আগমনে তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ ভক্তকুলের সমাগম ঘটতো অত্র অঞ্চলে। কালের পরিক্রমনে আজও বছরের ঐ একই সময় পরিধিতে স্থানীয় জনগন তাদের পরিবারের জামাই-ঝিদের নাইওরে আনে এবং তাদের যত্ন-আদ্দির মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকরীতির ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। আজও যে স্থানে গাজী তাঁর প্রথম বিজয় নিশান উড়িয়েছিলেন এবং যুদ্ধকালীন অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানেই বসে এ মেলা। কেল্লা-পোষী মেলা নামে পরিচিত মতান্তে জামাই মেলা নামেও অভিহিত হতে দেখা যায়।

১৩. মাদার পীর সম্পর্কিত কিংবদন্তি

অন্য আরেক কিংবদন্তি হলো মাদারপীরের থানকে কেন্দ্র করে এ মেলার উদ্ভব। মাদার পীরকে গবেষকগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করে বলেছেন- মাদার পীরের আসল নাম বদি আল দীন, শাহ মাদার তার উপাধি। তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আবু ইসহাক শামী। বলা হয়ে থাকে তিনি হজরত মুসার ভাই হযরত হারুনের বংশধর। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। লোকে তার মুখশ্রী দেখে বিভোর হয়ে যেতেন। এ কারণে তিনি নাকি মুখোশ পরে থাকতেন। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং সুলতান ইব্রাহিম শর্কির রাজত্বকালে তিনি ১৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কানপুরের মকনপুরে দেহত্যাগ করেন। তার অলৌকিক মাহাত্ম নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ প্রচুর সাহিত্য সৃজন করেছে। শুধু তাই নয়, এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে তার স্মরণে নানা ধরনের উৎসব-পার্বণ বা লোকাচার, কৃত্যানুষ্ঠান ও নাট্যগীতের অভিনয় পরিবেশিত হয়ে থাকে।

মাদার পীরের আখ্যান হতে জানা যায়- একদিন আল্লাহ ফেরেশতাদের নিয়ে সভায় বসেছিলেন। সভায় আল্লাহ'র সার্বক্ষণিক বন্দেগিতে ন্যস্ত ফেরেশতাগণ

www.pathagar.com

অভিযোগ করলো যে কোন আদমকে তাদের থেকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আল্লা তখন তাদের বললো যে, আদমের মধ্যে যে নূর আছে তার এক জাররা (অংশ) তোমাদের মধ্যে গেলে তোমরা আমাকে ভুলে যাবে। হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতা আল্লাহর এই কথা অস্বীকার করলে আল্লাহর নির্দেশে ঐ দুই ফেরেশতাকে ইরাকের বাবল শহরে নির্বাসনে রেখে আসে হযরত জিবরাইল। মর্ত্যে মানুষের সাথে তারা ওঠা বসা, চলাফেরা এবং খাওয়া দাওয়া করতে থাকে। মানুষের খাবার খেতে খেতে এক সময়ে তাদের শরীরে এশকো (কাম আসক্তি) শুরু হলো। কাম আসক্তিতে উন্মত্ত দুই ফেরেশতা তখন ঐ শহরের জোহরা বিবি নামের এক মেয়ের নিকট গিয়ে প্রেম আলিঙ্গন ভিক্ষা চায়।

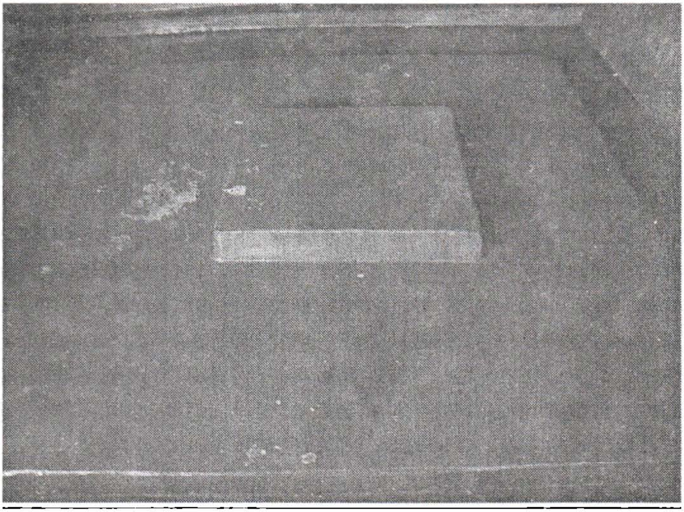

মাজারের থান

ফেরেশতা দুজনের কথা শুনে জোহরা রাজি হয়, কিন্তু তিনটি শর্ত সাপেক্ষে। যার মধ্যে তিন নম্বর শর্তটি ছিল যে এসমে আজম পড়ে তারা স্বর্গ মর্ত্যে যাতায়াত করে তাই শিখিয়ে দিতে হবে। হারুত মারুত এতে রাজি হয়ে এসমে আজম শিখিয়ে দেয়। তখন বিবি জোহরা হারুত মারুতকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে চলে গেলো, আর তারা পরে রইল মর্ত্যে। তাদের উভয়ের মাঝে কাম উদ্রেগ অতিমাত্রায় সঞ্চারিত হলে তারা দুইজন উভয়ের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় আর এই সঙ্গমে হারুতের উদর হতে একটি রক্ত দলা পড়ে যায়। এই ঘটনায় হারুত মারুত দুইজন ভয় পেয়ে যায় এবং তাদের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে। তখন আল্লাহর নিকট থেকে হুকুম এল যে, হাসরের ময়দানে তারা ক্ষমা পেলেও যত দিন কেয়ামত না হচ্ছে ততদিন দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর ঐ রক্ত পিণ্ডটি একটি ফুলের রূপ দিয়ে পৃথিবীতে রেখে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

এদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আমলে এক বিচারক ছিল নাম ওমর কাজী। আবু শামা নামে তার ছিল এক পুত্র। একদিন তিনি মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে একটি সুন্দর ফুল দেখতে পেয়ে যখনই ফুলটির ঘ্রাণ নিল অমনি ফুলটি উধাও হয়ে গেল এবং তার শরীরে তীব্র কাম উত্তেজনা শুরু হল।

আবু শামা তখন পাশের জঙ্গলে পিঞ্জিরা বিবি নামে এক সুন্দরীর সাথে মিলিত হয়। কিন্তু আবু শামার এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিচারে ওমর কাজী তার ছেলেকে ১০০ দোররা মারার হুকুম দেয়, আর পিঞ্জিরা বিবির গর্ভে সন্তান থাকায় তাকে দোররা মারা হয় না। গর্ভাবস্থার আট মাসের সময় সন্তানটির জন্ম হয়। পিঞ্জিরা বিবি তখন তার সন্তানটিকে একটি সুন্দর রুমালে করে বেধে গহীন বনের গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে আসে।

এ ঘটনা স্বপ্নে দেখতে পেলেন মা ফাতেমা। তিনি তখন হযরত আলীকে বললেন যে, হুজুর আপিন শিকারে গিয়ে একটি সুন্দর রুমালে পাবেন, ঐ রুমালটি আমাকে এনে দিতে হবে। কথা মত আলী শিকারে গিয়ে রুমালটি নিয়ে এসে ফাতেমার নিকট দেয়। ফাতেমা তখন ঐ রুমালটির মধ্যে থেকে সন্তানটিকে উদ্ধার করে তাঁর জিহ্বার লালা চুষে খাইয়ে খাইয়ে সন্তানটিকে বড় করে তোলে। এইভাবে সন্তানটি বড় হয়। ওখানে তার কিছু শিক্ষাদীক্ষা হওয়ার পর ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়। ঘুরতে থাকে এদিক সেদিক চুল দাড়ি বড় হয়ে পাগলা ফকির এর মত হয়ে যায়। এ অবস্থায় তার সাথে দেখা হয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে। তিনি তাঁর এই অবস্থা দেখে চুল দাড়ি কাটতে বলে। কথামতো মাদার তাঁর সাথে চুল কাটতে গেলো। কিন্তু চুল কাটতে গেলে প্রতিটি চুল থেকে রক্ত বের হতে লাগল।

এই অবস্থা দেখে তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, "তুমার নাম গুরু জিন্দা শাহ মাদার'। অর্থাৎ পশম জিন্দা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকটও তার কিছু শিক্ষাদীক্ষা হওয়ার পর মাদার ঘর ছেড়ে বের হয়ে ঘুরতে থাকে পথে পথে, আর ভাবে গুরু সত্যের ফকিরির জন্য ভক্তের দরকার। এই ভেবে মাদার চলে আসে গড়মড় শহরে।

সেখানের বাদশা নিঃসন্তান, তার বাড়িতে এসে দম....দম....বলে জিকির করলে বাদশা বেরিয়ে আসে এবং জানতে চায় সে কি চায়। তখন ফকির মাদার জানায় তার সিঃসন্তান ঘরে দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, তবে শর্ত হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটিকে তাকে দিতে হবে। একথায় বাদশা রাজি হয় এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে দুটি সন্তান লাভ করে। একটির নাম শেখ ফরিদ এবং অন্যটির নাম শেখ জুমল। সন্তান জন্মের আড়াই দিনের মাথায় মাদার একটি সন্তান আনতে গেলে বাদশা মিথ্যে বলে যে, সন্তান হয়েছিল কিন্তু দুটো সন্তানই মারা গেছে।

একথা শুনে মাদার ফিরে চলে যায়, কিন্তু মাদার কিছু দূর যেতে না যেতেই বাদশা গিয়ে দেখে সন্তান দুটোই মারা গেছে। তখন সবাই ছুটে গিয়ে মাদারকে ধরে নিয়ে এসে কান্নাকাটি করে এবং তার কাছে ক্ষমতা ভিক্ষা চায় এই বলে, "হুজুর, আগে যদি জানতাম আমি তুমি মাদার পীর, আগে দিতাম দুধ কলা পিছে দিতাম ক্ষির।"

www.pathagar.com

"তুমি বাবা জিন্দা শাহ মাদার আমার ছেলেকে তোমার ভালো করে দিতেই হবে। সকলের কান্নাকাটিতে মাদার সন্তান জিন্দা করে দেয় এবং শর্ত অনুযায়ী সুন্দর ছেলেটিকে দিতে বলে কিন্তু বাদশা আবারও চালাকি করে এবং কালো ও খুতসহ ছেলে জুমলকে তার হাতে তুলে দিয়ে বলে যে এইটিই তার সবচেয়ে সুন্দর ছেলে। মাদার এবারও বাদশার চালাকি বুঝতে পারে কিন্তু এবার সে কিছু না বলে জুমলকে নিয়ে চলে যায়।

এদিকে শিশু জুমল দুধ খাবে বলে চিৎকার করলে মাদার রাখালের নিকট থেকে দুধ নিয়ে এসে জুমলকে দেয়। কিন্তু যতই দুধ দিচ্ছে ততই খেয়ে নিচ্ছে। মাদার অবাক হয়ে ভাবছে এত দুধ সে কোথায় পাবে। তখন তার জিহ্বা জুমলের মুখে দিয়ে জিব চুষে খাওয়ায়। এরপর থেকে জুমলের আর কোন খিদে লাগল না। এবার মাদার জুমলকে নিয়ে ফকির হয়ে পথে পথে বেড়িয়ে পড়লো এবং দিকে দিকে তাঁর অলৌকিক শক্তি বলে সৃষ্টি হতে লাগলো অসংখ্য ভক্ত-মুরিদ।

লোকধর্মের এ আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর অসামান্য সাধনাবলে সাধারণ মানুষের মাঝে বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে লোকসমাজে আবির্ভূত হন এবং সকল প্রকার রোগ-জরা পক্ষাঘাতের বলয় থেকে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করেন। আবার পূর্ণ করেন মানতকারির অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাও। এতোসব অভূতপূর্ব কর্মের আকর্ষণে স্থানীয়তো বটেই দূর-দূরান্তের নানা প্রান্ত থেকে আগমন ঘটে ভক্তকুলের। এই আগমনে অত্র অঞ্চল পরিনত হয় মিলন মেলায়। আর এই আয়োজনে মাদার পীরের লালবরণ নিশান ও থানকে কেন্দ্র করেই কেল্লা- পোষী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার মূল আকর্ষণ স্থানীয় ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে কাঠের আসবাবপত্র এবং মৃৎপাত্রের সমাহার। মেলার মৌসুমি ফলের বিচিত্র সমাহারও লক্ষ করার মত। আম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, আনারস, কমলা ইত্যাদি ফলের পসরা চোখে পড়ার মত। সুসজ্জিত মিষ্টির দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়াও লোহার তৈরি তৈজসপত্র ও কৃষি উপকরণ গৃহিণী এবং কৃষকদের কাছে খুবই প্রিয় বস্তু। তাই তারা তাদের গৃহস্থালী এবং ক্ষেতের পেশাগত উপকরণাদি সারা বছরের জন্য এখান থেকেই সংগ্রহ করে রাখে। মেলায় বিনোদনের উৎসের কমতি থাকে না– থাকে নাগরদোলা, পুতুলনাচ, যাত্রা, সার্কাস আরও থাকে দেশের নানান প্রান্ত থেকে আগত লোকশিল্পীদের উপস্থাপনা। চলে সারা দিন-রাত। শেরপুর উপজেলা বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানে যাতায়াতের সুব্যবস্থাও বর্তমান। শেরপুর সদর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরত্বে কেল্লা-পোষী মেলার অবস্থান হওয়ায় ভ্যান, রিকসা, কিংবা হালআমলের ব্যাটারী চালিত অটোরিকশায় খুব সহজেই মেলায় পৌছানো যায়।

মেলার প্রচলন এবং থানের পাশাপাশি স্থানীক ঐতিহ্য যুক্ত হয়েছে শতবর্ষী বট-পাইকর গাছের বিবাহ অনুষ্ঠান। নানান আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। গ্রামবাসীর মতে বট ও পাইকর গাছদুটি জন্মলগ্ন থেকে একে অপরের শরীরে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে একই সাথে বেড়ে উঠেছে। যা কি-না গাজী ও চম্পাবতীর চিরন্তন

www.pathagar.com

মেলবন্ধনের প্রতীক– তাই তারা গাছ দুটিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এই মেলার স্থানে আরও দুটি বটগাছ রয়েছে। গ্রামবাসীর বিশ্বাস এ গাছ দুটি গাজীর ছোট ভাই কালু এবং মাদারপীরের প্রতীক হয়ে থানকে পাহাড়া দেয়।

২০০ বছর যাবত এ মেলার মালিকানার উত্তরাধীকার সূত্রে বর্তমানে মোঃ কানু মিয়া গাজীর থানের মতান্তরে মাদারপীরের থানের রক্ষণাবেক্ষণে তথা খাদেমদারী করছেন। তাঁর ভাষ্যমতে সাত পুরুষ পূর্ব থেকে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। পালন করতে হয় সকল রীতি-রেওয়াজ।[১৪]

ঘ. লোকপুরাণ

১. বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনি

বেহুলার বাসরঘর নিয়ে এখানে প্রচলিত আছে বেহুলা কাহিনি। সে কাহিনি ছাপার হরফে হরেক রকমের পুস্তিকাকারে দেদারছে বিক্রি হয় এখানে বেড়াতে বা মানত করতে আসা শত শত দর্শনার্থীর কাছে। বাসরঘরের গেটের সামনে বেহুলার বাসরঘর, হযরত শাহসুলতান বলখীর মহাস্থান বিজয় কাহিনি নিয়ে ছাপানো পুস্তিকা দোকানই গড়ে ওঠেছে সাতটি। এছাড়াও মুদির দোকানে এবং গেটের ভেতরে অস্থায়ীভাবে চারটি বইয়ের দোকান বসে প্রতিদিন। কিছু হকার ব্যাগের মধ্যে করে বই নিয়ে বাসরঘরে বেড়াতে আসা দর্শনার্থীদের পিছে পিছে ঘুরে বেহুলা কাহিনি বলে আর ব্যাগ থেকে ছোট পুস্তিকা বের করে মেলে ধরে। কোনো বই সাদা কালো ছাপা দাম পাঁচ টাকা, কোনো বই রঙিন মলাটে ছাপা। ভেতরের রঙিন বা সাদা কালো হাতে আঁকানো ছবি। সব বইয়ের পৃষ্ঠা প্রায় সমান (২০/২৫ পৃষ্ঠা) এবং একই কাহিনি কিন্তু লেখক ভিন্ন ভিন্ন। এ কাহিনিই আবার রেকর্ড করে সিডি আকারে বিক্রি হচ্ছে একটি দোকানে।

দোকানি লালমিয়া (২৪) জানালেন বেহুলার বাসরঘরের এই কাহিনি পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে প্রথম বিক্রি শুরু করেন মহাস্থানের স্থানীয় কবি- তবিবর রহমান। তারপর আবদুস সাত্তার। তবিবর সাহেব মারা যাবার পর গত কয়েক বছর ধরে তারই কাহিনি সামান্য একটু এদিক সেদিক করে প্রায় দশ বারোজন স্থানীয় ব্যক্তি তাদের নিজেদের নামে পুস্তক ছেপে বিক্রি করছেন। দিনে প্রায় এক দেড়শ পুস্তক বিক্রি হয়। শুক্রবারে বেশি বিক্রি হয়। যেহেতু তবিবর রহমানই এখানকার কাহিনির মূল লেখক সে কারণে তার কাহিনিটিই আমরা এখানে উপস্থাপন করলাম :

গোকুল মেড় হইতে কিছুদূরে চাঁদসওদাগর বা চন্দ্র বণিকের বাসগৃহ। ঐশ্বর্যশালী এই বণিক শিবের ভক্ত। শিবপূজা করত। কিন্তু নাগকন্যা মনসা দেবীর আক্রোশ চাঁদসওদাগরের প্রতি। তার মনোবাসনা জাগে চাঁদসওদাগর কর্তৃক পূজা নেওয়ার। প্রত্যাশা করে সে সংবাদ পাঠায় সওদাগরের কাছে। চাঁদসওদাগর তাহার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সে পণকরে কোনভাবেই মনসা পূজা করিবে না। মনসা সাপ, ব্যঙ ভক্ষণ করে। কঠোর শিবভক্ত তার পূজা দিতে পারেন না। অনেক চেষ্টা করে মনসা। তাহার রোষানলে চাঁদসওদাগর। প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়া ওঠে মনসার মনে। সে নিজেই সওদাগরের গৃহে গমন করেন। চাঁদসওদাগরকে তাহার পূজা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে অটল চাঁদসওদাগর মনসা দেবীকে হেমতালের ডাল দিয়া বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ক্ষিপ্ত মনসা সওদাগরকে অভিশাপ দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে (চাঁদসওদাগর) দেবী মনসার পূজা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সওদাগরের বংশ নির্বংশ হইতে থাকিবে। মনসা মঙ্গলের পৌরাণিক কাহিনিতে বর্ণিত আছে- সর্পের দেবী মনসা, শিব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চাঁদসওদাগরের কাছে পূজা লইতে আসিয়াছিলেন। কারণ চাঁদসওদাগর পূজা দিলে পৃথিবীর বুকে মনাসপূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আনুমাণিক খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে ১২শ' শতাব্দীর মধ্যে বহুল প্রচলিত ও সর্বস্তরের মানুষের আরাধ্য বেহুলা-লক্ষিন্দর মেড়টি নির্মিত হয়। বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনি বলিতে গেলে পদ্মাদেবীর কথা চলিয়া আসে।

পদ্মবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ইহার নাম পদ্মা। এই দেবী বিষহরী নামেও বিশেষ পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

প্রসঙ্গত উলেখ থাকে যে, কথিত আছে এই কালিদহ সাগর ঐতিহাসিক একটি সাগর। শ্রীরাম চন্দ্র এই সাগর হইতে একশত একটি নীলপদ্মা সংগ্রহ করিয়া, তাহার প্রাণপ্রিয় পত্নী সীতাকে উদ্ধারের জন্য ভারত সাগর উপকূলে বসিয়া প্রথম দূর্গোৎসবের আয়োজন করিয়া ছিলেন। মনসা দেবীর সম্পর্কে জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, তাহার সর্বমোট আটটি সর্প সন্তান ছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক একদা তাহার বাসভবন খনন করা হইলে একটি প্রস্তর মূর্তি এবং কিছু ইস্টক মূর্তি পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রস্তর মূর্তিতে আটটি সর্প এবং প্রতি মূর্তিতে একটি করিয়া সর্পমূর্তি তাহার মস্তকে ফণা তোলা অবস্থায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে।

পদ্মাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত লইয়া নানা কাহিনি প্রচলিত রহিয়াছে।

মহাদেব শিব একদা কৈলাস ভ্রমণে যাইতেছিলেন। ইহা হিমালয়ের পর্বত। যাহা শিবের বাসস্থান হিসেবে পরিগণিত হইয়া থাকে। পথে বিশ্রাম লইবার নিমিত্তে তিনি কালিদহ সাগরের তীরবর্তী এক স্থানে উপবেশন করেন। ঘটনাক্রমে তার স্ত্রী পার্বতীর কথা তাহার স্মরণ হইলে বীর্য স্খলন হয়। মহাদেব সেই স্খলিত বীর্য সংরক্ষণের নিমিত্তে সাগরের একটি পদ্মপাতার উপর তাহা রাখিয়া যান। এদিকে একটি পক্ষী সেই বীর্য খাইয়া ফেলে। পরবর্তীতে পক্ষীর ডিম্ব প্রসব করে। ঘটনাচক্রে তাহা পাতালপুরীতে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই ডিম্ব হইতে পদ্মা দেবীর জন্ম বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে।

পদ্মা দেবী বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে জানিতে পারে সে পাতালে 'বাসুকি' নামক একজন নারীর কাছে দিনাতিপাত করেন। বাসুকি ঘটনাক্রমে জানিতেন পদ্মাদেবীর পিতা হইল শিব। পদ্মার কথা শিবও জানিতে পারিলেন। তিনি দেবতাদের নিমন্ত্রণ সভায় পদ্মাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। মনসাদেবী দেবপুরীতে গেলেন, নিমন্ত্রিত ছিল অনেকেই। নিমন্ত্রণ সভায় পদ্মা দেবী বলিলেন, আপনি দেবতাকুলের দেবতা। সকল দেবের দেবতা। প্রথামতে আমারও মানবকুলের পূজা পাইবার যোগ্যতা রহিয়াছে। আমি তাহা পাইতে চাই। নরলোকেও জন্মিয়াছি। মহাদেব শিব তখন বলিয়াছেন যদি চাঁদসওদাগর নামক ব্যক্তি তোমায় পূজা দেয় তবেই সকল নরকুল তোমার পূজা দিতে সম্মত হইবে, কারণ শিব দ্বারা চাঁদসওদাগর 'হেমতাল' প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরই একটি গুণ ছিল যার গন্ধে

www.pathagar.com

সর্পকুল কাছে আসিতে পারে না। (হেমতাল এক ধরনের গাছ, যা পানের বরজে দেখা যায়) এছাড়াও শিবের আশীর্বাদে চাঁদসওদাগর 'মহাজ্ঞান' শক্তির অধিকারী হইয়াছিল বিধায় যে কোন সর্পকাটা রোগীকে তিনি নিরাময় করিতে পারিতেন। আবার ওঝা ধন্বন্তরী নামক প্রসিদ্ধ ওঝাও তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাই মনসা দেবীর জন্য চাঁদসওদাগরের বা নরকুলের পূজা পাওয়া অসম্ভব ছিল।

চাঁদসওদাগর তাহার ত্রিলোচন, দিগম্বর, হরিহর, কৃষ্ণাদাস, বিষ্ণুদাস, গুণ্যকর নামের সাত পুত্রকে লইয়া বাণিজ্যতে গেলে পদ্মাদেবীর রোষানলে পড়িয়া তাহারা সমুদ্রতে চৌদ্দসঙ্গীসহ নিমজ্জিত হয়। সওদাগর ফিরিয়া আসে। কিন্তু চাঁদসওদাগরের সন্তানদের সলির সমাধি হয়। মনসা দেবীর রোষ লুপ্ত হয় না। একদা চাঁদসওদাগর ও সনকা (সনুকা) রানির সপ্তম পুত্র লক্ষিন্দরের জন্ম হয়। অন্যদিকে মুক্তেশ্বর ওরফে বাসু বানিয়ার ঘরে ছয়পুত্র এক কন্যা। এই কন্যাই বেহুলা সুন্দরী।

কথিত আছে, চাঁদসওদাগর তাহার পুত্র লক্ষিন্দরের জন্য বাসু বেনের মেয়েকে বিয়ে করাইয়া পুত্রবধু গৃহে আনায়ন করিতে চাহিলেন। কিন্তু মুক্তেশ্বর তাহার কন্যাকে চাঁদসওদাগরের পুত্রের নিকট কন্যা সম্প্রদায় করিতে রাজি হইলেন না।

এদিকে পদ্মাদেবী বেহুলা সুন্দরীকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জানাইয়া দিলেন লক্ষিন্দরকে পতি হিসাবে বরণ করিতে। বেহুলা প্রাতঃকালে তাহার পিতার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে বাসু বেনে তাহাতে রাজি হইলে উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই পরিণয় সহজ ছিল না। বিবাহের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই নানাবিধ সমস্যা উপস্থিত হইতে লাগিল। সওদাগরকে মনসাও ভীতি ও তাহার দম্ভ দেখাইতে লাগিল। বাসু বেনে এবং সওদাগর যৌথভাবে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে লোহার বাসর ঘর বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করলে দেবী আরো হিংসাপরায়ন হয়ে ওঠে। কথিত আছে এক রাত্রে লোহার বাসরঘর নির্মিত হইয়াছিল। চাঁদসওদাগর ধুম্র দিয়া পরীক্ষা করাইলেন। বিশ্বকর্মা পুরস্কৃত হইয়াছে। সে বাড়ি ফিরিবার সময় পদ্মাদেবী তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার নাগ সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। দেবী রাগিয়া বিশ্বকর্মাকে নির্বংশ হইবার ভয় দেখাইলেন।

রাত্রিতে বিশ্বকর্মা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, নির্বংশ হইবার। সে ভীত হইয়া অস্ত্র লইয়া বেহুলা-লক্ষিন্দরের জন্য নির্মিত বাসর ঘরে যাইয়া গোপনে দুইটি চুলের মতো সরু ছিদ্র করিয়া রাখিল। কেউ যাহাতে উহা দেখিতে না পায়। তাই সে হরিতাল দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিল। চাঁদসওদাগর শব্দ শুনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলে চতুর বিশ্বকর্মা তাহাকে কোনরূপ যুক্তিতর্কে বুঝাইয়া উপহারসামগ্রী লইয়া বাড়িতে রওনা হইল।

বিবাহের রাত্রিতে নাগ সৈন্যদিগকে ডাকিয়া পদ্মাদেবী তার পরিকল্পনা জানাইলেন এবং তাহার হুকুম তামিল করিবার ইচ্ছুক কোনো নাগকে আগ্রহী দেখিতে চাহিলেন। কথিত আছে, এই আদেশ জারি হইবার পর এনি সাপ মাথা উত্তোলন করিয়া যাইতে সম্মত হইলে তাহাকে আড়াই তোলা বিষ মাকিয়া এক তোলা কলেকুটসহ নানা কৌশল দেখাইয়া দিয়া সফল হইবার শিক্ষা দিয়া তাহাকে বেহুলা-লক্ষিন্দরের বাসর ঘরে প্রেরণ করিলেন। এনি সাপ পথিমধ্যে মাছের গন্ধ শুকিয়া মাছ ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল।

www.pathagar.com

মাছের নেশায় বিভোর এনি সাপের পুচ্ছ ধরিয়া ছুড়িয়া মরিল। কালকুট তার নিকটে রক্ষিত কালকুট বিষ খুঁজিয়া পাইল গোবরের কাছে। গোবর শুকিয়া নেয়। এনি সাপ ভীত হইয়া পদ্মাদেবীর নিকট গেলে তিনি রাগন্বিত হইয়া সর্পের মস্তক আর লেজ ধরিয়া ছুরিয়া মারে, কথিত আছে, ইহার পর হইতে এনি সাপের মস্তক ও পুচ্ছ পেট অপেক্ষা সরু।

পদ্মাদেবী ইহার পর তাহার সর্প সন্তানদিগকে ডাকিয়া আবার আদেশ দিলে এইবার একটি ঢেড়া সাপ লোহার বাসর ঘরে যাইবার প্রস্তুত হইলে দেবী কী ভাবিয়া কালনাগকে এই দায়িত্ব দিলে কালনাগ তাহার কার্যসিদ্ধিতে গন্তব্যে চলিয়া যায়। কালনাগ ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া আসে। কারণ বিনা দোষে কালনাগ কাহাকেও দংশন করে না। পদ্মাদেবীর রোষে পড়িয়া কালনাগ পুনরায় ঐ বাসর ঘরে যায়। এবার কার্যসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ একটি মশক (মশা) কে সঙ্গে প্রেরণ করে। জয়তুন তেলে বাসরঘর আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষিন্দর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মশক একবার, দুইবার, তিনবার করিয়া ঘুমন্ত লক্ষিন্দরকে দংশন করে। ঘুমন্ত লক্ষিন্দরের পায়ের নিকট কালনাগ বসিয়াছিল। লক্ষিন্দর মশকের দংশনের জ্বালা সইতে না পারিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে পায়ের নিকট বসা কালসাপের মস্তকের উপর তাহার পা দিয়া আঘাত করিয়া বসেন। কালনাগ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষিন্দরের বামপায়ে ছোবল হানিল। জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, পতিব্রতা বেহুলা সুন্দরীর বাসর রাত্রে সিঁথির সিদুর মুছিয়াছিল বলিয়াই কালনাগের শিষে আজও বেহুলার সিঁথির সিঁদুর দেখিতে পাওয়া যায়। মশক ও কালনাগ লোহার বাসর ঘরের সূক্ষ্ম দুইটি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। বেহুলা কিছুই টের পায় না। পদ্মাদেবীর আছড়ে নিদ্রাদেবীর প্ররোচনায় বেহুলা সহ বাসরঘরের বাহিরে অবস্থানরত প্রহরীগণও গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া রহিয়াছে।

লক্ষিন্দর যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া শয্যা হইতে নিচে ঢলিয়া পড়িল। বেহুলা সুন্দরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কী এক দুঃস্বপ্নে। সে আর্তনাদ করিয়া জাগিয়া দেখিল লক্ষিন্দর ভূমিতে পতিত। চিৎকার করিয়া বেহুলা সকলকে ডাকিল। বাসুয়া বেনে, চাঁদ সওদাগরসহ অনেকেই ছুটে এল। বেহুলা তার মৃত স্বামীর দেহ লইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পুত্রহারা শোকে চাঁদসওদাগর তাহার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বেহুলা শ্বশুরের নিকট তাহার স্বামীর মৃতদেহ চাহিয়া লইলেন। বিশ হাত লম্বা একটা ভেলা তৈরি করাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইলে তাহার পিতা ও শ্বশুর ভেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কথিত আছে যাইবার প্রাক্কালে বেহুলা এক মুষ্টি সিদ্ধ ধান তাহার শ্বশুরকে দিয়া বলিল, এই ধান বুনিলে যদি তাহা হইতে গাছ হয়, তবে বুঝিবে স্বামী ধন লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিব এবং একটি লোহা নির্মিত পুঁটি মাছ চিনামাটির পাত্রের জলে ডুবাইয়া দিয়া কহিল ইহা যদি কখনো স্বাভাবিক পন্থায় জলে সাঁতার কাটে তবে বুঝিবে স্বামী ধন লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিব।

কোনোরূপ কাহারো সাহায্য না লইয়া বেহুলা একাকী তাহার স্বামীকে লইয়া রওনা হইল। পথিমধ্যে চলারকালে তোই ধোপানী নামের একজন ধোপানীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। এই ধোপানীর পিতার নাম শিব। শঙ্খমুণি তাহার স্বামীর নাম। তাদের ধনা নামক দুষ্টু সন্তান ছিল ধোপানী দেবালয়ের দেবতাদের পোশাক পরিচ্ছেদ ধৌত

www.pathagar.com

করিত। সে পদ্মাদেবীর বোন ও পরামর্শক হিসেবেও কাজ করিত। মহাস্থানগড়ের মাইল খানেক দক্ষিণে নেতাই ধোপানীর ধাপ (স্থান) অবস্থিত। এখানে কাপড় কাঁচার সান বাঁধানো চাড়ীও (পাটাতন) ছিল। কালের গর্ভে তা হারাইয়া গেছে। সংরক্ষণের অভাবে তাহা বিলুপ্ত। এই নেতাই ধোপানীর ঘাটে সে অন্যদিনের মতোই কাপড় ধৌত করিবার সময় তাহার সন্তানকে পিঁড়ির (বসিবার কাঠের উঁচু তক্তা বিশেষ) নিচে ফেলিয়া কাপড় ধৌত করছে এবং সেই মৃত সন্তানটিকে কি এক যাদুর কাঠির স্পর্শে তাহার মৃতসন্তানটিকে জাগাইয়া লইয়া কাপড় কাঁচা শেষে বাড়ি ফিরিয়া চলিল। বেহুলা আরও দেখিল এই নারী বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী। সেইমত সে নেতাই ধোপানীকে হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া দেবালয়ে যাইবার অনুমতি আদায় করিল। তাহার নিকট হইতে দেবতাকুলের কাপড় ধৌত করিবার অনুমতি লইয়া কাপড় ধৌত করিল এবং দেবালয়ে পৌঁছিল। শিব সেদিনকার পরিষ্কার কাপড় দেখিয়া মুগ্ধ হইল। জানিতে পারিল এক অপরূপ নর্তকী নেতাই-এর নিকট আসিয়াছে। শিব খুশি হইয়া নৃত্য দেখিতে চাহিল এবং ঘোষণা করিল মুগ্ধ করিতে পারিলে সে যাহা চাইবে তাহাই প্রদান করিবে। বেহুলার নৃত্য দেখিতে দেবালয়ের সকল দেবতা উপস্থিত হইল। শুধুমাত্র পদ্মাদেবী অসুস্থতার ভান করিয়া গৃহে রহিয়া গেল। সে তার ক্ষমতাবলে জানিতে পারিয়াছিল নর্তকী সম্বন্ধে।

অবশেষে আনন্দঘন পরিবেশে বেহুলার নৃত্য পরিবেশিত হইল। পদ্মাও উপস্থিত ছিল। বেহুলা শিবের কাছে তাহার প্রাপ্য চাইলে পরে অনেক বাক-বিতণ্ডার পর দেবগণ দেখিল কী কারণে এত সব ঘটনা ঘটেছিল তাহার শ্বশুর চাঁদসওদাগরের জীবনে। শেষে দেবগণ দেখিল পদ্মাদেবীর রোষাণলে পড়েছে বেহুলা-লক্ষিন্দর। তাহার উপরই ন্যাস্ত হইল লক্ষিন্দরকে পুনরায় জীবিত করার। বেহুলা কৃতজ্ঞচিত্তে পদ্মাদেবীকে প্রতিজ্ঞা করিল সে তাহার শ্বশুরকে দিয়ে পদ্মাদেবীর পূজা দিতে বাধ্য করিবে।

সকল কথা শুনিয়া পদ্মাদেবী রাজি হইল। বেহুলা দীর্ঘ ছয়মাসের মৃত স্বামীকে পদ্মাদেবীর সম্মুখে নিয়া আসিলে দেবী তাহার মন্ত্রে লক্ষিন্দরকে আবার জীবিত করিয়া তুলিল। বেহুলা তাহার স্বামীর অন্য ভাইদেরও জীবিত করিবার ও তাহাদের ধনসম্পদ ফিরাইয়া দিতে অনুরোধও করিল। অতঃপর সকল উদ্ধার হইল। সপ্তডিঙ্গায় পৌঁছে কালীদহ সাগর পার হইয়া চম্পক নগরে নৌকা ভিড়িল। ঘাটে উপস্থিত সকলে তখন পদ্মাদেবীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। চাঁদসওদাগরও নমনীয় হলো এবং ঘোষণা দিল ব্যাঙ খেকো পদ্মাদেবীকে তিনি ডান হাতে নয় বাম হাতে পূজা দিবে। পদ্মাদেবী তাহা জানিতে পারিলেন। চাঁদসওদাগররে নিকট হইতে যখন ফুল ডান হাত হইতে বাম হাতে লইতে যাইবেন ঠিক সেই সময় পদ্মাদেবী কৌশলে বলিলেন পূজা হইয়াছে। চাঁদসওদাগর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দেবীর এই কৌশল বুঝিলেন।

বেহুলা লক্ষিন্দর সকলকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। সুখে বসবাস করিতে লাগিল।

www.pathagar.com

ঙ. লোককবিতা

নন্দীগ্রাম উপজেলার অন্যতম একজন লোককবি মোঃ বেলাল প্রামানিক (৪০)। তার পিতা মৃত মোঃ ওয়ারেছ আলী প্রাং (গ্রাম : ছোট চাঙ্গাইর) নিজেও ছিলেন একজন লোককবি। স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পড়ালেখা খুব বেশি না থাকলেও ছোটবেলা থেকেই তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করেন এবং সে সকল অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। সমাজের নানান অসঙ্গতির দিকগুলো তার কবিতার বিষয়। ছন্দে ছন্দে নন্দীগ্রাম উপজেলার প্রায় সবগুলো গ্রামের নাম, সাধুবাবা এবং মোবাইল ফোন বিষয়ক তিনটি কবিতা তার কাছ থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। নিচে এগুলো উপস্থাপিত হলো :

১. ছন্দে ছন্দে নন্দীগ্রাম উপজেলার গ্রামের নাম

কুশাবাড়ি কোন গ্রাম, জোঁকা বোনগ্রাম। বেলাল বল গ্রাম ভাটরা ভাট গ্রাম। হরিহারা দেওগ্রাম থানা হয় নন্দিগ্রাম। মস্তকাঁশি জামগ্রাম, মাগুড়া ডোমরগ্রাম, আড়াল বিহিগ্রাম, ভিঁটি কালিগ্রাম, যাত্রাপুর ভাণ্ডারগ্রাম, রাতোয়াল করজগ্রাম, কালাই কুঁড়ি ছাতান গ্রাম, হলদি বাড়ি পাট গ্রাম, বগুড়া মালগ্রাম, আঙ্গুরপোতা দহগ্রাম, ভেঁল্লা ভেবড়া গাড়ি, বাগাদহ পালনকুঁড়ি, লোকনাথ পাড়া, আড়ো বাড়ি ছাইপাড়া পুঁয়াগাড়ী, কালা সিঙ্গা বেঁতকুড়ি, বিষাড়পাড়া, চাঁতরা গাড়ি, বাঁশো হাটকড়ি, কয়ারপাড়া পুঁটা গাড়ী, ভাদরা মাইকুড়ি, রাজশাহী গোদাগাড়ী, বিষলাল বিষহরি, আঁচলতা পাইকরকুঁড়ি, কুড়িগ্রাম ভুরুঙ্গা মারি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ মায়াবড়ি, টেকর সজ্ঞাবাড়ি চাকদহ্ মাধাইমুড়ি, চরকাই ফুলবাড়ি, চিটাগাং হাটহাজারী, পাঁচপীর ফকিরপাড়া, পানিসারা কল্যাপাড়া, ঘনকালাই জাঙ্গাল পাড়া, গুন্দিসর নওদাপাড়া, উত্তরে পলিপাড়া, তাল্লা চৌধরী পাড়া, বড় বড়া কই পাড়া, কুঁনা লগর পোঁতা পাড়া, উঁকর দিকি লাড়ানপাড়া, পাতাঞ্জ বান্দি গাড়া, ঢাকন্তা সোনার পাড়া, নিশিন্দারা আচারপাড়া, ডেওয়াবাড়ি হাট সাঁড়া, আটাশি যোগার পাড়া, ধানপূজা নিমার পাড়া, শীতলাই যুগিপাড়া, খাজলাল,পাকপাড়া, ধলাহাড় গোয়ালপাড়া, নামুট দামপাড়া, পতিশ্বর চাঁচখুর, নারহট্ট ইন্দখুর, সোনাতোলা সুখানপুকুর, কয়াকুঞ্চি আবাদপুকুর, ধাওয়াস তালগাছি, ধামকুড়ি দোগাছি, নাগরকান্দি মুড়ালদিঘী, ভুলবাড়া স্থাপন দিঘী, শিয়ালা লক্ষীকোলা, কাতাল চাঁন্দর খোলা, মেয়ের বাড়ি সোনা খালি, কক্সবাজার বাঁশখালি, মাসিন্দা আলো হালী, ফনী নোয়াখালী, কই গাড়ী খান্দার, উপিহার ধুন্দার, হাটধুমা হাটলাল, গ্রামধুমা ক্ষেতলাল, রাণিরহাট শাকপাল।

ধাপের হাট ফোঁকপাল, কাউনিয়া মহিমাগঞ্জ, আখাউড়া হবিগঞ্জ, ভৈরব আশুগঞ্জ গোয়ালন্দ নারায়নগঞ্জ, সিংড়া সিরাজগঞ্জ, কসবা সিদ্দিরগঞ্জ, মহাস্থান ছিলাদেবীর ঘাট, চিটাগাং কালুর ঘাট, লুঙ্গি ভাল বাবুর হাট, উত্তর বঙ্গে ঘোড়া ঘাট, ভারতে আছে বালুর ঘাট, বশিকোড়া গাদ ঘাট, ফুলছবি বাহাদুরা বাদ, বাঘাবাড়ি আড়িচা ঘাট, নগর বাড়ি ফেরী ঘাট, ঢাকায় আছে সদর ঘাট, পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁ, ঢাকায় হোটেল সোনার গাঁ, জেলার নাম নওগাঁ, মানুষের নাম নিমা খাঁ, শিল্প এলাকা তেজগাঁ, ষ্টেশনের নাম গফরগাঁ, বাণিজ্য এলাকা আগারগাঁ, মারা গেছে ফাতা খাঁ, ঝালকাঠি নেত্রকোনা, পাটের

www.pathagar.com

আরত সোনা কানা, তারাশ চান্দই কোণা, কাপ্তাই চন্দ্র ঘোনা, সান্তাহার ঈশ্বরদী, পাকশী নরসিন্দী, মহেশ খালি, বান্দরবন, বাগের হাট সুন্দরবন, ঈদল শিদল ঢাকুর, চাকলমা ভুস্কুর, সিংগাহার পানাই, হলুদ ঘর মদনাই। আন্দা শুরা আটান, নিমাই দিঘী পাটান। পলাশীর পান্তর, চৌদিকী ভাগবতর, নন্দনবাড়ি পালী, পাঁচবিবি হিলি, বেলকুচি পাবনা, রাজ্জাক শাবানা, বর্ষণ সান্তা, পুঁনালকান্তা, শেঁকাহার ভোলতা, পাঁচুঘুরি থালতা, বট বিরিক দেওতা, পিঁপড়া বাঁমোতা, আঁখিরা পারুল, দর্গাহাট এরুল, খিঁয়াল চামরুল, মাটিহাঁস দামরুল, মালচা শাবরুল, কুন্দার বিজরুল, গয়াকাশী বিন্দাবন, ঢাকায় হোটেল শেরাটন, পারঘাটা পারশন, বাঁশবাড়া ভালশন। দেবখণ্ড দেবরাশন, গুলারহাট ঘাটাগন, দমদমা মালশন দুই হাজার নয় সন। বসে বসে থাকি ছন্দ গুলো লেখি, কেমন লাগল মজা যেমন তিলা খাজা।

২. সাধুবাবার কবিতা

সাধুবাবার হাতে তছবি, খোদার নামসদায় জপি
লাল কাপড় সামনে পাতি, মাঝ ভাণ্ডারীর কেরামতি।
বসে বসে মানুষ দেখি, হোটেলে গিয়া তাবিজ লেখি।
টাকা পয়সা দিবে নাকি, সারা রাত শুধুই ফাঁকি।
মাজারের পাশে শুইয়া থাকি, কাছেই নদী ইছামতি,
মাজারে মাজারে দেখা যায়।
বছর বছর যোগ আসে, মাস্তান গড়ে সভা বসে
বৈশাখের শেষ বিষৎ বারে, বউ ছোল সব লাইন ধরে
সাধু বাবার ভিন্ন দল, বসে সবাই গোল গাল
মেয়ে পুরুষ একই সাথে, খাওয়া দাওয়া একই পাতে।
দিন রাত সমান সমান, সঙ্গে থাকে সবার দামান।
মচ্ছপ হয় সারা রাত, সময় নাই হবে কাত।
সবাই মিলে গান ধরে, লালনের গান সবার পরে।
কেউ ধরে গান হাঁসন রাজা, কেউ বলে শালা জোরে বাজা।
কারু সেতারা গলায় ঝোলে, বাদ্য যন্ত্র সবই মিলে।
গান হচ্ছে পুরুষ মেয়ে, কতক লোক দেখে চেয়ে।
কেউ বলে ঢাল কলকী, কেউ জ্বালায় আগুনের ফুলকী।
গাঁজার কলকীত মারে টান, খাজা বাবাক ধরা আন।
সুলতান বাবার কেরামতী, সাধুরা থাকতে হবে না ক্ষতি।
শেষ রাতে পোলার ঝাঁকী, কাউকে আবার দিলনা ফাঁকি।
সবাই মিলে পোলা খায়, বাড়ির দিকে রওনা দেয়।
সঙ্গে লয় কট্‌কটি ভাজা, আবার আসব হুঁ খাজা ॥

প্রতি বছর হয় ভাই...

www.pathagar.com

এমন যুগ এলো ভাই, কারু সাথে কারু মিল নাই।
ভোঁ ভোঁ করে মনের মাঝে, ঘুড়ে বেড়ায় সকাল সাঁঝে।
মানুষ শুধু টাকা খোঁজে, একটি কার ধার, একটি সোজে।
ছল চাতুরী করে যারা, শেষে তাদের বাঁচাই মরা।
ফেরেক বাজী করে যে জন, মনের পাল্লায় হয় ওজন।
দিনের বেলা খেল তামাসা, রাতে খায় ডেঙ্গু মশা।
ধোকা দিয়া কাছে টানে, মিল হয় না আত্মার সনে।
শুধু ভাই লেনা দেনা, মনের খবর কেউ করে না।
যাঁতা কলে পড়বে যে দিন, গোটা জগৎ ঘুড়বে সে দিন।
দুনিয়াটা গোলক ধাঁদা, কারু হাঁসা কারু কাঁদা।
পাঁটাক দেখা পাঁটি হাসে, তারপর আবার বকরাই আষে।
শেষে কিন্তু দেখা যায়-
রিয়াজ হাজি ছলের পাগল, মানত করে গরু-ছাগল,
গোপাল পুরের মজের পাগল, নিমাই দিঘীর নজরুল পাগল,
নিশিন্দারার মজি পাগল, চাঙ্গর ছিল মন্ছব পাগল,
গ্রামে ঘুরত সন্তেষ পাগল, শহর বন্দরে ঘোরে পাগল
কেউ ভাই টাকার পাগল, কেউ আবার মেয়ের পাগল,
আর এক ছিল সাদের পাগল, কেউ আবার জমির পাগল,
কেউ ভাই খাইয়া পাগল, কেউ আবার দেখাই পাগল
কেউ আবার আল্লাহ্র পাগল, লবড়া ভাই খাওয়ার পাগল
সব পাগল মারা যায়-
মোবাইলের এমনি ধারা, ছোঁড়া ছুঁড়ি পাগল পারা।
কল আসে লোকনাথ পাড়া, মা ভাবে স্কুলের পড়া।
মুখামুখি হয় না খাড়া, ওতে ঘাতে দেয় ধরা।
কথা বলে শুধু ইশারা, কি বলে ভাই তারা তারা।
আমি দেখা মন মরা, আমার নাই মোবাইলের বাঁড়া।
ভোটের বেনার চোধরী পাড়া, টানা দেয় আসমান জোড়া
ভোরের সময় দেখা যায়-
পাকিস্থান কিরগীছস্থান, বাংলাদেশের মহাস্থান।
ভোল্ডার গরু হিন্দুস্থান, ঢাকাই আছে গুলিস্থান।
খোদা বড় মেহেরবান, পোকা খায় জমির ধান।
আকাশে রমজানের চাঁন, সবার কিন্তু সালাম চান।

www.pathagar.com

পাটান হয় যাত্রা গান হুজুরের ভাই থাকে না মান।
এমন ঘটনা দেখা যায়-
কলি যুগের এমনি ধারা, পিতা মাতা পাগল পারা।
বেটার বৌ ঘরে এলে, ভয় নাই তার কঠিন দেলে।
চোখে দেখে নি খাতা বই, মুখে সদাই ফোটে খই।
বর্তমানের যুগ ভাই, কথা বলার জায়গা নাই।
বয়ের কুটুম সারি সারি, স্বামীর কুটুম বেজায় ভারী।
নিজের লোকের খবর নাই, শালা শমন্দী আপন ভাই।
ছেলেরা হয় খুলুর বলদ, নিজের মধ্যে পুরা গলদ।
পরের মেয়ের কি দোষ দিব, নিজের বেটা কুমটা ছিব।
বৌয়ের বরে পারে না, বাপ মা ভাই টগড়া কানা।
প্রায় বাড়িতে দেখা যায়, হা হুতাশে দিন যায়।
বর্তমানে হচ্ছে ভাই-
সায়েক আব্দুর রহমান ভাই, শালুর আবার বোমা ফাটায়।
মানুষের প্রতি মায় নাই, দাড়ি, টুপি জুব্বা গায়।
অনেক লোক মারা গেল, খালেদা জিয়া দেখতে পেল।
কয়েক দিন পর পড়ল ধরা, হাতে পায়ে লোহার কড়া।
সিলেটে কিন্তু ধরা পরে, বাসস্থান লাল ঘরে।
এক বৎসর পর বিচার হল, ফাঁসির মঞ্চে জীবন গেল।
ফখরুদ্দিন সরকার হল, সবার মাথায় বাজ পল।
এক এক করে ধরা পরে, বাসা ছেড়ে কোথায় সরে।
যখন বিচার শুরু হয়, সবার গোয়ায় আঠা ভাই।
বাদ পল না এম,পি মন্ত্রী, দেশের টাকা কেন কমতি।
বিদেশ ব্যাংকে টাকা জমা, খালেদা হাসিনার যত মামা।
কেউ থাকে ভাই লন্ডনে, কেউ আবার সুন্দরবনে।
ভোটের তারিখ ঠিক হল, পাটিরা মাথা চাড়া দিল।
জনগণের সুখ নাই, ইউরিয়া সার কন্টলে দেয়।
জন দরদি কে আছে ভাগ্য ঘোরে আগে পিছে।
বত্রিশ টাকা সরিষার পোয়া, কুলাই না ভাই গরীবের গোয়া,
গরীবের কথা কে শোনে, নিরবে ওরা ভ্যান টানে।
সামনে আবার ভোট এল, পাটি যত ভেঙ্গে গেল।
ভোটের কিযে ফল হবে, আল্লাহ রসুল বলে দিবে।

www.pathagar.com

আমার কিছু বলার নাই, জ্ঞানে গুনি দেখতে পায়।
ভোটের আগে ওয়াদা করে, পদ পেলে ভাই ফ্যাকম ধরে।
সংসদে ভাই চিল্লাচিল্লী, ঘুরে বেড়ায় নয়াদিল্লী।
সবাই কিন্তু ধোকা বাজ, কেউ করে না পাবলিকের কাজ।
আমি শুধু চোখেই দেখি, সকল নেতার ছন্দ লেখি।
ভাল কাজ যদি করে, জনগণের চোখে পরে।
নিরব ভূমিকা পালন করে, জবাব দিবে রোজ হাসরে।
এমন নেতা দেখা যায়-
মোদের সরকার ফখরুদ্দিন, ঘুমাই না সে রাত দিন
ইউরিয়া সারের সংকট পরে।
সরকারের আবার মাথা ঘোরে।
বিদেশ থেকে করে আমদানী, সার আসে ভাই মনে মনে।
সমুদ্র বন্দর চিটাগাংগে, সার খালাস হয় সঙ্গে সঙ্গে।
ডিলারের মারফত সার আসে, ডিলার আবার চিয়ারে বসে।
মেম্বার যারা সময় মাপে, হেলপার যত তছবি জপে।
ইউনিয়নের ভাই কৃষক যত, সোনা কানা আসে সময় মত।
সোয়া কেজি সার বিঘা প্রতি, কৃষকের মনে হয় দূর গতি।
গ্রাম প্রতি সার ২৫ বস্তা, মম চায়না করে নাস্তা।
সার এল টন বাহাত্তর, অর্ধেক গেল ভাগবতর।
বাংলাদেশের মানুষ ভাই, কথা বলার জায়গা নাই।

৮ সালে হয়েছে ভাই

বগুড়া যাবে মার্কেট করতে, পারল না কেউ কারণ ধরতে।
ছেলের নাম হয় আক্কেল আলী, তার ছিল ভাই একখান শালি।
নাম হয় তার মিসেস বেলি সিনিমা দেখতে সঙ্গে চলি।
বাড়ি হয় তার মশাবাস, শালির উপর ভীষণ টান।
বগুড়া আসে মিনি বাসে, ৭ টার দিকে শহরে পৌঁছে।
বডিং তারা ভাড়া করে, মাধু হলে লাইন ধরে।
ডি,সি'র দু'খান টিকেট কাটে, হলে ঢুকে বসে সিটে।
মটর কালাই মুখে ফেলে, কটর মটর হলে ঢোক গিলে।
বই দেখা শুরু হল, ৩ ঘণ্টা ভাই মজা পেল।
জমির মধ্যে থাকে লালি, কুটুমের মধ্যে হয় শালি।
পরের দিন বাড়ি ফিরে, আমার ছন্দ চলে ধীরে

www.pathagar.com

এমন ঘটনা শহরে হয়–
এই কবিতা কিনবেন সবাই ৩ টাকা এর দাম
বিদায় কালে ছালাম নিবেন হিন্দু মুসলমান ॥

৩. **মোবাইল**

মোবাইলের এমনি ধারা
ছোঁড়া ছুঁড়ি (ছেলেমেয়ে) পাগল পারা।
মুখা মুখি হয় না যারা
ওঁতে ঘাতে (গোপন জায়গা) দেয় ধরা।
মেয়ের বাড়ি দিঘির পাড়া
মেয়ে কিন্তু ঝড়ি পড়া।
মোবাইলে কথা বলে,
সময় কিন্তু রাত্রি কালে।
হেঁসে হেঁসে কথা বলে
ছোট ধাপ পায়ে ফেলে।
টাকা নাই মোবাইলে,
তবু শান্তি লাগে দেলে (মনে)।
আনোর অনেক বন্ধু মিলে,
তাইতো ঝোঁক মোবাইলে।
কি যে আছে মোর কপালে
কি করিবে করেন জালে।
বসে থাকি সবাই মিলে
প্রেম হল ভাই চুল পাকিলে।
টাকা নাই আনোর হাতে
মিল কিন্তু সবার সাথে।
কাউকে সে পর ভাবে না
সবার সাথে লেনা দেনা।
সবাই কে সে ভাল বাসে
আমি গেলে দূরে বসে।
পথের মাঝে অনেক কাঁটা
আনো ছুড়ি বড়ই ঠেঁটা।
আনোর ছবি হৃদয় মাঝে
জেগে ওঠে সকাল সাঁঝে।

www.pathagar.com

শেষে ঘোরে ভাগ্যেও চাকা
আনো আমছারে দেড় লাক্ষ টাকা।
অনুর মা গোয়া মারা যায়
দুই জন করে হায় হায়।

চ. লোকছড়া

আদমদিঘির লোকছড়া

১. হাটে গেলাম বাজারে গেলাম
কিনে এনলাম বস্তা
কড়ই বাজারের ছেলে গুলা
মুলার মতো সস্তা।

২. লাল লাল টুক টুক
ছিমলের ফুল
হাতের লিখা দেখিতে
অনেক কিছু ভুল।

৩. আকাশ ভরা লক্ষ তারা
মিটি মিটি হাসে
গত রাতি স্বপ্ন দেখি
তুমি হামার পাশে।

৪. লতুন খাতায় প্রথম পাতায়
লিখিয়ে গেলাম আলপনা
আমার ছবি কইবে কতা
আমি যখন থাকবো না।

৫. চুলার পাড়ে চাঁদের আলো
লতুন (নতুন) ভাবিক দেখতে ভালো।

৬. গোলাপ ফুল দেখতে ভালো
হয় যদি লাল
তার চেয়ে অধিক ভালো
তোমার দুটি গাল।

৭. খোকসার পাতা খসখসা
কচুর পাতা লরম
তোমার সাথে প্রেম করতে
আমার বড় শরম।

www.pathagar.com

৮. টিবল পাড়ে নারিকেলের গাছ
চিড়ল চিড়ল পাতা
তোমার কথা মনে হলে
ধরে আমার মাথা।

৯. সাদা সাদা হাঁসগুলি
নদীতে ভাসে
এই চিটির উত্তর যেন তাড়াতাড়ি আসে।

১০. পুকুরেতে পানি নাই পাতা কেন ভাসে
যার সাথে দেখা নাই সে কেন হাঁসে।

১১. কাঠের আগুন ঘুটার ছাই
চিঠির যেন উত্তর পাই।

১২. কাঁচা কাঁচা নারকেল
পাকা পাকা ব্যাল
তোমার মত ছেলে আমার
বাঁ পায়ের স্যান্ডেল।

১৩. আশায় মরে চাষা
গরম ভাতে দই
চৈত মাসে ম্যাঘের ডাকে
শুগানত পর্য্যা মরে কৈ।

কাহালুর লোকছড়া

গুলশান আরা সিম্মি। বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। আমার পরিচিত কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে একই মেসে থাকে। বাংলা ব্যাকরণের কিছু সমস্যা নিয়ে একদিন আমার বাসায় এসে হাজির। ওর নাম এবং বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় কাহালুর কথা বলতেই গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করলাম কতদূর কীভাবে যাওয়া যায় সবকিছু জেনে ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা বললাম।

০৬-০১-১২ ইং তারিখ সকাল বেলা বগুড়া উপশহর বিয়াম ফাউণ্ডেশনের বাসা থেকে বের হয়ে রিক্সা যোগে চারমাথা সেখান থেকে বাস রিকসা হয়ে সোজা পাঁচখুর গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। আগেই যোগাযোগ করা ছিল। সিম্মির বাবা এনামুল হক রাস্তা থেকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। সিম্মিদের পাশের বাড়ির বাহির বাটিতে গাছের তলায় ৬/৭ জন ছেলে মেয়ে খেলা করছে। ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওরা খেলা বন্ধ করে দিল। কেউ কেউ দৌড়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। আমার সাথে কিছু চকলেট ছিল। গাছের নিচে একটা আধভাঙ্গা বেঞ্চের উপর গিয়ে বসলাম।

www.pathagar.com

দু'একজন যারা অবশিষ্ট ছিল ওদেরকে কাছে ডেকে হাতে চকলেট দিয়ে পুনরায় খেলা শুরু করতে বললাম।

ওরা তখন খেলতে খেলতে কিছু ছড়া বলল তারপর আমি কয়েকজনকে ডেকে কিছু ছড়া শুনে ডায়রিতে লিখে নিলাম। এই সুযোগে বাড়ির ভিতর থেকে সিম্মি এলো এবং সুযোগ পেয়ে নিজেও কয়েকটি ছড়া বলে দিল :

১. দোলে দোলে
শিশু দোলে দোলে
সড়ের গাছের তলে
সাপ কুল কুল করে
সাপের তলে আন্ডা
শিমু বুড়িয়া ঠান্ডা।

২. আড়া জুড়ালো পাড়া জুড়ালো
বরগী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খাছে
খাজনা দেমু কাতে
ধান ফুরাল পান ফলাল
খাজনার উপায় কী?
আর কয়টা দিন সবুর কর
রসুন বেচে খাজনা দেম
ভাবনা আছে কি?

৩. আমরা দুই ভাই মিসতিরি
টিনের ঘরে কাজ করি
বিলাই দেখে ভয় করি
পাদে পুদে লাশ করি।

৪. হাডু ডু হ্যান্ডেল
পায়ে দিয়ে স্যান্ডেল
হাতে দিয়ে ঘড়ি
যাব শ্বশুর বাড়ি
আমার নাম জাহানারা
আকাশে তিন তারা

৫. একছিল রাজা
তার নাম খাজা
সে খায় বাদাম ভাজা

www.pathagar.com

একছিল রানি
তার নাম নানি
সে খায় পানি।

৬. এ বি সি সেপ্টিকিন
শিশু খায় ভিটামিন
ভিটামিনোত পোকা
ডাক্তার বাবু বোকা

৭. আনুরে ভাই টুনু
তোরা কুনটি গেলু
তোগোরক হামি খুঁজিচ্ছি
আনু আসে ডাক দিল
হামি কলেম টুনু কুটি
আনু কল ঘরত
উই কী করে
আনু কল হাগিচ্চে।

৮. সজন : মাগো মা
তোমার বেটি কুনটি গ্যাছে?
মা : কদম ফুল তলায়
সজন : সেটি উই কী করে?
মা : ফুল তোলে
সজন : কীসের জন্যে?
মা : মালা গাতপি
সজন : কার বিয়ে?
মা : সখীর বিয়ে।

৯. ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপতি উড়ে যা
ইস বিশ ধানের শিষ
কদম খ্যায়া মারলেম ঢিষ।

১০. এউড়ি বাঁশ তেউড়ি বাঁশ
ভালকা বাঁশের ছড়ি
দলের উপর লাফ ছাড়িছে
সোনা বান্ধা কড়ি (পুঁটি মাছ)
অক চড়িল, ঠক চড়িল
আর চড়িল জাটা (বক)

www.pathagar.com

কানি বগে কাঁন্দা খুচিলো
তার চড়িল হাটা।
নাকদড়ি দিয়া লরুন চোরা
শৈলা টিয়া ঘুঘু
দলের উপর কোরা পক্ষি
বলছে ডুবুক ডুবুক
বাদুড় পক্ষি লেখা দিল
কে কেলা খাওরে মৌ
শামুকের রাজা লেখা দিল
দিঘল দিঘল পাও (পা)
মাছরাঙ্গা মাছ খেয়েছে
আশটা গন্ধায় গাও (গা)।

১১. কাকের কাকা চিলের চি চি শুনছে ভালো কি
আমরা উঠছি কোন সকালে খোকন উঠে নি
এতো বড়ো লাজের কথা সূর্য যদি শোনে
আজ হয়তো উঠবে নাকো দুঃখ করছে মনে।

১২. আয় আয় চাঁদ আয় আয় উড়ে
আমার খোকনের মাথায় টিপ দিয়ে যারে।
খোকন দেখে চাঁদের মুখ
চাঁদ দেখে খোকনের মুখ
আয় আয় চাঁদ মামা আয় আয় উড়ে
আমার খোকনের মাথায় টিপ দিয়া যারে।[১৫]

গাবতলীর লোকছড়া

বগুড়ার জেলার অন্যান্য উপজেলা গুলোর মত গাবতলী উপজেলার প্রায় সবগুলো গ্রামই লোকজ সম্পদে অত্যন্ত ঋদ্ধ। তবে পুরো উপজেলার পাশাপাশি গ্রামগুলোতে প্রায় একই জিনিস বা বিষয় পাওয়া যায় অল্প স্বল্প ভাষার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। বিষয়বস্তু বদলায় খুবই কম। এজন্য আমরা বেশ কিছু জায়গা বা গ্রাম নির্দিষ্ট করে নেই। যাতে সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। প্রথমেই গাবতলীর রামেশ্বরপুর, পীরগাছা এবং কামারচট্ট গ্রামগুলিকে নির্ধারণ করে নেই। এরপর বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি সি.এন.জি স্টেশন থেকে সি.এন.জি চালিত অটোরিক্সা যোগে সোজা পীরগাছায় গিয়ে পৌছলাম। পীরগাছা বাজারে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছি। তখন দেখা হয়ে গেল শ্রী অনন্ত কুমারের সঙ্গে। অত্যন্ত বিনয়ি ও ভদ্রলোক। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানানোর পর একটি দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমরা গল্প শুরু করলাম। এক পর্যায়ে তিনি বেশ কয়েকটি ছড়া বললেন। আমি সে গুলো আমার ডায়েরিতে লিখে নিলাম।

www.pathagar.com

১. মাইয়াটা নয় কতাতে ঝগড়া করি
সদাই দৌড়ায় বাপের বাড়ি
এইগল্যা পিতল্যান কতই সওয়ন যায়
দেওয়ানী ওনাক বুজান ভাল করি
যায়না যেন বাপের বাড়ি
কতাটা মোর দ্যাখেন বুজিয়া।
সেদিন মহাস্থানের হাট করি
আসি দেখুম আছে শুতি
এইগল্যা পিতল্যান কতই সওয়ন যায়
দেওয়ানী ওনাক বুজান ভাল্ করি।

২. (ক) এ্যাংগা টুনি ব্যাংগ্যা টুনি
দুগ্না টুনির ছাও
কোন টুনি নিয়া গেল
আগে করে আও।
(খ) আইগ্যা টুনি বাইগ্যা টুনি
মইদ্দে টুনির ছাও
কোন টুনি গু খাচে
হামাক এ্যানা কও।

৩. করে কর্ম করায় কর্ম
উভয়ে হয় সমান ধর্ম।[১৬]

পীরগাছা বাজার থেকে উত্তর দিকে রওনা দিলাম। নদীর ধারে রাস্তার পাশে একটা পুরাতন বটগাছের নিচে বেশ কয়েক জন ছেলেকে বসে বসে গল্প করতে দেখে এগিয়ে গেলাম। তারপর ওদের সাথে একটু খাতির জমিয়ে আমার উদ্দেশ্যের কথা জানাতেই 'হামরা এগল্যা পারিন্যা। ছোট বেলার কতা হামাকেরে মনে নাই' বলে ৭/৮ জন ছেলের মধ্যে প্রায় সবাই কেটে পড়ল। শুধু ক্যামেরায় ছবি ওঠার জন্য কিছু সময় ছিল। তারপর খানিকটা জোর করে টেনে ধরে আর কিছু না হোক ন্যূনতম একখান ছড়া বলার জন্য অনুরোধ করলাম।

৪. কী টুনি
ভোট টুনি
কী ভোট
চিড়া কোট
কী চিড়া
নীল চিড়া
কী নীল
গু গেল্।[১৭]

www.pathagar.com

৫. ইছন বিছন চিচন ছা
প্রজাপতি উড়ে যা
এ্যাং ব্যাং চ্যাং
খ্যাতা কোনা ধুয়্যা দ্যান।[১৮]

এরপর রওনা দিলাম আরো একট পূর্ব দিকে। যেখানে নদীর মধ্যে ১২/১৩ জন শ্রমিক নদীতে বালু উত্তোলনের কাজ করছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানাতেই অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করল। নদীর পাড়ে বালু শ্রমিকদের বিশ্রাম নেওয়া এবং পাহারা দেওয়ার জন্য ছোট্ট একটি ঘর রয়েছে। সেই ঘর থেকে বেশ প্রশস্ত একটা চট ছেড়া বস্তা বা ছালা বিছিয়ে আমরা সবাই বসে পড়লাম। মাঝে মাঝে বিড়িতে টান দিয়ে গান শুরু করে দিল আমজাদ হোসেন নামের এক শ্রমিক। অত্যন্ত সুন্দর ও সুরেলা কণ্ঠে গানগুলো গাইতে লাগলেন। আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনলাম এবং সুযোগ বুঝে ডায়েরিতে লিখে নিলাম। কেউ কেউ ছড়া শুনাল সে গুলোও লিখে নিলাম।

৬. এক ঠক দুই ঠক তিন ঠকের মেলা
যামো পরামানিক হইল শয়তানের চ্যালা
জ্বর নাই জারি নাই
লেখা নাই পড়া নাই
আবজাল হইল বাবু
পশ্চিম পাড়ার বাবলুর বাপ
জলের হইল কুমির
আস্তে করে আও
যত মিছা সাচা শুনব্যার চাও
বাট্যা সরদারের কাছে যাও।

৭. কপাল প্রসান্ত হইলে
পড়্যা পায় সোনা
চাউল ভাজা খায়্যা চোর
মইলো সাত জনা
শোন দেবী সাম
বাড়িত যায়া দেখি
হইচে এক কাম
বেড়্যা বলদের লাত্তি খায়া
মইলো আতাব দি
ঘরের ইসতিরি হয়্যা মিছা কতা কয়
ছার হামি তার করমো কী?
বি : দ্র : প্রসান্ত-প্রসন্ন শন-কাক
আতাব দি- আতাব উদ্দিন[১৯]

www.pathagar.com

৮. মিষ্টি রে মিষ্টি
তোর বলে বিয়া
কে কোলো মা কে কোলো
ঐ পাড়ার টিয়া
হলদি কোটা হয় না
হলদি হলো বাশি
আশি টাকার খাসি
নব্বই ট্যাকার মোষ
তোর নানির লিকা হলে
আমাক এ্যানা কোস
লালে লাল শাড়ি
হাতে লেডিস ঘড়ি
চোখে চশমা পরি
বৌ যাবে বৌয়ের শশুর বাড়ি।

৯. এই ছেলেটা ভ্যাল ভেইলেটা
আমাদের পাড়ায় যাবি?
মোয়া মুড়ি খাবি?
খাবো না খাবো না
যাবো না যাবো না
সজনে তলায় ভূতের আসর।[২০]

১০. আশা লতা পালং পাতা
আজকে তোমার বিয়ে
বর আসবে পালকি চড়ে
টোপর মাথায় দিয়ে
বর দেখে যাও বর দেখে যাও
রান্না ঘরের ঝুল।

১১. উষ্ট বাপ চকচক
বিয়ান আইলো ঝকঝক
ও বিয়ান বসেন তো
দুটি কতা শোনেন তো
আপনের মেয়ে হাটে যায়
তাই বলে তার জাত যায়

www.pathagar.com

১২. আমার নাম চম্পা
গলায় গামছা
হাতে বালতি
কাখে কলসি।[২১]

১৩. শোন ছাত্রগণ
শিশু কালের কথা
এক লক্ষ তেঁতুলের পাতে
কয় লক্ষ পাতা।[২২]

১৪. একটি গাছে তিনটি ফুল
একটি ফুল লাল
তোমার আমার ভালোবাসা
থাকবে চিরকাল।

১৫. কলা গাছের ভিতর মরিজের ফুল
আমার লেখায় অনেক ভুল।[২৩]

১৬. আমার নাম মিতা
চুলে পরি ফিতা
কানে পরি দুল
কনকচাপার ফুল
পাশের বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলিনা
তার সাথে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি
তাদের বাড়ি দোতলা
করে শুধু ইশারা
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
বৌ এনে দাও খেলা করি
বৌয়ের মুখ কালো
নাকটি কেটে ফেলো
নাকে কাটলে রক্ত
দুগ্গা পূজার ভক্ত।

১৭. ও ছিলো ছিলো ছালা
হাল্কা গাড়ি রিকসা ওয়ালা
সাত সমুদ্র পেরিয়ে
ভাবি এলো বেড়িয়ে

www.pathagar.com

ভাইয়াকে বলো না
চিড়াখানায় চলো না
চিড়াখানায় হাতি নেই
আমার খেলার সাথি নেই
সাথি ছাড়া বাঁচবো না
কারো কথা মানবো না।[২৪]

পরের দিন সকাল বেলা বগুড়া শহরের চেলোপাড়া সি.এন.জি স্ট্যান্ড থেকে গাবতলী হয়ে জয়ভোগা গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামে গিয়ে কয়েক জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হল। ওদের মধ্যে সাব্বির, রওসন, রেহেনা, মৌলির সঙ্গে কথা হল। সাব্বিরের কাছ থেকে বেশ কিছু ছড়া শুনে লিখে নিলাম।

১৮. শামতালতা বাঁশের পাতা
বাশ ঝুম ঝুম করে
শামতালতার বিয়ে হবে
জমিদারের ঘরে
জমিদারের পোলারা মুরগি চুরি করে
অদ্দেক ঘাটাত যায়া মুরগি কক কক করে
হাতে দিবো লেডিস ঘড়ি
যেতে হবে শশুর বাড়ি
শশুর বাড়ি জিন্দাবাদ
আপ আপ সেবেন আপ।

১৯. ঐ পাড়ে হাইগব্যার বইচ্চে কে রে
কাঠি পোড়া দে রে
কাঠি হইল শক্ত
গোয়া দিয়া বাড়াইল অক্ত।

২০. আব্দুল গোয়া করে তুলতুল
কোদালে কাটিল গোয়া
অক্ত পড়ে পোয়া পোয়া
কাঠালের কোয়া কোয়া
আব্দুল কয় ওয়া ওয়া।

২১. আব্দুল গোয়া করে তুল তুল
কাঠালের কোয়া কোয়া
আব্দুল কয় ওয়া ওয়া
শিয়ালের ওয়া ওয়া।

www.pathagar.com

২২. ঠক ঠক ঠক
কে?
আমি পেপারওয়ালা
উপরে এসো।
ঠক ঠক ঠক
কে?
আমি দুধওয়ালা
উপরে এসো
কয় কে.জি?
এক কে.জি
ঠক ঠক ঠক
কে?
আমি ভূত
উপরে এসো
হাউ মাউ খাও।

২৩. ওয়ান ফুলের বাগান
টু আল্লাহর বন্ধু
থিরি পায়খানার মিস্ত্রি
ফোর জুতা চোর
ফাইভ মাস্টারের গোয়াত ধর লাইট।[২৪]

২৪. কলাবতী এক আনা
কলাবতী দুই আনা
কলাবতী তিন আনা
কলাবতী চাইর আনা
কলাবতী পঞ্চম
হাত ধাপ্পু তুলার স্টম।

২৫. হাডুডু খেলব
তবলা বাজাবো
তবলার তলে
মোমবাতি জ্বলে
কাঁচা ব্যাল খাবো না
পাকা ব্যাল খাবো।

২৬. আলামিন ভাঙ্গা টিন
জোড়া দিলে কয় দিন
এক মাস দশদিন।

www.pathagar.com

২৭. ওয়ান ফুলের বাগান
টু কুইচ্যা মুরগির গু
থিরি পায়খানার মিসতিরি
ফোর হেড মাস্টারের জুতা চোর
ফাইভ মাস্টারের গোয়া টাইট।

২৮. টুনটুনি পাখি
নাচোত দেখি
না বাবা নাচবো না
পড়ে গেলে বাঁচবো না
বড় আপুর বিয়ে
কসকো সাবান দিয়ে
কসকো সাবান নষ্ট
বড় আপুর কষ্ট।[২৫]

২৯. এলো না বেলো না
কলার পাতায় ঘি
পাখির লড়ে না চোখ
দুপুস করে পড়ে না
রাজার বাড়ি চোর উঠেছে
আজকে সবাই চুপ।

৩০. ইলিশ মাছের তেইশ কাটা
বোয়াল মাছের দাড়ি
রহিমা ভিক্ষা করে
জরিনার বাড়ি।

৩১. একটি কলা দুটি কলা
তিনটি কোলা পাকে
বৌমা ডাকে
ও বৌমা ডাকিস না
কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাস না
মাথায় দিমো ঝাটার বাড়ি
চল্যা যাবি বাপের বাড়ি।

৩২. একে ঋতু
দুয়ে ডবল টু
তিনে ঘোড়ায় চড়ে
চারে চতুর্থ

www.pathagar.com

ধিন ধিনা ধিন
পাঁচে কদম ফুলের ঝুমকা
ছয়ে ছিলিপ কাটে
সাতে শাড়ি
আটে আসেন তো দুলাভাই
বসেন তো চিয়ারে
সরবত গুলিতে কী কী লাগে
একসের পানি সোয়াসের চিনি।

৩৩. নিন্দওয়ালি নিন্দওয়ালি নিন দিয়া যা
কালাই খামো না কালাই খামো না
কলসি কি না দে
কলসির মধ্যে ঢোড়া সাপ
ফুকে উঠিছে
তাই দেখে উম্মুলের শ্বশুর
ভয় পাইয়াছে।

৩৪. কিৎ কিৎ কা
কল্লা আছে কলার ডুম
আতুর বিলাই ল্যাংড়া বিলাই
ধরে ধরে ভাত খিলাই
পানির উপর পানি
ঐ যে আমার নানি
পানার উপর পানা
ঐ যে আমার নানা
আমের গাছে গামছা
দ্যাখতো মাগির তামশা
ঐ পাড়ার লবো
মুরগি করো না জবো
ঐ পাড়ার আছি
মুরগি কোনা বাছি
ঐ পাড়ার ফ্যালানি
কস্যা মারে ত্যালানি
ঐ পাড়ার হাছি

www.pathagar.com

তরকারি কোনা বাছি
লিত্যি লিত্যি কাপড় ধোয়
স্বামী আইলে তুইল্যা থোয়
গরুর গাড়ির চাকা
রাস্তা কাঁচা
মোষের গাড়ির চাকা
রাস্তা পাকা
পাইল্যার মোদে গোস্ত
ঐ যে আমার দোস্ত
টিনের উপর পয়সা থুইনা
আশ্যার বিয়া ঠিক করি না
খুঁটির মোদে পয়সা থুয়্যা
আশ্যাক ধর্যা মারে
আশ্যার বাপ কই গেল
ডাক্যা কও তারে
আশ্যা বড় দুকিনি
তার মতোন কাউক দেকিনি
আশ্যা বড় দুকিন
ভাত খায়নি তিনদিন।[২৬]

৩৫. ইক্স ওয়াক্স অনাহার
ওয়ান টু থ্রি
বি কুইক বান্ধবীগণ
তোমরা কি সব বলতে পার
কয়টি করে ফুলের নাম
যেমন ধরো শাপলা, গোলাপ, জবা
চেঞ্জকরো তাড়াতাড়ি
বলত পারো?
কয়টি করে ফলের নাম
যেমন ধরো আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু
চেঞ্জ করো তাড়াতাড়ি
নাম বলো?
কীসের নাম?

www.pathagar.com

মাছের নাম
যেমন ধরো ইলিশ, চিতল, বোয়াল, শোল
চেঞ্জ করো তাড়াতাড়ি
গান ধরো কীসের গান
দেশের গান
যেমন ধরো 'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি'
'ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা'
'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'
চেঞ্জ করো তাড়াতাড়ি
ড্যান্স করো......
কী ড্যান্স
যেমন ধরো পপ ড্যান্স লাকি ড্যান্স ব্রেক ড্যান্স
চেঞ্জ করো তাড়াতড়ি
খেলা করো
কী খেলা?
যেমন ধরো ফুটবল, বৌচি, হাডুডু
চেঞ্জ করো তাড়াতাড়ি।

৩৬. ওয়ান টু থিরি
পড়্যা পাল্যাম বিড়ি
বিড়িত নাই আগুন
পাল্যাম একটা বাগুন
বাগুনে নাই বিচি
পড়্যা পাল্যাম কেচি
কেচিতে নাই ধার
পড়্যা পাল্যাম হার
হারেত নাই লকেট
পড়্যা পাল্যাম পকেট
পকেটে নাই টাকা
চল্যা গেলাম ঢাকা
ঢাকাত নাই গাড়ি
চল্যা আল্যাম বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত

www.pathagar.com

পুকটি শুক্যা থাক
পুকটিত হলো ঘা
ডাক্তার খানা যা
ডাক্তার খানা বন্দ
পুকটি ধর‍্যা কান্দ।
সুভাষিত করে বলেছে পুকটির বদলে 'পেট'।

৩৭. আইসক্রিম ক্লাস থিরি
একতালি বল্টু
দুই তালি ডবল জিরো।

৩৮. নিন্দওয়ালি নিন্দওয়ালি নিন দিয়া যা
কালাই খামো না কালাই খামো না কলসি কিনা দে
কলসির মোদে ঢোরা সাপ ফুল্যা উঠিছে
দুড্যা কাতল মাছ ধরেছি
একটা লিছে পবন ঠাকুর
একটা লিছে টিয়ে
টিয়ার বিটির বিয়ে
বিয়ে করে লিয়ে গেল
কদম তলা দিয়ে
কদম তলা দুইটা ছুঁড়ি
হাইগব্যার বসিছে
চিকন চিকন চুল বাতাসে উড়িছে
তাই দেক্যা টিয়ার বিটি ভয় পায়্যাছে।

৩৯. দেই দেই পাইয়ার পাতা
আলো নারে শালার ব্যাটা
আসো বিয়ান বসো
পান্তা পান খাও
তোমার বিটি ঘাটে গ্যাচে
লোকের সাথে কতা কচে
তাই কি বিটির জাত গ্যাচে?

৪০. হাজির ব্যাটা পাজি
মুন্সীর ব্যাটা চোর
সাধুর ব্যাটা মুচি
ঐ পাড়া গরু মইরচে
কাচি কোদাল লিয়ে দৌড়।[২৮]

www.pathagar.com

ধুনটের লোকছড়া

১. আয় নিন্ আয়
হামার চান ঘুম আয়
কালা গাইয়ের দুদ দিমু
দুদ খাবার খোরা দিমু
মাচা পাইতে শুতবার দিমু
ছোলের চোকে নিন আয়
আয় নিন আয়।

২. আয়রে ঝড়ি লইড়া
হাতির পিটেত চইড়া
হাতির মায়ের কাটা কান
কুলা ভরা হাওয়া আন।

৩. আয়রে পানি ঝমাঝম
দিন বোইয়া যায় নাই দম।

৪. আকনি টুকনি
শ্যাওরের গাছের ভূতনী
শউর খায়্যা মকমকায়
হাড়ির দিকে চোক পাকায়।

৫. ভূত হামার পুত
পেত্যনী হামার ঝি
সিঁদোল পোড়া দিয়া
ভাত রান্দিছি।

৬. কালী কালী মহাকালী
পর্বতে থাকেন মা কালী
যৈবন করলেন ভার
কালী তুমি কার
যেই কর্মে লাগব
সেই কর্মে লাগ।

৭. কিষ্টা কিষ্টি কুকুর ভুকে
কালীমায়ের মাথাত চড়ে
ডাইনে আলা বামে বুধ
এই দেহ মন
কালিকার পুত।
এই বনে হেলিব কেলিব
চড়াবো ঘাও
দোহাই লাগে শিব চণ্ডীর
রক্ষা কইরো

www.pathagar.com

হামার গাও।
৮. ইর কুলারে ধীর কুলা
বাঘের নামে তিন কুলা
যে দেয় না বাঘকে ধান
তার ছোলেক টাইনা আন।
৯. আস্যো বিয়্যান বস্যা যাও
দুঃকের কথ্যা শুন্যা যাও
তোমার বেটি হাটোত্ যায়
লোকের সাথে কথা কয়
তাকি হামার পরাণে সয়?
১০. কুন্টি গ্যালা সোনার ভাগিনা
পড়্যা রছে ফাঁকা আঙিনা
শুতপার গেলে দেকি
তুমার মামা নাই ঘরে
একলা ঘরে কেমনে থাকি
তুমাক তাই পুছ করি
কুন্টি আছ সোনার ভাগিনা
আস্যা পরো হামার আঙিনা।
১১. হামার গইনে এট্টু দুয়া
কর কপিল্যা কর
তোর গিরোস্তে উঠাই য্যানা
হামাক তোরা ধর।
১২. তাল পাতের ঘর নয়
পাথর প্রাসাদ
এক প্রাসাদে শত ঘর
হাজার বাতি ছাদ
পূর্বেতে গঙ্গা সাগর
রাজহংসির খ্যালা
পশ্চিমে সবুজ বাগান
মব ফলের ম্যালা
উত্তরে ফসলি জমি
ধান পাটের চাষ
দক্ষিণে খ্যালার মাঠ
রবে বার মাস
এই মত বাড়ি যার
সুখে কাটে কাল
সকাল সন্ধা জয়জয়
উজানী কপাল।[৩০]

www.pathagar.com

নন্দীগ্রামের লোকছড়া

১. খেলার ছড়া

ক. হাই পিন্সিল লতাপাতা
আমি যাবো কলিকাত্তা
কলিকাত্তার গাছটি
বোটা ধর‍্যা পাঁচটি
বোটা যখন লাল হয়
হাজার টাকার মাল হয়।
বরকী খাইচে ছিমলের পাতা
কাক খায় দই
আয়রে আলম
বস্যা থাক্যা দুঃখের কতা কই।

খ. টৌপা [illegible] করে
বাগের অক্ত লড়ে
বাগ গ্যাছে হরিপুর
আনবে ১ টা লাকের (নাকের) ফুল
লাকোতো (নাকে) সয় না
পিংকি তো মিলে না।
ছোট ছোট আদার গাছ
তাকে দেবো বনোবাস
বনোবাসের পিচকারি
আমরা দুইবোন দুলালী।

২. বিয়ের ছড়া

ক. উড়ে এলো প্রজাপতি
পড়ে গেলো ফাঁদে
ঝরনা রানির পায়ে পড়ে
চঞ্চল বাবু কাঁদে।

খ. আলুর পাতা থালু থালু
কচুর পাতা দই।
কাজল বাবু এসে বলে
রত্না রানি কই।

৩. খেলার ছড়া

টুনটুনি পাখি
নাচোতো দেখি

www.pathagar.com

না বাবা নাচবো না
পড়ে গেলে বাঁচবো না।
বড় আপুর বিয়ে
কচকো সাবান দিয়ে
কচকো সাবান নষ্ট
বড় আপুর কষ্ট।

৪. বিনোদনমূলক ছড়া

ক. আকাশেতে লক্ষ তারা
মিটি মিটি হাসে
গত আতে (রাতে) স্বপ্ন দেখি
তুমি হামার পাশে।

খ. ওয়ান, টু, ত্রি
হলো একটা বিড়ি
বিড়িত নাই আগুন
হলো একটা বাগুন (বেগুন)
বাগুনত নাই বিচি
হলো একটা কেচি (কাচি)
কেচিত নাই ধার
হলো একটা হার
হারত নাই টেকা
চললাম ঢাকা
ঢাকাত নাই গাড়ি
চল্যা আনো বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত
পুটকি শুগা থাক
পুটকিত হলো ঘাও
ডাক্তার খানাত যাও
ডাক্তার খানা বন্ধ
হায়রে পুটকির গোন্ধ।

গ. আপালের বেটা পত্তা (মরিচ) পোড়া
খায় কাঁগুড়ার ঝোল।
আলের (জমির আইল) বাতাত (পাশে) শুয়া থাক্যা
লাপ্পা উঠে হোল।

www.pathagar.com

৫. সামাজিক ছড়া

ক. বাটা ভরা পান মুখ ভরা খাও
হামার আঙনা ভাঙ্গা গ্যাচে
সিলাই দিয়া যাও।
বাটা ভরা পান দাও
মুখ ভরা খাই
তোমার আঙনার তলদিয়া ধরো
সিলাই দিয়া যাই।

খ. বোকার বেটা বোকা
বোকা নম্বর এ্যাক
গারা হাটে ঘুর্যা বেড়ায়
হাতে নিয়া ব্যাগ।
বোকার বেটা বোকা
বোকা নম্বর দুই
সারা বছর ঘর ছাই
ঘরের না সারে টুই।
বোকার বেটা বোকা
বোকা নম্বর তিন
খাট পালঙ ঘরোত থুয়া
খোলাত (আঙিনা) পাড়ে নিন্ (ঘুম)।
বোকার বেটা বোকা
বোকা নম্বর চার
নিজের বেটি দোষ করে
মাওক ধর্যা মার।

গ. যে চেয়ারার (চেহারা) চেয়ারা
তার নাম আবার পিয়ারা।

ঘ. মাছের মধ্যে রুই
শাকের মধ্যে পুঁই
নারীর মধ্যে মদনের মাও
পুরুষের মধ্যে মুই।

ঙ. আলসাতে মোল (মারা গেল) আজার (রাজা) হাতি
গর্তে মোল সাপ
খায়া মলো শিয়াল শকুন
রাবিয়া মলো কাকের বাপ।

চ. আম জাম কাঁঠাল কলা
চল যাই গাছতলা
আমপাতা উরে যায়
তোর হামার মনে চায়।

www.pathagar.com

ছ. আশি টাকার খাসি কিনলাম
নব্বই টাকার দই।
সব জামাই খায়্যা গেল
মেজ জামাই কই?[৩১]

শাজাহানপুরের লোকছড়া

১. গোদা গেছে বিবিল
মাইরা আনছে শইল।
শইল গেছে নাফাইয়া
গোদা গেছে দাপাইয়া।
এ গোদা খাইস তো খা
না খাইস তো ধান বনে যা
আন ভাঙছে শুয়ারে
ঘটি বাটি দুয়ারে।

২. কাঁচকলাডা হাতে লিয়া
শাকপালা নি যাবা।
নোখ্খি দিলো ধান দুব্বা
কালী দিলো ফোঁটা।
অঙ্গিলারে বিয়া দিলাম
সাত গাঙের ওপার
ও যমুনা উঠ
পিঠার চাইল কোট
পিঠা অলো ধলা
যমুনা অলো কালা।
মানুষ গ্যাছে মাছ মারতি
মানুষ যায় না ক্যান
খিদা নাকছে ক্যান
ছিয়ার উপরে পাইল্লা রছে
পাইড়া খায় না ক্যান
খাটোখোটো হাত পাও লিয়ে
ইগোল পায় না ক্যান।
ডপঁড়ার উপর পিঁড়া থুইয়া
উইড়া খায় না ক্যান

www.pathagar.com

খাটোখোটো হাত পাও লিয়ে
বউ কিলায় ক্যান?
কিল না খামু
না কোরমু বিয়া
একলা ঘরে থাকমু শুয়া।

৩. আমরা দুইডা ভাই
চিড়া কুইটা খাই।
অ্যাটটা চিড়া কোম পড়লি
দাদার কাচে যাই
দাদার আছে গাই গরু
এ্যাক দাবড়ে মাওনপুর
যাতি যাতি মাওনপুর
পালাম এ্যাক গাই
পাইর ঠ্যাংয়ে দিলাম কোপ
বাউরালো দুই ভোগ।
ভোগে দিলাম আগুন
বাইরোলো দুই বাগুন।
বাগুন বলে বাবা
কাঁচকলাডা খাবা

৪. লোতুন বরশি
লোতুন ছিপ
মাছ মারি টিপ টিপ
সোগ্‌গুলির বরশি ধলা কালা
হামার বরশি হোবরি কেলা
হামার নাম ভন্যা
মাছ উঠামু টান্যা

৫. কোল্ল্যা খ্যাতের হাজু লো মাজু লো
গাঙে যাবিনি, গাঙে যাবিনি
গাঙ দিয়া জাহাজ যায়
জাহাজ বেডাডা নিতে চায়
কুখু মালা দিতে চায়
পদ্মা আমার মা
দেখা দিলা না!

৬. আইলোরে অড়িয়া
অসতীর উপর চড়িয়া
অসতীর গলায় ঘণ্টা বাজে

www.pathagar.com

তাত কি আর বকরি বাজে।
আয় বকরি চুনা খা
চুনা গ্যালো ধাইতি
বাঘের দুধ বাঘে খায়
নল বনে দুম দুম
এ্যাক বুড়ি খুম খুম।
আয় বুড়ি তোর ভাঙ্গি দাঁত
বুড়ি কইলো পুষ মাস
পুষ মাসের একাদশী
বুড়ির কপালে চন্দন ঘষি।
ঘষতি ঘষতি পইলো ফোঁটা
এই বাড়িতি হাত বেড়া
বেড়া নারে আঠারো নাতি
বইড্যার কানদে ডবল চাতি।
সোনা না রোপার বয়লা
এ ঘরডা দেখতি ভালা
ঘরডা ভালো ছাটনি
গিন্নি কেন বেড়া দেওনি।

৭. এ ঝইড়া এহানে আইছিস ক্যা?
ঝড়ে আনছে।
মুলা উঠাইলি ক্যা?
ধরি আর উঠে।
আঁটি বান্দিস ক্যা?

৮. কুটি কুটি সরু ব্যাঙ
ভাত দিতে সেজে না
বুড়া দাদা বোঝে না।

৯. ঠ্যাং, ঠ্যাং, ঠ্যাং
কালী পূজার ঠ্যাং
ঠ্যাংগে দিলাম আগুন
বাউরালো দুই বাগুন
বাগুন দিলাম ভাজতি
বউ নাইলো কানিত।
ডরে আমার বাবাজান
নুতুন বাড়িত ছিন্নি খাবার যান।

www.pathagar.com

১০. বোলরে বোল
হেই লোছ।
শান্তি পুরে
হেই লোছ।
ঢোল বানো
হেই লোছ।
বাজে কাড়া
হেই লোছ।
সোনার নাতিন
হেই লোছ।
কাটের টিয়া
হেই লোছ।
কাট বান্দিল
হেই লোছ।
হুগলি যাইয়া
হেই লোছ।
হুগলি ছিলো
হেই লোছ।
হীরা নোটি
হেই লোছ।
সে ছিলো
হেই লোছ।
কাঁসার বাটি
হেই লোছ।
রসের নীলা
হেই লোছ।
আইজ ক্যানো তোর
হেই লোছ।
যইবান ঢিলা
হেই লোছ।
ছিলা যইবন
হেই লোছ।

www.pathagar.com

এ্যাকদিন মারলি
হেই লোছ।
সাত দিন জ্বর
হেই লোছ।
আল্লারে আল্লা
হেই লোছ।
মারেক মওলা
হেই লোছ।
মওলার বাণী
হেই লোছ।
আমরা জানি
হেই লোছ।
জানির জানি
হেই লোছ।
বছর দুই
হেই লোছ।
মারতি কুটতি
হেই লোছ।
ঘাম বরিষণ
হেই লোছ।
চুয়ায় গোটা
হেই লোছ।
গোটা সিদ্ধি
হেই লোছ।
পরম ধন
হেই লোছ।
মন জুড়ায় না
হেই লোছ।
জুড়ায় হিয়া
হেই লোছ।
পন মারাইছো
হেই লোছ।

www.pathagar.com

হুগলি যাইয়া
হীরা নোটি
হুগলি আছে
হেই লোছ।
হীরা নোটি
হেই লোছ।
তার মুখহান
হেই লোছ।[৩২]

শিবগঞ্জের লোকছড়া

শিবগঞ্জ বগুড়া জেলার লোকজ উপাদান সমৃদ্ধ একটি উপজেলা। এই শিবগঞ্জেই রয়েছে ইতিহাস ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তির তীর্থভূমি প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর রাজধানী মহাস্থান। মহাস্থানে রয়েছে হযরত শাহ সুলতান বল্‌খী মাহী সাওয়ার (রহ.) এর মাযার শরীফ। শিবগঞ্জের প্রাচীনত্বের কারণেই এখানকার প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি পাড়া যেন লোকজ সম্পদের এক একটি আকর। তবুও নির্দিষ্ট কিছু গ্রাম নির্ধারণ করে লোকজ উপাদান সংগ্রহের জন্য মাঠে নেমেপড়ি ০৯-০৯-১১ ইং তারিখে প্রথমেই মহাস্থান মধ্যপাড়ায় এসে একটি মনিহারি দোকানে গিয়ে শান বাঁধা বেঞ্চের উপর বসলাম। সময় বিকাল চারটা। শুক্রবার টিভিতে সিনেমা থাকায় তখনো ছোট ছেলে মেয়েসহ অন্যান্য লোকজনের বেশির ভাগই সিনেমা দেখায় ব্যস্ত ছিল। তবু টিভিতে বিজ্ঞাপন কিংবা সংবাদের ফাঁকে কয়েকজন ছেলেমেয়ে বাইরে এসে দোকানের সামনে খেলা শুরু করল। খেলার সাথে সাথে কখনো হাত তালি দিয়ে কখনো উপুড় হয়ে ছড়া বলছিল আর নিজেদের মধ্যে নানান রকম অঙ্গভঙ্গি করে খেলছিল। হারজিত নিয়ে কখনো দুই পক্ষ ঝগড়াও করছিল। দোকানদারকে আমি আগেই সবকিছু খুলে বলছিলাম। সে নিজে থেকে কয়েকজনকে ডেকে এনে আমার কাছে বসিয়ে দিল। তারপর ওদের কাছ থেকে একটার পর একটা ছড়া শুনে ডায়েরিতে লিখে নিতে থাকলাম। ইতোমধ্যে দোকানে সদাইপাতি কিনতে আসা লোকজনও পরিবেশ বুঝে নিজের জানা ছড়াটিকে বইয়ের পাতায় ছাপার মাধ্যমে অমর করে রাখার সুযোগ হাতছাড়া না করে অবলীলায় বলা শুরু করল। সন্ধ্যা নেমে আসায় আগামীকাল আবার আসব বলে আজকের মত বিদায় নিলাম। সংগৃহীত ছড়াগুলো নিম্নরূপ :

১. পুঁই পুঁই পুঁইয়ের পাতা
আইচে শালার ব্যাটা
এবার আইলে ধরম ঝাঁটা
আসনে বিয়ান বসেন গা
পান্তা ভাত খান গা
আপনের মিয়া ঘাটত গ্যাচে

www.pathagar.com

মানুষের সাথে কতা কচে
কতা কচে কি জাত গ্যাচে?

২. বেদের মেয়ে জোসনা
ফুলের কি বাসনা
এক ঘুঘুর তিনমাথা
যায় ঘুঘু কলিকাতা
কলিকাতার ভিতরে
ধান খায় কইতরে
কিস কিস কিসের পাতা
তার সাথে কি কতা?[৩৩]

৩. মঞ্জুয়ারা ভাতের কাড়া
ভাত লিয়া বেড়ায় সারা পাড়া
মাও কয় কি জ্বালা
বাপ কয় বিয়ে দে ফালা
নানি কয় কাক দিয়া
নানা কয় হামাক দিয়া
নানি কান্দে ফেরত।

৪. আমার নাম মিতা
মাথায় দিব ফিতা
কানে দিক ফুল
ঝুমকো জবার ফুল।

৫. পাশের বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলিনা
তার সাথে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি
তাদের বাড়ি দোতালা
করে শুধু ইশারা
তাদের বাড়ি তিনটি বৌ
বড় বৌ রান্না করে
ছোট বৌ খায়
মেজ বৌ রাগ করে
বাপের বাড়িত যায়

www.pathagar.com

বাপ দিল লাত্তি
খালার বাড়িত যাচ্চি
খালা দিল চড়
গাওত আলো জ্বর।

৬. মাগো মা পায়ে পাড়ি
বৌ এনে দাও খেলা করি
বৌয়ের মাথায় লম্বা চুল
এনে দেব গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলের গন্ধ
হাই ইস্কুল বন্ধ
হাই ইস্কুলে যাবো না
বেতের বাড়ি খাবোনা
বেত গেল ভাইঙ্গে
মাস্টার বাবু গেল কাইন্দে।

৭. ও মিলো ছিলো ছালা
হ্যাজ বয় লেডি বয়
পিন পান সাতসমুদ্র পেড়িয়ে
ভাবি এলো বেড়িয়ে
ভাইয়াকে বলো না
চিড়াখানায় চলো না
চিড়াখানায় হাতি নাই
আমার কোন সাথি নাই
সাথি ছাড়া বাঁচবো না
কোন মানা মানবো না।[৩৪]

৮. ওমনি ঘোমনি
সারে গাছে মোমনি
সার খায়ে মকমকায়
হাড়ির দিকে চোক পাকায়
কাটু আচে কাটু নাই
বাইটে দেবার মানুষ নাই।

৯. ইচা মিচা চামচিকা
চামের আগাত গর

www.pathagar.com

এলো হাতি সঙ্গে রাজা
গাভিন বলে চোর।

১০. এত্তু এ্যানা বরই গাছ
বরই থুক্ থুক্ করে
টোনা পাখি ঠোকর দিলে
মোট্‌টি বরই পড়ে।

১১. মাগো মা
ঐ পাড়ার ছেলে মিয়ে
পিটা ভেজেচে
পিটার মোদে ল্যাকটা গু
চ্যাকটা লেগেছে
ধা থু থু থু
উহ্ বড্ড লেগেছে।

১২. সুলতানা বিবিয়ানা
সায়েব বিবির বৈঠক খানা
আজ বাড়িতে যাইতে
পান সুপারি খাইতে
পানের আগা মৌরি কাটা
হাতে পায়ে রক্তের গোটা
সায়েব বিবি পাইল্যা
বুট্টুস ...।[৩৫]

১৩. আছিল ক্যাশ
খাইয়ে শ্যাষ
নাই ক্যাশ
ধরছি ভ্যাস
আল্লা দিচ্‌লো
ভগমান লিচ্‌লো।

১৪. পুঁটি মাছ খেলা করে
নতুন পানিতে
তোমার আমার খেলা হবে
বাসর ঘরেতে।

১৫. ভাব গাছে ভাব নাই
আছে শুধু বাঁধা
যে মেয়েটির প্রেম নাই
সে একটি গাঁধা।

www.pathagar.com

১৬. বাড়ির পাচে ধান গাছ
লম্বা লম্বা শিষ
তুমি বন্ধু না এলে
আমি খাবো বিষ

১৭. রান্না ঘরে বসে আমি
চোখে লাগে ধুমা
এমন সময় এসে তুমি
গালে দিলে চুমা।

১৮. পুকুর পাড়ে বসে তুমি
মিষ্টি মিষ্টি হাস
সত্যি করে বলো তুমি
কাকে ভালো বাস?

১৯. বেসতী নারী যারা
ঘোরে তারা পাড়া পাড়া।

২০. তোমার গুটি লাল
আমার গুটি লাল
দুই গুটিতে যুক্তি করে
রবে চিরকাল।

২১. আকাশ থেকে পইলো খাইটে
সেলিনার মাও মইলো ওলান ফাইটে।[৩৬]

গতদিনের কথা অনুযায়ি ১০-০৯-১১ ইং তারিখ যথাসময়ে এসে উপস্থিত হই মহাস্থান মধ্যপাড়ায়। আজ দোকানে নয়। একটু খানি দূরে বাঁশঝাড়ের নীচে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা টুল চেয়ে নিয়ে বসে পড়লাম। গতকালের পরিচয়ের সূত্র ধরে মীম আলমকে সামনে পেয়ে গেলাম। ওর মাধ্যমেই অন্যদেরকে ডেকে এনে খেলা শুরু করতে বললাম। আজকেও খেলার সময় বলা ছড়া শুনে লিখে নিলাম। আর কয়েক জনকে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে গল্প এবং আড্ডার ফাঁকে বলা ছড়াগুলো ডায়েরির পাতায় লিখে নিলাম।

২২. হা ডু ডু খেলব
তবলা বাজাব
তবলার নীচে
মোমবাতি জ্বলে
কাঁচা ব্যাল খাবো না

www.pathagar.com

পাকা ব্যাল খাবো
কনের মায়ের দ্যাড় ঠাং
কনের মায়ের নাই ঠ্যাং।

২৩. গোলাপ ফুল তুলতে গিয়ে
হাতে লাগে কাঁটা
বন্ধুর কতা মনে হলে
মনে লাগে ব্যাথা।[৩৭]

২৪. টু টু টু সরকার
গাছে ওঠা দরকার
গাছ থেকে পড়ে গেলে
ওষুধের দরকার
ওষুধ নাই ঘরে
ট্যাকা চুরি করে
সাতদিন পড়ে
জেল খাইটে মরে।

২৫. হেল কুত্ কুত্ তারে নারে
ঘু ঘু ডাকে বারে বারে
ক্যারে ঘু ঘু তুই ডাকিস ক্যা
নিন্দের ছোলেক তুলিস ক্যা
নিন্দের ছোলের প্যাক্না
ধরে মারমু থ্যাকনা।[৩৮]

২৬. আই এ্যাম সরি
লম্বা লম্বা দাড়ি
ছোট খাটো মোছ
তুই আমার দোস্।
আমার বাবা অফিসার
আমার মা ডাক্তার
আমার বোন নাচ্নেওয়লি
আমার ভাই ঢিসিম ঢিসিম।

২৭. একে ঋতু
দুইয়ে ডবল টু
তিনে ঘোড়ায় চড়ি

www.pathagar.com

চারে চারপাতা
ধিন ধিন ধিন
পাঁচে কদম ফুল
ঝুমকো ধরে
ছয়ে ছিলিপ কাটে
সাতে মাথা ঘোরে
বন বন বন।
আট এ আসেন তো দুলাভাই
বসেন তো চিয়ারে
শরবত গুলিতে
কি কি লাগে
দুধ আর চিনি
নয় এ নাঙ্গল
দশে দামড়া
এগারোয় এঁড়ে
বারোয় বেড়ে
তেরোয় তেড়ে
চৌদ্দয় চান্দর
পনেরোয় পান খিলি
ষোলোয় গান গাই
সতেরোয় ইঞ্চি
আঠারোয় বাঁশের কঞ্চি
উনিশের কন্যা
বিশের বিয়ে
একুশের একমাস
বাইশের দুই মাস
তেইশে তিনমাস।

২৮. তেজ তেজ তেজ পাতা
নেভির বিয়ে কলিকাতা
কলিকাতার ভিতরে
ধান খায় কইতরে
কে কে যাবে

www.pathagar.com

আটটি কুকুর যাবে
একটা কুকুর যাবে না
নেভির বিয়ে হবে না
নেভির বাপ দারোগা
আন্ডা পাড়ে বারোটা
একটা আণ্ডা নষ্ট
নেভির বিয়ের কষ্ট।

২৯. চোখ করে মিটি মিটি
মিষ্টি হাসি হাসো
সত্যি করে বলো তুমি
কাকে ভালোবাস।[৩৯]

৩০. দাঁত করে চিক্ চিক্
চাঁদ দেয় আলো
কাজীপুরের মিয়েরা
প্রেম জানে ভালো।

৩১. গাছে গাছে টিয়া পাখি
করে টিউ টিউ
আমি তোমায় ভালোবাসি
ও খড়াবুড়।[৪০]

৩২. আকাশেতে ওড়ে পাখি
নিচে তার ছায়া
ভালোবাসা ভেঙে গেলে
থাকে শুধু মায়া।

৩৩. ফুল ফোটে বাগানে
প্রেম হয় গোপনে
প্রথম প্রেম ভেঙে গেলে
সুখ হয় না জীবনে।

৩৪. আলু খাইতে বালু বালু
তরমুজ খাইতে পানি
গত রাইতে স্বপ্ন দেখি
তুমি আমার স্বামী।

৩৫. কাঁঠালের পাতা হিয়া হিয়া
কলমের শিষ
তুমি বন্ধু চলে গেলে
আমি খামু বিষ।

www.pathagar.com

৩৬. গুড় মিষ্টি চিনি মিষ্টি
আরো মিষ্টি মধু
তার চেয়ে বেশি মিষ্টি
বাসর ঘরের বধু।[৪১]
৩৭. তুমি যাও সাইকেলে
আমি যাই হেঁটে
তোমার সাথে দেখা হবে
ইস্কুলের গেটে।
৩৮. হাতে নাই আংটি
মনে নাই শান্তি
বারে বারে মনে পড়ে
তোমার ঐ নাম টি।
৩৯. কুমড়ার পাতা খস্ খস্
লাইয়ের পাতা নরম
তোমার গালে চুমা দিতে
আমার লাগে শরম।
৪০. বাড়ির পিছে পিয়ারা গাছ
পিয়ারা ধরে না
বন্ধুর কাছে শুবার গেলে
বালিশ লাগে না।
৪১. হাটে গেলাম বাজারে গেলাম
কিনা আইনল্যাম বস্তা
শুদামপুরের ছেলেরা
মুলোর মতো সস্তা।[৪২]

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী নিবেদন দাস, পিতা : মৃত ফকির চান দাস, বয়স : ৫০, গ্রাম : তেতুলিয়া, পো : কুন্দুগ্রাম, থানা: আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৬/০৮/১১
২. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, পিতা : মোঃ তবিবর রহমান, বয়স : ৫৫, গ্রাম : দামরুল, পো: হাটকড়ই, থানা : নন্দীগ্রাম সংগ্রহ : ২২/০৮/১১
৩. সুকিমন বেওয়া, স্বামী : মৃত আবু তালেপ আলী, বয়স : ৮০, গ্রাম : পারশন, পো : চাঁপাপুর, থানা : নন্দীগ্রাম সংগ্রহ : ২৮/০৮/১১
৪. শ্রী চিত্তরঞ্জন প্রাং, পিতা : শ্রী তারিনি কান্ত প্রাং, বয়স : ৫৩, গ্রাম : বুড়ইল, পো : ঐ, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহ : ২২/০৮/১১
৫. গুলশান আরা সিম্মি, পিতা : মোঃ এনামুল হক, বয়স : ১৮, গ্রাম : পাঁচখুর, পোস্ট : তিনদিঘী হাট, ইউনিয়ন : কালাই, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

www.pathagar.com

৬. মোছাঃ রুবিয়া বেওয়া, স্বামী : মৃত নুরুল হুদা, বয়স : ৬৫, গ্রাম : পিলকুঞ্জ, পোস্ট : তিনদিঘি হাট, ইউনিয়ন : কালাই, উপজেলা : কাহালু, জেলা বগুড়া।

৭. মোঃ আসাদুল আকন্দ, পিতা : মৃত ছামেদ আলী, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, পেশা : কৃষি, ডেকোরেশন মিস্ত্রি, বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত, গ্রাম : মেন্দিপুর, পোস্ট : নারুয়ামালা, ইউনিয়ন : নারুয়ামালা, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া। তাং- ০৮-০৭-২০১১

৮. কাজী নজরুল ইসলাম (হিটলু কাজী), পিতা : মরহুম কাজী আজিজুর রহমান, বয়স : ৬০ বছর, গ্রাম : গাবতলী, পোস্ট : গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

৯. কাজী নজরুল ইসলাম (হিটলু কাজী), পিতা : মরহুম কাজী আজিজুর রহমান, বয়স : ৬০ বছর, পেশা : ডিপ্লোমা সার্ভেয়ার (অবসর প্রাপ্ত), গ্রাম : গাবতলী, পোস্ট : গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

১০. মোঃ গফুর সরদার, পিতা : মৃত ফায়েজ সরদার, বয়স : ৭২, পেশা : কৃষি, গ্রাম : দামগারা, পো : ভাটরা, ইউনিয়ন : ভাটরা। সংগ্রহের তারিখ : ১০/০৩/১২

১১. রওশন আরা, স্বামী : খোরশেদ আলম, বয়স : ৪০, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : দামগারা, পো : ভাটরা, ইউনিয়ন : ভাটরা, সংগ্রহের তাং : ১০/০৩/১২

১২. নাম : বীপিন চন্দ্র কবিরাজ, পিতা : মৃত হরচন্দ্র কবিরাজ, বয়স : ৯৪, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : বামনগ্রাম, পো : ভাটরা, ইউনিয়ন : ঐ, সাক্ষাতের তাং : ১০/০৩/১২

১৩. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (৬০), অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, সোনালী ব্যাংক, সরকারি আযিযুল হক শাখা, বগুড়া। গ্রাম : চিঙ্গাসপুর, মহাস্থান, উপজেলা : শিবগঞ্জ। সংগ্রহ স্থান : মহাস্থান মাযার। তারিখ : ২৪/০৬/২০১২

১৪. মোঃ আলিমুদ্দিন (৫৫), গ্রাম : বাঘোপাড়া, গোকুল, মহাস্থান। পেশা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিবারণ চন্দ্র সরকার (৫০), পেশা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। গ্রাম : চিঙ্গাসপুর, মহাস্থান। সংগ্রহস্থান : মহাস্থান মাযার, তাং ২৪/০৬/২০১২ইং

১৫. মোঃ ইয়াছিন মোল্লা (৬০), গ্রাম : টোলা, শেরপুর, পেশা : ব্যবসা। সংগ্রহ তাং ০৮/০৯/১২ইং স্থান- খেরুয়া মসজিদ।

১৩. মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন (৫০), গ্রাম : টোলা, শেরপুর, সংগ্রহ তাং- ০৮/০৯/১২ ইং, সময় বিকাল-৪.৩০, স্থান : টোলার মাযার।

১৪. মোঃ কানু মিয়া, পিতা : মোঃ আমজাদ আলী মিয়া, পেশা : কৃষি, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি পাস। ঠিকানা : খন্দকার পাড়া, ওয়ার্ড : ৯, পোষ্ট : শেরপুর, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া।

১৫. গুলশান আরা সিম্মি, পিতা : মোঃ এনামুল হক, বয়স : ১৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ.এস.সি, গ্রাম : পাঁচখুর, পোস্ট : তিনদিঘি হাট, ইউনিয়ন : কালাই, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

১৬. শ্রী অনন্ত কুমার দাস, পিতা : মৃত ইন্দ্রেশ্বর দাস, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি, পেশা : কীর্তন, গ্রাম : কামারচট্ট, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

www.pathagar.com

১৭. মোঃ ইমরান খান, পিতা : মোঃ তফিজ উদ্দিন সরকার, বয়স : ১৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা: দশম শ্রেণি, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পীর গাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

১৮. মোঃ আরিফুল ইসলাম মণ্ডল, পিতা : মোঃ আব্দুল হামিদ, বয়স : ১২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৯ম শ্রেণি, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পীরগাছা, ইউইনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

১৯. মো : সোলেমান মোল্লা, পিতা : মৃত : রমজান আলী মোল্লা, বয়স : ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, পেশা : দিন মজুর, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পীরগাছা, ইউ : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২০. নিরঞ্জন দেবনাথ। পিতা : নরেন্দ্র নাথ, বয়স : ৪১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ.এস.সি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন: রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২১. মোছা : হাবিবা আকতার, পিতা : আঃ মতিন আকন্দ, বয়স : ৫ বছর, গ্রাম : জয়ভোগা, পোস্ট : গাবতলী, ইউনিয়ন : গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২২. শ্রী প্রশান্ত মজুমদার, পিতা : শ্রী প্রমথ মজুমদার, বয়স : ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বাক্ষর জ্ঞান, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২৩. মোঃ জাকির হোসেন মোল্লা, পিতা : মোঃ খোকা মোল্লা, বয়স : ২২ বছর, পেশা : ব্যবসা, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২৪. মোছা : শামসুন নাহার, পিতা : মো : শাহিন, বয়স : ১২ বছর, গ্রাম : কামারচট্ট, পোস্ট: পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া। ২২/০৬/১২

২৫. মোছা : রোকসানা খাতুন ববি, পিতা : মো : আব্দুস সাত্তার, বয়স : ১০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : জয়ভোগা, পোস্ট : গাবতলী, ইউনিয়ন : নারুয়ামালা, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২৬. মো: সালেক উদ্দিন, পিতা : মৃত : ছহির উদ্দিন আকন্দ, বয়স : ৭২ বছর, পেশা : শিক্ষকতা (অবসর প্রাপ্ত), গ্রাম : তরফমেরু, পোস্ট : গাবতলী, ইউনিয়ন : গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া। তারিখ : ০৬/০৭/১২

২৮. মোছা : মৌমিতা খাতুন, স্বামী : মো : এনামূল হক, বয়স : ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাটফুলবাড়িয়া, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

৩০. নাম : রূপালী আক্তার, পিতা : আজাহার আরী, পেশা : গৃহিণী, বয়স : ২৯, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাস। বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : চালাপাড়া, উপজেলা : ধুনট, জেলা : বগুড়া।

৩১. মোছাঃ আকলিমা খাতুন, পিতা : মোঃ আকবর হোসেন, বয়স : ৯, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, পেশা : ছাত্রী, গ্রাম : মাটিহাঁস, পো : কুমড়া পুন্ডিত পুকুর, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহের তাং: ১০/০৩/১২, সময় : দুপুর ১.১৫। (১-৮নং ছড়ার কথক)।

www.pathagar.com

৩২. ১. নাম : সুবাস চন্দ্র পাল, পিতা : শ্রী সুদেবচন্দ্র পাল, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ আড়িয়া পালপাড়া, পোষ্ট : ডেম জানী, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া, পেশা : কুমার (মৃৎপাত্র প্রস্তুতকারি), বয়স : ৫৮।

২. নাম : মর্জিনা খাতুন (১২), পিতা : নূরুল ইসলাম, গ্রাম : আড়িয়া বাজার, পোষ্ট : ডেম জানী, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলা : বগুড়া,

৩৩. মোছাঃ শিরিন আক্তার, পিতা : মোঃ আব্বাস উদ্দিন, বয়স : ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৭ম শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৩৪. মোছা ঃ উম্মে হাবিবা পিপাসা, পিতা : মোঃ আনিসুর রহমান, বয়স : ১১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি, পেশা : ছাত্রী, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৩৫. নাম : মোঃ মেহেদী হাসান, পিতা : মোঃ শাজাহান আলী, বয়স : ১৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১০ম শ্রেণি, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : যাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৩৬. মোঃ রায়হান, পিতা : মোঃ হান্নান মিয়া, বয়স : ১৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ।

৩৭. মীম আলম, পিতা : মোঃ আনিছার রহমান, বয়স : ৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ২য় শ্রেণি, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৩৮. মোঃ পিয়াস বাবু, পিতা : মোঃ সাইফুল ইসলাম, বয়স : ৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ২য় শ্রেণি, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৩৯. মোছা ঃ জ্যোতি খাতুন, পিতা : মোঃ ফেরদৌস আলম, বয়স : ৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি, পেশা : ছাত্রী, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৪০. শাবলী, পিতা : মোঃ সাহেব আলী, বয়স : ১২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি, পেশা : ছাত্রী, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলাঃ শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৪১. মোছাঃ সীমা খাতুন, স্বামী : মোঃ শামসুল হক, বয়স : ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর জ্ঞান, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : জাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া

৪২. মোছাঃ ফাহিমা খাতুন, পিতা : মোঃ ফাহিম আলম, বয়স : ১২ বছর, পেশা : ছাত্রী, গ্রামঃ মহাস্থান মধ্যপাড়া, পোস্ট : যাদুঘর, ইউনিয়ন : রায়নগর, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প

প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণের ভেতরেও কোনো কোনো সময় মানুষের শৈল্পিক সত্তা নিজেকে উন্মোচনের সুযোগ অন্বেষণ করে থাকে। লোকশিল্প প্রসঙ্গে কথাটির যথার্থতা প্রযোজ্য। লোকশিল্পের সৃষ্টি মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনে আর এই ব্যবহারিক উপকরণাদির মধ্যে লোকসমাজের নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটেছে। ঘরগেরস্থালির নিত্যকার সামগ্রী হাঁড়ি-পাতিল-সরার সঙ্গে একত্রে নির্মিত হয় শৈল্পিক গড়ন ও চিত্রায়ণ সমৃদ্ধ শখের হাড়ি ও সরা। লক্ষণীয়, যাঁরা হাড়ি গড়েন তাঁরা আবার চিত্রণের কাজও করেন। একই মানুষ আবার ধর্মজ প্রতিমা ও খেলনা দুই-ই গড়েন সমানতালে। তাঁদের সৃজনকর্ম কেবল আকার সদৃশ না থেকে হয়ে ওঠে বাস্তবের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। জীবন্ত মানুষের চেয়েও কখনও কখনও তা বহন করে গভীর ভাব-গড়িমা। জীবন, ধর্ম, প্রয়োজন, আনন্দ, বেদনা সবই যেন এ শিল্পের ঘূর্ণায়মান চাকার বৃত্তে ঘুরে ফিরে সঞ্চারমান। এরই ভেতর সমাজ মানসিকতা চরিত্র ও কৃষ্টি পরিচয় নিহিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে এ চক্রে সমাজের জীবন ও কর্মপ্রবাহ পরিচালিত।

বাংলার লোকশিল্পের অত্যতম নিদর্শন মৃৎশিল্প। মাটি দিয়ে প্রস্তুতকৃত শিল্পবস্তুই হচ্ছে মৃৎশিল্প। বাংলার লোকশিল্পের আওতায় যেসব মৃৎশিল্পের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাটির পুতুল, ঘট, প্রতিমা, তৈজসপত্র, রন্ধনপত্র, চিত্রিত সরা, ফুলদানী ও বিভিন্ন খেলনাসামগ্রী উল্লেখযোগ্য।

লোকশিল্পের উদ্ভব ও বিস্তারের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত এ শিল্প গড়ে উঠে সহজলভ্য উপাদান-উপকরণ প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে। এজন্যে দেখা যায় যেখানে বাঁশ বেতের সহজলভ্যতা আছে সেখানে এ জাতীয় শিল্প গড়ে উঠেছে। আর যেখানে কাঠ, শোলা বা শাঁখের সহজ প্রাপ্তি সেখানে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। এজন্য দেখা যায় সব পরিবেশে সব শিল্প গড়ে উঠে না। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটির সহজলভ্যতার কারণে বাংলার নদী বিধৌত অঞ্চলে এ শিল্পের প্রসারতা ঘটেছে। তবে বর্তমানে তা নিম্নমুখী। মাটির কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসমাজ বাংলার কুমার বা কুম্ভাকার নামে পরিচিত। এদের উপাধি পাল এবং বাংলার প্রায় সব অঞ্চলে এদের বসতি পালপাড়া এবং কুমারপাড়া নামে অভিহিত। এরা ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেকেই পেশা হিসেবে মৃৎশিল্পকে বেছে নিয়েছে, তবে তার সংখ্যা নগণ্যই।

www.pathagar.com

বগুড়া জেলার নব্যতম উপজেলা শাজাহানপুরের আড়িয়া ইউনিয়নের পালপাড়া মৃৎশিল্পের জন্য অত্র অঞ্চল উল্লেখ্যযোগ্য। পাতিল, ঠিলা, পূজার ঘট, ধুপতী, প্রদীপ, গাছা, রসের হাঁড়ি, ঠিলা, কলস, দইয়ের গ্লাস, সরা, ডুকি, ডুঙ্গি, ঢাকনা, কাসা, ঢোকসা, গামলা, চারী, তাওয়া, সাতখুপি, ছাইদানী, ফুলদানী, হরেক রকম খেলনা আরও অনেক ধরনের মৃৎপাত্র তৈরিতে এখানকার মৃৎশিল্পীরা-পারদর্শী এমনি বলছিলেন আড়িয়া পালপাড়ার মৃৎশিল্পী সুদের চন্দ্র পাল। তিনি আরও বলেন যে কোনো ডিজাইনের যেকোনো সাইজের দ্রব্য দেখলে হুবহু সেই দ্রব্য/পণ্য তৈরি করতেও তারা সমান দক্ষ। মৃৎশিল্প পরম্পরায় বহমান একটি গোষ্ঠী শিল্প। কুমার পরিবারের নারী-পুরুষ বৃদ্ধ সকলেই এর সাথে সংশ্লিষ্ট। জন্মের পর থেকে খেলার ছলেই কাদা মাটির গোলা হাতে পাল পরিবারের সন্তানরা নিপুণ এই মৃৎশিল্পকর্মের অংশ হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যিক পেশাকে টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে এরা বিবাহ প্রথা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। কুমার পরিবারের যেসব মেয়ে হাতের কাজে (মাটির কাজকে বলা হয়েছে) যত পারদর্শী বিয়ের ক্ষেত্রে সেই মেয়ের তত কদর এবং চাহিদা বেশি– বলছিলেন নিভা পাল। কারণ মৃৎশিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক যে পর্যায়গুলো আছে তার মধ্যে ভারি ও শারীরিক শ্রমের কাজগুলো ছাড়া বাকি সব কাজে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পুতুল ও খেলনা সমগ্রী তৈরি ও রং করার কাজগুলো অধিকাংশ ঘরের মেয়েরাই করে।

বাংলাদেশের সবস্থানেই মৃৎশিল্প প্রস্তুতের বিভিন্ন পর্যায় যেমন : মাটি প্রস্তুতকরণ, চাকে মাটির মণ্ডের আকৃতি দান, ভাটায় পোড়ানো, রং করার প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রায় একই রকম। তথাপি আড়িয়া পালপাড়ার কুমারদের রয়েছে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রক্রিয়া, রয়েছে প্রত্যেকটি পর্যায়ের পৃথক পৃথক স্থানিক বৈশিষ্ট্য। এখানকার কুমাররা চিলের বিল থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় মাটি– স্থানীয় ভাষায় যাকে বলি মাটি বা এতি মাটি বলা হয়, সে মাটি সংগ্রহ করে। স্থানীয় নদী এবং বিলসমূহ তাদের প্রয়োজনীয় নাব্যতা হারানো এবং স্থানীয় বালু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে অগভীর স্তরের মাটির কারণে বর্তমানে মৃৎশিল্পে মাটি সংকট তৈরি হয়েছে ফলে কাঙ্ক্ষিত মাটির ব্যয়ও বেড়ে গেছে। যে মাটি পূর্বে প্রতি ভ্যান ২০-৩০ টাকায় কেনা যেত সেই মাটি এখন কিনতে হয় ১৫০-৩০০ টাকায়। মাটি সংগ্রহের পর তাতে বালুর মিশ্রণে পা দিয়ে কোচা হয়। এরপর মিশ্রিত মাটি থেকে আঁকিড়, খোলাসহ অপ্রয়োজনীয় সকল উপাদান বেছে বাদ দিয়ে মসৃণ মণ্ড তৈরি করা হয়। তৈরিকৃত মণ্ড থেকে ম্যাগ (কাঠ দিয়ে তৈরি ধারালো অস্ত্র বিশেষ) দিয়ে কেটে প্রয়োজনানুপাতিক গোলা বানানো হয়।

মাটির দ্রব্য উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার চাক বা চাকা। গোলাকৃতির ঘূর্ণায়মান এ প্রযুক্তি একান্তই কুমার সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ। বর্তমানে সময়ের সত্বর গতিকে সঙ্গ করতে কুমারদের চাকে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ চালিত মটর। ফলে বেগ পেয়েছে উৎপাদনকার্য। মাটির মণ্ড চাকে স্থাপন করে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উদ্দিষ্ট দ্রব্যের আকার দিয়ে এবং সুতা দিয়ে কেটে চাক থেকে পৃথক করা হয়। এভাবে এক ভ্যান মাটি থেকে ২০০টি মাঝারি আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি অথবা ১০০০টি গ্লাস তৈরি করা যায়। আকৃতির তারতম্যে এ সংখ্যা কম-বেশি হয়। চাক থেকে নামানো পাত্রগুলো রাখা হয় ঘরের

www.pathagar.com

ঝাপায়। গোলাকৃতির পাত্রের আকার দিতে বেইলা নামক কাঠের তৈরি একধরনের দ্রব্যের ব্যবহার করা হয়। সর্বাঙ্গ সমান করা হয় ফ্যাশন নামক বস্তু দিয়ে। নকশার প্রয়োজনে বাঁশের তৈরি কাইন ব্যবহার করা হয়। সাধারণত মৃৎশিল্পে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হয়। রঙের জন্য ইটের গুড়া, তেঁতুল বীচি, বেলের আঠা, মেঠে সিদুঁর, পিউরি, চকের গুড়া, ইত্যাদি সহযোগে মৃৎদ্রব্যাদি রং ও গ্লেজের কাজ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক এসব দ্রব্যের অপ্রতুলতার কারণে অনেকে বাজারের কৃত্রিম রঙও ব্যবহার করছেন। মুখ্যত আড়িয়া পালপাড়া অত্র অঞ্চলের দধি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পাত্র সরবরাহ করে তাঁদের শিল্পকর্ম এবং জীবনযাপন সচল রেখেছে। তৈরিকৃত পাত্র সমূহ দু'দিন রোদে রেখে শুকানো হয়। তারপর বড় আকৃতির দধি পাত্র ১০০০-১৫০০ টি অথবা ছোট আকৃতির গ্লাস হলে ৪০০০-৫০০০টি একত্রে ভাটায় পোড়ানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাত্রগুলো সাজাতে সময় লাগে দু'দিন, পোড়াতে হয় একদিন ধরে এবং নামাতে সময় লাগে আরও দু'দিন। অবশেষে পাত্রগুলো বাজারজাতকরণের জন্য খরিদ্দারের সম্মুখীন করা হয়। তুলনামূলকভাবে বাজারে প্রাপ্ত অপরাপর উপকরণজাত পণ্যের চেয়ে কম ব্যয়বহুল হওয়ায় ক্রেতাসাধারণ বিশেষত অত্র অঞ্চলের দধি প্রস্তুতকারী এবং বিক্রেতা পর্যায়ে মৃৎপাত্রের চাহিদা আজ অবধি একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান। কিন্তু নগরসভ্যতার বিস্তার এবং শহরমুখিতার কারণে সাধারণ মানুষ শেকড় তথা প্রকৃতিজাত দ্রব্যের থেকে ক্রমশ যন্ত্রসভ্যতা এবং কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে। ফলে বিমুখ হয়েছে মৃৎশিল্প থেকেও। এর প্রভাব পড়েছে পালপাড়াগুলোতেও। বংশানুক্রমিক মৃৎকর্মের সাথে যুক্ত অনেকেই আজ পেশা ছেড়ে বিকল্প পেশায় যাওয়ার প্রয়াসে নিয়ত। এর কারণ অনুসন্ধানে দৃশ্যমান হয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিকল্প পণ্যের সহজ লভ্যতা, যোগান অনুযায়ী চাহিদা পণ্য সরবারাহে ঘাটতি, অর্থনৈতিক দীনতা, পুঁজির অভাব, মাটির মূল্য বৃদ্ধি অন্যতম। আগে জলাভূমি, খাল, হাওড়, বিল ইত্যাদি স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করা যেতো। বর্তমানে দ্রুত নগরায়ণের ফলে জলাশয় ও নিম্নাঞ্চল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতো প্রতিকূলতার মাঝেও যারা তাদের ঐতিহ্যিক পেশার চাক সচল রেখে সমাজ দেশ তথা জাতিগত ঐতিহ্যের ধারা বহমান রেখেছেন তারা সত্যিই বাহবা পাবার দাবি রাখেন। বৈশ্বিক আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে পৃথিবীতে আজ যে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে চলেছে তার অন্যতম উপাদান-উপকরণ যেমন : প্লাস্টিক, পলিথিন, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ঐতিহ্যিক মৃৎশিল্পের ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের এখনই উপযুক্ত সময়। তবেই বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির বহমান ধারায় নির্মিত মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য তার স্ব-অবস্থানে বিদ্যমান থাকবে এ আশা সকল মৃৎশিল্পীর হৃদয়জাত।[১]

২. তাঁতশিল্প/কম্বল শিল্প

আদমদিঘি উপজেলা সদর থেকে সোজা পূর্ব দিকে মুরইল বাজার। এই মুরইল বাজার থেকে প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে শাঁওইল গ্রাম। এই গ্রামের মাঝখানে একটা বাজার আছে। বাজারটার নাম শাঁওইল বাজার। এই গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ

www.pathagar.com

একটা পেশার সাথে জড়িত তা হলো কম্বল তৈরি, সুতা তৈরি এবং দড়ি (রশি) তৈরি। তবে সবচেয়ে বেশিরভাগ মানুষ বা পরিবার কম্বল তৈরি এবং কম্বলের সুতা প্রস্তুতের কাজ করে। তারা এই পেশার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাই এই গ্রামকে কম্বল গ্রাম নামে ডাকা হয় বা পরিচিত। গ্রামটি বর্তমানে সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত। গ্রামের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের এই পেশার হালচাল।

চড়কায় কম্বলের সূতা তোলা হচ্ছে

কম্বল তৈরির জন্য যে সুতা ব্যবহার করা হয় তা তারা শাঁওইল বাজার থেকে কিনে থাকে। শাঁওইল বাজারে সারা বাংলাদেশ যেমন– ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন। তাদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সুতা কিনে। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আবার তাঁতিরা সুতা কিনে। সুতা সাধারণত মণ বা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। কম্বল তৈরির জন্য সুতাগুলো ৮ হাজার থেকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা মণ বিক্রি হয় আর দড়ি বা রশি তৈরির জন্য সুতাগুলো দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা মণ বিক্রি হয়।

বেশির ভাগ সুতা উল বা কটন। তবে গার্মেন্টস-এর ঝুট সুতা যেমন বিভিন্ন পোশাক বা সোয়েটার থেকে বের করা সুতা বাজারে আসে বেশি। সুতা যখন কেনা হয় তখন তা প্রায় অগোছালো অবস্থায় থাকে। তাই তা ললি বা সুচিতে (সুতা প্যাঁচানো লাটাই) প্যাঁচানো হয় চড়কির দ্বারা। চড়কিতে প্যাঁচানোর পর তা আবার চকড়াতে প্যাঁচানো হয় কম্বল বোনার উপযুক্ত করে। চড়কার দ্বারা চড়কি ঘুড়িয়ে ববিনে (প্লাস্টিকের তৈরি সুতা প্যাঁচানোর জন্য লাটাই) সুতা প্যাঁচানো হয়। এই চড়কির দ্বারা ললিতে বা ববিনে সুতা প্যাঁচিয়ে নেওয়া হয় কেজি দরে। সাধারণত প্রতি কেজি সুতা

www.pathagar.com

প্যাঁচানোর জন্য ১০-১৫ টাকা দেওয়া হয়। এই কাজ করে গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই। বিশেষ করে ৫-৭ বছরের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত। কম্বল তৈরির জন্য সুতাগুলো পছন্দ মতো রং করা হয়। রং করার জন্য সাধারণত পাতিলে পানির সাথে রং মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। এরপর সুতাগুলো ঐ গরম রংয়ের ভিতর ডুবানো হয়। এরপর তা রোদে শুকিয়ে কম্বল বোনার জন্য প্রস্তুত করা হয়। দড়ি তৈরির জন্য বিশেষ এক ধরনের মেশিন আছে তাতে এক সাথে তিন প্যাঁচের দড়ি তৈরি করা যায়। দড়ি তৈরির জন্য যে মেশিনটি ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত সাইকেলের চাকার সাহায্যে বানানো হয়। আবার ললি থেকে সুতা উবড়ানোর (খোলার) জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম মই। দড়ি পাকানো বা তৈরির জন্য দুই জন লোকের দরকার হয়। একজন মেশিন হাতে ঘুড়ায় আর অপর জন দড়ির অপর প্রান্ত ধরে তা ঠিক করে দেয়। দড়ির তৈরির পর তা পাইকারদের কাছে কেজি দরে বা মণ করে বিক্রি করা হয়। প্রতি মণ দড়ির দাম ৪ হাজার থেকে ৪২০০ টাকা। আর ঘচর (বিভিন্ন কালারের সুতা দ্বারা তৈরি) দড়িগুলো দামে একটু কম। এই গ্রামে যে কয়েক ঘর হিন্দু আছে তারাই সাধারণত এই সুতার দড়ি তৈরি পেশার সাথে জড়িত।

কম্বল যারা তৈরি করেন তাদের অনেকেই বলেন তারা বাপ দাদার আমল থেকে এই ব্যবসার সাথে জড়িত। আবার কেউ কেউ বলেন প্রায় ২৫ বছর ধরে এই গ্রামে কম্বল তৈরি করা হয়। তবে যে কয়েক বছর আগে থেকেই তৈরি করা হোক না কেন, তারা যে দক্ষ একজন তাঁত শিল্পী বা কম্বল প্রস্তুত কারক তা বোঝা যায় তাদের বুনন শৈলী দেখে। এই গ্রামের মুসলমান পাড়াতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে তাঁত আছে। তারা নিজেরাই নিজের তাঁতে বসে কম্বল তৈরি করে। একটা তাঁত চালাতে সাধারণত দুই জন লোকের দরকার হয়। একজন যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন আরেক জন আবার তাঁতে বসে। এভাবে পালাক্রমে সারাদিন তাঁতে কাজ করে ৮-১০ টা কম্বল তৈরি করতে পারে। কম্বল তৈরির জন্য একজন দক্ষ কারিগরকে সারাদিনে খাবার সহ ৩০০ টাকা দিতে হয়। কম্বলগুলোতে সাধারণত যে চেক ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে গ্রামীণ চেক, বল খোপ বেশি ব্যবহার করা হয়। কম্বলগুলো সাধারণত ৩০০ টাকা পিচ বিক্রি করা হয়। সারা দেশ থেকে খুচরা বিক্রেতা বা পাইকাররা এসে এই কম্বলগুলো নিয়ে যায়।[২]

৩. তালপাখা শিল্প

ইতিহাসখ্যাত কাহালুর যোগীর ভবন গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী আলোড়া পূর্বপাড়া (আতালপাড়া) জেলার বাইরের মানুষদের কাছে কবে যে তালপাখার গ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করেছে সে হিসেব জানা নেই সে এলাকার লোকজনের। যোগীর ভবন ও আতালপাড়ার প্রায় প্রতিটি পরিবারই তালপাতার হাতপাখা তৈরি করে। কেউ জীবন ও জীবিকার তাগিদে, কেউ বা অবসর সময় কাটানোর এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও সকলের পূর্বপুরুষই এই পেশাকে আঁকড়ে জীবন ধারণ করেছে বলে জানান গ্রামের প্রবীণেরা।

www.pathagar.com

তালপাখা

বগুড়ার কাহালু উপজেলার পাইকড় ইউনিয়নের যোগীর ভবন ও আলোড়া গ্রামটি কাহালু উপজেলা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তরে এবং বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এক সময় লাল মাটির এই গ্রামে যাতায়াতের জন্য সরু মেঠোপথ ছাড়া তেমন ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। যদিও ইতিহাস খ্যাত এই এলাকায় এক সময় ছিল বলকাইনাথ গোস্বামীর জমিদার বাড়ি। সে সময়ই এখানে এসে বসবাস শুরু করে সাধক, সন্ন্যাসীরা। জমিদার তাদের জন্য যে জায়গাটি বরাদ্দ করেন তাই এক সময় যোগীর ভবন নামে পরিচিতি লাভ করে। সেই যোগীর ভবনের পাশে এলাকার জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় যখন দাঁড়িয়াল মেলার আয়োজন করা হয়, তারপর থেকেই মূলত পাখা তৈরির দিকে ঝুঁকে পড়ে এলাকার মানুষ। তাও প্রায় দেড় শ’ বছর আগের কথা। সেই সময় থেকেই বংশ পরম্পরায় চলে আসছে তাল পাতার পাখা তৈরির কাজ। এখন সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে দুই শতাধিক পরিবার।

এলাকা সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই চলছে পাখা তৈরির কাজ। যোগীর ভবন গ্রামের আশরাফুল ইসলাম ও তার প্রতিবেশীরা সমবেতভাবে পাখা তৈরি করছেন একটি পুকুরপাড়ে। তীব্র গরমের কারণে গাছপালায় ঘেরা ওই পুকুরপাড়ে আশরাফুলের সঙ্গে পাখা তৈরি করছিলেন তার প্রতিবেশী জিন্নাহ মিয়া ও তার স্ত্রী রেহেনা আকতার, আনছার আলী, আব্দুস সোবহান, মনছের আলী ও তার স্ত্রী বেদেনা বিবিসহ বেশ কয়েকজন। তারা জানান প্রতিদিন একজন মানুষ গড়ে প্রায় ৩০টি পাখা তৈরি করতে পারে। তাল পাতার পাখা হিসেবে বাজারে পাখার পরিচিতি থাকলেও প্রস্তুতকারকদের কাছে এসব প্রকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

আশরাফুল জানান, তাল পাতা দিয়ে তৈরি হলেও মূলত চার ধরনের পাখা তৈরি হয়। এর মধ্যে রয়েছে মূল দণ্ড বিশিষ্ট পাখা যা স্থানীয়ভাবে ডাটা পাখা নামে পরিচিত। এছাড়াও দণ্ডহীন শুধু তালপাতার সঙ্গে বাঁশের হাতল লাগানো পাখা পরিচিত হরতন পাখা নামে। একই ধরনের পাখা কিন্তু বাঁশের হাতলে ঘুড়নি লাগানো থাকায় অপর পাখার নাম ঘুরকি এবং স্কুল শিক্ষার্থী ও শৌখিন মানুষদের জন্য তৈরি তালপাতার কোষ ছড়িয়ে মুঠো করার মতো পাখা পরিচিত পকেট পাখা নামে। এই পাখাগুলো জড়িয়ে পকেটে বহন করা যায় বলে এই নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

ওই এলাকার প্রবীণ পাখা প্রস্তুতকারক আব্দুস সোবহান (৬৫) জানান, পাখা তৈরি শেখা ওই এলাকার মানুষদের কাছে বিশেষ কোন বিষয় নয়। পরিবারের সকলেই এই কাজ করতে শেখে ছোট থেকেই। তাঁদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। বাড়ির লোকজনের দেখাদেখি এবং ছোটখাটো সহযোগিতা করার ফলেই ক্রমান্বয়ে তাঁরা এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, একসময় এই এলাকাতেই পাখা তৈরির জন্য তালপাতা পাওয়া যেতো। সেসময় সর্বত্র বিদ্যুতের ছড়াছড়িও ছিল না, ফলে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পাতা দিয়ে তৈরি তালপাখা দিয়েই এই এলাকার চাহিদা মেটানো হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তালগাছ কেটে ফেলা এবং কাটার পর তেমন তালগাছ না লাগানোর ফলে এখন আর এলাকায় পাতা পাওয়া যায় না বললেই চলে। যে সামান্য তাল গাছ আছে তা দিয়ে পাখা তৈরি করা সবার হয় না। তাই রাজশাহী ও নওগাঁর তালবাগান এলাকা থেকে শতকরা হিসেবে পাতা কিনতে হয়।

নওগাঁর পত্নীতলা ও মহাদেবপুর এলাকায় এবং রাজশাহীর ঘুপসী এলাকায় তাল বাগান থেকে তাদের কাছে তালপাতা বিক্রি করা হয় বলে জানান অপর পাখা প্রস্তুতকারক সিদ্দিক হোসেন। সিদ্দিক জানান, ৩০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা শতকরা হিসেবে তালপাতা কেনার পর গাছ থেকে কেটে নেয়া এবং পরিবহণ খরচ দিয়ে তাঁর পরে প্রায় ৬০০ টাকা শতকরা। কেনা এই পাতা দিয়ে তালপাখা তৈরির পর পাখা প্রতি খরচ হয় গড়ে ৬ থেকে ৭ টাকা। সে হিসেবেই পাইকারি বিক্রি করা হয়।

তালপাতার প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে জানালেন ওই এলাকার বাসিন্দা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস। তিনি নিজেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর বগুড়া বিসিক থেকে প্রায় ৫ বছর আগে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি জানান, খরচের হিসাব এবং প্রস্তুত প্রণালী দুই-ই বিশাল। কিন্তু পৈত্রিক পেশা বলেই অনেকে এটি আঁকড়ে বেঁচে আছে। তালগাছ থেকে পাতা কেটে এনে প্রথমে মোটা দণ্ড বিশিষ্ট পাতার মধ্যাংশ দিয়ে দুই ভাগ করে নিতে হবে। এরপর পাখার সাইজের চেয়ে কিছুটা বড় আকারে তা কেটে নিয়ে পানিতে ভেজাতে হবে যেন তৈরির সময় পাতার মাঝখানে ফেটে না যায়। পানিতে ভেজানোর পর সেই পাতা রঙয়ের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে হালকা রোদে শুকানোর পর আবারও পানি ছেঁটাতে হবে তার উপর। সেটিকে বাঁশের শলাকা দিয়ে বাঁধতে হবে যা স্থানীয় ভাষায় চাকানো হিসেবে পরিচিত। কুদ্দুস জানান, চাকানোর পর সেই পাখায় আবারও বিভিন্ন রঙ করা হয় ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। তালপাতার পাখা হলেও শুধু যে তালপাতা কেনার পরই খরচ শেষ তা নয়; বাঁশ কিনতে হয়, সঙ্গে রঙ এবং কেরোসিন তেল দুই-ই লাগে। এভাবেই তৈরি হয় তালপাতার হাতপাখা। তিনি আরও জানান, তৈরি

www.pathagar.com

পাখা সাধারণত সাইজ (আকৃতি) অনুযায়ী এবং প্রকারের উপর ভিত্তি করে দাম নির্ধারণ করে বিক্রি করা হয়। সে অনুযায়ী পুরো গরমের মৌসুমে বড় আকৃতির ডাটা পাখা বিক্রি হয় ১ হাজার টাকা শতকরা। মাঝারি সাইজের গুলো ৮০০ টাকা, ঘুরকি ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকা, হরতন ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং পকেট পাখা ৩০০ টাকা শতকরা।

পাখা তৈরি করছিলেন আলোড়া পূর্বপাড়ার আঙ্গুরা বেগম। তিনি জানান, পুরো গরমের সময়ই সাধারণত পাখা তৈরির অর্ডার পাওয়া যায় বেশি। গরমের মৌসুম মোকাবেলায় তারা মাঘ মাস থেকে পাখা তৈরি শুরু করেন। এই কাজ চলে ভাদ্র মাস পর্যন্ত। তিনি বলেন, 'চইত মাসোত (চৈত্রমাস) কামবেশি থাকে বাবা। অন্য সোমে কাম কম।'

এলাকার প্রবীণদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, আগে যে চাহিদা ছিল, এখন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য তা কমে এসেছে। তারপরও এখান থেকে সিরাজগঞ্জ, সোহাগপুর, টাঙ্গাইল ও কুষ্টিয়া এলাকায় পাইকাড়ি হারে পাখা বিক্রি হয়। তারা বলেন, রাস্তার আশপাশে তালগাছ লাগানোর মাধ্যমে এই পেশাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। তাই এখন অনেক রাস্তাতেই তালগাছ লাগানো হয়েছে বলেও তারা জানান। এই দু'টি গ্রামের মধ্যে পাখা তৈরি করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেছেন যারা তাঁদের মধ্যে আছেন হাফিজার রহমান, সিদ্দিক হোসেন ও হবিবর রহমান। তাঁরা হাত পাকা তৈরি করে মাঘ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত অতিবাহিত করে বছরের অবশিষ্ট সময় অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলেও পাঠিয়েছেন তাঁরা। হাফিজারের একমাত্র পুত্র এবার দশম শ্রেণির ছাত্র। সেও অবসর সময়ে পিতার কাজে সহযোগিতা করে বলে জানান হাফিজার।

আশরাফুল ইসলাম জানান, সরকারিভাবে বা ব্যাংক থেকে কৃষিকাজ ও পশুপালনের উপরে ঋণ দেওয়া হলেও এই পেশায় নিয়োজিতদের কোনো প্রকার ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় না। যেকারণে তাঁদের নির্ভর করতে হয় পাইকারদের দেওয়া আগাম টাকার উপরে। একারণে পাইকারদের বেঁধে দেওয়া মূল্যের মধ্যেই তাঁদের পাখা তৈরি করে দিতে হয়। এতে লাভ থাকে খুবই কম। তিনি বলেন, গরমের তীব্রতা বৃদ্ধির পর পাখার চাহিদা বেড়ে গেলেও নগদ পুঁজি হাতে না থাকার কারণে তাঁরা পাতা কিনে আনতে পারেন না, ফলে চাহিদা অনুযায়ী পাখা সরবরাহ করা হয় না। এই বিষয়ে নজর দেওয়া হলে তাঁদের আর কোন সমস্যা থাকবে না বলে জানান আশরাফুল।

৪. বাঁশ ও বেতশিল্প

বগুড়া শহর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে গাবতলীয় উপজেলায় কূপতলা গ্রাম। এ গ্রামসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের নারীরা তালাই বুনে ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তালাই বা চাটাই গ্রামীণ জনপদের মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ। ছোট বড় অনেকেই এ পেশার সাথে জড়িত। বাড়ির অঙ্গিনায় স্তূপ করা থাকে ৩০-৪০ হাত লম্বা বাঁশ। ধারালো দা দিয়ে বাশেঁর পাতলা চাচটি কেটে নিপুণভাবে তৈরি করে তালাই।

www.pathagar.com

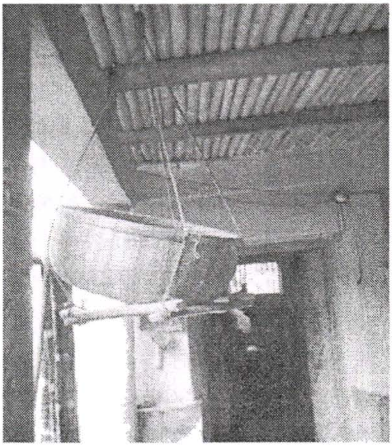

বাঁশ ও বেতের তৈরি তালাই শিল্প

তালাই শিল্প প্রাচীন শিল্প। আগে এর জনপ্রিয়তাও ছিল ব্যাপক। বর্তমানে প্লাস্টিকের পাটির প্রচলন হওয়াতে তালাই শুধু গ্রামেই বেশি প্রচলন দেখা যায়। কোরবানির গরু জবাই বা কোন মৃতদেহ ঢেকে রাখতে এ তালাই ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে এখনও তালাইর কদর রয়েছে। মাটিতে খাবার খাওয়ার জন্য বা গরমে উঠোনে কিংবা অতিথি এলে তালাই বিছিয়ে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া বুইক্যা তালাই ঘরের দেয়ালে বা পার্টিশান দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। নীলেড়া বা পিট তালাই ধানের গোলা, চাটাড়ী, হুচা, কুলা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। কখনো মাটির ঘরের সিলিং হিসেবে এ দু'ধরনের তালাই জনপ্রিয়তা পায়। একটি ৩০-৪০ হাত লম্বা বাঁশে ৪/৫ টা তালাই তৈরি করা যায়। এককেটি তালাই ৩০০-৪০০ টাকায় বিক্রি হয়। শীতলপাটি তৈরির মত মিহি বাঁশ ধারালো দা দিয়ে চেঁছে বাঁশের ভেতরের নরম অংশ বা বুইক্যা দিয়ে এ তালাই তৈরি হয়। অন্যদিকে ঘরের দেয়াল বা সিলিং দেয়ার জন্য বাঁশের পিঠ বা নীলেড়া দিয়ে তৈরি হয় তালাই।

কৃপতলা গ্রামের নারী-পুরুষসহ ছোট ছেলেমেয়ে তালাই বানাতে সিদ্ধহস্ত। গ্রামের তালাই কর্মী ছবিরন বলেন, 'কী করি কন। ছোট বেলাতুন তালাই বোনাইচ্চি। চোখে দেখতে পাইনা ভালভাবে। তারপরও তালাই বুনিচ্ছি'। এ গ্রামের জাহানারা, মিনি, শেফালী, জুলেখা তালাই বুনে সাবলম্বী হয়েছে। জাহানারা বলেন, 'নেকা পড়া করিনি, চারকী পামু কুটি, এগুলানই করি। ভাল আচি।'

ডোল

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, ধুনট, গাবতলী উপজেলায় বাঁশের তৈরি ডোল ঘরের ভেতর মাচায় ধান বা যে কোনো ধরনের শস্য সংরক্ষণের পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয়। এসব এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঘরের ভেতর মাচাং এর ওপর ডোল দেখা যায়। একেকটি ডোলে ৮/১০ মণ ধান রাখা যায়।

বেড়

বেড় ডোল থেকে আকারে বড় হয়। এতে ৩০/৪০ মণ, বড় বেড়ে ৬০/৭০ মণ ধান রাখা যায়। এটি ডোলের মতো চাটাই দিয়ে তৈরি হলেও এর বেড়া বাঁশের বাতা দিয়ে শক্ত করে বাধা থাকে যাতে ধানের চাপে ভেঙ্গে না পরে।

টোপা

বগুড়া প্রায় সর্বত্রই পোটা ব্যবহৃত হয়। টোপা সাধারণত ঘর-গৃহস্থালির প্রায় সব কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় টোপা মাঠের কাজে, ময়লা আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ছোট টোপা গরুর মুখে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ সময়ে গরু যাতে খড় বা ঘাস খেতে না পারে তার জন্যে এ টোপা ব্যবহৃত হয়।

কুলা

দৈনন্দিন জীবনে বগুড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কুলার ব্যবহার দেখা যায়। দৈননন্দিন জীবনের বাইরে মুসলিম পরিবারে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বিয়ের সময় নকশি কুলার ব্যবহার দেখা যায়। অর্থাৎ কুলা ছাড়া এ অঞ্চলে কারোরই বিয়ে হয় না।

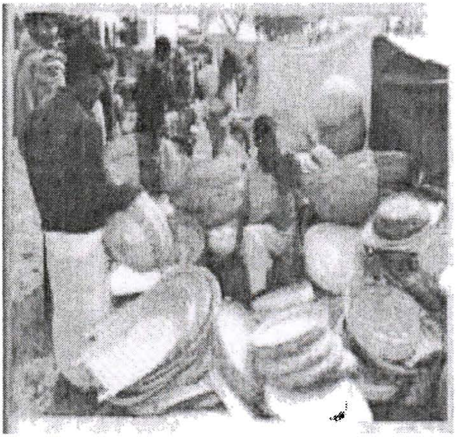

লোকপ্রযুক্তি হাট, গোসাইবাড়ী, ধুনট

টুবরি

বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে তৈরি হয় টুবরি। সাধারণত মাঠের কাজে বিশেষ করে মাটি কাটা, শস্য বহন ইত্যাদি কাজে টুবরি ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

হুচা

বাঁশের চাটাই ও কঞ্চির সাহায্যে হুচা তৈরি হয়। এটি দেখতে ত্রিভুজাকৃতির মতো। এর দ্বারা ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। বাঁশের উপরিভাগের সবুজ অংশদ্বারা অনেক সময় বিভিন্ন রকম নকশা করা হয়।

খলই

বাঁশের চাটাই ও শলাকার সাহায্যে খলই তৈরি হয়। খলই মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পেলা জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় খলই মাথায় বা কোমরে বেধে রেখে মাছ ধরে খলইয়ে রাখা হয়।

মাতুল

সাধারণ বাঁশের তেয়াল ও বাঁশের পাতার সাহায্যে মাতুল তৈরি করা হয়। প্রচণ্ড রোদে মাঠে কাজ করার সময় কৃষকেরা মাথায় মাতুল ব্যবহার করে থাকে।[৩]

ডালা

বাঁশের তৈরি ডালা এ অঞ্চলের মানুষের সাংসারিক জীবনে একটি অন্যতম উপকরণ। ডালায় সাধারণত আলু, পেঁয়াজ, পটল, বেগুন, মরিচ, আদা-রসুন ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক পণ্য সংরক্ষণ করা হয়। বিয়ের সময় এ ডালা করেই বর বা কনে পক্ষের বাড়িতে ডালা সাজানো পাঠানো হয়। নতুন জামাই বাড়িতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারও দেয়া হয় এ ডালায় করেই।

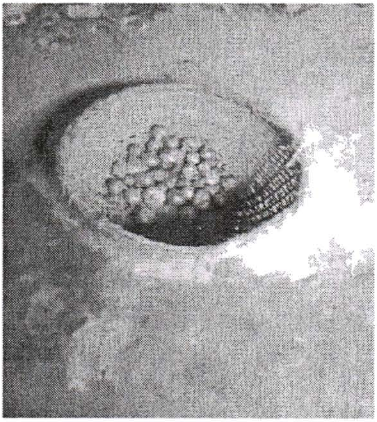

ডালা

ধুনট উপজেলাস্থ গোসাইবাড়ি হাটে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বসে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে ব্যতিক্রমধর্মী বাঁশজাত পণ্যের হাট। স্থানীয় ক্রেতার পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্রেতাদেরও আগমন ঘটে এই হাটে। হাটে বাঁশের তৈরি প্রধান পণ্যের মধ্যে রয়েছে- ডোল, (ধান রাখার পাত্র), চালুন, কুলা, বেড়, চাঙ্গারি, ঝাঁকা, ঝাঁটা, হুচা,

www.pathagar.com

চাটাই, তালাই, টোপা, ইত্যাদি। এছাড়াও আছে মাছ ধরার বিভিন্ন যন্ত্র। যেমন- পলো, দারকি, ধিয়ার, খোলসেনি, খলই, ইত্যাদি।

এ হাটে এসব পণ্য এতোই পরিমাণে ওঠে যে, আশেপাশের আর কোনো হাটে এতো বাঁশজাত পণ্য দেখা যায় না। এ হাটে এসকল পণ্য ওঠার কারণ সম্পর্কে হাট কমিটির সদস্য জনাব মিজানুর রহমান (৪৮) জানান :

'এ হাটকে মূলত চাঙ্গারি, ডুলে, কুলা, ঝাঁকা, ঝাঁটা, দারকি, ধিয়ার, খলির পাইকারি হাট বলা যায়। শুধু গোসাইবাড়ি, শেরপুর, ধুনট, কাজিপুর, সারিয়াকান্দি এলাকা থেকেই মানুষ এখানে এসব পণ্য বেচা-কেনার জন্য আসে না। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনেকেই এখানে এসব পণ্য কেনার জন্য আসেন। তারা এখান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে আবার তাদের এলাকায় নিকটবর্তী হাটে বিক্রি করেন'।

'যমুনা নদী দিয়ে এ এলাকায় আসাম, কুড়িগ্রাম, দেওয়ানগঞ্জ, গাইবান্ধা এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে বাঁশের ভুর আসে। সেসব ভুর থেকে বাঁশ কিনে অত্র এলাকার আশেপাশের একেবারে সারিয়াকান্দি থেকে শুরু করে কাজিপুর পর্যন্ত অনেক গ্রামে নলেপাড়া গড়ে ওঠেছে। যোগযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার কারণে প্রায় সব এলাকা থেকে লোকজন এখানে হাট করতে আসে। এমনকি যমুনার ওপার সরিষাবাড়ি, মাদারগঞ্জ থেকেও লোকজন এ হাটে আসে এসব কেনা-বেচার জন্য।

আরেকটি কারণেও এ বাজার প্রসার লাভ করেছে বলে মনে হয়। এ এলাকায় শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, কাজিপুর এলাকায় প্রচুর নদী নালা খাল-বিল রয়েছে। বর্ষার সময় এ এলাকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সে কারণে এখানে দারকি, ধিয়ার, পলোই ইত্যাদির হাট গড়ে ওঠেছে বলা যায়'।

বাঁশ জাত পণ্য ছাড়াও কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রযুক্তিপণ্যও যেমন- লাঙ্গল, মই, জোয়াল, নাংলে ইত্যাদি এ হাটে ওঠে।

উপর্যুক্ত লোকপ্রযুক্তি পণ্য ছাড়াও গোসাইবাড়ি হাটে পাটের বিখ্যাত কারবার হয়ে থাকে। হাটটি যমুনা নদী তীরবর্তী হওয়ায় বড় বড় নৌকা যোগে এখান থেকে পাট চলে যায় সরিষাবাড়ি ও নারায়নগঞ্জ।

বাঁশ ও কৃষিজাত লোকপ্রযুক্তি ছাড়াও এ হাটে পুরাতন রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল এবং ভটভটি পর্যন্ত কেনা-বেচা হয়ে থাকে।[৪]

৫. টুপিশিল্প

কোনো প্রকার যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র হাত দিয়ে সুই-সুতার বুননে নির্মিত বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ টুপি শিল্পের উৎস। শেরপুর-ধুনটে টুপি সেলাই করে সাবলম্বী হয়েছেন ৭৫ হাজার নারী। তাঁদের তৈরি টুপি রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও। এক সময়ে যেসব নারী সংসারের কাজকর্ম সেরে দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরে বসে কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প-গুজবে কাটাতেন, তারাই এখন টুপি সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এ কাজে শুধু গৃহবধুরাই নয়, স্কুল-কলেজপড়ুয়া মেয়েরাও ব্যস্ত।

www.pathagar.com

মূলত শেরপুরে টুপি শিল্পের যে কারখানাটি গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করেই শেরপুর ও ধুনটের নারীদের হাতে সেলাই করা টুপি দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রির পাশাপাশি রপ্তানি হচ্ছে সৌদি আরব, পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। এ দুই উপজেলার ২২০টি গ্রামের প্রায় ৭৫ হাজার নারী টুপি সেলাই করে সাবলম্বী হয়েছেন। গ্রামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- চালাপাড়া, চরধুনট, জিঞ্জরতলা, পূর্ব ও পশ্চিম ভরণশাহী, মাটিকোড়া, উল্লাপাড়া, মাঠপাড়া, বথুয়াবাড়ি, বিলকাজুলি, পেঁচিবাড়ি, জালসুকা, কুমিরাডাঙ্গা, জাঙ্গালপাড়া, ভুবনগাতি, পোয়ালভাগ, মধুপুর, পিরহাটি ও ধেরুয়াহাটি ইত্যাদি।

চালাপাড়া গ্রামের গৃহবধু কল্পনা খাতুন বলেন, 'ছোলের বাপের একলার কামাই দিয়্যা আগে খুব কষ্টে দিন কাটিছে। কিন্তু আখন আর সি কষ্ট নাই'। কল্পনা দীর্ঘ ১২-১৩ বছর ধরে টুপি সেলাই করছেন। ঘরের কাজ সেরে দিনে ২-৩ টি টুপি সেলাই করেন। তিনি জানান, টুপি বিক্রি করতে হাট বাজারে যেতে হয় না। বাড়ি থেকেই পাইকার এসে প্রতি সপ্তাহে টুপি কিনে নিয়ে যান। সব খরচ বাদে তার প্রতি মাসে এক থেকে দেড় হাজার টাকা আয় হয়। একই গ্রামের রূপালী জানান, এর আগে হাত-খরচের টাকা স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হতো। অভাবের সংসারে স্বামী কোনো কোনো দিন সে টাকা দিতে পারতেন না। টুপি সেলাই করার পর থেকে তাকে আর কারও কাছে টাকার জন্য হাত পাততে হয় না। সেলাই করা টুপি থেকে প্রতি মাসে প্রায় ২ হাজার টাকা আয় হয়। কল্পনা, রূপালী মতো ওই গ্রামের গৃহবধু জুলেখা, হাসিনা, সুমি, লাভলিসহ আরও অনেকেই টুপি সেলাই ও বিক্রি করে এখন সাবলম্বী। আবার পেঁচিবাড়ি গ্রামের জালশুকা মোজাহার আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুবিনা খাতুন পড়ালেখার পাশাপাশি টুপি সেলাই করে প্রতি মাসে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা আয় করছে। ধেরুয়াহাটি গ্রামের আদিবাসী নিবারণ চন্দ্রের মেয়ে রত্না রায় টুপি সেলাইয়ের টাকা দিয়ে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছেন। তিনি এবার মুথুরাপুর জিএমসি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি.-তে জিপিএ-৫ পেয়েছেন।

টুপি বুননে ব্যস্ত কিশোরী, ধুনট

www.pathagar.com

টুপি সেলাই কাজে ব্যস্ত নারীরা জানান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় টুপির চাহিদা বেশি থাকে। চাহিদা বাড়ে বিশ্ব ইজতেমার সময়ও। টুপি সেলাইয়ের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত সুতা ও ক্রুশকাটা পাইকাররা সরবরাহ করে থাকেন। তারা ১৫-২৫ টাকায় ক্রুশকাঁটা এবং ৭০ থেকে ৮০ টাকায় সুতার ডলার সরবরাহ করেন। কারও টাকা না থাকলেও বাকিতে এসব জোগান দেন তারা। পরে টুপি কেনার সময় ক্রুশকাঁটা ও ডলারের দাম কেটে রেখে বাকি টাকা দিয়ে দেন। চালাপাড়া গ্রামের পাইকারি টুপি ব্যবসায়ী বাচ্চু মিয়া জানান, সিডিউল অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে তাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সুতা ও ক্রুশকাঁটা সরবরাহ করতে হয় এবং পরের সপ্তাহে সেলাই করা টুপি কিনে আনতে হয়। প্রতিটি টুপির জন্য রকমভেদে ১৫ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত দাম পড়ে। তিনি আরও জানান, আগে শুধু এক ডিজাইনের টুপি তৈরি হতো। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে বাহারি নাম ও ডিজাইনের টুপি তৈরি হচ্ছে। কল্পনা ও জুলেখার কাছে জানা যায় এসব টুপির বিভিন্ন নাম। মূলত নকশার নামানুসারেই টুপির নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন : আল্লাহু, বিস্কুট, স্টার, কলারফুল, বকুলফুল, তালাচাবি, গাছলতা, টিকা, কদমফুল, কৈল্লার চাক, ভিউফুল, লায়ের জাংলা, বোতামফুল, গুটিফুল, আনারস, মৌচাক, মাকড়শার জালসহ বিভিন্ন নামে তৈরি হচ্ছে এসব টুপি। ডিজাইনভেদে আনারস টুপি প্রতিটি ৪০ থেকে ৪৫, মৌচাক ২৮ থেকে ৩০, বিস্কুট টুপি ১৫ থেকে ১৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা গ্রামের নারীদের সেলাই করা টুপি কিনে ঢাকার চকবাজার, বায়তুল মোকাররম মার্কেটসহ রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে বিক্রি করেন। সেখান থেকে রপ্তানি হয় সৌদি আরব, পাকিস্তান, কুয়েত, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশের তৈরি এসব টুপির চাহিদা সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানে ও সৌদি আরবে।[৫]

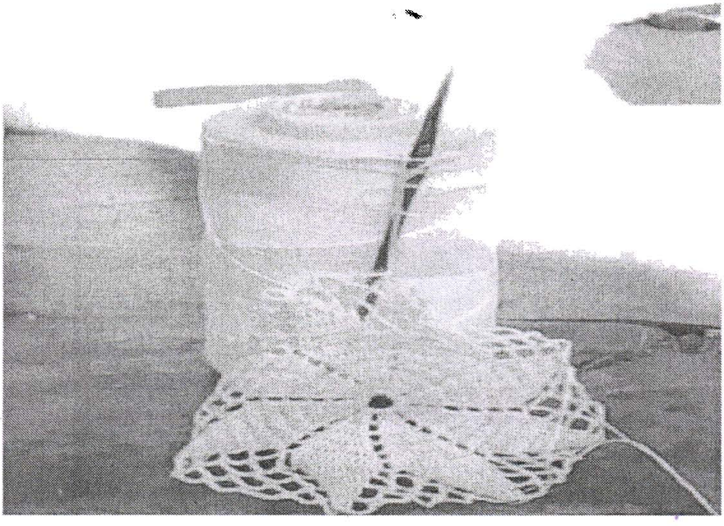

সুতার ডলার, ক্রুশকাটা এবং প্রস্তুতরত টুপির বুনন, ধুনট

www.pathagar.com

৬. নকশিকাঁথা

সাধারণত বর্ষার সময় যখন মহিলাদের কোনো কাজ না থাকে তখন সারিয়াকান্দি উপজেলার নদী পাড়ের প্রায় সব গ্রামেই নকশিকাঁথা তৈরির ধুম পড়ে। এ সময় গ্রামের অধিকাংশ মহিলারাই নকশিকাঁথা তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। সম্প্রতি সারিয়াকান্দির মথুরা পাড়া, দীঘলকান্দি, কুতুবপুর, চন্দনবাইশা প্রভৃতি এলাকায় এনজিও বিশেষ করে ব্র্যাকের মহিলাদের আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পে যুক্ত হয়ে অনেক মহিলা নকশিকাঁথা সেলাই করছে। মথুরা পাড়ার আরজু (৩৫) জানায়, একটা কাঁথা সেলাই করতে প্রায় চার পাঁচ দিন লাগে। আর টাকা পাওয়া যায় প্রায় পাঁচ-ছয়শ। বর্ষার সময় প্রায় তিন-চার মাস এ এলাকায় পানি থাকে, তাতে নকশিকাঁথা সেলাইয়ের একটি কর্মসূচি থাকায় এ সময় একজন মহিলা প্রায় আট-দশ হাজার টাকা আয় করেন। বিভিন্ন ধরনের নকশিকাঁথা এরা সেলাই করে। কাঁথার কাপড়, সুঁই, সুতা, ডিজাইন সবই সংশ্লিষ্ট ক্রেতাই সরবরাহ করেন। সেলাইয়ের ধরন চাহিদা (ঘন বা পাতলা সেলাই) অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। নিচে পাঁচশ টাকা থেকে উপরে আট-নয়শ বা এক হাজার টাকা পর্যন্তও মজুরি পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের নকশিকাঁথা এরা তৈরি করে যেমন– বিলচাপড়ি কাঁথা, হাসকাঁথা, নওশাকাঁথা, জামাই কাঁথা, বর কনে কাঁথা ইত্যাদি। নওশাকাঁথা, জামাই কাঁথা, বর কনে কাঁথা সাধারণত বিয়ের কাঁথা। বিয়ে উপলক্ষ্যে লোকজন এগুলো অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নেয়। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ছাড়াও ধুনট, দুপচাঁচিয়া, আদমদিঘি প্রভৃতি এলাকাতেই কিছু কিছু নকশিকাঁথা তৈরি হয়।[৫]

নকশিকাঁথা

www.pathagar.com

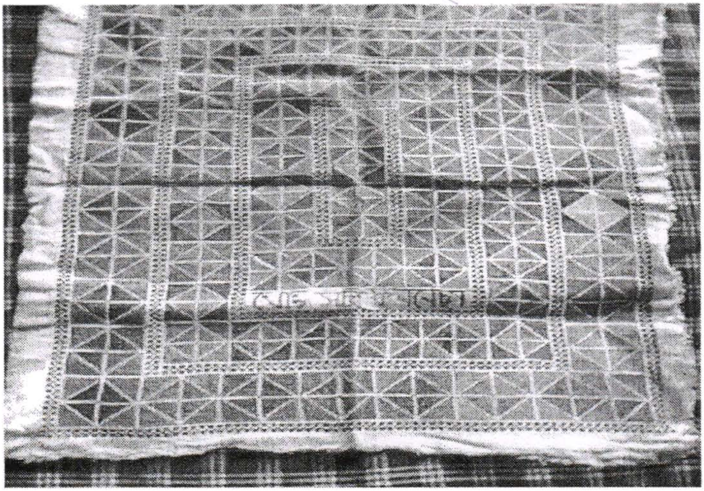

নকশিকাঁথা

৭. নকশিশিকা

বগুড়া জেলার প্রায় সর্বত্রই শিকার ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে রান্না ঘরে এ শিকার বেশি ব্যবহার দেখা যায়। তবে আজকাল শহরের অনেক শিক্ষিত পরিবারের ড্রয়িং রুমে অথবা বেলকনিতে বাহারি শিকায় ছোট ছোট টপ বা বিভিন্ন নকশি হাড়ি টাঙিয়ে রাখতে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত তিন, চার বা পাঁচ-ছয় সুতোর শিকা দেখা যায়। সাধারণত পাটের চিকন দড়ির সাহায্যে এ শিকা তৈরি হয়। বিড়ালের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষ করে রান্না করা খাবার, দুধ, তরকারি, মাছ, মাংস, ইত্যাদি বাটি বা হাড়িতে করে শিকায় টাঙিয়ে রাখা হয়। জেলার সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা, গাবতলী উপজেলায় প্রচুর পাট উৎপন্ন হয় বলে এ এলাকার প্রায় বাড়িতেই শিকার ব্যবহার দেখা যায়।

৮. দেয়ালচিত্র

যাও পাখি বলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে
অথবা মায়ের আর্শিবাদ

ইত্যাদি বাণী সম্বলিত দেয়ালচিত্র একটা সময় বগুড়ার গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই চোখে পড়তো। এখনো এগুলো একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। সারিয়াকান্দির দেবডাঙ্গা গ্রামের মনোয়ারা, শরিফুন, শরিফার তৈরি কয়েকটি প্রাচীন ওয়ালমেট আমরা দেখতে পাই। কাপড়ের ওপর বিভিন্ন রঙিন সুতোর বুনানো মুখোমুখি বসা টিয়া পাখি, বিভিন্ন ফুল যেমন– রক্ত জবা, গোলাপ ইত্যাদির নিচে বিভিন্ন কবিতার লাইন বা বাণী

www.pathagar.com

লেখা। ঘরের খুঁটি বা বেড়ার সঙ্গে আটকানো দেয়ালচিত্রগুলো যেমন একদিকে ঘরের শোভাবর্ধন করে অন্যদিকে অন্যদিকে তেমনি গৃহিণীর সৃজনশীলতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শুধু গ্রামেই নয় আজকাল শহরে প্রায় বাড়িতেই ড্রয়িং রুমে নানা ধরনের দেয়ালচিত্র দেখা যায়।[৬]

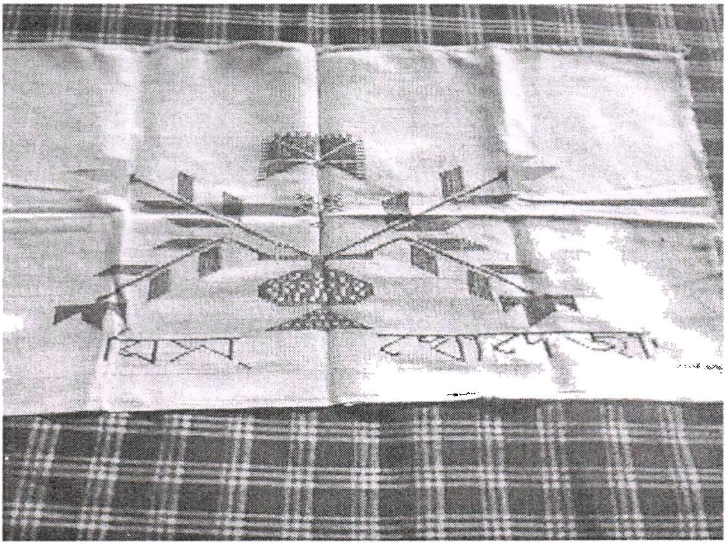

দেয়াল চিত্র (ওয়ালমেট)

দেয়াল চিত্র (ওয়ালমেট)

www.pathagar.com

৯. হাতপাখা বা বিচন

বগুড়া জেলায় দু ধরনের হাতপাখা দেখা যায়। পশ্চিম বগুড়ায় প্রচুর তাল গাছ দৃষ্ট হয় বলে এ এলাকায় তালের বিভিন্ন ধরনের পাখা দেখা যায়। পক্ষান্তরে পূর্ব বগুড়ায় তাল গাছের সংখ্যা কম বিধায় এ এলাকায় তালপাখার পাশাপাশি কাপড়ের তৈরি বিভিন্ন ধরনের হাতপাখা দেখা যায়। এ ধরনের পাখাকে এ এলাকায় বিচন বলে। চিকন বাঁশ কেটে গোল করে তার সঙ্গে কাপড় লাগানো হয়। কাপড়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের ফুল, পাখি, অথবা বিশেষ কোনো দৃশ্য সুই-সুতোর সাহায্যে গাঁথা হয়। এরপর পাখার চারপাশে (গোলাকার বাঁশের বৃত্ত) রঙিন ঝালোর লাগানো হয়। পাখার ডাটে একটি বাঁশের চুঙ্গি লাগানো হয়। এই চুঙ্গির সাহায্যেই পাখা ঘোরানো হয়।

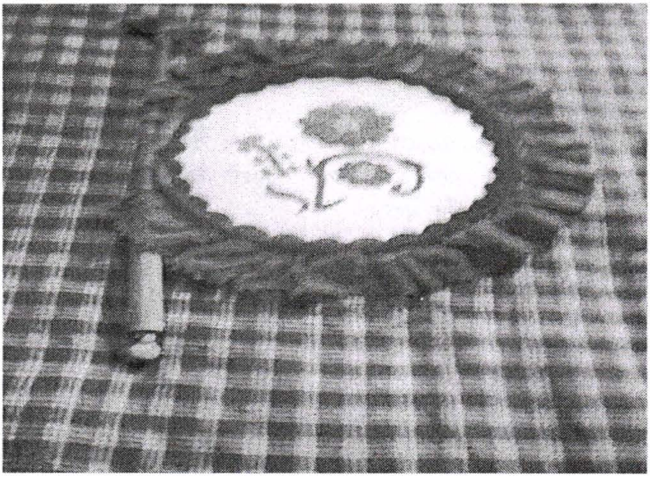

হাতপাখা (বিচন)

তথ্যনির্দেশ

১. সুদেব চন্দ্র পাল, পিতা : শ্রী মঙ্গল চন্দ্র পাল, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : আড়িয়া পালপাড়া, পোস্ট : ডেমাজানী, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া, পেশা : কুমার (মৃৎপাত্র প্রস্তুতকারী), বয়স : ৫৮, সংগ্রহ তাং- ১৩/০৫/১১ ইং

২. শ্রী গোপেন চন্দ্র দেবনাথ, পিতা : মৃত হরিপদ চন্দ্র দেবনাথ, বয়স : ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কৃষি/তাঁতি, গ্রাম : শাঁওইল, ইউ : নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৩/১১/২০১১

৩. মোঃ সেকেন্দার আলী শেখ, পিতা : মৃত লালমোহাম্মদ শেখ, বয়স : ৫৫ বছর, পেশাঃ তাঁতি, গ্রাম : শাঁওইল, ইউ : নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৩/১১/২০১১

www.pathagar.com

৪. মোঃ মকবুল হোসেন, পিতা : মৃত ইশারত উল্লা, বয়স : ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১০ম শ্রেণি, পেশা : তাঁতি, গ্রাম : শাঁওইল, ইউ : নশরৎপুর, উপজেলা : আদমদিঘি, সংগ্রহ: ১৩/১১/২০১১

৫. এম মনোয়ার হোসেন (ফরিদ), বয়স : ২৪, ঘোষপাড়া, শেরপুর, বগুড়া। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম কম (হিসাব বিজ্ঞান), পেশা : ব্যবসায়।

৬. মোঃ মিজানুর রহমান (৪৮), গ্রাম : গোসাইবাড়ি, ধুনট পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা: টাইটেল পাশ।

৭. রুবিনা খাতুন (১৩), পিতা- আনিছার রহমান, গ্রাম : পেঁচিবাড়ি, ধুনট, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষা- ৭ম শ্রেণি।

৮. কল্পনা খাতুন (৩৭), স্বামী- এলাহী বক্স, গ্রাম : চালাপাড়া, ধুনট, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা- ৫ম শ্রেণি।

৯. রত্না রায় (১৫), পিতা- নিবারন চন্দ্র, গ্রাম : ধেরুয়াহাটি, ধুনট, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষা- ৮ম শ্রেণি। সংগ্রহ তাং- ২৩/০৩/১১ ইং,

১০. মো সোলেমান আলী, বয়স : ৫০, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : দেবডাঙ্গা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

১১. মোছা: শাহানা পারভীন, বয়স : ৫০, পেশা : গৃহিণী স্বামী : তোফাজ্জল হোসেন, গ্রাম: নিউ সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

বগুড়া জেলার লোকস্থাপত্যের মধ্যে সাধারণত মাটির, টিনের ও ছনের বাড়িঘর এবং খড়ের পুঞ্জ বা পালাকে উল্লেখ করা যায়। করতোয়া নদী এ জেলার মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ প্রবাহিত হয়ে জেলার ভূ ভাগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। করতোয়ার পশ্চিমভাগের ভূ-ভাগ বরেন্দ্রভূমি হওয়ায় এ এলাকার মাটি শক্ত ও এঁটেল মাটি। ফলে পশ্চিম বগুড়ার নন্দীগ্রাম, আদমদিঘি, কাহালু, দুপচাঁচিয়া, শিবগঞ্জ, শেরপুর প্রভৃতি এলাকায় দোতলা মাটির বাড়িঘর চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে করতোয়ার পূর্বভাগ তথা পূর্ববগুড়া পলি অঞ্চল হওয়ায় এ এলাকায় সাধারণত টিনের ও ছনের বাড়িঘর চোখে পড়ে। এ এলাকার সঙ্গে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার বাড়িঘরের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মাটির বাড়িঘর

পশ্চিম বগুড়ার অন্যতম লোকস্থাপত্যিক ঐতিহ্য হলো মাটির ঘর। হাজার হাজার বছর ধরে এ এলাকায় মানুষের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাটির বাড়ি ঘর। এ এলাকার মাটির যে বাড়িঘর চোখে পড়ে তার প্রায় একশো ভাগই মাটির দোতলা ঘর।

বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জে পাকা রাস্তা ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকেই এখন বিশেষ করে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা মাটির ঘরের পরিবর্তে ইটের ঘর ব্যবহার করছেন। এ ক্ষেত্রে কাদা মাটির দেয়ালের পরিবর্তে পোড়া ইট ব্যবহৃত হচ্ছে। মাটির ঘরের মতোই ছাউনি হিসেবে টিন অথবা রড সিমেন্ট সহযোগে পাকা ছাদ ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে মাটির ঘরের তুলনায় ইটের ঘরের খরচ প্রায় একই হওয়ার এবং ইটের ঘর গ্রামীণ সামাজিক মর্যদাসূচক হওয়ায় এ ধরনের বাড়ি ঘরের সংখ্যা এখন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

মাটির ধরন

মাটির ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এঁটেল মাটি। জমি অথবা পুকুর থেকে এ মাটি সংগ্রহ করা হয়।

মাটির ঘরের নকশা

মাটির ঘর তৈরির জন্য ভূমি নক্শা সাধারণত পেশাদার নির্মাণ শ্রমিকরাই করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ নক্শা হয় রোমান বর্ণ আই (I) বা এল (L) এর মতো। কোথাও কোথাও ইউ (U) আকৃতির বাড়িঘরও চোখে পড়ে। একটি আই বা এল আকৃতির বাড়িতে দুটি থেকে তিন/চারটি ঘর থাকে। ইউ আকৃতির বাড়িতে ঘর সংখ্যা আরো বাড়ে। প্রতিটি ঘরের মাপ (দেয়াল ব্যতীত ভেতরের অংশ) দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট থেকে ২০/২৫ ফুট এবং প্রস্থ ১০ থেকে ১৫ ফুট। দেয়ালের মাপ চওড়া ৪/৫ ফুট।

www.pathagar.com

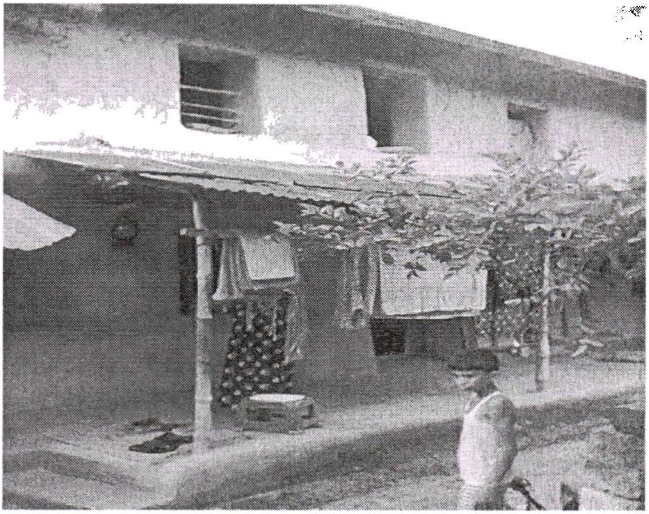

দো'তলা মাটির বাড়ি, নন্দীগ্রাম

নির্মাণ কৌশল

ফিতা দিয়ে মাপ নেয়ার পর দেয়াল নির্মাণের জায়গাটি কোদাল দিয়ে এক ফুট পরিমাপ গর্ত করে নেয়া হয় এবং গর্ত খোঁড়ার পর তা দু'একদিন ফেলে রাখা হয় রোদে শুকানোর জন্য। জমি বা পুকুর থেকে সংগৃহীত মাটি উঠানে এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। এ মাটি কয়েকদিন রোদে শুকানো হয়। ভালোভাবে শুকালে পানি দিয়ে দু-তিন দিন ভিজে রাখা হয়। মাটি ভালোভাবে ভিজলে উত্তম করে কাদা করা হয়। কাদা করার সময় পাট বা খড় ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে কাদার সঙ্গে মেশানো হয়। এভাবে দু-তিন দিন ফেলে রাখার পর কাদা একটু শুকনো শুকনো হলে তা বলের মতো করে মণ্ড বানানো হয়। একেকটি মণ্ড বড় সাইজের একটি তরমুজের মতো দেখতে হয়। এ সব মণ্ড দিয়েই দেয়াল নির্মাণ করা হয়। একদিনে দু'সারির বেশি নির্মাণ করা হয় না। দু-তিন দিন বিরতি দিয়ে আবার এক সারি বা দু'সারি গাঁথা হয়। এভাবে একটি ঘর নির্মাণ করতে সাধারণত দু-তিন মাস লেগে যায়। দোতলা একটি বাড়ির জন্য প্রায় ৩০/৩৫ ফুট উঁচু দেয়াল নির্মাণ করতে হয়। সম্পূর্ণ দেয়াল নির্মাণ শেষ হলে তার ওপর চারচালা বা আটচালা ছাউনি দেয়া হয়। যখন টিন ছিল না তখন ছাউনি হিসেবে ছন বা খড় ব্যবহৃত হতো। সাধারণত ১৫/২০ ফুট দেয়াল নির্মাণের পর প্রথম ছাদ এবং পরবর্তী ১০/১২ ফুট নির্মাণের পর দ্বিতীয় ছাদ দেয়া হয়। ছাদের ক্ষেত্রে তালগাছ লম্বা করে চিড়ে তা ডাঁসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডাঁসার ওপরে বাঁশ দিয়ে তার ওপর মাটির প্রলেপ দেয়া হয়। প্রতিটি ঘরের বাড়ির ভেতরের অংশে বারান্দা থাকে এবং একাধিক জানালা থাকে।

www.pathagar.com

নির্মাণ সময় ও খরচ

সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মাটির ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং তা চলে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত। দু-তিন কক্ষ বিশিষ্ট দোতলা একটি মাটির ঘর নির্মাণে টিনের ছাউনি ও লেবার খরচসহ সর্বমোট প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়।

স্থায়িত্ব

এক একটি মাটির ঘরের স্থায়িত্ব এক দেড়শো বছর থেকে প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সুবিধা

বসবাসের জন্য মাটির ঘর খুবই উপযোগী। গরমকালে এ ঘর ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম থাকে। তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে এর খুব একটা ক্ষতি হয় না।

সৌন্দর্য

প্রায় প্রত্যেকটি মাটির ঘর লেপার সময় ঘর ও ঘরের বাইরে (ভেতরের অংশে) নানা ধরনের নক্‌শা করা হয়। নকশাগুলো অনেকটা আলপনা টাইপের। বিয়ের সময় অথবা বাড়িতে অতিথি আগমনের সময় এ রকম নক্‌শা বেশি করা হয়।

টিনের ঘর/বাড়ি

টিনের চাল ও টিন, বাঁশ, ছন বা পাটখড়ির বেড়া দেয়া ঘরকে সাধারণত টিনের ঘর বলা হয়। পূর্ব বগুড়ায় তিন ধরনের - দোচালা, চারচালা ও আটচালা টিনের বাড়িঘর চোখে পড়ে। এর মধ্যে চারচালা ব্যড়িঘরই বেশি। যারা গরীব দুস্থ তাদের বাড়িঘর দোচালা। আর যারা অভিজাত বা বনেদি পরিবার তাদের বাড়িঘর সাধারণত আটচালা হয়ে থাকে। আটচালা বলতে আটটা চালের সমন্বয়ে যে বাড়ি সেটিকেই আট চালা বলা হয়। এ ঘরের চারপাশেই বারান্দার মতো চারটি চাল থাকে। এর ওপরে মূল ঘরে আরো চারটি চাল থাকে। সাধারণত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় সবার ঘরই চারচালা টিনের ঘর। অধিকাংশ ঘরেই টিনের বেড়া থাকে। যাদের টিনের বেড়া দেবার সামর্থ নেই কেবল তাদের ঘরেই বাঁশ, ছন বা পাটখড়ির বেড়া দেখা যায়। আজকাল অনেকেই বেড়ায় টিনের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করছে।

নকশা ও মাপ

টিনের ঘর নির্মাণের পূর্বে যেখানে ঘর তোলা হবে সেখানে ফিতা ধরে চিহ্ন করে দাগ দেয়া হয়। প্রথমে চারকোণায় চারটি খুঁটি পোতা হয়। এরপর মাঝে মাঝে খুঁটি দেয়া হয়। পূর্ব বগুড়ায় সাধারণত ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৪ বা ৩০, ৩২ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১০/১২ হাত প্রস্থ পর্যন্ত টিনের ঘর দেখা যায়। অধিকাংশ ঘর আই বা এল আকৃতির হয়ে থাকে। ঘরের দৈর্ঘ্যই এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক চিত্র বলে দেয়। যারা স্বচ্ছল বা একটু টাকা পয়সার মালিক তাদের ঘরের দৈর্ঘ্য ৩০/৩২ হাত বা তার বেশি হয়ে থাকে। এদের ঘরের বেড়া টিনের হলেও তা বিভিন্ন নক্‌শাকৃতির হয়।

www.pathagar.com

পূর্ব বগুড়ার টিনের বাড়ি-ঘর

নির্মাণ কৌশল

যারা টিনের ঘর নির্মাণ করেন বগুড়ায় এদের বলা হয় ছুতার। ছুতার বাঁশ বা কাঠের টুকরো দিয়ে প্রথমে ঘরের একটি কাঠামো তৈরি করেন। এরপর এর ওপর বিভিন্ন মাপের টিন বসিয়ে তা লোহা বা পেরেক দিয়ে আটকে দেন।

নির্মাণ সময় খরচ ও স্থায়িত্ব

কাঠামোসহ চারচালা একটি টিনের ঘর নির্মাণে দু থেকে তিনদিন সময় লাগে। ১৮/২০ হাত পরিমাণ একটি টিনের ঘর নির্মাণে ২০/২৫ হাজার টাকা খরচ হয়। টিনের ঘর ক্ষণস্থায়ী। ঝড় বৃষ্টিতে যে কোনো সময় উড়ে যেতে পাড়ে। তবে বন্যার সময় এ ঘর সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায়।

ছনের ঘর

সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা উপজেলায় যমুনার চরে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের ঘর ছনের ঘর। ছনের ঘর সাধারণত দো'চালার হয়ে থাকে। যমুনার চরে যে কাশ বা শন জন্মে তা দিয়েই এর চাল ছাওয়া হয়। স্থানীয়ভাবে একে কাশ্যা বলে।

খড়ের পুঞ্জি বা পালা

বগুড়া জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ বাড়িতেই খড়ের পালা দেখা যায়। ধান মাড়াইয়ের পর বাড়ির উঠানের এক পাশে খড়ের পালা দেয়া হয়। বগুড়ায় একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো 'খড়ের পালায় মানুষ চেনায়'। অর্থাৎ খড়ের পালা দেখে মানুষ চেনা যায়। যে বাড়ির খড়ের পালা যতো বড় সে বাড়ির গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা ততো ভালো। খড়ের পালার জন্য প্রথমে পরিমাণ মত জায়গা গোল করে নিয়ে সেখানে মাটিতে খড় বিছিয়ে

www.pathagar.com

নেয়া হয়। এরপর সেখানে একের পর এক খড় বিছিয়ে উঁচু করা হয়। উপরের দিকে গিয়ে চারদিকেই ঢালু করা হয় যাতে বৃষ্টির পানি ভেতরে প্রবেশ না করে সহজেই গড়িয়ে পড়ে। একটি খড়ের পালা সাধারণত এক বছরের জন্য নির্মাণ করা হয়।

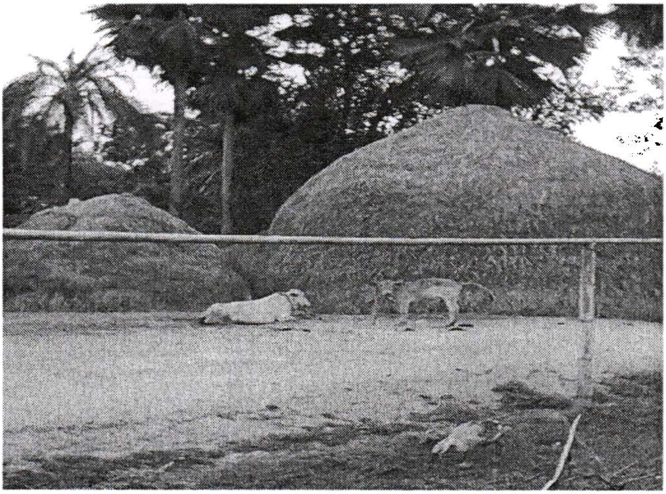

খরের পালা

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ গোলাম রব্বানী (৫০), গ্রাম-ভাটরা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া । পেশা : শিক্ষকতা।

২. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (৫০), গ্রাম- নিউসোনাতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

বগুড়া জেলা লোকসংগীতে বেশ সমৃদ্ধ। এ জেলায় বাউল, মুর্শিদি, মারফতি ইত্যাদি গান ছাড়াও ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, দেহতত্ত্ব, মেয়েলিগীত ইত্যাদি লোকসংগীত প্রচলিত রয়েছে। নিচে বগুড়া জেলার লোকসংগীতের পরিচয় উপস্থাপিত হলো–

১. বাউলগান

সারিয়াকান্দি উপজেলার চরপাড়া (মথুরাপাড়া) গ্রামের শখের বাউল আশরাফ আলী। পেশা- কৃষিকাজ কিন্তু শখের বশে গান করেন, গান বাঁধেন, নিজেই সুর করেন। নদী ভাঙ্গনের ফলে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে লেপ তোষকের ব্যবসা করছেন। আগের মতো এখন খুব একটা গান করেন না। তবে কেউ ডাকলে গানের মায়ায় ছুটে যান। তার পাঁচটি গান এখানে উপস্থাপিত হলো।

১

আর ঝুপ সাগের ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)
এবার তালা মারছো কালেমাতে চাবি রইলো মুরশিদের হাতে।
ওরে মুরশিদ বিনে খুলবে কেমন করে
আর ঝুপ সাগরে ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)
আর ঘরে তোমার ভাঙ্গা বেড়া।
সব জায়গাতে হইয়াছে টেরা
ওরে মুনের বেড়া লাগাও শক্ত করে
আর ঝুপ সাগরে ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)
ওরে সাগরে যদি না নামিস মুক্তা তুলার কোনো আশা নাই
কি করি তুলব মুক্তা পাগল আশরাফ ভেবে কয়।
ঝুপ সাগরে ডুবলি পাবি তারে আপন ঘরে (২)।

২

পিরিতি পিন্দাইলো ছিঁড়া তেনা আগে জানিনা (২)
আর জানিনারে নিষ্ঠুর ব্যাঈমান তর হৃদয় অ্যাতুই পাষাণ
জানরে কি প্রেম (২) করতাম লেনাদেনা আগে জানিনা (২)
পিরিতি পিন্দাইলো ছিঁড়া তেনা আগে জানিনা (২)
ওরে দুষ্ট লোকের মিষ্টি বুলি অন্তরেতার বিষরেও গুলি

www.pathagar.com

কোকিল কণ্ঠে হইছিলাম দেওয়ানা আগে জানিনা (২)
পিরিতি পিন্দাইলো ছিঁড়া তেনা আগে জানিনা
যখন আসলাম তোমার ঘরে পিতা মাতা পিচে গো পিচে
ওরে ভাই বেরাদার কেউ কাজে লাগে না দুঃখে বাঁচিনা
পিরিতি পিন্দাইলো ছিঁড়া তেনা আগে জানিনা।
শুনে তোমার মুখের কথা ছেড়ে দিলাম পিতা ও মাতা
ওরে কলংকিনি জাতির কুলমান রাখলে না আগে জানিনা (২)
পিরিতি পিন্দাইলো ছিঁড়া তেনা আগে জানিনা।
পাগল আশরাফ ভেবে বলে, পইরা গেলাম বিষম কূলে
ঐ জাতি পিরিত যে মইজা। (২)
ওরে লোক না চিনে পিরিত করলে কানতে হবে সারা জনম
ঘটনাটা সবারই জানা আগে জানিনা
পিরিতি পিন্দাইলো ছিঁড়া তেনা আগে জানিনা। (২)

৩

ও দয়াল আল্লা গো ও দয়াল মওলা গো
এক বার পার করো মোরে (২)
আমি আয়লাম কোথায় যাবো কোথায় (২)
নেও গো আমায় সেই জাগায় আর (২)
আমায় দিলা তুমি পারের তরী পাইলাম না বাইতে তরি
তুমি নওগো দয়াল পর পারে
পার করো আমায় আর
ও দয়াল আল্লা গো ও দয়াল মওলা গো
একবার পার করো মোরে (২)

৪

হাই মোহাম্মদ কামলী ওলা আয়রে আমর বুকে আয় (২)
চাঁদ সুরুজ আর গ্রহতারা জ্বিন ইনছান আর ফেরেস্তা (২)
আর দিবা নিশি পাগল কান্দে হুর ফেরেস্তা নুরানি (২)
হাই মোহাম্মদ কামলীওলা আয়রে আমার বুকে আয়
জগত মহিমার ফুলের গন্ধে থাকি আমরা কী আনন্দে (২)
ফকির দরবেশ বাদশা ওলি, তুলে তারা ফুলের কলি (২)
আবার ভিক্ষার ঝুলি কাদে নিয়ে ঘুরে তারা বাড়ি বাড়ি (২)
ভোলামন মন রে আমার ....

www.pathagar.com

দয়াল ডাকছি তোমায় কৃতদাসী শান্তি দাও মোর কলিজায়
হাই মোহাম্মদ কামলীওলা আয়রে আমার বুকে আয় (২)

৫

এ বিশ্ব বাগানে শাহি নিরানজনে মানুষ দিয়া ফুটাইছে ফুল গো
এ বিশ্ব বাগানে (২)
হাওয়া যখন গন্দম ছিরে বেহেস্ত খানায়
তিন ফুটা কুন জারী তখন হইয়া যায়
দেখো এক ফুটা দিয়া, মানুষ বানাইয়া (২)
হইয়াছে এই দুনিয়ার মূল .... ঐ (২)
এবার গন্দমেরি আটা দিয়া বানাইলাম কালী
সাবাগানের ঘরে ঘরে কোরান দেয় তালী (২)
আশরাফ কয় আসল কতা যদি বলি ভুলা মুনশী হয় বেজার
এবার সেই ফল খাইতে মান করতে খুদা ....ঐ
আবার সেই ফল আমরা সবাই করতেছি আহার ....
বাবা সে আদম, হাওয়া সে গন্দম (২)
এই দুনিয়া ভাঙ্গল কুল (২)
এ বিশ্ববাগানে শাহিনিরানজনে মানুষ দিয়া ফুটাইছে ফুল গো
এ বিশ্ব বাগানে (২)[১]

ছকমান বয়াতির গান

সারিয়াকান্দি এলাকায় একসময় নামকরা বাউল শিল্পী ছিলেন ছকমান বয়াতি। আমাদের সংগৃহীত তার তিনটি গান এখানে সংকলিত হলো।

১

দিনের দিন গত হলো এমন দিন আর হবে না,
আলেম লোকের মছলা শুনে ভেবে বাঁচি না।
আমি বারে বারে বারণ করি ওরে ছকমান শোননা,
জাহান্নামে যাইবা রে ভাই জারি গাইও না।
ছকমান যদি গাও হে জারি
কাজে কামে মোল্লা পাইবা না।
আলেমেরা বলছে ওর হাতের খানা খাইও না,
বাপের ধর্ম করলেও ওর বাড়ি যাইও না
ছকমান হাদিস মানে না।
শুনে কথা মর্ম ব্যথা ভয় লাগে মোর অন্তরে

www.pathagar.com

আলেমেরা দলিল দেখে কি জব দিবা আখেরে,
ও ভাই কি জব দিবা আখেরে।

২

আশ্বিনা পূজা গাঁয়ে লক্ষি পূজা পুন্নাম দিয়ে
মোল্লা বাড়ির পর
সব মুসুল্লি ঠাইসা ধরে ওরে ব্যাদিন তওবা পর
দিন তো তর বইয়া গেছে ওরে তুই আল্লারস্তে
নামাজ পড়
ব্যাদিন কাব্য খ্যান্ত কইরা মন তুই দিনের পন্থ ধর।
আমার এক মন কয় তওবা পড়ি।
আরেক মন কয় পড়বো না ফের গাইবো জারি
আরেক মনে উইঠা বলে মহরমটা দেই না পাড়ি
মুখে রাইখাছি দাড়ি
আমার শুভক্ষণের আর নাইরে দেরি,
এক মনে দুই দিকে টানে মনরে কোনডা আমি ঠিক করি।

৩

আদমের একটি কথা সভায় করি বর্ণনা
হাউস করে আদম আল্লা পয়দা করেছে
আল্লাতালার হুকুমেতে আদম থাকে বেহেস্তে
ফেরেস্তারা তারিফ করে আদমের বন্দেগি দেখে।
প্রথমে আদম বলে ওগো আল্লা বিধাতা
একলা ভবে পাঠাই দিলা দোসর দিল না.
আমি একমুখে কই আল্লা আল্লা
আর তো কেহ বলে না,
দোসর একজন পয়দা কর একলা ভাল ঠেকে না।
আদমের কথা আল্লা দরগাতে করলেন কবুল
মা হাওয়াকে বানাইতে করিলেন হুকুম
যাও যাও যাও ফেরেস্তা শিগরো করে যাও
আদমের বাও রাঙ্গা নেকে মা হাওয়াকে বানাও।[২]

জোতদার বাউলের গান

হামাগিরে বগড়ায় আছে মহাস্তান
স্থান পেয়ে জীবন ধণ্য হলো
জুরাইছ হামরা প্রাণ
মহাস্তানের বটগাছ তলে
একটি পাথর পড়ে আছে

www.pathagar.com

মুসলমানে পাথর ছালাম করে
হিন্দু করে প্রণাম
প্রতি বছর বৈশাখ শেষে
পাগলেরি ভাই মেলা বসে
কত আশেক কত সাধু
ছুটে আসে মহাস্তান
দুই কূলের কাণ্ডারি সুলতান
হিন্দু মুসলিম আর বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
বাউল মুকুল বসে আছে
চরণে ধুলি কর দান
হামাগরে বগড়ায় আছে মহাস্তান

২. মাজারের গান (আধ্যাত্মিক)

শাহ সোলতান বাবা তুমি-ই-ই-ই
দরবারে লি ই-ই-ই
ইসলাম প্রচারে বাবা
মহাস্তান আইলি-ই-ই-ই
ধর্ম যুদ্ধ কইরা শাহা-
নাম হইয়াছে শাহ-সোলতান
তোমার নামে মানত করে-এ-এ-এ-এ
হিন্দু মুসলমান
ইসলাম প্রচারে বাবা
মহাস্তান আইলি
কত পাপী তাপী আলো
তোমার কাছে দোয়া চাইল
দুর হইল মনের ব্যাথা।
মুশকিলো আছান
কত পাগল বাবা তোমার সংসার ত্যাগী পাগলতো নাই
বাউল মুকুল বিনয় করে
চরণে দিও ঠাঁই।[৩]

৩. কর্মসংগীত

ঢেঁকিতে চাল বা আটা কোটার গীত

সারিয়াকান্দি এলাকায় বিয়ে উপলক্ষ্যে বর বা কনের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিভিন্ন পিঠা-চিড়ার আয়োজন থাকে। এ জন্য ঢেঁকিতে আটাকুটা হয়। ঢেঁকিতে আটাকুটার সময় চলে আটাকুটার গীত। এমনি দুটি গীত হলো :

www.pathagar.com

এক

আমতলা, জামতলা, কাঁঠালতলা গেছলাম গো,
সেটি (সেখানে) না যাইয়া দেকি দুই সতীনের আন্ধন (রান্না) গো,
দুই সতীনের আন্ধন হামি একলাই আন্ধিনু গো,
তাও জানি ফিরে স্বামী সতীন তোলে না ঘরে গো।

দুই

দুপুরের ওদের মধ্যে ওগো লালবি (নাম) উঠিয়া দিছো বাড়া,
আসিয়া হামি ধরি চিলবিল পাখি লালবি তোলা ঢেঁকির বাড়া।

শব্দার্থ

১. ওদ- রোদ
২. সেটি- সেখানে
৩. হামি- আমি
৪. চিলবিল- এক ধরনের পাখি।

৪. গাইনের গীত

ক্ষেত্র বন্ধু জাহিদ ইকবাল জিতু জানালেন নারহট্ট বাজারে দিঘির পাড়ে হযরত শাহ সুলতান (রহ.) পীরের মাযারের পাশে হাসিনা বেগম নামে একজন লোকশিল্পী আছে তার কাছে গেলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। সময় নষ্ট না করে আমরা দু'জন রওনা দিলাম হাসিনা বেগমের কাছে। পুকুর পাড়ে সরকারি খাস জমির উপর পানি ছুঁই ছুঁই করে অনেকগুলো ছোট সারি বাঁধা টিনের ঘর। কোনটি টিনের বেড়া কোনটি আবার বাঁশ থ্যাতলানো খলপার বেড়া। এমনি একটি টিনের বেড়া দেওয়া মাটির মেঝেতে চৌকির নিচে এবং মেঝের অনেকখানি জুড়ে পেঁয়াজ আলু বিছানো ঘরে গিয়ে বসলাম।

হাসিনা বেগম কে আমরা যখন আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালাম তখন সে তার স্বামী মতিউর রহমান কে ফোন করে আশপাশের কোন এক জায়গা থেকে ডেকে নিয়ে এলো। স্বামী মতিউর রহমান ছোট চৌকির উপর হাসিনা বেগমের মুখোমুখি বসে কী-বোর্ড বাজানো শুরু করল। কী-বোর্ডের সাথে হাসিনা বেগম নিচু গলায় গান গাচ্ছিল। কেননা তার বাড়ির পাশেই রয়েছে দরগাহাট মাযার এবং তার ঘরের সাথে যে রাস্তা সেই রাস্তার অপরদিকে একটি কওমী মাদ্রাসা। সুতরাং হাসিনা বেগমের জোর গলায় গান গাওয়ার অভ্যাস থাকলেও নিচু গলায় গান গাইতে লাগলেন। তার এই নিচু গলায় মিষ্টি সুরের গান শুনে আশপাশ থেকে ৭/৮ জন মধ্যবয়সি ও বৃদ্ধা মহিলা তার ছোট্ট ঘরে চটের বস্তা পাড়া মেঝেতে বসে পড়ল। সঙ্গে ৪/৫ জন ৫-১০ বছর বয়েসি ছেলে মেয়ে বসে ঘরটি রীতিমত গানের আসরে পরিণত করে ফেলল। মায়ের গানটা গাওয়ার পর দু'জন বৃদ্ধা মহিলা চোখের জল মুছলেন। নবিজি-কে নিয়ে গাওয়া গান শোনার পর হালিমা বেওয়া (৫৫) নামে এক মহিলা বলে উঠলেন- 'মান্ষে এমনিই খারাপ খারাপ

www.pathagar.com

কথা বলে দুন্‌নাম করে বদনাম করে। কিন্তুক গান শুনলি পারে বোজা যায় গান কোনা কত গভীর তত্ত্বের গান। চোকের পানি ধরে রাখা যায় না।' হাসিনা বেগমের গানে সেখানে প্রায় সব শ্রোতাই যেন মুগ্ধ হল। তবে এ কথা স্পট বোঝা গেল সমাজে হাসিনা বেগম এর নামে কুৎসা এবং বদনামের অন্ত আছে বলে মনে হয় না। এখানে আরো একটি মজার ব্যাপার হলো গানের আসরের শেষ দিকে যখন ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা বের করেছি তখনই উপস্থিত শ্রোতা মহিলারা মুখে কাপড় দিয়ে উঠে দৌড় দিলেন। তারা কেউই আমার ক্যামেরার সামনে ছবি ওঠার জন্য দাঁড়ালেন না। তাদের ধারণা ছবি ওঠা হারাম এবং ছবি তুললে রোজ হাশরের বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে। তারা যে পৃথিবীতে খারাপ কাজ করেছিল আল্লাহ্‌র কাছে ঐ ছবিগুলো সাক্ষ্য দিবে। তবে হাসিনা বেগম তার স্বামী এবং একমাত্র মেয়ে ছবি তুলতে দিতে কোন বাঁধা দেয় নাই। বরঞ্চ তারা ছবি উঠাতে বেশ খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধই করেছে।

যেভাবে আজকের হাসিনা বেগম

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে হাসিনা বেগমের মা মারা যায়। চার বোনের মধ্যে হাসিনাই ছিল সবার বড়। সংসারের হাল ধরার জন্য পিতা দবির উদ্দীন মণ্ডল আবার বিয়ে করে একদিকে অভাব ও দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত অন্য দিকে সৎমায়ের নিষ্ঠুর অত্যাচার হাসিনা বেগমের জীবন যেন একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলে। সৎমায়ের অত্যাচার নির্যাতনে দিশেহারা হাসিনা বেগম যখন কোন কূলকিনারা পাচ্ছিল না তখন তাদের গ্রামে দুপচাঁচিয়ার বাবুল ওপেরা যাত্রাদল তাদের গ্রামে যাত্রা করার জন্য আসে। বাবুল ওপেরা যাত্রাদলের নায়িকা সন্ধ্যা রানি তার স্বামী নায়ক নিশান সুব্বর, প্রদীপ সুব্বর নামে তাদের ছয় মাসের শিশু পুত্রের জন্য একজন ছোট মেয়ে খুঁজছিল। সৌভাগ্য ক্রমে তারা হাসিনা বেগম কে পেয়ে যায়। হাসিনা বেগমও তখন এই বর্ণিল জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এমন মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাত্রাদলের নায়িকা সন্ধ্যা রানির হাত ধরে মনের আনন্দে তাদের সাথে পথে বের হলেন। সেই যে পাঁচ বছর বয়স থেকে ঘরছাড়া আজো তার আর ঘরে ফেরা হলো না। হাসিনা বেগম প্রদীপের দেখাশোনা করে এবং রাতে যখন যাত্রাপালা হয় তখন নায়িকা সন্ধ্যা রানির মুখ থেকে উচ্চারিত ডায়ালগগুলো এবং গানগুলোর বেশিরভাগই সে শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলে। ছোট্ট প্রদীপ-কে কোলে নিয়ে একা একাই কখনো যাত্রার বিভিন্ন পালার ডায়ালগ বলে অথবা মুখস্থ করা গানগুলো গুনগুন করে গাইতে থাকে। তার এই ডায়ালগ বলা এবং গান গাওয়ার চমৎকার প্রতিভাটি সন্ধ্যা রানির চোখে পড়ে। সন্ধ্যা রানি তখন তাকে ঐ অল্প বয়সেই মঞ্চে দুই একটা করে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেয়। ওস্তাদ কিংবা দীক্ষাগুরু বলে হাসিনা বেগমের কেউ নেই। পরবর্তীতে যাত্রা পালায় অভিনয় করার সুযোগ হয়। এভাবেই আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে। যৌবন কালে অত্যন্ত আকর্ষণীয় যাত্রা নায়িকা হিসেবে যাত্রার জগতে আবির্ভূত হন। একসময় যাত্রায় মন্দা অবস্থা চললে সাকার্স দলের সাথে যুক্ত হয়ে সার্কাসের নানান রকম কলা এবং কসরত শিখে নেয়। বর্তমানে বিভিন্ন যাত্রাপালার পাশাপাশি জুয়ার আসরে নেচেগেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

www.pathagar.com

সংগীত পরিবেশন করছেন হাছিনা বেগম, কাহালু

৫. লোকগান

১. ওহে আমার মনগো আল্লা
দুধ জোগাদে দুই বেলাতে
খাবি দাবি পরকে দিবি
আসল দুধ আমাকে দিবি
ওহে আমার মনগো আল্লা
দুধ জোগাদে দুই বেলাতে ॥
ঐ
দুধ থুস্না তুই আল্‌গা করে
হিংসা বিড়াল পিছে ঘোরে
সুযোগ পালে খাতে পারে
তেবে কি দুধের মান থাকিবে ॥
ঐ
এক জাগায় ছয় বাছুর ঝোলে
কাম বাছুরে দড়ি ছেড়ে
লালন কয় দুধ শুকালে
খাওয়াইবি কামের ঘরে
তেবে সে দুধের মান থাকিবে ॥
ঐ

www.pathagar.com

ঘরে আছে ধর্মের গাভি
যখন ইচ্ছা তখন পাবি
কামের ঘরে খাওয়াইবে
তেবে দুধের মান থাকিবে ॥
ঐ

২. হঠাৎই আঘাত পাইলে
মা শব্দটি মুখে লয়
মা যে আমার কত কাছে রয়
মা যে আমার কত কাছে রয় ॥
ঐ
একমা আমার হয় যে মাটি
তার কোলেতে পেয়েছি স্মৃতি
আরাক মা আমার ফাতেমা জননী
পরকালে করবেন পার
মা যে আমার কত কাছে রয় ॥
ঐ
এক মা আমার হয় দুখিনি
তার কোলে জন্মেছি আমি গো
মা যে আমার জনম দুখিনি
অতি কষ্টে সন্তান লয়
মা যে আমার কত কাছে রয় ॥
ঐ

৩. আ র র র শোন বলি লো প্রাণ সখী
ও আমার বন্ধুর মনে এই কি ছিল
শোন বলি লো প্রাণ সখী
ও আমার বন্ধুর মনে এই কি ছিল ॥
ঐ
ভালোবাসা করলা তুমি
চোখের জলে ভাসি আমি
এই কি ছিল তোমার মনে বন্ধু রে

www.pathagar.com

আগে তো না আমি জানি
বন্ধু আগে তো না আমি জানি ॥
ঐ
না জানি গো বন্ধুর ঠিকানা
কেমন আছে বন্ধু তাও জানি না
আছে কিবা মারা গেছে তাও জানি না
সখীরে এনে দে আমার মনের মানুষকে তোরা
আমার বন্ধুর মনে এই কি ছিল ॥
ঐ
আজ হইতে বন্ধু হারায়া
এখন হইতে গৃহছাড়া
কী আর হবে বেঁচে থেকে
বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো সখী
বন্ধুর মনে এই কি ছিল সখী
শোন বলি লো প্রাণ সখী
ও আমার বন্ধুর মনে এই কি ছিল ॥

৪. আ র র র মন তোরে পাই নারে
আমি বানাইতাম মনরতন
মনতোরে পাইনারে
আমি বানাইতাম মনরতন ॥
ভাই কাঁদবে ভাতিজা কাঁদবে কাঁদবে ঘরে অমণী
শিহরে বসে কাঁদিবে আমার মাও জননী
রে পাষাণীর মন ॥
ঐ
পাষাণ মন তোরে পাই না রে
আমি বানাইতাম মনরতন
চৌদ্দ ইঞ্চি কোদাল রে ভাই
আড়াই হাত তার ডাটি
সেই কোদালে কাটিয়া তুলিবে
আপন ঘরের মাটি
রে পাষাণীর মন ॥
ঐ

www.pathagar.com

৫. আমি তোর মনের কথা জানি প্রাণ সজনি
আমি তোর মনের কথা জানি।
হাতের উপর হাত রাখিয়া
আমায় কথা দিয়াছিলে
এখন কেনে রইলি ভুলে
আমার কথা নাই তোর মনে
আমি শুধু হইলাম কলঙ্কিনী ॥
ঐ
যতই দেখো আশেপাশে
তোমার লিদান কালে কেউ না আসে
আমি তো আছি তোমার কাছে
যতই আমি দূরে থাকি
তোমার কথা মনে করি
আমার কথা নাই বুঝি তোর মনে প্রাণ সজনি ॥
ঐ
যখন আমি মারা যাবো
তখন তোমার মনে পড়বে
কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে সেদিন প্রাণ সজনি ॥
ঐ

৬. এই দুনিয়াটা পুতুল খেলা আল্লা
এই দুনিয়াটা পুতুল খেলা
পুতুল খেলা নয়রে ছেলে ভোলা
ছেলে ভোলা নয়রে স্বপনের খেলা ॥
ঐ
এসেছ একা খেয়েছ ধোঁকা
সেজেছ বোকা মন পাগলা
এই দুনিয়াটা পুতুল খেলা
নয়রে খেলা ছেলে ভোলা
ছেলে ভোলা নয়রে স্বপনের মেলা
এই দুনিয়াটা পুতুল খেলা ॥

www.pathagar.com

ঐ

আবু কা দিল্‌কা
দুই কান্দে দুই ফেরেশ্‌তা
ডানে বামে আমল নামা
যে জন খাঁটি মুসলমান
জবাব দিবেন বর্তমান
জবাব না দিতে পারলে হইবে গুণা ॥

ঐ

যাইতে সময় করলাকি
আইস্যা ভবে বললেন কি
জিগাইলে আল্লা
বাপ মাও যাবে না
স্ত্রীগণ যাবে না
যার যার কবরেতে যাবি একেলা ॥

ঐ

৭. আ র র র আমাবস্যা পূর্ণিমায়
দ্বিনের নবির জন্ম হয়
নিরালায় বইসে কাঁন্দে
বিবি আমেনায়
আমাবস্যা পূর্ণিমাতে
দ্বিনের নবির জন্ম হয় ॥
নবি যে ছিলো আমার আদমের দেওয়ানা
নবি যে ছিলো আমার আশেকের দেওয়ানা
নবি যে ছিল আমার উম্মতের দেওয়ানা
দয়াল নবি গো ও ও ও ॥
নবি বলে মাগো মা তোমার দুধ আর খাবো না
তোমার দুধ খাইলে মাগো উম্মত পাইবো না
নবি যে ছিলেন আমার আশেকের দেওয়ানা
দয়াল নবি গো ॥
ও একদিন নবি যে ভবেতে এলো

www.pathagar.com

এই দুনিয়া দেখতে পেল
তেষট্টি বছরে নবির এন্তেকাল হলো ॥
ঐ
চার জনে গোসল করায়
কান্দে মাতা ফাতেমায়
নবিজি চলে গেলেন আসল ঠিকানায়
নবিজি ছিলেন আমার আশেকের দেওয়ানা ॥
ঐ
একদিন নবিজির কবর দ্যান
শিরালে তা দেখতে পান
নবির মুখের কাপড় নাজি
নড়ে তার কথায়
ধীরে ধীরে কাছে যায়
নবির বুকে কান লাগায়
নবিজি কানছে আজি উম্মতের লাইগ্যা ॥
ঐ
ও একদিন কঠিন ওজ হাশরে
দারুণ ওজজো পড়িবে
কাঁন্দিবে উম্মত সেইদিন পানি পানি বলে
উম্মত বলে মোর দুয়াই
পানি মাগো পাই কোথায়
পানি বিহনে নবি প্রাণ বাঁচেনা
নবি যে ছিলেন আমার আদমের দেওয়ানা
নবি যে ছিলেন আমার আশেকের দেওয়ানা
নবি যে ছিলেন আমার উম্মতের দেওয়ানা
দয়াল নবি গো ॥
ঐ

৮. সত্য জবান তক্তা গড়া
ঈমানে লাগাইছে গোড়া
অহংকারে ময়লা পড়া
তোবাতে সাবান লাগাও
গাও সকলে নবির গুনগান ॥
ঐ

www.pathagar.com

এলো নবি পৃথিবীতে এই দুনিয়া দেখতে পেলো
উম্মতের লাইগ্যা নবি কান্দে জারো জার
গাও সকলে নবির গুণগান ॥[৪]

ঐ

গাবতলীর লোকগান

কামারচট্ট গ্রামে ইছামতি নদীর পাড়ে বসে বালু শ্রমিকদের সাথে বসে যখন ছড়া ও গল্প শুনায় মশগুল ঠিক তখনই আমজাদ হোসেন নামের এক ব্যক্তি বলল- হামি একখান গান কমো। তারপর তিনি গান গাওয়া শুরু করলেন। তার অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠে যমুনার করাল গ্রাসের করুণ চিত্রের গান শুনে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সকলের অনুরোধে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পটভূমি নিয়ে তৈরি আরও একটি গান শুনাল। হাতে সময় না থাকায় বাজারে যাওয়ার তাড়া আছে বলে চলে গেল।

১. যমুনার ভাঙ্গনে আমার সবই গেল হায়
এখন আমি কি যে করি নেই কোন্ উপায় ॥
ছিল আমার জায়গা জমি ছিল বাড়ি ঘর
সর্বনাশা যমুনারে তুই সবই করলি পর
চোখের জলে কাঁন্দি সারা জীবন ভর ॥
আহারে যমুনারে তুই কত ঘর ভাঙ্গিলি
শত শত ময়না বিবির কোল খালি করিলি
কী করিব কোথায় যাব বলে দে আমায় ॥
শোনেন শোনেন গেরাম বাসি শোনেন গো সবাই
অন্ন বস্ত্র বাসস্থান নেই আমার ॥

২. ও ও শহিদ হইল খান সেনাদের গুলিতে ॥
বাংলাদেশের বীর সন্তান
স্বাধীন যুদ্ধে দিল প্রাণ
সেই স্মৃতি আজও পারি নি ভুলিতে ॥
ইয়াহিয়া টিক্কা খান
তোমার দেশ পাকিস্তান
বাংলাদেশে আইস্যা তোমরা
কাড়িলা বাংলার মান
কত লোকের গেল প্রাণ কত নারীর মান সম্মান
সেই স্মৃতি পারি নি আজো ভুলিতে ॥
একাত্তরের যুদ্ধে তারা দিয়া গেল প্রাণ
তাই দেখিয়া ভারত বাসী পাঠালো টেনগান

www.pathagar.com

টেনগান আর মেশিন গান
রক্ষাকরল বাংলার মান
সেই স্মৃতি আজো পারি নি ভুলিতে ॥[৫]

৩. ও কালা ভাই
আমার তো কোন জাগা জমি নাই
ওরে কালা ভাই
এই দেশ স্বাধীন যে বছর
বাইজ্যাছিল ভাই ঘোর গন্ডগোল
জমি বেচ্যা লবণ কিনা খাই
রে কালা ভাই ॥
ওরে আসিয়া বন্যার পানি
খ্যাতের গ্যাছে ফসল খানি
কী খিলা ছোল পোলেক বাঁচাই ॥

৬. মেয়েলি গীত

আদমদিঘির মেয়েলি গীত

কড়ই গ্রামের মাবিয়া বিবি খুব একটা গীত টিত গান না। তার গীতের ভাণ্ডারও বেশি নয়। বন্ধুর পরিচিত বলেই তার অনুরোধে আমাদের একটি গীত শুনিয়ে দেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা রেকর্ড করে ফেলি। গীতটি নিম্নরূপ :

আমি গেঁথেছিলাম ফুলের মালা
ফুলের মালা দুলাভাই
পড়াইবো তোমার গলে-॥
রাস্তার মানান হুন্ডা দেবো দুলাভাই
চড়িয়া চড়িয়া ঘুরিয়ো।
হাতের মানান ঘড়ি দেবো দুলাভাই
টাইম দেইখ্যা বেড়াইয়ো
গেঁথেছিলাম ফুলের মালা দুলাভাই
পড়াইবো তোমার গলে।
ঘরের মানান বুবু দেবো দুলভাই
দেখিয়া দেখিয়া থাইকো।[৬]

কাহালুর মেয়েলি গীত

আগেই গুলশান আরা সিম্মির কাছে ওর বৃদ্ধা দাদির কথা শুনেছিলাম। ওর সঙ্গে বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমেই ওর দাদির কাছে গিয়ে বসলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে একথা

www.pathagar.com

সেকথা বলতে বলতে দাদির বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তাঁদের সময়ে কীভাবে বিয়ে হতো বিয়ে বাড়ি কী হতো ইত্যাদি। দাদি তাঁদের সময়ে বিয়ের নানান বিষয় বলতে বলতে বিয়ের গীতের বিষয় আসতেই একটা গীত শোনানোর অনুরোধ করলাম। লজ্জা পেলেন। সিম্মি সাথে সহযোগিতা করার কথা বলার পর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন।

১. হামার ঘরে আছেরে বেলোয়া (কন্যা) সাহেব কেমনে জানে।
হামার ঘরে আছেরে বেলোয়া লায়েবে কেমনে জানে।
কাগারায়ে (কাক) শুনেছি বেলোয়া আছে ঘরে।
পঙ্খি কয় (পাখি) শুনেছি খবর বেলোয়া
একো কথা দুয়ো কথা তিনো কথার পরে
লায়েব মটোরে তুলা লিল
হামার মঞ্জিলের শোভা কারেবা মঞ্জিলে গেলো।
হামার আগিনার শোভা কারেবো আগিনার ঘরে।
একো দিন দুয়ো দিন তিনো দিনকার বেলা
হামার বেলোয়া আর লায়েব ঘুরে আসল বাড়ি
তোমার মঞ্জিলের শোভা কেমন ভালো হলো
হামার মঞ্জিলের শোভা দেখিয়া হামার কলিজা ভরিয়া গেলো
একো দিন দুয়ো দিন তিনো দিনের বেলা আবার আসিবো ঘুরে
মা দুঃখ যেন করো না মনে।

২. আজার (রাজা) বেটা হরিলাল সাদা ঘর
আলো ঘরে ছাতি (বুক)
ধরো না ধরোনা ছাতি লকায় যাবে তোমার জাতি।
তুমি হলেন রাজার ছেলে লকায় আমি হলাম ডোমের মেয়ে।
জাতি গেলে জাতি পাব কামুনি (বউ) পাব কুটি (বউ)
আগা হালের গরু বেচা গিয়াতি খিলামু
জাতি তুলিয়া নিমু আহারে ডোমের মেয়ে জাতি তুলিয়া নিমু
আহারে রাজার ছেলে লকায় জাতি তুলিয়া নিমু।

৩. তোমার মাথায় কিসের বোঝায় রে অসের আনি (রসের বউ)
তোমার মাথার বোঝা ফেলো রে অসের গোয়াল আনি।
তোমার সিন্দূর বায়না দিছি।
তোমার মাথার বোঝা ফেলোরে
মালা বায়না দিছি।
শাড়ি বায়না দিছি।
তুমি পালঙ্গে বসা পইরো
তুমি আয়না ধরা দেখো রে অসের গোয়াল আনি
তুমি আরশি ধরা দেখো রে অসের গোয়াল আনি।[৭]

www.pathagar.com

গাবতলীর মেয়েলি গীত

সাধারণত গায়ে হলুদের দিন রাতের বেলা থেকে গীতগুলো গাওয়া শুরু হয়। গ্রামে গীত গাওয়ায় পারদর্শী মহিলার দল কনে কে ঘিরে গীতের আসর জমায়। আবার কোন কোন সময় অন্যগ্রাম থেকে গীত গাওয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে লোক নিয়ে আসে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন অথবা চেনাজানা মহিলারাই বিয়ে বাড়িতে গীতের আনন্দ দিয়ে থাকে। গীতগুলোতে একই কথা সবাই মিলে বার বার বলে থাকে। কোন কোন সময় ৪/৫ জন থেকে ৮/১০ জন পর্যন্ত মহিলা এক সাথে হয়ে গীত গায়। এ সময় খুব চেনা জানা এবং আপনজন না হলে মেয়েলি গীতের আসরে পুরুষ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না।

বিয়েরগীতের সাথে নাচছে রিনা ও কয়েকজন

১. পান আইনব্যার কছনু দামান
পান আনো নি
পাইকোড়ের পাতা দামান
তাওতো চিনো নি
সুপারি আইনব্যার কছনু দামান
সুপারি আনো নি
বটেরই ফল দামান
তাওতো চিনো নি
খর আইনব্যার কছনু দামান
খর আনো নি
শিয়ালেরই গু দামান

www.pathagar.com

তাওতো চিনো নি
দামান ছিঃ দামান ছিঃ
বেন্যা দামান দেক্যা বিয়া বসিচি।
শাড়ি আইনব্যার কছনু দামান
শাড়ি আনো নি
কলারই পাতা দামান
তাওতো চিনো নি
ত্যাল আইনব্যার কছনু দামান
ত্যাল আনো নি
পুকুরের পানি দামান
তাওতো চিনো নি
দামান ছিঃ দামান ছিঃ
বেন্যা দামান দেক্যা
বিয়া বসিচি।

২. বায়ে হালে বাতাসে ঢোলে
ভোমরা ওড়ে তার সাথেরে
ময়না কান্দে ॥
পরদেশে গেচিল্যাম ময়না
কি কি দেমো তার সাথে রে
ময়না কান্দে ॥
ময়নার গাওত গয়না দিনু
দিনু ময়নাক শাড়ি
হ্যাট্যা না গেল ময়না
চড়্যা দিল্যাম গাড়ি
ময়না যায় রে ও ময়না কান্দে ॥[৮]

৩. মাগো খুলিত আচ্চে পাখি মারা আলা
মাগো খুলিত আচ্চে পাখি মারা আলা ॥
মাগো তারগেরে পায়ে সোনার নেপূর বাজে
মাগো তারগেরে পায়ে সোনার নেপূর বাজে ॥
মাগো হামি না যামু পাখি মারার সাতে
মাগো হামি না যামু পাখি মারার সাতে ॥
মাগো কোলের যাইদাক কাকে দিয়া যামু
মাগো কোলের যাইদাক কাকে দিয়া যামু ॥
মাগো কোলের যাইদাক শাশুড়িকে দিমু
মাগো কোলের যাইদাক শাশুড়িকে দিমু ॥
মাগো তাও না যামু পাখি মারার সাতে
মাগো তাও না যামু পাখি মারার সাতে ॥

www.pathagar.com

মাগো আকার রান্দন কাকে দিয়া যামু
মাগো আকার রান্দন কাকে দিয়া যামু ॥
মাগো আকার রান্দন জাইদাক দিয়ে যামু
মাগো আকার রান্দন জাইদাক দিয়ে যামু ॥
মাগো তাওনা যামু পাখি মারার সাতে
মাগো তাওনা যামু পাখি মারার সাতে ॥
মাগো ঘরের স্বামীকে কাকে দিয়ে যামু
মাগো ঘরের স্বামীকে কাকে দিয়ে যামু ॥
মাগো ঘরের স্বামীকে সতীনেক দিয়ে যামু
মাগো ঘরের স্বামীকে সতীনেক দিয়ে যামু ॥
মাগো তাওনা যামু পাখি মারার সাথে
মাগো তাওনা যামু পাখি মারার সাথে ॥

৪. বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে লাকের বেসর সুতে লইয়াছে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে কানের দুল সুতে লইয়াছে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে গলার হার সুতে লইয়াছে ॥

বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে মাথার টিকলি সুতে লইয়াছে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে পায়ের নেপূর সুতে লইয়াছে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে হাতের বাজু সুতে লইয়াছে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে কোমরের বিছ্যা সুতে লইয়াছে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি ॥

www.pathagar.com

শাশুড়ি আম্মা গালি পারে
স্বামী হয়্যা আদর কারে ॥
শাশুড়ি আম্মা গালি পারে
স্বামী হয়্যা আদর কারে ॥
ওটো বালি জ্বালায় বাতি বেসর পর নিশি রাতে
ওটো বালি জ্বালায় বাতি বেসর পর নিশি রাতে ॥
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
বাড়ির আগে ফানুস নদী আপাল খেলে চেংড়া বালি
আপাল খেলিতে ঝাপাল খেলিতে লাকের বেসর সুতে লইয়াছে ॥

৫. ভাসিয়া যায়রে শিমুলের ফুল অধম দরিয়ার মাঝে
ভাসিয়া যায়রে শিমুলের ফুল অধম দরিয়ার মাঝে ॥
থা পাইয়া ধরিব ফুল রাখিব খোঁপার মাঝে
থা পাইয়া ধরিব ফুল রাখিব খোঁপার মাঝে ॥
খোঁপার মোদে জ্বলেরে ফুল
খোঁপার মোদে জ্বলেরে ফুল ॥
জ্বলে যেন আসমানের তারা
জ্বলে যেন আসমানের তারা ॥

৬. সোনালী রূপালী দুইটি পাখি তারা আসামনে জমিনে উড়ে
সোনালী রূপালী দুইটি পাখি তারা আসামনে জমিনে উড়ে ॥
ছেলের বাবারা নিবার পালা দোকানে বসিয়া হাসে
ছেলের বাবারা নিবার পালা দোকানে বসিয়া হাসে ॥
মেয়ের বাবারা দেওয়ার মালিক দোকানে বসিয়া কাঁন্দে
মেয়ের বাবারা দেওয়ার মালিক দোকানে বসিয়া কান্দে ॥

৭. সাত নদী সাতরে গো রাজা বিয়ে করব্যার যায় ঐ নদীর পাড়ে
সাত নদী সাতরে গো রাজা বিয়ে করব্যার যায় ঐ নদীর পাড়ে ॥
অদ্দেক নদীত্ যায়্যা গো রাজা নৌকা ডুবিয়া মলো
অদ্দেক নদীত্ যায়্যা গো রাজা নৌকা ডুবিয়া মলো ॥
খবর দেও গো শালা সমন্ধির আগে ঐ নদীর কূলে
খবর দেও গো শালা সমন্ধির আগে ঐ নদীর কূলে ॥
তোমাগার নয়া জামাতা নৌকা ডুবিয়া মলো ঐ নদীর কূলে
তোমাগার নয়া জামাতা নৌকা ডুবিয়া মলো ঐ নদীর কূলে ॥
বাবাগারে বাইচাল গো থাকিতে নৌকা
বাবাগারে বাইচাল গো থাকিতে নৌকা ॥
ডুবিয়া মলো ঐ নদীর তীরে

www.pathagar.com

ডুবিয়া মলো ঐ নদীর তীরে ॥
সাত নদী সাতরে গো রাজা বিয়ে করব্যার যায় ঐ নদীর কূলে
সাত নদী সাতরে গো রাজা বিয়ে করব্যার যায় ঐ নদীর কূলে ॥

৮. আরে এ-এ-এ বাড়ির আগে কামারিয়া বসামু
আরে এ-এ-এ বাড়ির আগে নোয়ারে বসামু
নিমু লোহারও পিঞ্জিরা ॥
আরে এ-এ-এ তারি মোদে ময়নাক লুকে থুমু
আরে এ-এ-এ তাওনা দিমু দুধের ময়নাক বিয়েরে॥
বাড়ির আগে পুষ্কুরি দিমু আরে এ-এ-এ
তারি মোদে ময়নাক লুকেয় থুমু আরে এ-এ-এ ॥
ওনা পিঞ্জরা লাতিয়া ভাংগুমু
তাই না করমু দুধের ময়নাক বিয়ে ॥
ওনা পুষ্কুরি জাকিয়া তুলমু আরে এ-এ-এ
তাই না করমু দুধের ময়নাক বিয়েরে ॥[৮]

৯. অলি বিলের পোলি মাছ হিম সাগরের পানি
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম সিন্থের সিন্দূর
অলি বিলের পোলি মাছ হিম সাগরের পানি ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম সিন্থের সিন্দূর
না হারাল্যা সিন্থের সিন্দূর আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম লাকের ব্যাসর
না হারাল্যা লাকের ব্যাসর আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম কানের দুল
না হারাল্যা কানের দুল আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম গলার হার
না হারাল্যা গলার হার আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম মাথার টিকলি
না হারাল্যা মাথার টিকলি আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম হাতের বাজু
না হারাল্যা হাতের বাজু আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম পায়ের জুতা
না হারাল্যা পায়ের জুতা আবার কিন্যা দিমু ॥
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম কোমরের বিছ্যা
না হারাল্যা কোমরের বিছ্যা আবার কিন্যা দিমু ॥
অলি বিলের পোলি মাছ হিম সাগরের পানি
সেইন্যা লদীত সাঁতার খেলতে হারাল্যাম সিন্থের সিন্দূর
না হারাল্যা সিন্থের সিন্দূর আবার কিন্যা দিমু ॥

www.pathagar.com

১০. চ্যারিমোরা চারি লিথ্যান গারে লিয়াদার মোদ্দে
একেলা মোদ্দে যামুনা দাদি লটে লিমু হামার সাথে ॥
চ্যারিমোরা চারি লিথ্যান গারে লিয়াদার মোদ্দে
একেলা মোদ্দে যামুনা দাদি লটে লিমু হামার সাথে ॥
কানা দাদা যাবার দিবার লয়
জরুয়ার ছবি লিমু হামার সাথে ॥
কানা দাদা যাবার দিবার লয়
জরুয়ার ছবি লিমু হামার সাথে ॥

১১. হলদি রে তোর কোন খানে জলঙ্গ
হামার জলঙ্গ আতারে পাতারে ॥
হলদি রে তোর কোন খানে জলঙ্গ
হামার জলঙ্গ আতারে পাতারে ॥
দুগলা রে তোর কোনখানে রে জলঙ্গ
হামার জলঙ্গ আতারে পাতারে
হামি গেলে যে হবি বাছার বিয়া রে ॥
ধান রে তোর কোন খানে জলঙ্গ রে
হামার জলঙ্গ আতারে পাতারে
হামি গেলে যে হবি বাছার বিয়া রে ॥
ঘরষা রে তোর কোন খানে জলঙ্গ রে
হামার জলঙ্গ কুলু রে কোন খানে রে।
হামি গেলে যে হবি বাছার বিয়া রে ॥

১২. রুনির বাবার দুয়ারের আগে দিঘি সরোবর
কারব্যান বাবার সরলা পঙ্খি দিঘি করল ঘোলা আ রে
বাপও নাই রে ॥
রুনির বাপক ব্যান করল দিঘি ঘোলা রে
কারব্যান বাবার সরলা পঙ্খি রে ॥
রুনির বাবার দুয়ারের আগে দিঘি সরোবর
কারব্যান বাবার সরলা পঙ্খি দিঘি করল ঘোলা আ রে
বাপও নাই রে ॥
রুনির বাপক ব্যান করল দিঘি ঘোলা রে
কারব্যান বাবার সরলা পঙ্খি রে ॥

১৩. তেলানির পাতিল তুলিয়া ওরে উমা রে জিরা নিমার যায়
পাতিল পুড়িয়া এর মধ্যে এ্যালো হেপির স্বামী আইল আরে।
যুগ যুগ যাইবার চিঠিত আইল রে
চালের বাতা ধরিয়া হেপি কান্দিয়া আইল রে ॥
তেলানির পাতিল তুলিয়া ওরে উমা রে জিরা নিমার যায়
পাতিল পুড়িয়া এর মধ্যে এ্যালো হেপির স্বামী আইল আরে।

www.pathagar.com

যুগ যুগ যাইবার চিঠিত আইল রে
ঘরের ব্যাড়া ধরিয়া হেপি কান্দিয়া আইল রে ॥
তেলানির পাতিল তুলিয়া ওরে উমা রে জিরা নিমার যায়
পাতিল পুড়িয়া এর মধ্যে এ্যালো হেপির স্বামী আইল আরে।
যুগ যুগ যাইবার চিঠিত আইল রে
বসার পিড়্যা ধরিয়া হেপি কাঁন্দিয়া আইল রে ॥

১৪. কুয়ার পারত হ্যানচা থপ থপা ম্যাওলা আইল রে
তারি মোদ্দে বাঘ বসিয়া আছে রে
ধরিয়া বাঘ গিলিয়া খাবার আসে গো ॥
কুয়ার পারত হ্যানচা থপ থপা ম্যাওলা আইল রে
তারি মোদ্দে বাঘ বসিয়া আছে রে
ধরিয়া বাঘ গিলিয়া খাবার আসে গো ॥

১৫. উপর তলাত থেকে রে সনি কয় রে
মুরগি জবাই করে রে
নিচ তলাত থেকে সাইন কয় রে ॥
হামি দিমু মুরগি জবাই করে রে
উপর তলাত থেকে রে সনি কয় রে
মুরগি জবাই করে রে ॥
সাইন নিচ তলাত থেকে কয় রে
হামি মুরগি জবাই করে দিমু রে ॥[১০]

নন্দীগ্রামের মেয়েলিগীত

১. কলা আজরিলাম সারে সারে রে মোবারক
ও আরে নারকেল ঘিরিলাম বাড়িত রে
কেনে নারি রইলেন রোদে...
কোনবা দ্যাশের লাইয়া ব্যাপারী হায়রে
লাও লাগাচে ঘাটে রে...
ক্যানে নারি রইলেন রোদে।
নৌকা কোণা সরাও ব্যাপারী
গোসল কর‍্যা উঠিরে...॥
ক্যানে নারি রইলেন রোদে।
নৌকা কোণা সরাও ব্যাপারী
কলস ভইর‍্যা উঠিরে...
ওমোহিনী সুন্দরী কোমোলা হায়রে
ক্যাশ ক্যান দেকি খালিরে...
ক্যানে নারি রইলেন রোদে।

www.pathagar.com

হামার সাতে গেলে হায়রে
ক্যাশের দিমো তেলোরে...
ক্যানে নারি রইলেন রোদে।
হামার সাতে আলে সুন্দরী শীশে দিমো সিন্দূররে
ঐ সব কতা কইলে ব্যাপারী হায়রে
মুকে মারিবো ঝাঁটারে...
ঐ সব কতা কইলে ব্যাপারী হায়রে
মুকে মারিবো লাত্তিরে...
ক্যানে নারি রইলেন রোদে।

২. চিটকা মাটি তুলারে বক্কর গুটি বানাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...
ঘারে আচিলো লাল গামচা গুটি সুগাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...
লাল শাড়ি ফিনদারে আম্বিয়া লদিত নামাচে
হলদা শাড়ি ফিনদারে আম্বিয়া বিলত নামাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...
হলদা পাকি ভাবারে বক্কর গুটি মারাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...
লাল পাকি ভাবারে বক্কর বাটুল মারাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...
দৌড়া দৌড়ি কর‍্যারে বক্কর কোলে তুলাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে
দৌড়া দৌড়ি কর‍্যারে বক্কর বুকে তুলাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...
পকেটে আচিলো নোয়ার হাতুর দাতি খুলাচে
পকেটে আচিলো নোয়ার চাবি দাতি খুলাচে
চিটকা মাটি তুলারে বক্কর গুটি বানাচে
আহারে সোনার আম্বিয়ারে...

৩. আগনাতোনা লাগ্যা গেচিলাম মারো (॥)
সবরি ঝাড়ের গাচো
ডালিম ঝাড়ের গাচো
হামার কতা মনে হলে মারো (॥)
ডালিম পাইর‍্যা খাইয়ো
ওকি মারো
সবরি পাইর‍্যা খাইয়ো
ওকি মারো

www.pathagar.com

দেওয়ালত ল্যাইপা গেচিলাম মারো
মাজাতোনা ল্যাইপা গেচিলাম মারো
পঞ্চ হাতের ল্যাপা
হামার কতা মনে হলে মারো
ল্যাপা দেইখ্যা থাইকো (॥)
হাঁসালতি ল্যাইপা গেচিলাম মারো
পঞ্চ হাতের ল্যাপা
হামার কতা মনে হলে মারো (॥)
ল্যাপা দেকা থাইকো (॥)
ওকি মারো দাগ
দেকিয়া থাইকো

৪. সুন্ধা লাগিলে পঙ্খি উড়ায় মাটে
শ্যাওলায় লো ॥
আজগার সিন্দূর হামরাই পড়িলো
আজগার ত্যালো হামরাই পড়িলো
শ্যাওলায় লো ॥
সুন্দা লাগিলে পঙ্খি উড়ায় মাটে
শ্যাওলায় লো ॥
আজগার হোন্ডাত হামরাই চড়িবো
আজগার সাইকেলে হামরাই চড়িবো
শ্যাওলায় লো ॥
আজগার শাড়ি হামরাই পড়িবো
আজগার বেলাউচ হামরাই পড়িবো
শ্যাওলায় লো ॥
আজগার সুনু হামরাই দিবো
আজগার পাউডার হামরাই দিবো
শ্যাওলায় লো ॥
আজগার লিবিস্টিক হামরাই দিবো
আজগার ছেন হামরাই দিবো
শ্যাওলায় লো ॥ (এভাবে চলতে থাকে)

৫. বগড়া শহরে দেইয়া আইলাম স্বামীধন
সতিনের শীষের সিন্দূর
বগড়া শহরে দেইখা আইলাম
সতিনের ক্যাশের ত্যালোরে
সতিনবান পড়িবে
শিল ঢুলাঢুল লাচিবে

www.pathagar.com

জীবনে সইবে না।
কাঞ্চা কুঞ্চি কাট্যা ওমোর স্বামীধন
আগিনাত দ্যাবো ব্যাড়া
কাঞ্চা বিন্যা কাট্যা ওমোর স্বামীধন
দ্যাবো ব্যাড়া
ঘাড়ের গামছা ছিড়া ওমোর স্বামীধন
কশিয়া দ্যাবো বান্দন
ঘাড়ের গামছা কাট্যা ওমোর স্বামীধন
আটিয়া দ্যাবো ব্যাড়া
বগড়া শহরে দেইখা আইলাম স্বামীধন
....

৬. লিচুর বাগানে দিয়েছিলাম পাও সখীরে
লিচুর পাতায়ে ঘিরে লিলো গাও।
বায়ে বাতাসে না জুড়ালো গাও ॥
সখীরে অঞ্চল দিয়ে মুছে দ্যাও গাও।
পিয়ারার বাগানে দিয়েছিলাম পাও
সখীরে পিয়ারার পাতায়ে ঘিরে লিলো গাও।
বায়ে বাতাসে না জুড়ালো গাও
সখীরে অঞ্চল দিয়ে মুছে দ্যাও গাও।
আমের বাগানে দিয়েছিলাম পাও
সখীরে পিঁপড়ায়ে ঘিড়ে লিলো পাও
বিষের জ্বালায়ে জ্বল্যা গেলো গাও।
সখীরে ডাক্তার আনিয়া দ্যাও।
সখীরে কবিরাজ আনিয়া দ্যাও।
সখীরে কবিরাজ আনিয়া দেকতো
হামার গাও ॥

৭. লিধুয়া পাথারে হেলাল ছাড়িয়া দিলিন গাড়ি
ঝুমকা বাজায় বাঁশি।
বাজনা বাজায় বাঁশি।
বিবির সিঁতির সিন্দূর কিনিতে হইলো এতো রাতি
ঝুমকা বাজায় বাঁশি।
বাজনা বাজায় বাঁশি।
বিবির ক্যাশের ত্যালো লিতে হইলো এতো রাতি
ঝুমকা বাজায় বাঁশি।
বাজনা বাজায় বাঁশি।

www.pathagar.com

বিবির গায়ের গয়না কিনিতে হইলো এতো রাতি
ঝুমকা বাজায় বাঁশি।
বাজনা বাজায় বাঁশি।
বিবির জন্যে শাড়ি কিনিতে হইলো এতো রাতি
ঝুমকা বাজায় বাঁশি।
বাজনা বাজায় বাঁশি।

৮. বগড়া যাইয়ো না সোনা
মাতায় রোদি লাগিলে জীবনে সইবে না।
হাতে এলি ডাটের ছাতি
রোদি লাগিবে না।
রংপুর যাইয়ো না সোনা
প্যাটে খিদা লাগিলে জীবনে সইবে না।
ঘাঁটায় ঘাঁটায় বন্দুর বাড়ি খিদা লাগিবে না।

৯. স্বামী গো স্বামী
গোসল করিলা
সাবান কোথায় রাখিলা
সেটি হয়েছে সাবান ফুলের বাগিচা।
স্বামী গো স্বামী
গোসল করিলা
লঙ্গি কোথায় রাখিলা
সেটি হয়েছে লঙ্গি ফুলের বাগিচা।
স্বামী গো স্বামী
গোসল করিলা
গামছা কোথায় রাখিলা
সেটি হয়েছে গামছা ফুলের বাগিচা।
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভাল বাসি।

১০. তকতার (কাঠের চৌকাঠ) উপর দুলামিয়া
ক...মে...লা।
পোলা পাকাও বিবি
ক...মে...লা।
লছাৎ দামান আসপে বিবি
ক...মে...লা।
খাসি মারো বিবি
ক...মে...লা।

www.pathagar.com

১১. হাতে ঝাড়ি কাঙ্কে কলসি
যায় যমুনার ঘাটেরে
নৌকা খানি হেঁটাও ব্যাপারী
ঝাড়ি ভইরা উঠি
অতো সুন্দর কন্যা তোমার
শীশ খান দেকি খালি
আমার লায়ে (নৌকা) আইলে দিবো
শীশের সিন্দূর রে।[১১]

৭. বিয়ের গীত

সারিয়াকান্দির বিয়ের গীত

১১.০৫.২০১২ তাং শুক্রবার সকাল ৯টায় আমরা সারিয়াকান্দি উপজেলার ছাইহাটা গ্রামে আসি। ছাইহাটা গ্রামের জনাব আনিছার আমার পূর্ব পরিচিত। তাকে আগেই বলে রেখেছিলাম গ্রামে কোনো বিয়ে বাঁধলে অন্ততপক্ষে একদিন আগে জানাবেন। গতকাল রাতে তিনি মুঠোফোনে আমাকে আজকে ছাইহাটা একটি বিয়ের খবর দেন। সে খবর শুনেই সাতসকালে বগুড়া থেকে সিএনজিতে চড়ে ছাইহাটায় আগমন। আনিছার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে যাবার পথেই মাইকে বিয়ের গীত শুনতে পেলাম। সম্ভবত অল্প বয়সি কোনো মেয়ে গীত গাইছে। বাতাসে ভেসে আসা গীতের কথাগুলো কিছু বুঝা যাচ্ছে কিছু যাচ্ছে না। তবে গীতের করুণ সুরটি বুঝা যাচ্ছে।...তুমি কান্দো না গো ও ও ও। আমরা বিয়ে বাড়ির উঠানে পা দিতেই মাইকে গীত শেষ হয়ে গেল। যে মেয়েটি গীত গাইছিলো তাকে আবার গীতটি গাইতে বললাম। সে লজ্জা পেল। কিছুটা চুপ থাকার পর খালি গলায় শুরু করলো। আমি আমার ক্ষুদ্র টেপ রেকর্ডারে গীতটি রেকর্ড করলাম।

বিয়ে বাড়ি সাধারণত যে রকম হয় লোকজনে ভর্তি। সাজ সাজ রব ইত্যাদি তেমন কিছু এখনো চোখে পড়লো না। বর আসবে বিকেলে পাশেই জোড়গাছা গ্রাম থেকে। বাড়ির বাইরের উঠানে খাসি জবাই করা হয়েছে তা ছেলা হচ্ছে। সেখানে চার পাঁচজন শিশুসহ কিছু লোক জটলা বেধেছে। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখি ঢেঁকিতে হলুদ পাড় দেয়া হচ্ছে। একজন নারী বসে থেকে গোরের ভেতরে কাঁচা হলুদ ঠেলে দিচ্ছেন আর দুজন নারী ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন্। ঢেঁকির পাশে একটি টুলের ওপর কনেকে বসে রাখা হয়েছে। তাকে ঘিরে আছে তিন চারজন শিশুসহ কয়েকজন নারী। একনারী ঢেঁকির দিকে তাকিয়ে হলুদ কোটা নারীদের উদেশ্যে বলে ওঠলেন, 'ক্যালো হলদি কুটা শ্যাস হয়্যা আলো তাও কামুন তরা গীত গাস না। ইডে কি ছেড়ি গুল্যা'। বলেই সে দ্রুত পায়ে ঢেঁকির কাছে এসে গোরের মহিলাকে তুলে দিয়ে নিজে বসে গোর‍্যার ভেতর হলদি ঠেলে দিতে দিতে ঢেঁকির তালে তালে গীত শুরু করলেন।

www.pathagar.com

১. ডালা ডালা রং মালা গো
ডালা ডালা ফুল মালা গো
ডালা আইলো কইনা ছাইহাটা হাটে গো
ডালা দেখিয়ে আব্বা কাঁন্দে
ডালা দেখিয়ে আম্মা কাঁন্দে
ডালা দেখিয়ে ঐ না সন্তার কন্যা হাসে গো
আব্বা তুমি কান্দো না গো
হামি যামু ঐ ডালার সাথে গো।

২. হলদি কোটে মিন্দি কোটা সাজাবো আরঙ্গোতে
কইর হোলদি দিয়্যা লাচরে গোল্যাপী
কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে।
গোলাপীর সিতের সেন্দুর রোদে ঝলমল কররেরো-ও-ও-ও-ও-ও
কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে।
গোলাপীর এক বাদশা খাইবে
মন ভুলাইবে কারো রো
কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে গোলাপী
কইর হেলানি দিয়্যা লাচরে।

শব্দের অর্থ

১. আরঙ্গোতে-আনন্দ হাসিতে
২. লাচরে-নাচতে বলা হয়েছে।
৩. সিতে-সিঁথি
৪. সেন্দুর-সিঁদুর/সিন্দূর
৫. ওদে-রোদে
৬. কইর-দরজার কপাট বা পল্লা।

হলুদ কোটার বর বা কনেকে গোসল করানোর আগে হলুদ মাখিয়ে দিতে দিতে গীত গাইতে থাকে। বিয়ে বাড়ির ঠাট্টা সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একটা কুলা বা নতুন চালনি বা চালুনে (যা বাঁশের তৈরি) করে হলুদ, দূর্বা, সরিষার তেল, ধান, মাটির প্রদীপ (কুপি) অনেকে মোমবাতি ব্যবহার করছে। অনেক পরিবার এর সাথে মুশুর ডাল ও মাসকলাই ডাল ভিজিয়ে পাটায় পিষে নেয়। এরপর এগুলো সধবা, কুমারী ও শীর্ষস্থানীয়রা একেকজন বরের বা কনের কাছে এসে আয়োজন করে হলুদ দেয়। আবার গীতও গায়, পাশাপাশি চলে ঠাট্টা মশকরা বর বা কনে চিন্তিত ও ভীত থাকে এ সময়। তাদের এ অবস্থা দেখে অন্যরাও মজা পায়। তারা নানা প্রতীকী মাধ্যমে নবদম্পতির জীবনের নানাকথা বলে কথা বা গীতের মাধ্যমে।

এমন একটি গীত হল :

www.pathagar.com

৩. কি দে তুলিচেন তোমার সোনা মুকের ছিরি
আরে ও বিবি আরে ও বিবি ই বিবি ওরি অর্দ্দেক ছিরি হামাক
বাটিয়া দ্যেও আরে ও-ও-ও বিবি ই বি-বি,
আরে এ ও বি-বি-ই বিবি।
অন্যজন প্রথম জনের কথার প্রেক্ষিতে সে কথার সুর ধরে বলে-
হামার ভাবি তুলিচ্যে এ সোনা আ-আ-আ মুউ-উ-কের ছিরি।
আরে এ-বি-বি-ই-ই আরে ও-ও-ও-বি-বি-ই
হামার বুবু তুলিচ্যে সোনা মুকের ছিরি-ই-ই-ই
আরে এ-এ-ও-বিবি-বিবি-ই-ই
আরে এ-এ ও-ও-বি-ই-বি-ই।
এ হিরি হামি বাটে দ্যাওয়া পারসোনা
আরে এ-এ-ও-ও বি-বি-ই-ই
আরে এ-এ ও-ও-বি-ই

সোনাতলার বিয়েরগীত

আবহমান কাল ধরে বাঙালি তাদের আচারে গীতকে করে নিয়েছে আপন। সংগীত প্রিয় এ জাতি। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে নাচ গান অনাদিকাল থেকেই প্রচলন। গ্রামের সরল মানুষগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের রূপ-রসকে নিজের ভেতর ধারণ করতে গান বা গীতকে আপন করে নিয়েছে। কখনো ক্ষেতে-খামারে, কখনো মাঝি মাল্লার কাজে, কখনো ঘর গেরস্থালি বা অবসরে গান হয়ে উঠেছে জীবনের অনুষঙ্গ।

উৎসব পার্বণেও মনের মাধুরী মিলিয়ে সুরের মূর্ছনায় মুখরিত করে চারপাশ। বিয়ে, পূজা, থেকে শুরু করে নবান্নের উৎসবেও গীত অগ্রগণ্য। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর খুনসুটি, ভাবাবেগ, ঝগড়া, অভাব-অনটনসহ স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় পক্ষের আগমন, কখনো সে আগমন হালকা বিরহ মাখা অথবা হাস্যরঙ্গে রূপ নেয়। নারী পুরুষের চিরায়ত সম্পর্ক ঘিরে গড়ে ওঠে নানা আচার অনুষ্ঠান। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ গীত তৈরি করে উৎসব মুখর পরিবেশ।

বগুড়া জেলায়ও গীতের প্রাচুর্যতা ব্যাপক। নানা অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, গায়ে হলুদ, সন্তান জন্মগ্রহণ উপলক্ষ্যে নানা রকম অনুষ্ঠান দেখা যায় এ জেলায়। গীতের কথা, ভাব, আর সুরের ব্যঞ্জনাও মধুর। নীচে বগুড়া জেলার সোনতলা উপজেলা থেকে সংগৃহীত কয়েকটি বিয়ের গীত নীচে দেওয়া হল :

১. বোগড়া শহরেত দ্যাখা আলাম স্বামীধন সতিনের সিঁথির সেন্দুর
হায়রে আসিবে সতীন, পরিবে গো সেন্দুর , পরাণে সহিবে না,
হায়রে বোগড়া শহরেত দ্যাখা আলাম সতিনের সিঁথির সেন্দুর ।
হায়রে বোগড়া শহরেত দ্যাখা আলাম স্বামীধন সতিনের
লাকের বেসর গো।

www.pathagar.com

হায়রে বোগড়া শহরেত দ্যাখা আলাম স্বামীধন
সতিনের লাকের বেসর গো।
আসিবে সতিন পরিবে গো বেসর
পরাণে সহিবে না।
হায়রে বোগড়া শহরেত দ্যাখা আলাম স্বামীধন
সতিনের পরনের শাড়ি।
হায়রে বোগড়া শহরেত দ্যাখা আলাম স্বামীধন সতিনের পরনের শাড়ী-ই-ই।
আসিবে সতিন, পরিবে গো শাড়ী।,
পরানে সহিবে না।
হায়রে উলো কাঁসা কাটায়-এ
মোর স্বামীধন লাগে নাহি হিরিয়া দিও। (২)
হায়রে বাড়ির আগে মাটি খুঁইড়ে গো,
স্বামীধন পুইকর বানাইয়ে দিও।
ও মোর স্বামীধন, বাড়ির আগে মাটি কাইটে গো
পুইকর খুঁইড়ে দিও।
আসিবে সতিন করিবে গোসল,
পরানে সহিবে না
হায়রে স্বামীধন আসিবে সতিন করিবে গোসল পরাণে সহিবে না।
হায়রে তুমি নাহি বইল্যা ছিলা, স্বামীধন বিয়া করিব না। (২)
হায়রে বিয়া করছ, ভালোই করছ স্বামীধন
কইর্যা কিন্যে খাইও।
হায়রে গোয়াল ভরা গরু থাকল স্বামীধন
বেচা-কিন্যা য্যান কইরো না।
হায়রে এতই সুখের ভাত ও মোর স্বামীধন
হামি খাবার লয়-ও-ও-ও
হায়রে কাল সকালে চল্যা যামো ও স্বামীধন
তালাক লিখ্যা দিও।
কাল সকালে চল্যা যামো ও মোর স্বামীধন
তালাক লিখ্যা দিও।
যেদিন বাবায় মটো করিবি দ্যান,
সাধু সেইদিন হামি করমু আও-ওরে।
ঐ

শব্দার্থ

১. দুলালী বেটি- আহল্াদী কন্যা

২. আজা- রাজা

৩. দ্যান- দান (টেনে সুরকরে বলা)

www.pathagar.com

বিবরণ

মা-বাবার আদরের মেয়ে মনোয়ারা। সে কুয়ার পাশে মরিচ তুলতে যাচ্ছে। দেখে রাজার ছেলে জয়বাংলা তার লোক লস্কর নিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী মেয়েকে ডেকে নাম জিজ্ঞেস করে। দরিদ্র ঘরের মেয়েকে রাজার লোকেরা তুলে নিয়ে যেতে চায়। সাধু বলছে প্রভাবে ধনী গরীবের মিল হবে না। মনোয়ারা রাজার ছেলেকে বলে যেদিন তার দরিদ্র পিতা যৌতুক দিতে সমর্থ হবে তখন সে এ বিয়েতে রাজি হবে। এই গীতের কথিকা বলছে রাজার পুত্র হাতি বা ঘোড়ায় করে বিয়ে করে। কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী তা বদলে যায়।

২. কুয়ার পাড়ে ঝাল মরিচের গাছ ও...
মনোরা মরিচ তুলোনে যায়
ঐমিন দিয়া জয়বাংলা আজার ছেলে
মটোর মারিয়া যায়।
হামি হল্যাম বাপ দুলালী বেটি...ই...ই
সাধু গায় গান, দিবে না হায়।
কুয়ার পাড়ে ঝাল মরিচের গাছ ও...
মনোরা মরিচ তুলোনে যায়।
ঐমিন দিয়া জয়বাংলা আজার ছেলে হুন্ডা মারিয়া যায়।
হামি হল্যাম ভাই দুলালী বোনো ওরে
সাধু গায় গান, দিবে না হায়।
যেদিন ভাইয়েরা হুন্ডা করিবি দ্যান
সাধু সেই দিন ও...ওরে,
হামি করমু আওও...রে।
কুয়ার পাড়ে ঝাল মরিচের গাছ ওরে
মনোরা মরিচ তুলোনে যায়
ঐমিন দিয়া জয়বাংলা আজার ছেলে
মটোর মারিয়া যায়।
হামি হল্যাম বাপ দুলালী বেটি
সাধু গায় গান, দেবে না হায়।
যেদিন বাবায় মটো করিবি দ্যান,
সাধু সেইদিন হামি করমু আও...ওরে।

৩. দামান ...ও...দামান
গাও বা ধুয়ে দামান সাবান কোটে রাখচো
সেখানে হচে দামান সাবান, ফুলের বাগিচাও।
কাটিয়া আসো দামান সাবান, ফুলের বাগিচাও।
ঐ
গাও বা ধুয়ে দামান বালটি কোটে রাখচো

www.pathagar.com

সেখানে হচে দামান বালটি, ফুলের বগিচাও,
কাটিয়া আসো দামান বালটি, ফুলের বাগিচাও।
দামান...ও দামান...দামান
গাও বা ধুয়ে দামান গামচা কোটে রাখচো।
সেখানে হচে দামান, গামচা, ফুলের বাগিচাও
কাটিয়া আসো দামান গামচা, ফুলের বাগিচাও।
গাও বা ধুয়ে দামান তমন কোটে রাখচো,
সেখানে হচে দামান তমন ফুলের বাগিচাও,
ঐ

শব্দার্থ

১. দামান...স্বামী
২. বাগিচা...বাগান
৩. গাও...শরীর
৪. হচে...হয়েছে
৫. বালটি...বালতি
৬. কোটে...কোথায়
৭. তমন...তেমন
৮. গামচা...গামছা

৪. তুইনা কছলু গাড়্যাল ভাতার ভালো রো ভাবি,
ছটকার বারি দিয়া পিঠ কর‍্যাছে কালো রো ভাবি।
ভাবি তুইনা কছলু হাউলা ভাতার ভালো রো ভাবি
হাউলা পান্টি দিয়া পিঠ কর‍্যাছে কালো রো ভাবি।
ভাবি তুই না কছলু পণ্ডিত ভাতার ভালো রো ভাবি,
ছড়ির বাড়ি দিয়া পিঠ কর‍্যাছে কালো রো ভাবি।
ভাবি তুই না কছলু ক্যারানি ভাতার ভালো রো ভাবি।
কলমের গুতা দিয়া চোখ কর‍্যাছে কানা রো ভাবি।

শব্দার্থ

১. কছলু...বলেছিলে
২. গাড়্যাল...গাড়োয়ান
৩. ছটকা...গবাদি পশু তাড়াবার জন্য দড়ি লাগানো বিশেষ ভাবে তৈরি (ব্যবহৃত) ছোট লাঠি।
৪. হাউলা...হাল
৫. পান্টি...বাঁশের চিকন কঞ্চি
৬. রো...মেয়েলি সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

www.pathagar.com

৫. চোতা বোশাখে আজা বিরাট মেলায় যে
দামান গো দামান (২)
ও দামান মেলায় ও যাইমে এমিনি দিয়া যাইও গে।
দামান ও দামান গো
মেলা যাইতে এমিনি দিয়া যাইও গে।

ও দামান গামছার আচলে ট্যাকা বান্দিয়া দিমু গে
দামান গো ও দামান।
দামান মেলায় যায়া বাঁশি কিনিয়া লিও গে।
ঐ
ও দামান মেলায় যায়া বাঁশি কিনিয়া লিও গে।
দামান গো ও দামান গো বাঁশি বাজায়া এমিন
দিয়া যাইও গে।
ঐ
দামান গো ও দামান
বাঁশি বাজায়া এমিন দিয়া যাইও গে।
ও দামান হামি রায়মালা চায়া থাকমো
রয়া গে
দামান গো ও দামান গেটে থাকমো অয়া গে।
দামান বাঁশির বাজে আউলাইলো গে পরান ওরে।
দামান গো
দামান বাঁশির বাজে আউলাইলো গে
দামান ও দামান মেলায় যাইতে এমিন দিয়া
যাইও গে।

অর্থ : এই গীতের অর্থ সম্পর্কে গীতের কথক লিপি খাতুন বলেন :
চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিবগঞ্জের রাজা রিবাটে এলাকায় মেলা হয়। মেলা উৎসবে নতুন জামাইকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। নতুন জামাইকে শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা দেওয়া হয় মেলা উৎসবে খরচ করার জন্য। জামাই মেলা থেকে মিষ্টি, খোরমা, বাতাসা কিনে আনে। বড় মাছ বা মাংসও কিনে আনে। কখনো কখনো এ মেলায় খাট, পালঙ্ক বা নানা ধরনের আসবাব কেনে সে। এমন সময় শালি বা শালার বউ জামাইকে মেলা থেকে নানা জিনিস আনতে আবদার জানায়। এ গীতে তেমনি বরের সম্বন্ধীর স্ত্রী (স্ত্রীর বড় ভাইয়ের বউ) ঠাট্টাছলে জামাইকে বলছে মেলায় যখন যাবে তখন গামছায় করে টাকা নিয়ে যেও। বাড়ি ফিরবার পথে একটা বাঁশি কিনে এনো। বাঁশি বাঁজিয়ে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যেও। আমি তোমার বাঁশির সুর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। সম্বন্ধীর বউ বিলাপ করে এ গীত গাইছে। বলছে জামাই তোমার বাঁশির সুর এত মধুর যে, আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। তোমার বাঁশির সুরে আমি আর ঘরে থাকতে পারছি না।

www.pathagar.com

শব্দার্থ

১. চোতা...চৈত্র মাস
২. বিরাট...রাজা বিরাট স্মরণে মেলা
৩. এমটি...এদিক দিয়ে
৪. যায়া...যেয়ে
৫. লিও...নিও
৬. বাজায়া...বাজিয়ে
৭. রায়মালা...আয়মালা (নাম অর্থে)
৮. আউলাইলো...এলোমেলো[১২]

এই গ্রামের রীনা খাতুন (৩০) একজন অপেশাদার গীতকার। যেখানে বিয়ে সেখানেই তিনি গীত গাওয়ার জন্য ছুটে যান। শখ করেই তিনি বিয়ের গীত পরিবেশন করেন। গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনোদিন পারিবারিক বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হননি। ছোটবেলা থেকেই গীতের প্রতি তার ঝোঁক। তিনি বয়স্ক নারীদের মুখে গীত শুনে শুনে মুখস্ত করেছেন। দুই সন্তানের জননী রীনা খাতুন পেশায় একজন গৃহিণী। তার গাওয়া ১৬টি গীত নিচে প্রদত্ত হলো :

গীত-১

সোনাতলা উপজেলার পাতিলা কুড়া ইউনিয়নের পাতিলা কুড়া গ্রামের গ্রামবাসীদের সামাজিক অনুষ্ঠান বিয়েতে নানা ধরনের গীত গাওয়া হয়। এমনই কয়েকটি গীত হলো :

কইন্যার মায়ের মাথাডা
পাইল্যা কুড়্যার আড়াডা
ত্যালের পরকাশ নাই মাতাডা
হামার বাড়ি আয়রো ত্যাল কিন্যা দেইড়ো
একন্দা হলো তোর ত্যালের শোভা মাতাডার
কইন্যার মায়ের প্যাটডা
ফজলুর পাগারড়া
ভাতের পরকাশ নাই প্যাটটাত
হামার বাড়ি আয়রো ভাত খায়্যা যায়রো
একন্দা হলো তোর ভাতের শোভা প্যাটটা

অর্থ : এ গীতের অর্থ হলো এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। গিয়ে দেখে সেই বাড়ির বউটির মাথায় তেল নাই। পেটে ভাতও নাই। তখন প্রতিবেশী বলছে তোর মাতা ক্যা উস্কা (এরকম) হামাগের বাড়ি আয় মাতায় ত্যাল দে যা। প্যাটেত ও ভাত নাই। হামার বাড়ি আয় প্যাট ভইরা ভাত খায়া যা।

গীত-২

কাঞ্চন চারিমোরা কাঞ্চন আঙিনা সামটে

www.pathagar.com

কাঞ্চন চারিমোরা কাঞ্চন চারি আঙিনা সামটে
কাঞ্চন চারিখুলি কাঞ্চন চারি খুলি, চারিমুরা সামটে।
কাঞ্চন এনা সমে কাঞ্চন সেন্দুর দোকানদার আসে।
কাঞ্চন দৌড় দেয়
কাঞ্চন দয়ার বাবার কাছে দৌড় দেয়।
কাঞ্চন দয়ার ভাবির কাছে যায়, ভাবী গো দ্যাওগো সেতির সেন্দুর ।

অর্থ : গানের অর্থ স্বামীর বাড়িতে রাগ করে মেয়ে বাপের বাড়ি আসে। বাপের বাড়িতে মেয়ের আদর নাই। ভাইর কাছেও বোনের কদর নাই। ভাইয়ের বউ ননদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এ দিকে দোকানদার সিঁদুর বিক্রি করতে এসেছে। কাঞ্চন সিঁদুর কিনবে কিন্তু টাকা নেই। তাই তার ভাবী ঠাট্টা করে দোকান দারের সামনে ননদকে নিয়ে গান গাইছে।

গীত-৩

ক্যামনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো (২)
শ্বশুর উটিয়া বলে ও পুতের বৌমা গো...ও...ও
ক্যামনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
ঠেকিলায় ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
শ্বশুরোক বোঝামু হামি হুকা শুলকা দিয়া গো...ও...ও
শাউরির বোঝামু হামি কি দিয়া গো...ও...ও
শান বান্দার ইস্কুল খানি পিঞ্জরা বান্দা দুয়ার গো...ও...ও
কেমনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
স্বামী পুছারি করে অ ঘরের বউ গো...ও...ও
কেমনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
আছিরায় ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
শাউরিক বোঝামু হামি পানের বাটা দিয়াগো...ও...ও
শান বান্দার ইস্কুল খানি পিঞ্জরা বান্দা দুয়ার গো...ও...ও
কেমনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
কেমনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
আছিরায় ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
থেকিনায় ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
স্বামীকে বোঝামু হামি কি দিয়া গো...ও...ও
দেওর পুছারি করে অ ভাবিজান গো...ও...ও
কেমনে ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি গো...ও...ও
আছিরায় ভাঙ্গিলো কাঁখের কলসি...ও...ও
স্বামীকে বোঝামু হামি মুকের হাসি দিয়া গো...ও...ও
দেওরকে বোঝামু হামি কি দিয়া গো...ও...ও

www.pathagar.com

অর্থ : বাড়ির বউ পানি আনতে গিয়ে মাটির কলসি ভেঙ্গে ফেলেছে। সে চিন্তিত শ্বশুর বাড়ি ফিরে গিয়ে কি বলবে। রাস্তায় হাটতে হাটতে বুদ্ধি করছে কিভাবে ঘটনা বর্ণনা করবে।

গীত-৪

শিষো বাইন্দা দিব্য করুণা করে।
শিষো বাইন্দা দিব্য করুণা করে...এ...এ...এ
কোতায় পাব দিব শিষের সেন্দুর
হায় গো কোতায় পাব,
দিব শিষের সেন্দুর ।
বাইন্যা পাড়ার বানিয়া মারা গেছে।
হায় গো পাড়ার বানিয়া মারা গেছে।
নাকো বাইন্দা দিব্য করুণা করে (২)
হায় গো কোতায় পাব দিব্যর লাকের বেশর
হায় গো সোনাপাড়ার সানাইরা মারা গেছে (২)
হায় গো সোনাপাড়ার সানাইরা মারা গেছে
হায় গো কালা বাইন্দা দিব্য করুণা করে
বায় গো গলা বাইন্দ্যা দিব্য করুণা করে
কোতায় পার দিব্যর গলার মালা (২)
নাউরা মালার মালাইকার মারা গেচে
হায়গো মালার মালাইকার মারা গেচে
হায়গো কোতায় পাব দিব্যর শিষের সেন্দুর ।

গীত- ৫

লয়া পাড়ার লয়া বাড়ি গো
বাড়ির পাশে বালি গো
বালি সাপ লয় বালি সাপ লয়
হামার সিতের সেন্দুর ঝলক দেকা যায় আয়...আয়
সাপ লয় বালি সাপ লয়
বালি তোমার লাকেরও উপরে নি সাপ
বালি ঢোলে আলোকে সদাগর
বালি সাপ লয় বালি সাপ লয় বেশরের
ঝলক দেকা যায় (২)
বালি তোমার গলার উপরে নি সাপ
বালি তোমার গলার উপরে নি সাপ
বালি ঢোলে আলোক সদাগর
বালি মালার ঝলক...দেকা যায়...য়...য়।

www.pathagar.com

বালি তোমার কমরে উপর ও নি সাপ
বালি ঢোলে আলক সদাগর
বালি সাপলয় বালি সাপলয়
বালি বিছ্যার ঝলক দেকা যায়...য়...য়
বালি সাপ লয় বালি সাপ লয়।

অর্থ : বালি হচ্ছে পাত্রী। তার মাথায় সিঁদুর। একজন বলছে বালি তোমার মাথার উপর এনি সাপ। বালি বলছে না এনি সাপ নয় সেটি আমার সিঁদুরের ঝলক। আলম একজন সওদাগর। বালির রূপের মুগ্ধ আলম সওদাগর রূপ দেখে ঢুলতে থাকে। এভাবে বালির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গে গহনার বিবরণ দিয়ে যায় যার ঝলক দেখে সওদাগর মুগ্ধ হয়। এভাবে গীতটির বিবরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

গীত-৬

আলোরে হামার আষাঢে বান
খায়্যা গেল হামার জোমির ধান
আইক্যা গেল হামার মুরগি খান।

গীত-৭

নয়া বাড়ির নয়া জোছনা উঠ্যে আসমান জুড়্যা যে...এ...এ...এ
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে রো (২)
দৌড় দিয়া যায় শিল্পী দয়াল বাবার আগে যে (২)...এ...এ...এ
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে,
হামা কোণা দ্যাও চাচা ঐ জোছনা পারিয়া যে
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে,
কারো বাবার শক্তি নাই যে ওই (২)
জোছনা পারিবার যে,
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে,
দৌড় দিয়া যায় শিল্পী দয়াল চাচার আগে যে (২)
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে
হামা কোণা দ্যাও চাচা ওই জোছনা পারিয়া যে
কারো বাবার শক্তি লাই যে ওই জোছনা পারিবার যে
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে,
লয়া পাড়ার লয়া জোছনা উঠছে আসমান জুড়্যা যে,
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে
দৌড় দিয়া যায় শিল্পী দয়াল সোয়ামির আগে যে
হামা কোণা দ্যাও ঐ সোয়ামি ঐ জোছনা পারিয়া যে,
কারো বাবার শক্তি লাই যে ওই জোছনা পারিবার যে,
দলে দলে জোড়্যা দিয়া ঐ জোছনা পারিল যে,

www.pathagar.com

জোছনা দেকিয়া শিল্পী কাঁন্দেরে
নলে নলে জোড়্যা দিয়া ঐ জোছনা পারি যে (২)
পরের ব্যাটা সাদু হয়্যা এ হাউস মিটালো যে,
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে-২
বাবা গেরে দালান কোঠায় দুবলা আগুন লাগুক যে,
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে
পচাগেরে দালান কোঠা দুবড়া আগুন লাগুক যে,
সোয়ামিগের দালান কোঠা যমের
বাইতলা জ্বলুক যে,
জোছনা দেকিয়া শিল্পী কান্দে যে,

গীতের অর্থ

শিল্পী মা বাবার আদরের সন্তান। স্বামী সোহাগি স্ত্রী। ভাই সোহাগি বোন। আদরের শিল্পী যা চায় তাই পায়। সে বায়না ধরে তাকে জোছনা এনে দিতে হবে। সে প্রথমে বাবার পরে চাচা ভাইয়ের কাছে আবদার। অবশেষে নানাভাবে আকাশ থেকে জোছনা এনে দেয়া হলো। তার কাছে জোছনা দেখার পর সবাই ভাবলো (রূপক অর্থে) ওই জোছনার আলোতে সব পুড়ে যাবে। কিন্তু জোছনা আলোকিত করে। এখানে গ্রামীণ পরিবেশে ছনের ঘেরা ঘর ও মাটির ঘরের যে সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি, সব কিছুর পরিচয় মেলে।

গীত-৮

সাহেদারা, রীনা, জাহানারা, তেলও যে পোড়া গেল যে কলসে কলসে...এ...এ...এ
ক...ও...ও...ল...সে... এ...এ...এ...ঐ
আরে পলত্যাডা পোড়া গেল মুইদ্যার আরও মইদ্যে।
ক্যামনে বাজারা গাবুর হইল এত ও...ও রাতি রে (২)
আরে হামার যে বুবু আছে বাউলা হাটের লটি যে (২)
আরে তা গো বুঝ্যাততে হামার হইল এত রাতি।
আরে ত্যালত তো পোড়া গেল কলসে কলসে...এ...এ...এ
শরীরডা তো পোড়া হোসে আরও মুতে...এ...এ...এ...এ
ক্যামনে বাজারা গাবুর হইল এত রাতি যে (২)
আরে হামার যে মাও আছে, নাউড়ামালার লটি যে (২)
আরে তা কো বুঝাতে হামার হইল এতো রা...আ...তি যে (২)

গীতের অর্থ

কনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে। রাত গভীর হচ্ছে কিন্তু এখানো বর যাত্রী আসেনি। বর যাত্রী আসার পর কনে পক্ষ বলছে, ন্যামা জ্বালাতে মুঠি মুঠি পলতাও পোড়া গেছে। অথচ জামাই বিয়ে করতে আসছে না শ্বশুর বাড়িতে। তার অনেক দেরি হয়েছে। কনেপক্ষ রাগ করেছে। তারা এত রাতে বর আসাতে বিরক্ত। বর কেন

www.pathagar.com

এতরাতে দেরি করে এসেছে তার বর্ণনা দিচ্ছে। পথে আসাতে মাকে বোঝাতে হয়েছে যে নাড়ুয়ামালার হাটে বেশ্যার কাজে নিয়োজিত। আবার তার বোন সে ও বাউলা হাটের নটি। তাদের বোঝাতে গিয়ে বিয়ে করতে আসতে দেরি হয়েছে।

অর্থ : গাবুইরা-পাত্র (শ্লেষকরে বলছে)।

লটি-নটি।

ন্যাম্পু-টিনের চিকন ডিব্বা। যাতে কেরোসিন তেল ব্যবহার করে অন্ধকারে আলোর ব্যবস্থা করা যায়। পলত্যা : ন্যাম্পু জ্বালাতে সলতের ব্যবহার দেখা যায়। একে সোনাতলাসহ বগুড়ার সব স্থানে পলতা, পইলত্যা, ইত্যাদি নামে বলা হয়।

গীত-৯

আরে নাল ঘোড়া, তোষকের মোড়্যা।
বাবরী ওড়ে তার সাথেতে
আরে কি কি দিবা দানে ভাইরা
শুনি আপন কাছে এ...এ...এ...এ
নাল ঘো...ও...ওড়া, তোষকের সোড়া...আ।
আরে কি কি দিবেন দানে গো বাবা
শুনি আপন ও...ও...কা...আ...আ...ছে।
গাই দেমু বাছুর গো দিমু, গোয়াল দেমু তার সাতে...এ...এ
আছে নাল ঘোড়া তোষকের মোড়্যা।
আরে কি কি দিবেন মা...ও...ও...ও।
থাল দেমু বাসন গো দেমু আরও দেমু কাম...ম...লি...ই...ই...ই।

গীতের অর্থ

এ গীত মেয়ের বিয়ের গীত। বাপের বাড়ি থেকে যাবার সময় মেয়ে বলছে শ্বশুর বাড়িতে বাবার জন্য কি দেয়া হয়েছে। উপঢৌকন স্বরূপ মেয়ের বিদায় কালে মেয়ে দাদাকে বলছে তুমি কি কি জিনিসপত্র দিচ্ছ। দাদাও বলছে, থাল দিলাম, বাসন দিলাম, কামলি দিলাম সাথে। বাবার কাছে গিয়ে জানাতে চায় কী কী দেয়া হয়েছে। সে বলছে গাই দিলাম, বাছুর দিলাম, রাখলে দিলাম তোর সাথে।

গীত-১০

আকাশ মারে আকাশরে তার আ...আ
পূর্বে মারে বা...আ...কি...ই...ই রো (২)
কিও মোতে না মিয়া নেমো রো
বড়লোকের বিটি...ই...ই...ই...ই
কিওমোতে নামিয়া নেমো রো
জনম বেইন্যার বেটি...ই...ই...রো
কারে শিষে নাইরে গো শিষের গো সেন্দুর

www.pathagar.com

লাকে নাইরে মোর বেশর
আকাশ মারে বাতাসরে তারা...আ
পূর্বে মারে...এ...এ...এ
গলায় নাই গো মোর গলার মা...আ...আ...লা
হাতে নাইগো মোর বা... আ...আ...ল
কিওমোতে লামিয়া নোমা গো
জনম বেইন্যার বেটি...ই...ই...রো

অর্থ : গৃহস্থ বাড়ির বউ শ্বশুর বাড়ি প্রথমবারের এসেছে। কিন্তু সে যে এয়োতি, তার কোন চিহ্ন নেই। সিঁথিতে সিন্দূর নেই। শাশুড়ী তখন ক্ষেপে গিয়ে বলছে কোন আদর যত্ন না করে বউ ঘরে তুলবে। গলায় হাতেও তার অলংকার নেই। তাই রাগ করে বলছে জনম বেইন্যার বিটি গো। অর্থাৎ নিঃস্ব বা হত দরিদ্র ঘরের মেয়ে তাই তার মা-বাবা মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি সাজিয়ে পাঠায় নি। শাশুড়ি খুব রাগ করে নতুন বউকে অপমান করছে।

শব্দার্থ

১. কিওমোতে- কোনপ্রকার/যাচ্ছেতাই ভাবে।
২. জনম বেইন্যা- কৃপন অর্থে যদিও। এখানে হতদরিদ্র, বা গরিব ব্যক্তির মেয়ে বুঝিয়েছে।
৩. শিষের- সিঁথির
৪. সেন্দুর-সিঁন্দূর।

গীত-১১

উইড়্যা উইড়্যা পড়েরে এ বাওই পড়েরে এ বাওই বানিয়ার ও দোকানেতে...এ...এ...এ
শিষ মাজিয়া কিন্যেরে বাওই কিন্যেরে বাওই বালির সিতির সেঁন্দূর-রে।
উইড়্যা উইড়্যা পড়েরে বাওই পড়েরে বাওই সোনারেরও-দোকানে...এ...এ
হাতত বাড়্যাই য় কিনেরে এ বাওই বালির হাতের চুড়ি...ই...রে।
উইড়্যা উইড়্যা পরেরে বাওই পড়েরে বাওই ব্যানিয়্যার ও দোকানে...এ...এ
ঘুইর্যা ঘুইর্যা কিনেরে বাওই বালির পরনেরও শাড়িরে...এ...এ
উইড়্যা উইড়্যা পড়েরে বাওই, পড়েরে বাওই জোতার ও...ও দোকানে...এ...এ
ঘুইর্যা ঘুইর্যা কিনেরে বাওই বালির পিন্দনের জোতারে...এ...এ।

শব্দার্থ

১. বালি...কন্যা
২. বাওই...বাবুই পাখি
৩. সেঁন্দূর...সিঁদুর
৪. জোতা...জুতা।

www.pathagar.com

৫. বানিয়া...ব্যবসায়ী।

বিবরণ

আদরের কন্যা কেনাকাটা করতে হাটে গিয়েছে। রকমারি জিনিস দেখে সে চঞ্চল। কথিকা এখানে তাকে আদর করে সম্বোধন করেছে বাবুই। বলছেন সেই কন্যা প্রথমে ব্যবসায়ীর দোকানে গেছে। সিঁদুর কিনেছে। সোনারের দোকানে গিয়ে অলংকার কিনেছে। কাপড়ের দোকানে গিয়ে কাপড় খরিদ করেছে। সবশেষে কিনেছে জুতা।

গীত-১২

হলুদের গোসল

হলুদের সারা করে ইতুলের গাড়ে কন্যারে
মাইলান বিছন থোবার ডাইক্যা আনে জাগা না রে।
মাইলান বিছন বেইচ্যা কিনমো শিষের সেন্দুর না রে
মাইলান শালার বেটি ভাত দিতে শিষের সেন্দুর জোড়ে না রে
মাইলান ভাত দিতে সতিন সেন্দুর জোরে না রে এ
মাইলান শালার বেটি তুই সেন্দুর কোথা পালুনারে
মাইলান ঘরের পাছে নয়া জামতা ফেরে না রে
মাইলান তাই দিছে শিষের শোভা সেন্দুর না রে

শব্দার্থ

মাইলান বিয়ের আইওর/আইও যারা
বর বা কনেকে বিয়ের আগে গোসল করায়।
তারা সহযোগী।

এটি একটি বিয়ের গীত। কনের বিয়ের পরবর্তী সময়ে যে পরিস্থিতি হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরছেন আইওরা (যারা বিয়ের সময় কনের বা স্বামীর গোসলের সময় থেকে বিয়ের সাজ সাজানো পর্যন্ত সহযোগী হিসেবে কাজ করে)। কনেকে বলছে, সে সময় পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপার ছিল। সতিনের ব্যবহার কেমন হবে, তা দেখিয়ে আইও বলছে, সতিনের কাছে ভাত চাইলে সে দিবে না, সিঁথির সিঁদুর চাইলেও তা পাওয়া যাবে না। এদিকে ঘরের পিছনে নতুন বর ঘুরছে তার নবপরিণিতা স্ত্রীকে দেখার জন্য। কনেকে সেই কথাই গীতছলে বলছে গীতের মধ্য দিয়ে।

গীত-১৩

মাতায় কালো কচুর বোঝা, সোন্দর মাইলান
বোঝাটা নামা একবার দেখি সোন্দর মাইলান
পিছনে উডা তোমার কেডা সোন্দর মাইলান
পিছনে উডা হামার দেওর সোন্দর মাইলান।

www.pathagar.com

দেওরডা কিসের জন্যে ঘোরে সোন্দর মাইলান
দেওরডা ছাতা ছাতা কইর‍্যা কান্দে সোন্দর মাইলান
কালিই আজা বিরাটের মেলা সোন্দর মাইলান
সেটি ছাতা কিন্যা দিমু মোন্দর মাইলান।
মাথায় কালো কচুর বোঝা, সোন্দর মাইলান
বোঝাটা নামাও একবার দেখি সোন্দর মাইলান।
কোলে উঠা কিসের ছাওয়াল সোন্দর মাইলান
কোলে উঠা ব্যাটা ছাওয়াল সোন্দর মাইলান
ছাওয়ালডা কিসের জন্য কান্দে সোন্দর মাইলান
ছাওয়ালডা কলা কলা কইর‍্যা কান্দে সোন্দর মাইলান
কালিই আজা বিরাটের মেলা সোন্দর মাইলান
সেটি কলা কিন্যা দিমু সোন্দর মাইলান।

শব্দার্থ

১. আজা বিরাট-রাজা বিরাট নামের একজন রাজার নামানুসারে এ অঞ্চলে প্রতিবছর মেলা হয়। এখানে সেই মেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মাইলান আইও বিয়ের গোসল করাতে ও সাজাতে সহযোগী যারা কনেকে বিয়ের গোসল করানো সময় আই থাকে। তারা কনেকে জিজ্ঞেস করে মাথায় কিসের বোঝা নিয়ে যাচ্ছ, কোলে কে, পিছনে কে এরকম প্রশ্ন করলে কনের হয়েই অন্য একপক্ষ এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গীত গায়। এতে একটি সুন্দর আনন্দ মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। হাস্য কলরবের মধ্য দিয়ে বিয়ের গোসল পর্ব শেষ হয়।

গীত-১৪

আনো হলদি পিষিতে রে, হামার পাটা জানি ধরে না রে
আনো হলদি পিষিতে রে, আমার পাটা জানি নড়ে না
পাটা যদিল নড়ে রে আমার শিল জানি নড়ে না।
বাঁশোর আগালেত কইল্যা রে, কইল্যা ধরছে বাঁদা বাঁদা
জানারা ছড়ি তোলানিরে, তাই যে তোলে কোঁচা কোঁচা
মান্না ছোড়া ব্যাপারীরে এ...এ, তাই যে নাপদে ধরে খোঁপা।
মান্না ছোড়া ব্যাপারী রে তাই যে কাঁপ দে ধরে খোঁপা
কাল বেনা আসিবি রে...এ...এ আমার ঘোড়ায়ালার ব্যাটা
তাই ও না নিবি...ই রে, হামার কইল্যা মাপা ঝোকা

শব্দার্থ

১. ছোড়া ছুড়ি-উত্তরাঞ্চলে ছেলে মেয়েকে এ সম্বোধনে ডাকা হয়।
২. নাপ- লাফ দেয়া
৩. বেনা- সকাল
৪. নাপা-মাপা

www.pathagar.com

৫. ঝোকা- মাপার সমার্থক শব্দ (মাপ-ঝোপ)

অর্থ :

এ গীতের মর্মার্থ সম্পর্কে কথক বলেন, মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। মেয়ের মা ঘরকন্যার কাজে ব্যস্ত। সে ঝোপের পাশে করলা গাছ থেকে করলা তুলতে যাচ্ছে। মেয়ের জামাই তার নিজের হবু স্ত্রী মনে করে শাশুড়িকে পিছন দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে। তার খোপা স্পর্শ করে। শাশুড়ি পিছন ঘুরে মেয়ের জামাইকে দেখে লজ্জা পায়। এরপর শাসায় এই বলে যে, কালকে আমার করলা মাপা ঝোকা করতে ব্যাপারী আসবে। সে ঘোড়ার মালিকের ছেলে। তুমি জামাই কেন এদিকে এসেছ।

এই গীতটি হলুদের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট গীত। এটি বিয়ের বাড়িতে সবাইকে আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এক হাস্যরসাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গীত-১৫

ফুটিয়া/ফুতিয়া বা ফুরুল তোলার গীত

আল্লার সালামে মানো হে দুলাবালা এ...এ
বিলান সাবেলান দিও হে দুলাবালা এ...এ...এ
বাপ মায়ের সালামে মানো হে দুলাবলা...এ...এ
বিলান সাবেলান।
পাড়া পড়শির সালামে মানো হে দুলাবালা
বিলান সাবেলান দিও হে দুলাবালা...আ...আ
গ্রামের সকলের সালামে মানো হে দুলাবালা...আ
বিলান সাবেলান দিও হে দুলাবালা...আ...আ
বিলান সাবেলান দিও হে দুলাবালা...আ...আ।

এ অঞ্চলে এই গীতকে ফুটিয়া বা ফুতিয়া তোলা বলা হয়। বর বা কনেকে গোসল করানো হয় তক্তায় করে বসিয়ে। এ সময় বর বা কনেকে বসিয়ে মাথার উপর চাদর রেখে তার উপর একটা বাটির মধ্যে সরিষা রাখা হয় গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজনরা এ সময় বর বা কনেকে কেন্দ্র করে সরিষা তার উপর ছিটাতে থাকে এই গানের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে। যেমন : ফুতিয়া খেলামো হামি চ্যাংড়া দামানের (বর) সঙ্গে।

গীত-১৬

ফুতিয়াগীত

যকন দুনিয়া পতন হইলো, হানিফের জলমও হইলো ফতেমার উপরে হায় ফুতিয়া।
হানিফের জলম হইলো ফতেমার উদরে হায় ফুতিয়া
ফুতিয়া খেলামো হামি চ্যাংড়া দামান্দের সাতে রে হায় ফুতিয়া।
ফুতিয়া খেলাতে হামার জুরলো শিষের সেন্দুর হায় ফুতিয়া।
ফুতিয়া খেলামো হামি নানান দুজবে হায় ফুতিয়া
ফুতিয়া খেলামো হামি নানান ঠেগেরায় হায় ফুতিয়া
মাছ ও না খায়া ফালালাম কাঁটা

www.pathagar.com

আশোর মায়ের কোলে দেকি চাঁন বরণ ব্যাটা হায় ফুতিয়া।
ফুতিয়া খেলাতে হামার জুরলো শিষের সেন্দুর হায় ফুতিয়া।
ফুতিয়া খেলাতে হামার জুরলো লাকের বেসর হায় ফুতিয়া
কি মতে খেলামো হামি চ্যাংড়া দামান্দের সাতে হায় ফুতিয়া।
কি মতে খেলামো হামি ছোয়াল দামান্দের সাতে হায় ফুতিয়া।
বড়ই না খায়া ফালালাম আঁটি
আশের মায়ের কোলে দেকি চাঁন বরণ মালা হায় ফুতিয়া
আশের মায়ের গলায় দেকি সোনা বরণ মালা হায় ফুতিয়া

গীতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় কি কি করবে বিয়ের গোসলের সময়। কনে বা বর উভয়ের বিয়েতেই এই গীত গাওয়া হয়।

শব্দার্থ

১. দেখি- দেখা
২. খেলামো- খেলব
৩. চ্যাংড়া- যুবক/যুবতী
৪. দামান্দ- স্বামী।
৫. চাঁন- চন্দ্রের মত।

বিয়েরগীত-১

দাও কুড়াল নেয়ে চিনি যায় বান বাঁশের খোপে যে,
কাঞ্চায় বাঁশের ডালা যে,
বাইছা বাইছা কাটরে চিনি, আড়ার সরস বাঁশিরে
কাঞ্চায় বাঁশের ডালা যে,
সেই না ডালা নেড়ে চিনি যায় বান বাউলার হাটে যে
কাঞ্চায় বাঁশের ডালা যে,
হামার ডালার মূল্য গো চিনি
নাইকো তোমার পকেটে যে,
কাঞ্চায় বাঁশের ডালা যে
ডালা দেইক্যা বাপে কান্দে গো
ডালা দেইক্যা মায়ে কান্দে গো
ও ও ডালা দেইক্যা ও তাতার কইন্যা হাসে গো।
ডালা দেইক্যা ভাইও কান্দে গো
ডালা দেইক্যা বোনও কান্দে গো।
ও...ও ডালা দেইক্যা তাতার কইন্যা হাসে এ গো।
হামি যামো ঐ হোন্ডাওয়ালার সাতে গো।

এই গীতের অর্থ হলো মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। সবার মনে আনন্দ। কিন্তু কনের নিকটজন মা-বাব, ভাইবোন, তারা কাঁদছে। তাদের হৃদয় ব্যাথিত। কনের মনে কোন

www.pathagar.com

শঙ্কা নেই। সে অত্যন্ত আনন্দিত। সে খুশিতে হাসছে। বলছে, আমার বিয়ে হবে হোন্ড ওয়ালার সাথে। আমি তার সাথে চলে যাব।[১৩]

বিয়েরগীত-২

কাটা কাটা গুয়ারে যাদুরাম, কেচি কাটা কাটা পান...আন
সরতা কাটা গুয়ারে যাদুরাম, কেচি কাটা কাটা পা...আ...ন
শিল্পীর মায়ের আছে গো যাদুরাম, খোঁপার মধ্যে মধ্যে নাং
খোঁপা ঝাড়া দিয়া রে যাদুরাম, বাইর হয়্যা যাক নাং
সরতা কাটা গুয়ারে যাদুরাম,
কেচি কাটা কাট পা...আ...ন
কইন্যার মায়ের আছে গো যাদুরাম কাপড়ের তলে তলে নাং
কাপড় ঝাড়া দাও ওরে যাদুরাম, বাইর হয়্যা যাক নাং।

অর্থ : এই গীতটি বিয়ে বাড়ির জনপ্রিয় প্রচলিত গীত। হাস্যরসাত্মক ভাবে এই গীতটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। এস্থানে বলা হয়েছে কাটা সুপারি, কেচি দিয়ে কাটা হয়েছে পান, কিন্তু বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার মা সদায় ব্যস্ত। বিয়ের বাড়িতে যারা গীত গাইতে এসেছে তাদেরকে পান দেওয়া হচ্ছে না। তাই আইও...রা গাইছে, তার মা এত ব্যস্ত কারণ তার অনেকগুলো গোপন প্রেমিক রয়েছে। যাদের নাং বলা হয়েছে। তারা মেয়ের মার খোঁপার মধ্যে লুকিয়ে আছে, পরনের শাড়ির তলাতেও লুকিয়ে আছে তাদের বের করে দেবার তোড়জোড় চলছে।[১৪]

ষাইটের গান

খুলোহাটি যাইওগে ছেলের দাদা
কি তাঁবু টাঙ্গাইলো ছোলের দাদা।
ব্যাপারে ঘরে হচে গো নাতি
এনা তেলও দেওগো খুলু ভাই
ষাট্যার কোণা বসাই কি খুলু ভাই
কাপড়া হাটি যায়া গো ছোলের চাচা
কি তাঁবু টাঙ্গাইলো ছোলের চাচা
ভাইয়ের ঘরে হচে গো ভাইস্তা
এনা কাপড় দেওগো কাইপড়া ভাই
ষাট্যার কোণা বসাই কি কাইপড়া ভাই।

পোয়াতী মেয়ের সন্তান ভূমিষ্ট হয় মেয়ের বাবার বাড়িতে। মেয়ের শ্বশুর বাড়ি থেকে এ সময় নতুন শিশুকে দেখতে কাপড় নানা উপঢৌকনসহ নাতিনকে দেখতে যায়। তখন এ উপলক্ষ্যে একটা অনুষ্ঠান হয়। গীত গাওয়া হয়। একে সোনাতলা অঞ্চলের লোকেরা ষাট্যার গীত বলে।[১৫]

www.pathagar.com

৮. বিরহগীত

বিরহগীত-১

জিরা বইলাম মালানি গো
জিরা বইলাম পালানি গো
জিরা বইলাম হামি তোলা মাটির ওপর
ছ'মাস হইল্যা হামি যাইন্যা বাপের দ্যেশে,
কাউয়া যদি হল্যাম হিনি ই গো
সূর্য যদি হল্যাম হিনি ই গো
উড়্যা যায়া পড়তাম বাবার দালানের উপর
জিরা বইলাম মালানি গো
জিরা বইলাম পালানি গো।
জিরা বইলাম হামি তোলা মাটির উপর।
ছ'মাস হল্যা হামি যাইন্যা মায়ের দ্যাশে।
কাউয়া যদি হল্যাম হিনি গো
সূর্য যদি হল্যাম হিনি গো
উড়্যা যায়া পড়তাম মায়ের দালানের উপর।
দ্যাখা.আলাম হিনি সোনা মায়ের মুখ...উ।

অর্থ : মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতেই রয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে যায়নি সে। মনটা তার খারাপ। ছয়মাস হয়ে গেছে। বাপের বাড়ি থেকে কেউ তাকে নিতে আসেনি। সে তখন গাইছে কাক বা সূর্য যদি হতো তবে ভাল হতো। নারী জীবনের আক্ষেপ তার। বলছে তবে সে উড়ে যেত। গিয়ে বাবা ও মার সোনার মুখ দেখে আসত।

শব্দার্থ :

১. উড়্যা-উড়ে গিয়ে
২. হিনি- তাহলে
৩. জিরা-জিরিয়ে বসা।

বিরহগীত-২

আরে ধুতি ভর্যা ভর্যা ট্যাকা আইন্যা বাইন্দ্যাছে
মন মনেরা।
আরে আজকে বারাছি বাবাজানের তালাশে মন মনেরা।
আরে বাবাজানের জমি যে লিনাম হয়্যা যাচ্চেরে মন মনেরা।
আরে হামি যে বারাছি বাবাজানের তালাশে মন মনেরা
আরে ভাইয়ে ভাইয়ের জমি যে লিনাম হয়্যা যাচ্ছেরে মন মনেরা।
আরে ধুতি ভর্যা ভর্যা ট্যাকা আইন্যা বাইন্দ্যাছে মন মনেরা।
আরে ধুতি মধ্যে ভর্যা ভর্যা ট্যাকা আইন্যা বাইন্দ্যাছে মন মনেরা।

www.pathagar.com

অর্থ : বিয়ের পর কন্যা স্বামীর বাড়িতে রয়েছে। সে হঠাৎ শুনতে পেল তার বাবার বাড়ি ঘর নিলামে উঠেছে। সে চিন্তিত। বাবার বাড়ি যাতে নিলামে না ওঠে সেজন্য টাকা যোগাড় করেছে। যেভাবেই হোক পিতৃগৃহ সে রক্ষা করবে। শ্বাশতকাল ধরে পিতার প্রতি কন্যার যে সহমর্মিতা স্বামী-শ্বশুরের সংসারে থেকেও আদরের কন্যা তা বুঝতে পারে। সে তাই মা-বাবার দুখে দুখি ও সুখে সুখী হয়ে যায়।[১৬]

৯. জারিগান

আদমদিঘির জারিগান

আদমদিঘি উপজেলার বরবাড়িয়া গ্রামের প্রশান্ত চন্দ্র সরকার একজন শৌখিন লোকসঙ্গীত শিল্পী। তিনি নিজে গান লেখেন, নিজেই সুর করেন এবং পরিবেশন করেন। আমরা তার কাছে গেলে তিনি তাৎক্ষণিক আমাদের দুটি বগুড়ার গান শোনান। গান দুটি নিম্নরূপ :

গান- ১

শোনেন শোনেন দেশ বাসী শোনেন দিয়া মন
বগুড়া জেলার জারি হামরা করি যে বর্ণন
পোরথমে বন্দনা করি আলা নবির নাম
যত পীর মুর্শিদের নামে জারি শুরু করিলাম
আরে ও ও ও...।

উত্তর বঙ্গের মধ্যে খান্তি বগুড়া জেলা ভাই
মিচ্চি এ্যানা বগুড়ার কথা জারিতে কয়্যা যাই
ভাইরে...।
বার পীর আওলিয়ার জেলা ইতিহাসত আছে
তিন প্রধান মুন্ত্রির বাড়ি এই জেলাতে।
ভাইরে...।
করত্যা লদী এই জেলার মধ্যে দিয়া গ্যাছে
সাজাগোজা শহর লদীর পাড়ত দ্যাড়া আছে
এ... এ... এ।
আরে ও... ও... ও
পত্যা, হলদি, কুষারের গুঁড়, চিটকা আলু হাগরাই
এতো রকম ফসল রে ভাই কোন জেলাত নাই
ভাইরে কোন জেলাত নাই...॥
সগলি হামরা কষ্ট কর্যা অনেক ফসল ফলাই,
আলার দোয়ায় হামাকেরে হিংসা বিদ্বেষ নাই
না... আ... আ... ই
আরে ও...ও...ও
মহাস্থানে সুত্যা আছে বাবা শাহ সুলতান

www.pathagar.com

জিয়ারত করে সবার জুড়ায় ও পরান,
ভাইরে জুড়ায়ও পরান...॥
বেহুলার বাসর ঘর আছে আরো এটি
দেখতে পাবি যাও যদি একটু খানি হাঁটি
ই...ই...ই...।
আরে ও...ও...ও
এরি মধ্যে একনা কতা ফুসুত কর্‌য্যা কই
আছে এটি দ্যাশের সেরা বারকি শরার দই
ভাইরে...॥
আরো আছে শুকনা পত্যা চিটকা আলুর কাই
সালাম দিয়া সবাই হামরা বিদায় হয়্যা যাই
হায়রে বিদায় হয়্যা যাই...॥

গান- ২

পলি মাটির ছল হামরা
লাল মাটির ছল
বগড়াত হামাকেরে বাড়ি ই...
বগড়াত হামাকেরে বাড়ি।
বগড়া হামার মায়ের লাকান
বগড়া যে হামারি
বগড়াত হামাকেরে বাড়ি।
বাংলা দ্যাশের আদি শহর
পুণ্ড বর্ধন নাম আছিল... ॥
এখন হইছে মাস্থানের গড়
সগলি সালাম করি
বগড়াত হামাকেরে বাড়ি।
শুকনা পত্যা হামরা জলমায়
ক্যাংকা চোটের এই পত্যা ভাই
হামরা কলে শ্যাংকা চোটের
কাক্কু ভয় না করি।
বগড়াত হামাকেরে বাড়ি।[১৭]

গহিনবাদের জারি

সারিয়াকান্দিতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন ঠেকাতে ১৯৯৬-৯৭ সালে কালিতলা ও দেবডাঙ্গায় দু'টি হার্ডপয়েন্ট নির্মাণ করা হয়। স্থানীয়লোকেরা একে গ্রোয়েনবাধ (স্থানীয় উচ্চারণ- গহিনবাদ) বলে থাকে। এই বাধকে নিয়ে ছাগলধরা গ্রামের সেকান্দার বয়াতি একটি জারিগান বাধেন। আজও এ জারিগান স্থানীয় লোকজনের মুখে মুখে ফিরে। গানটি নিম্নরূপ :

যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
প্রতম আল্লা নবির নামটি ধরি

www.pathagar.com

গহিনবাদের বান্দিলাম জারি
কেমনেতে দিব পাড়ি দয়াল
তড়াও গুরু এইবারে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
সন ১৪০৩/৪ সালে
সেকন্দার আলী ভেবে বলে
বিদ্যা নাই আমার অন্তরে।
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
শেখ হাসিনা পাইলো গদি
বিদ্যাশআলাক ছাড়্যা দিলো যমুনা নদী
কানিত্যাছে নিরবধি
বুকভাসে চোকের জলে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
জাহাজ অ্যালো সারেখান্তি থানা
কতদেকলাম কলকারখানা
চ্যাংড়াবুড়ে কেউ ছাড়ে না দয়াল
সকলে যায় বাদ দেকতে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
যাইয়্যা দেকি কালিতলা
কত নুকের নাগচে ম্যালা
ওই দ্যাশের ভাই মানুষ ধলা
সকলি ভাই এক বয়সের
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
ওই দ্যাশের ভাই মানুষ শ্বেতা
বুঝা যায় না তাহার কতা
বুঝতে গ্যালে আমার ঘুরে মাতা
ভাবছি বসে অন্তরে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
কালিতলা এক কাণ্ড হইলো
বাদ দেকিতে এক মেয়ে প্রবস হইলো
কাপড়ের কাণ্ডারি কইললো
সুন্দর ছেলে হয়্যাছে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
রাজশাহীতে মেয়ের বাড়ি
ইযাপ করে মটর গাড়ি
বাদ দেকতে যায় তাড়াতাড়ি
সারেখান্তি পৌঁছাছে

www.pathagar.com

যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
দেবডাঙ্গা কাজ কইল্‌লো শুরু
মেশিন দিয়ে তুলে বালু
মটর দিয়ে ঠেলে ফালায়
দেকিলাম দু নয়নে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
দেবডাঙ্গা এক ঘটনা হইলো
নৌকাডুবে কতো ছেলে মারা গ্যালো
কতো ট্যাকা দান করিল ওই ছেলের মায়েকে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
আর সারেখান্তি বুলুক তয়ার হইলো
ফেরিতুলে দেবডাঙ্গাতে নইয়া গ্যালো
পাতর ফ্যালান শুরু কল্‌লো
কি চমৎকার দেকিতে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
বিদ্যাশি এক ডুবারু অ্যালো
পিচবুট থাক্যা ঝাপদে পড়্যা ডুবে গ্যালো
তিনচার ঘণ্টা ডুবে ছিলো
তারপর ভাস্যা উটে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
কালিতলা ফালায় বালুর চর
বড় বড় তুলে টিনের ঘর
চতুর দিকে পাচির ঘেরা
মাঝখানে অফিস বসাচে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
সেই ঘরের ভাই ক্যাটাগরি
জানলা কাটা সারি সারি
আনেচে কত বিদ্যাশি নারী
দেকলাম কত নজরে
গহিন বাদের করচে কত ঠাট
জাগায় জাগায় বান্দাচে ঘাট
নাম রাইখাচে প্রেমেরই ঘাট
কতনুক বইস্যা আচে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
যমুনা নদীর এমনি নীতি
বাদ ভাঙ্গে বাড়াইচে নদী
কত নোকের করচে ক্ষতি

www.pathagar.com

কতঘর ভাস্যা গ্যাচে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)
গান বান্দে ভাই সেকেন্দার আলী
ছাগল ধরা বসত বাড়ি
ওস্তাদ আমার অইজমুন্সি
সালাম রাকি তিনার চরণে
যমুনারও ওই গহিনবাদ অ্যালো বাংলাদ্যাশেতে (ধুয়া)[১৮]

১০. সারিগান

সারিগান : (নৌকা বাইচের গান)

১. ওরে টেংরা কাতল যায়
মাগুর মাছে কেক কাটায়
শিং মাছটা যাবু হানা পরান যায় জলিরে
কি মাছ ধইরাছো বর্শি দিয়া ও হারুজি
ভেদা মাছ কেদা খায় পুটি মাছের পরান যায়
বৃষ্টি হলে কই মাছটা চলে ডাঙ্গা দিয়ারে
গুরু বলে মিথ্যা নয় চেং ধরেছি
ঝোল খাইবো দুটি বেগুন দিয়ারে।

২. চেলা মাছে পানসি নাও দাড়ায় ওরে মোয়া ভাই
চেলা মাছে পানসি নাও দাড়ায়।
ওরে দারকে পুটি অল্প জলে ছল ছলাইয়া যায়
ওরে ভেদা মাছে কাদোর নিচে দাঁত নিটকাই রয় (২বার)
ওরে ইলিশ মাছ বড় ভালো জামাই আদর পায়
কানুছ মাছ আসিয়া আবার শুর শুরি মিটায়
ওরে মোয়া ভাই।

৩. কালা পার করো হে আমি না জানি সাতার
আমায় ভব নদী পার করো হে
কালা মুই নারী তোমার
কালা পার করো হে।
নয়া বিয়ান গো পান্তা ভাতে ঢাইল্যা দিল ঘি
যাওয়ার সময় আইনা দিল টাটকা জিলেপি।[১৯]

www.pathagar.com

১১. নারী ও পুরুষের পালাগান

নারী ও পুরুষের পালা গান

সারিয়াকান্দি উপজেলায় এই গীতটি ২ জন নারী পুরুষ নাম ভূমিকায় পালা করে গান গায়। এই গীতে তৎকালীন সমাজের জীবনযাত্রার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

নারী পুরুষের পালাগান-১

পুরুষ

সোনার গাংগে লোনা পানি
রসিক যারা নাও চালায় গো
প্রেমিক যারা নাও চালায়,
দেখতে শুকনো গো নদী
ওরে কান্দে ফুল জল আদি
জোয়ার ভাটা নের বধি
সাধু যারা টের পায়।

নারী

কে যাবিরে আয়রে আয়
ভক্তি দিতে মায়ের পায়
রবেনা সামনের ভয়
তোর এ ভব সংসারে (২ বার)
জগতে বলতে গেলে মায়ের কৃর্তি
লেগে যাবে সারা রাত্রি
ঘোষণা হইতো প্রাপ্তি মায়েরি ব্যাপার।
ও ভাই কালি দেবী কমলা
তোর গলায় মণ্ডু মালা
অতিথি প্রাপ্ত চরণের ব্যাপার।

পুরুষ

ওরে অসতি নারী
পতি যারা আয়ু থাকতে জমে ধরে
জগতে নারীর দোষেই পুরুষ মরে সংসার জগতে।
যেমন নারীর দোষেই খেত খামার যায়
নারীর দোষে রাখাল পালায়
নারীর দোষে হালের বলদ বিলে মরে
নারীর দোষে পল বাগানে ফল ধরেনা
গাছের ফল ঝড়িয়া পড়ে গো।

www.pathagar.com

নারী

যা দেখিলে ঝইড়া পড়ে সিদ্ধ লোকের মাথার মনি
মায়া ভুজঙ্গিনি আমি মায়া ভুজঙ্গিনি
ভাইরে ভাই মরা লোকের মুখের হাসি
দাঁতে দমকায় বিদ্যুৎ রাশি
ধরতে গেলে কাছে এসে মিছেই জিন্দিগেনি
যেমন আগুনে পতঙ্গ জলে দিবস রজনি
সেথায় লোহা গেলেও হাইলা পড়ে
কাম সাগর লোনা পানি।

পুরুষ

ওরে না খাইয়ে খাওয়ায় যে
তাই তো একটু আদর করি
মাইয়ার দল পোষা বিড়াল
মাইয়ার দল রয় চিরকাল স্বামীর বাড়ি
ওরে মেয়ে লোকের এমনি ধারা
সুযোগ পেলে বেড়ায় পাড়া
গোপন কথা শুনতে তারা ইচ্ছুক ভারি
নয় বাড়ি ছড়াইয়া দেয় থাকুক কিবা ছেড়ি বুড়ি।

নারী

ওরে বিশ্ব মাতার রয় অধিকার
পাপী উদ্ধার করিবার তরে
মেয়ে জগতের প্রথম পাক জবান
যা বলেছে ফাতেমারে
মেয়ে জগতে প্রধান।
মেয়ের হাতে বেহেস্তের ডুরি হাদিসে আছে প্রমাণ
যার নাম ধরে হাসতে ডাকবে আল্লাহ ছোবহান
ওরে সবার আগে বেঁচে যাবে
বিচার করে দেখ তবে
মায়ের কি আর হবে এ সংসারে।[২০]

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ চরপাড়া, ডাকঘরঃ মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
২. শুকুর আলী শেখ (৭৫) ও শাহাজাহান শেখ (৭০), পিতা ছকমান বয়াতি, গ্রামঃ মানিকদাইড়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

www.pathagar.com

৩. জোতদার বাউল মুকুল (৫০), গ্রাম : পাতিলকুড়া, সোনাতলা।

৪. মোছাঃ হাসিনা বেগম, স্বামী : মোঃ মতিউর রহমান, বয়স : ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : গান, যাত্রা পালায় অভিনয়, সার্কাসে খেলা দেখানো, গ্রাম : নারহট্ট, পোস্টঃ নারহট্ট, ইউনিয়ন : নারহট্ট, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

৫. মোঃ আমজাদ হোসেন, পিতা : মোঃ হবিবর মোল্লা, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি, পেশা : দিনমজুর, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিম পাড়া, পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

৬. মোছাঃ মাবিয়া বিবি, স্বামী : মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন, বয়স : ২৬, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : এস.এস.সি, গ্রাম : কড়ই, পো : ঐ, থানা : আদমদিঘি, সাক্ষাতের তাং : ১৫/০১/১১

৭. মোছাঃ আমিনা বিবি, স্বামী : মৃত মোহাম্মদ আলী, বয়স : ৮০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, গ্রাম : পাঁচখুর, পোস্ট : তিনদিঘিহাট, ইউনিয়ন : : কালাই, উপজেলা : কাহালু জেলা : বগুড়া।

৮. মোছাঃ সাদিয়া আফরিন, পিতা : আব্দুস সামাদ, বয়স : ১৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতাঃ ৭ শ্রেণি, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, ইউনিয়ন : হাটফুলবাড়ি গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

৯. মোছাঃ হাফিজা বেগম, স্বামী : আব্দুর রশিদ, বয়স : ৩৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতা : স্বাক্ষর, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, ইউনিয়ন : গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

১০. মোছা : ফিরজা বেগম, স্বামী : হাপু তরফদার, বয়স : ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতা : স্বাক্ষর, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, ইউনিয়ন : হাটফুলবাড়ি, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

১১. ক. মোছাঃ ছায়মা খাতুন, পিতা : মোঃ মতিন আলী, বয়স : ২৬, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : পারশন, পো : চাঁপাপুর, থানা : নন্দীগ্রাম, জেলাঃ বগুড়া। সাক্ষাতের তাং : ১০/০৩/১২, সময় : রাত ৮.০০। (১-৭ নং পর্যন্ত মেয়েলি গীতের কথক)

খ. মোছাঃ আছিয়া বেগম, স্বামীঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, বয়স : ৫০, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষাঃ ২য় শ্রেণি, গ্রাম : দামরুল, পো : হাট কড়ই, থানা : নন্দীগ্রাম জেলাঃ বগুড়া। সাক্ষাতের তাং : ০১/০৩/১২, (৮-১১ নং পর্যন্ত মেয়েলি গীতের কথক)

১২. লিপি খাতুন (৫০), গ্রাম : পাতিল্যাকুড়া, সোনাতলা, বগুড়া। সংগ্রহ তাং : ০৮/১২/১১ইং

১৩. নার্গিস। বয়স : ৩০, গ্রাম : পাতিল্যাকুড়া, জেলাঃ বগুড়া। পেশা : গৃহিণী।

১৪. রীনা বেগম ও জাহানারা। বয়স : ৩০,৩৫। গ্রাম : পাতিল্যাকুড়া, সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া।

১৫. নার্গিস। গ্রাম : পাতিল্যাকুড়া, বয়স : ৩৫ পেশা : গৃহিণী।

১৬. পিতা-পুত্রী। তারা দুজনে প্রায় সময় বিয়ে বাড়িতে এই মর্মস্পশী গীতটি গেয়ে থাকেন। গীতকারের নাম : বাদশাহ (৪৫), আলেমা (৩৫)। গ্রাম : পাতিল্যাকুড়া। উপজেলা : সোনাতলা, বগুড়া তারিখ : ০৮/১২/১১

www.pathagar.com

১৭. শ্রী প্রশান্ত চন্দ্র সরকার, পিতা : শ্রী সুধন্য চন্দ্র সরকার, বয়স : ২২, পেশা : গায়ক, শিক্ষা: ৯ম শ্রেণি, গ্রাম : বরবড়িয়া, পো : নশরৎপুর, থানা : আদমদিঘি, ১৬/০৮/১১

১৮. সোহরাব হোসেন (৪৩) পিতা- সেকান্দর বয়াতি, গ্রাম-ছাগলধরা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া। পেশা - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পল্লী চিকিৎসক।

১৯. জগদিশ বাউল, বয়স (৭০), পেশা : বাউল, গ্রাম : দেব ডাঙ্গা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি।

২০. জগদিশ বাউল, বয়স (৭০), পেশা : বাউল, গ্রাম : দেব ডাঙ্গা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

২১. মো : জাকির হোসেন মোল্লা, পিতা : মো : খোকা মোল্লা, বয়স : ২২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, পেশা : ব্যবসা, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২২. গীত দুটির কথক : আলেয়া খাতুন (১৪), পেশা : ছাত্রী, গ্রাম–ছাইহাটা, সারিয়াকান্দি।

২৩. আঞ্জু বেওয়া (৭০) গ্রাম : ছাইহাটা। পেশা : ভিক্ষাবৃত্তি।

২৪. বাদশা মিয়া। বয়স : ৫০, গ্রাম : পাতিল্যাকুড়া। উপজেলা : সোনাতলা, সময়: ৯.৩০, স্থান : বাড়ির উঠানে, তারিখ : ০৮/১২/১১

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব

বগুড়া থিয়েটারের বৈশাখি উৎসব

বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় পৌর পার্কে বিগত ৩০ বছরের ধারাবাহিকতায় বগুড়া থিয়েটারের উদ্যোগে প্রতি বছর পালিত হয় পাঁচ দিনব্যাপী বৈশাখি মেলা। ভোর ছয়টা হতে রাত বারোটা পর্যন্ত চলে মেলা। বগুড়া শহরের প্রায় সকল মানুষ উপচে পড়ে এই মেলায়। বাংলা ১৪২০ সনের এই মেলার উদ্বোধনী পর্ব (ভোর ৬ টা থেকে বেলা ৯ টা পর্যন্ত) চ্যানেল আই সরাসরি সম্প্রচার করায় এ বছর বগুড়াবাসীর কছে এ মেলার আবেদন আরো বেড়ে গেছে। বাংলা ১৪২১ সনের চ্যানেল আইতে সরাসরি সম্প্রচার নেই তবুও অনেক লোক ভোর ছয়টার আগেই পৌর পার্কে জড়ো হয়েছে। কেউ কেউ গতবারের মতো এবারও চ্যানেল আই সরাসরি সম্প্রচার করবে মনে করে আগে ভাগেই চলে এসেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত প্রায় সবাই এসেছে বৈশাখের নতুন কাপড় পরে। বৈশাখের নতুন সাজ যেন ঈদ-পূজাকেও হার মানিয়েছে। সকাল ন'টায় শুরু হয় বৈশাখি র‍্যালি মঙ্গল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি, মুখোশ পরে শত শত নারী পুরুষ অংশ নেয়। ঢোল, খরতাল, ঢাকের শব্দে চারদিক মুখরিত। শোভাযাত্রা সকাল এগারটায় পার্কে ফিরে আসে। বিকেলে পার্কের উন্মুক্ত মঞ্চে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। প্রতিদিন মেলায় থাকছে লাঠিখেলা মোরগ লড়াই, পাতাখেলা, পুতুল নাচ, গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে বউচি, গোল্লাছুট, পুথি পাঠ এছাড়াও বগুড়ার বিভিন্ন সংগঠন সমূহের নানা ধরনের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান বলতে লোকনৃত্য, মহিলাদের বিয়ের গীত পরিবেশন, বৈশাখি গান, লোক সঙ্গীত, লোকনাটক, বউবন্ধক পালা, লছিমনের পালা ইত্যাদি পরিবেশন। গভীর রাত (রাত ১২ টা থেকে ১ টা) পর্যন্ত চলে এসব অনুষ্ঠান। প্রথমদিন রাত ন'টায় মেলায় শুরু হয় বউবন্ধক পালা। পালা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হওয়ার প্রথমদিন মেলা পণ্ড হয়ে যায়। মেলায় শেষদিন অনুষ্ঠিত হয় লছিমনের পালা। পালা পরিবেশন করে বগুড়া সদর উপজেলার মানিকচক গ্রামের একতা নাট্যগোষ্ঠী। মেলার পাঁচদিনই বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাগরদোলা, চড়কি, বিভিন্ন মৃৎশিল্পের ও হস্তশিল্পের দোকান, পান্তার হাড়ি, রকমারি খেলনার দোকান, চুড়ি, ফিতাসহ হরেক রকম পণ্য। এই মেলা এখন বগুড়াবাসীর প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। এই মেলা সম্পর্কে বগুড়া থিয়েটারের কর্ণধার জনাব তৌফিক হাসান ময়না বলেন :

'বৈশাখ আমাদের শেকড়। বগুড়া থিয়েটার ত্রিশ বছর ধরে এই শেকড়ের চর্চা করে আসছে। বগুড়া থিয়েটারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলা এখন বগুড়াবাসীর অন্যতম

www.pathagar.com

প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। গত বছর চ্যানেল আই এর সরাসরি সম্প্রচার করায় এর ব্যাপ্তি আরো প্রসারিত হয়েছে।'

বগুড়া থিয়েটারের পাশাপাশি এবছর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট বগুড়া শাখার উদ্যোগেও আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আরেকটি বৈশাখি মেলার আয়োজন করা হয়। দুটি মেলা খুব কাছাকাছি হওয়ায় মেলা প্রাঙ্গণ যেমন বেড়েছে তেমনি এর ব্যাপ্তিও প্রসারিত হয়েছে।

শাজাহানপুরের বৈশাখি উৎসব

শাহাজানপুর উপজেলার আড়িয়া বাজারে 'উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠেছে ২০০৮ সালে। সংগঠনটি ২০০৮ সালে আত্মপ্রকাশ করলেও এর কার্যক্রম শুরু হয় প্রায় এক দশক আগে। এ সংগঠনের কর্ণধার সেক্রেটারি জনাব নূরুল ইসলাম জানান 'লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ লোকজশিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। আমি সেক্রেটারি হলেও এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান সভাপতি বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল। বর্তমানে এ সংগঠনের ২১ জন সদস্য রয়েছে। সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবছর আড়িয়া বাজার নদীর পারে ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপন এবং গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন হয়ে থাকে।

বাংলা বর্ষবরণে বিগত বছরগুলোতে উপজেলায় সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আড়িয়াবাজার এলাকায় অবস্থিত উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য চর্চা কেন্দ্র। বর্ষবরণে এ বছরও ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল জলিলের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানরত বাংলা বিষয়ের এক ঝাঁক সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষক-ছাত্র ৪ বছর আগে ১৪১৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'উত্তরবঙ্গ লোক সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' নামের এই প্রতিষ্ঠান। ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে এখন রয়েছেন বগুড়া সরকারি আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক বগুড়ার গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা ফাজিল মাদ্রাসার বাংলা বিষয়ের প্রভাষক নুরুল ইসলাম জানান পল্লী এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বাঙালির সংস্কৃতি, লোকজ সাহিত্য ও লোকাচারগুলো সংগ্রহ, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠান। গত ৩ বছর যাবৎ বাংলা নববর্ষ বরণে উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট ও লোকজ কৃষ্টি সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান করে স্থানীয়দের মাঝে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও মাটির সানকিতে ইলিশ ভাজা, বিচি কলা, আলু ভর্তা দিয়ে পান্তা ভাত এবং দুপুরে ছিল প্রায় ৪০ রকমের ভর্তা দিয়ে ভর্তা ভাতের আয়োজন। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, করতোয়া নদীর তীরে আলোচনা সভা, বাউলগান, লাঠিখেলা, পালাগান, জারিগান এবং বাউল শিল্পীদের পুরস্কৃত করা। মেলায় মুক্তিযুদ্ধ, দেশ প্রেমসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধারণ মানুষের মাঝে চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লোকগান,

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকাচার তুলে ধরেন স্থানীয় শিল্পীরা। লোকসংস্কৃতি চর্চায় উপজেলার একমাত্র প্রতিষ্ঠনটির উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মজিবর রহমান জানান, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয়। এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তিনি সাধ্যমত সহযোগিতা করবেন।[১]

২. নবান্ন

এই লোকাচারটি বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত। অনেক ফোকলোরবিদ এই লোকাচারকে লোকউৎসব বলেও সমর্থন করেছেন। তবে এর সাথে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার যুক্ত থাকায় তা লোকাচার হিসেবে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এটি লোকঐতিহ্যের ধারাবাহিক রূপ। প্রধানত হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই এই লোকাচারের সূচনা। আবার বলা যায় অঘ্রাণের ১লা তে নতুন ধানের ভাত খাওয়া বা নতুন ধান ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করেই এর উদ্ভব। কারণ আদমদিঘি উপজেলায় সাধারণত ১লা অঘ্রাণে এই লোকাচারটি পালন করা হয়। ঐ দিন সকালে জমি থেকে আখ (তিন থোপ ধানের গাছ ধানসহ কেটে আনা হয়) নিয়ে আসা হয়। নবান্নের দিন সকালে স্নান করে বাড়ির ছোট ছেলেকে নিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কোন ব্যক্তি জমিতে যায়। যাওয়ার সময় গামছায় বা লাল সালু কাপড়ে করে আতপ চাল, গুড়, কলা, আগরবাতি, কাস্তে, পূজার ফুল, সিঁদুর, কাজল, বাজানোর জন্য ঘণ্টা বা শঙ্খ (বাচ্চাদের চোখে যেটা দেওয়া হয়) ইত্যাদি সাথে নেয়। এরপর যে জমি থেকে আখ আনা হবে সেই জমির মাস্তানা কোণায় (উত্তর পূর্ব কোণ) তিন গোছ ধান গাছকে এক সাথে বেঁধে উক্ত উপচার দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা করা হয়। তারপর পূজা শেষে প্রণাম করে তা কেটে ঐ ছোট ছেলের মাথায় গামছা দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলেটি ঘণ্টা বা শঙ্খ বাজাতে বাজাতে বাড়িতে চলে আসে।

নবান্নের আখ (ধানগাছ) কেটে বাড়িতে নেওয়ার দৃশ্য, নন্দীগ্রাম

www.pathagar.com

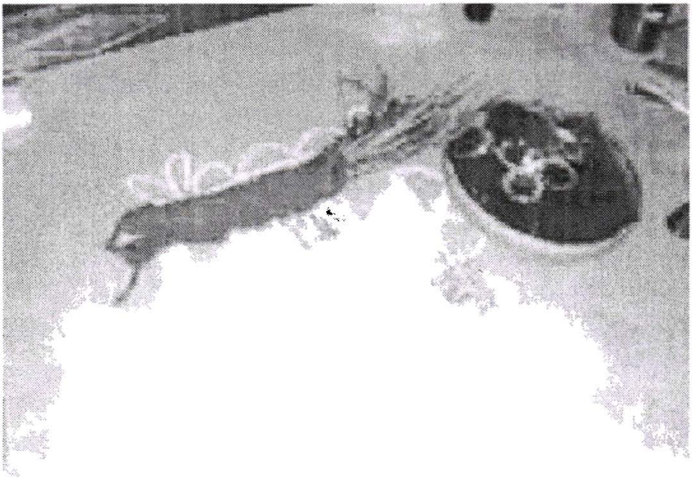

নবান্নের আখ বাড়িতে কেটে আনার পর ঘরের মেঝেতে আল্পনা এঁকে তাতে আখ রাখা হয়। আল্পনাতে লক্ষ্মীর ঘর আঁকানো হয়েছে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার বাড়িতে আসার সময় ঐ ছেলেটির কারো সাথে কথা বলা যাবে না। বাড়িতে আসার পর তাকে বরণ করে নেওয়া হয় পরছা (উলু ধ্বনি সহযোগে বিশেষ ক্রিয়া) দিয়ে। এরপর তার মাথা থেকে আখ নামানো হয়। আর এরই মধ্যে বাড়িতে যারা থাকে তারা ঐ সময়ের মধ্যে ঘরের ভিতর, বারান্দায়, আঙিনায় বিভিন্ন রকম আলপনা আঁকে এবং নানা রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করে। খাবারের মধ্যে যে লোকখাবারের নমুনা প্রত্যেক বাড়িতে দেখা যায় তা হলো লাবড়া (বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে)। আখ আনার পর বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা নতুন চালের আটা দিয়ে তার সাথে গুড়, কলা, নারকেল, পানিফল ইত্যাদি দ্বারা পেস্ট করে এক প্রকার খাবার তৈরি করা হয়। এই খাবার প্রথমে চৌদ্দ পুরুষের নামে কলার পাতা ছোট ছোট করে কেটে তাঁদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'বারান'। তারপর পরিবারের সবাই একসাথে জ্ঞাতিদের প্রণাম করতে যায়। বিশেষ করে যারা যার থেকে বয়েসে বড় বা সম্পর্কে বড় তাদের প্রণাম করা হয়। এরপর বাড়িতে এসে ঐ চালের আটার গুলানো প্রসাদ সবাই মিলে এক সাথে বসে খায়। আর তার সাথে লাবড়া সহ নানা রকম লুচিপুরি, মিষ্টি, দই ইত্যাদি খাবার খায়। এই খাবারের মধ্য দিয়ে নবান্নের প্রথম পর্বের কার্য শেষ হয়।

নবান্নের দিন পুকুর থেকে সবচেয়ে বড় মাছ ধরা হয় বা যার পুকুর নেই তারাও চেষ্টা করে বাজার থেকে বড় মাছ কিনতে। আর গৃহিণীরা বাড়িতে রকমারি রান্নার যোগাড় করতে থাকে। ঐ দিন প্রত্যেক বাড়িতে কমপক্ষে দশ রকমের তরকারি রান্না করা হয় কিংবা তারও বেশি। তবে এটা নির্ভর করে সাধ্যের উপর। রান্নাবান্না শেষ হয় বিকেলে বা সন্ধ্যার সময়। এরপর আবার যে সব তরকারি রান্না করা হলো সেগুলো

www.pathagar.com

একটু একটু করে একটি কলা পাতায় নিয়ে 'বারান' হয়। তারপর পরিবারের সবাই আবার একসাথে বসে রাতের খাবার খায়। আর এভাবেই নবান্নের দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। আর নবান্নের পরের দিনের যে আনুষ্ঠানিকতা তাকে বলা হয় 'বাসি নবান্ন'। এই দিন নবান্নের দ্বিতীয় দিন। এই দিনে সবাই এক জন আরেক জনের বাড়িতে খাবারের জন্য বের হয় বা তাদের নিমন্ত্রণ করা হয়। খাবারের ব্যাপারটা আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বর্তমানে তাও অনেক কমে গেছে। এভাবেই নানা রকম খাবারের আয়োজনের মধ্যে দিয়েই নবান্নের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

আবার এই অঞ্চলের মুসলমানগণও নবান্ন পালন করে থাকে। তবে তা আগের চাইতে তুলনামূলকভাবে কম। এই অঞ্চলের মুসলমানেরা অঘ্রান মাসের প্রথম শুক্রবারে তাদের নবান্নের দিন হিসেবে মনে করে। তাই ঐ দিন তারা নতুন চালের পায়েস রান্না করে মসজিদে শিন্নি দেয় এবং নতুন চাল, গুড়, কলা দিয়ে মেখে বাড়ির সব গরুকে খাওয়ায়। তবে বর্তমানে বেশির ভাগ বাড়িতে চালমাখা গরুকে খাওয়ানো হয় না। এছাড়া সেদিন গ্রামে সবাই মিলে গরু জবাই করে নতুন চালের ভাত দিয়ে মাংস খায়। এভাবেই এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ে নবান্ন উৎসব পালিত হয়।

৩. পৌষপার্বণ

বগুড়া জেলায় পৌষপার্বণকে বলা হয় পুষণে। পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের আগের দিন পর্যন্ত গ্রামের ছেলেরা দল ধরে লাঠিতে ঘুঙুর বেঁধে মাগনের গান বা ছড়া গেয়ে মাগন তোলে। সন্ধ্যার পর পরই ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগন তোলা শুরু করে। সারা মাস ধরে সংগ্রহ করা মাগন দিয়ে পৌষ মাসের শেষ দিন ফাঁকা মাঠে গিয়ে খির খিচুড়ি রান্না করে গ্রামের সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করে।

একটি মাগনের গান

এলোরে ভাই উড়িয়ে
হাত্তির কান্দে চড়িয়ে
হাড়ির কা দুল দুল করে
নাপা বাগুন গাচে ধরে
নাপা বাগুন চিড়ল ভাত
তাইদে খাইলাম বাসি ভাত
বাসি ভাত খাইয়া রে
হিজল তলি যাইয়া রে
হিজল তলি বাঘের ভয়
খায় আর কড়মড়ায়
দুই চোখ দিয়ে ভরভরায়
দুই চোখেত দুই মুইলে
মুলে ধরে মাললাম পাক
বামুন কয় বাপরে বাপ।
ওরে খসলা ভাই
মাগুন দেও ও ব্যাত যাই।[২]

www.pathagar.com

৪. চড়ক

শেরপুরের চড়ক উৎসব এখানকার হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। চৈত্রসংক্রান্তির দিন শেরপুর উপজেলায় চার/পাঁচটি চড়ক উৎসব হলেও শেরপুর শহরের বারোদুয়ারী এবং পৌরপার্কের চড়ক দুটিই সর্ববৃহৎ। এ দুটি চড়ককে ঘিরে সকাল থেকেই বারোদুয়ারী প্রাঙ্গণ এবং পৌরপার্কে মেলা বসে।

বারোদুয়ারীর চড়ক গাছটি প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। পৌরপার্কেরটা এর থেকে একটু ছোট। একটি গর্তের মধ্যে চড়ক গাছ পোতা হয়। গাছের মাথায় একটি লম্বা বাঁশ আড়াআড়িভাবে বসানো থাকে। বাঁশের দু প্রান্তের রশিতে সন্ন্যাসী জাতীয় মানুষের পিঠে বড়শি লাগিয়ে চতুরদিকে বাঁশ ঘুরাতে থাকে। ১০ থেকে ১৫ মিনিট এভাবে বাঁশ ঘোরানো হয়। যখন বাঁশ ঘোরানো হয় তখন অনেকেই মন্ত্র পড়তে থাকে বিশেষ করে পুরোহিত এবং তার সঙ্গীরা দ্রুত মন্ত্র পড়তে থাকে। এছাড়াও হিন্দু মহিলারা এসময় উলুধ্বনি দেয়। চড়ক ঘোরানোর আগে শিব ঠাকুরের পুজো করা হয়।[৩]

নন্দীগ্রামের মাটিহাঁসের চড়ক

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠেয় প্রাচীন লোকউৎসব ও শৈব অনুষ্ঠান। স্থান এবং কাল বিশেষে অনুষ্ঠানাদির প্রকারভেদে চড়ক অনুষ্ঠান গাজন, নীলপূজা, গম্ভীরাপূজা ও ভরন নামে পরিচিত। বিশেষ করে বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলায় মাটিহাঁস গ্রামে যে ভরন হয় তাতেই চড়কের বা চড়ক পূজার আয়োজন করা হয়। কথিত আছে এই দিনে শিব উপাসক কিংবদন্তিখ্যাত বাণরাজা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রীতি উৎপাদন করে অমরত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদি ও স্বীয় গাত্ররুধির দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে নিজ অভিষ্ট সিদ্ধ করে। তদনুসারে শৈব সম্প্রদায় এই দিনে শিবপ্রীতির জন্য এই উৎসব করে থাকে। তবে বর্তমানে শুধু শৈব সম্প্রদায় নয় অন্যান্য সম্প্রদায় দেশের বা অঞ্চলের অনেক দিনের চলিত অনুষ্ঠান হিসেবে এই চড়ক পূজা করে থাকে। তেমনি আগের মত দিনক্ষণ বিচার করে এই চড়ক পূজা করা হয় না। মাটিহাঁস গ্রামে যে উপলক্ষ্যে চড়ক হয় তা ঐ অঞ্চলে আরো অন্যান্য গ্রামে যেমন গোপালপুর, হাটকড়ই, কয়ারপাড়া ইত্যাদি গ্রামে হয়ে থাকে। তবে ঐ সব গ্রামে ভরনের সময় চড়ক হয় না। শুধু মাটিহাঁস গ্রামেই ভরনের সময় চড়ক হয়ে থাকে। মাটিহাঁস গ্রামের চড়ক পূজা বা ভরন প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে শুরু হয়ে শুক্রবার পর্যন্ত হয়। এই ভরন কমিটির একজন সদস্য শ্রী শৈলেন চন্দ্র বললেন- 'হামাগেরে (আমাদের) এটি অনেক দিন থাক্যা (থেকে) ভরন হয়। হামি জন্মের পর থাক্যা দেকিচ্চি (দেখছি)। আর চড়ক সব বছর হতো না। একন (এখন) দেকিচ্চি চেংরা পেংরারা (ছেলেপেলে) প্রতি বছর হাউস (শখ) কর্যা চড়ক করবার লাগিচে।'

একই গ্রামের অধিবাসী ভ্যানচালক সুদেক বলেন-'হামিও জন্মের পর থাক্যা দেকিচ্চি ভরন। কিন্তু হামি কোন দিন ভক্ত হই নি। খালি ছোট বেলা একবার ঘ্যাতা (ছোট ছেলেরা ভক্ত সেজে ঢাকের সাথে নাচে) ভক্ত হচ্নো (হইছিলাম)।' চড়ক পূজা বা ভরনে অংশগ্রহণকারীদের ভক্ত বা সন্ন্যাসী বলা হয়। ভক্তদের পরিচালনা করে সন্ন্যাসী। তিনিই মূলত এই ভরনের মূল পূজারী। এই চড়ক পূজায় পুরোহিতের

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয় না। ভরনের জন্য সাময়িকভাবে দীক্ষিত এইসব ভক্তরা এই কয়েকদিন কঠোর ব্রত ও সংযম পালন করে থাকে। এই কয়েকদিন তারা নিরামিষ আহার করে থাকে। ভরনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় মূলত শনিবার থেকে। মঙ্গলবারে হয় প্রধান ভরন। এরপর বুধবার বৃহস্পতিবারে হয় শশ্মান খেলা এবং শিব পূজা। আর শুক্রবারে হয় চড়ক। চড়কের আগের দিন বা সেই দিন পুকুর থেকে চড়ক গাছ তোলা হয়। পুকুর থেকে চড়ক গাছ তোলাকে বলা হয় চড়কগাছ 'জাগান'। পুকুর থেকে চড়ক গাছ তোলার সময় ভক্ত এবং সন্ন্যাসী উভয়ের প্রয়োজন হয়। এই গাছ তোলার সময় ঢাক বাজানো হয়। যে জায়গায় চড়ক গাছ পোঁতা হবে সেই জায়গায় আগেই গর্ত করা হয়। গর্তটা এমনভাবে করা হয় যাতে ঐ গর্তে একজন মানুষ ভালো ভাবে নামা যায়। গর্তটা একটা ছোট কূপের মতো করলেও তার ভিতর বা পাশে গর্তটা খালি করা হয়। কারণ চড়ক গাছ পোঁতার আগে সন্ন্যাসী ঐ গর্তের ভিতর নানা পূজার অর্ঘ্য সম্বলিত চালুন ফলমূল, কড়ি, তামার পয়সা ইত্যাদি সহযোগে নেমে নানা রকম ক্রিয়াদি করে উঠে আসে। এরপর সবাই মিলে চড়ক গাছ পোঁতে। চড়ক গাছ সাধারণত শাল ও কদম গাছেরই বেশি হয়। তবে কদম গাছ হলেই বেশি ভালো হয়। এই চড়ক গাছের শীর্ষে আর একটি কাঠের দণ্ড থাকে যার মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত। এটি এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে চড়ক গাছকে কেন্দ্র করে ঐ কাঠের দণ্ডটি শূন্যে বৃত্তাকারে আবর্তিত হতে পারে। এই কাঠের দণ্ডের এক পান্তে একটা মোটা রশি। যার প্রান্ত ভাগ একে বারে নিচের দিকে আর আরেক প্রান্তে থাকে তুলনামূলক ছোট রশি। এই ছোট রশির প্রান্তে চড়কা (যার পিঠে বর্শি ফুটিয়ে দেওয়া হয়) পিঠে বর্শি লাগিয়ে ঝুলে থাকেন। আর যে প্রান্তে বড় রশি লাগানো থাকে সেই প্রান্ত একেবারে চড়কের গাছের গোড়ার সাথে একটা বাঁশের সাথে এমনভাবে লাগানো হয় যাতে ৮-১০ জন লোক একসাথে এটি ঘোরানো যায়। চড়ক করার জন্য যার পিঠে বর্শি ফুটানো হয় তাকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। এজন্য তাকে দিন ৩-৪ হাজার টাকা দিতে হয়। চড়ক সাধারণত বিকেল বেলা বেশি হয়। মাটিহাঁস গ্রামে শুক্রবার বিকেলে চড়ক হয়ে থাকে। চড়কের আগে সন্ন্যাসী চড়কার পিঠে বর্শি ফুটিয়ে থাকে। এই সময় সন্ন্যাসী নানা রকম মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করে থাকে। তারপর পিঠে খুব জোরে জোরে থাবা (চাপড়) মারে। এরপর বর্শি ফুটানো হয়। চড়কা যখন চড়ক করতে উঠে তখন তার হাতে একটি বেত এবং গামছাতে কিছু ফলমূল, সন্দেশ, বাতাশা থাকে। চড়কা যখন চড়ক গাছে ঘুরতে থাকে তখন ঐ সব ফলমূল বাতাশা খেয়ে খেয়ে ফেলে দেয়। ঐসব ফল অনেক দর্শকরা বিশেষ করে মেয়েরা নিয়ে থাকে। বিশ্বাস আছে ঐ সব ফল খেলে বন্ধা নারীর সন্তান হয়, অনেকের অসুখ বিসুখ ভালো হয় ইত্যাদি। এই ভরন উপলক্ষ্যে মাটিহাঁস গ্রামে মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পযর্ন্ত অনেক বড়মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৪]

৫. রথযাত্রা

শেরপুরে জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে প্রতিবছর আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রথই শেরপুরের সবচেয়ে বড় রথ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দিরের পাশে শেরপুর ডিজে হাইস্কুল মাঠে বিরাট মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ মেলায় যোগ দেয়। রথের যে গাড়িটি বেড়োয় তাতে

www.pathagar.com

পুরোহিত বসে থাকেন। শতশত লোক রথের দড়ি ধরে টানতে থাকে। পুরোহিত তাদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। রথের দড়ি ও রথ স্পর্শ করা পুণ্যির কাজ বলেই হিন্দু সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করেন।

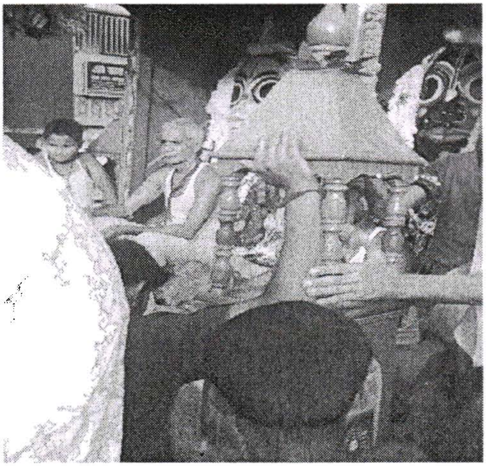

রথযাত্রা, শেরপুর

৬. ইছলে সওয়াব উৎসব

বগুড়া জেলায় প্রায় সর্বত্রই ইছল সওয়াব হতে দেখা যায়। তবে পূর্ব বগুড়ার তুলনায় পশ্চিম বগুড়ার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এই বাৎসরিক ইসলাম-ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ণ থেকে শুরু করে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে ধর্মীয় জলসার আয়োজন হলে সে উপলক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারেই আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা হয়। সভাস্থলের অদূরে সে কারণে একটি ছোটখাটো মেলাও বসে। এসব মেলায় বাচ্চাদের নানান খেলনা, নারীদের নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী এবং মিষ্টি বিক্রি হয় প্রচুর। প্রতিটি পরিবার সাধ্য অনুযায়ী কমপক্ষে ২০/২৫ কেজি থেকে এক/দেড় মণ পর্যন্ত মিষ্টি কিনে থাকে। এই ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বাৎসরিক মিলন ঘটে।

www.pathagar.com

লোকমেলা

বগুড়া জেলায় অসংখ্য লোকমেলা রয়েছে। নিচে এই মেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো–

জামুন্যা মেলা

শাজাহানপুর উপজেলায় অন্যান্য মেলাসমূহের মধ্যে জামুন্যার মেলা, বি-কুষ্টিয়ার বারুনি মেলা, নগর মেলা, ডেমাজানী মেলা উল্লেখযোগ্য। এসব মেলার মধ্যে জামুন্যা মেলাটি বিখ্যাত। এ মেলার সঙ্গে শেরপুরের বিখ্যাত কেল্লা পোষী মেলার একটি সম্পর্ক রয়েছে। জামুন্যা মেলাটি একদিনের। বৈশাখের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠের প্রথম রবিবার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার পরের রবিবার (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ২য় রবিবার) থেকে কেল্লা পোষী মেলা শুরু হয়।

জামুন্যা মেলাকে কেউ কেউ মাদারের মেলাও বলে থাকেন। জামুন্যা বাজারের প্রাচীন বটবৃক্ষে এ মেলা উপলক্ষ্যে মাদারের নিশান তোলা হয়। এখানে নিশান তোলার পর দিন থেকেই মাদার ভক্তরা মাদার বাঁশ নিয়ে ঢোল বাজনা সহযোগে গ্রামে গ্রামে মাদার বাঁশ নাচিয়ে বেড়ান এবং বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ ও খেলা প্রদর্শন করেন। এসবের মধ্যে লাঠিখেলা অন্যতম। সাতদিন গ্রামে গ্রামে বাঁশ নাচিয়ে এবং খেলা প্রদর্শন শেষে কেল্লা পোষী মেলার প্রথম দিন নাচানো বাঁশ কেল্লা পোষী মেলার মাদার থানের বটবৃক্ষে খাড়া করে রাখা হয়। আগে এ বাঁশে নিশান লাগিয়ে বটবৃক্ষের মাথায় সবচেয়ে উঁচুতে লাগানো হতো। আশেপাশে যত মাদার বাঁশ আছে সবগুলো কেল্লা পোষী মেলার প্রথমদিন মেলার মাদার থানে এসে জমা হয়। কেল্লা পোষী মেলায় যত মাদার বাঁশ আসে তার সবগুলোই জামুন্যা মেলার দিন থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। এ মেলায় নানা রকম মিষ্টি, কাঠের ও স্টিলের ফার্নিচার, নানা রকম খেলনা ছাড়াও নাগরদোলা, চড়কি, বায়োস্কোপ অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।[৫]

লক্ষ্মীকোলার ঘোড়দৌড় মেলা

বগুড়ার শাজাহানপুরের লক্ষ্মীকোলা গ্রামে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা। বিগত প্রায় দুই বছর যাবৎ আমন ধান কাটার পরে পরিত্যক্ত ধানক্ষেতে এ ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন স্থানীয় লোকজন। এতে ২০ সহস্রাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু দর্শকের সমাগম ঘটে। আধ্যাত্মিক সাধক মরহুম হযরত শাহ্ রওশন জালাল (রহঃ)'র মাজার উন্নয়নকল্পে প্রতিবছর পৌষ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা। এ উপলক্ষ্যে মাজারে বিশেষ জিয়ারতের আয়োজন করা হয়। এলাকায় শুরু হয় শীতের উৎসব, বসে মেলা। প্রতিটি বাড়ি ভরে ওঠে আত্মীয়-স্বজনে। শীতের পিঠার ধুম পড়ে।

www.pathagar.com

মেলায় মিষ্টান্ন, মাছ-মাংস, কাঠের আসবাবপত্র, লোহার সামগ্রী কেনা-কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা। ছোটদের খেলনার পোঁ-পোঁ শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে লক্ষীকোলা ও এর আশপাশের এলাকা।[৬]

ছাইহাটার পৌষমেলা

পৌষ মাসের শেষ বুধবার থেকে তিন দিনব্যাপী ছাইহাটা বাজারে প্রতিবছর পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা। ছাইহাটা বাজার ও কলেজ মাঠ সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা বসে ছাইহাটা বাজার স্কুল ও কলেজ মাঠ জুড়ে। মেলা উপলক্ষ্যে আশেপাশের গ্রামগুলোতে বিশেষ করে ছাইহাটা, সোনাতলা, ডোমকান্দি, ভেলাবাড়ির প্রায় প্রতিটি ঘরেই উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। এসব গ্রামের প্রায় সকল আত্মীয়, জামাই-ঝিকে মেলা উপলক্ষ্যে দাওয়াত করা হয়। মেলায় প্রধান পণ্য হলো কাঠ ও স্টিলের আসবাবপত্র। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, খেলনা, কসমেটিকস পণ্য এবং নানা ধরনের সাংসারিক জিনিসপত্র যেমন দা, বটি, খন্তা, হাড়ি-পাতিল, পোষাক ইত্যাদি সব ধরনের পণ্যই বিক্রি হয়।

ছাইহাটা গ্রামের বাসিন্দা এবং মেলা কমিটির সদস্য জনাব মুকুল (৩৮) জানান, 'মেলাটি খুব পুরনো নয়। এর বয়স বছর বিশেক হবে। আমাদের এলাকায় সবচেয়ে বড় মেলা হলো পোড়াদহ মেলা। কিন্তু মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাসের শেষ বুধবার। তখন আমাদের এলাকায় প্রায় সব জায়গায় ইরিধান লাগানো শুরু হয়ে যায়। অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তখন মেলায় যাওয়া হয়ে ওঠে না। পৌষ মাসের মাঝামাঝির মধ্যেই আমাদের এলাকায় প্রায় ঘরে ঘরে আমন ধান কাটা মাড়াই শেষ হয়ে যায়। লোকের হাতে টাকা পয়সা ও সময় দুটোই থাকে তাই এ সময়টিতেই এখানে তিন দিনব্যাপী মেলা জমে ওঠে।'

ছাইহাটার মেলার অন্যতম আকর্ষণ নারী-পুরুষ সকলেই এ মেলায় আসে পণ্য কিনতে এবং ঘৌড়দৌড় দেখতে।

হরিণার শ্রী পঞ্চমীর মেলা

সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হরিণায় শ্রী পঞ্চমীর তিথিতে একদিনের একটি মেলা হয়। মেলাটি একদিনের হলেও এখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এ মেলার প্রধান পণ্য হলো নান ধরনের মিষ্টি। বিশেষ করে শুকনা মিষ্টির জন্য বিখ্যাত এই মেলা। এছাড়া বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলনা এবং কসমেটিকস সমগ্রী এ মেলার প্রধান আকর্ষণ। এ মেলার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এ মেলায় আসে।

কাহালুর নিশানের মেলা

বগুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম আরেকটি মেলা নিশানের মেলা। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রোববার কাহালু উপজেলার দাড়িয়াল গ্রামে এ মেলা

www.pathagar.com

বসে। এ মেলার প্রধান আকর্ষণ নিশান (পতাকা) খেলা। বর্তমানে এটি ঘুড়ি মেলা নামে পরিচিত। লক্ষ্যাধিক লোকের সমাগম হয় এ মেলায়। শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে শত গ্রামের মানুষের মিলন মেলা বসে। প্রায় ৪'শ বছর ধরে চলা এ মেলাকে ঘিরে গ্রামগুলোতে আত্মীয়-পরিজন ও নতুন জামাই, মেয়ে বউকে নিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মেলা উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ মেলার কেনাকাটা চলে। রান্না খাবারের আয়োজন ও অতিথি আপ্যায়ন চলে।

রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের বারপুর বাজার থেকে বগুড়া দিনাজপুর সড়ক ধরে সামনের দিকে প্রায় ১৮ কি.মি দূরে হাজরাদিঘি তিন মাথা বাজারের পাশে এ মেলার আয়োজন হয়। মেলায় নাগরদোলা, মটর সাইকেল খেলা, বাঁশ ও মাটির তৈজসপত্র বিক্রি, হাতপাখা ও দা-বটি, চুড়ি, ফিতা থেকে শুরু কার, টমটম, মিষ্টি, জিলাপি, দই-চিড়া, মুড়ি-মুড়কি, কাঠের আসবাবসহ নানা দ্রব্যসামগ্রীর মেলা বসে।

নিশানের মেলা, কাহালু

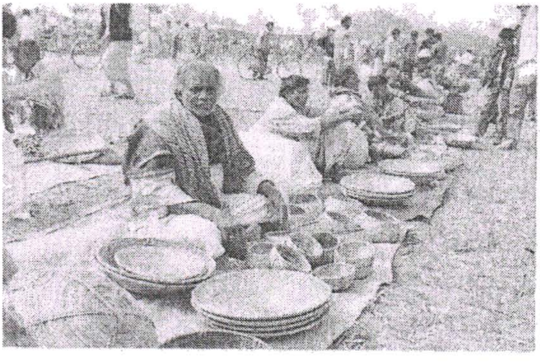

নিশানের মেলা, কাহালু

www.pathagar.com

কাহালু কুরাহাট থেকে ঘুড়ি কিনতে এসেছে শাহ আলম (৮)। বলেন, বাবার সাথে মেলাতে আসচি। ৩০ টাকার ঘুড়ি কিনেছি।

বগুড়া সদরের পল্লী মঙ্গল হাই স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী সুমি বলেন, প্রতিবছর মেলাতে আসি। গ্রামীণ ঐতিহ্য তো হারিয়ে যাচ্ছে। এখানে এসে ভাল লাগে।

সরলপুর গ্রামের বৃদ্ধ লাল মিয়া বলেন, ৪শ বছর ধরে এ মেলা হচ্ছে। আমরা বাবা-দাদার মুখে এ মেলা নাম শুনেছি। আগে শুধু নিশানের প্রতিযোগিতা হতো। এখন নিশান নেই। আছে নানা রঙের ঘুড়ি।

নিশান মেলা উল্লেখযোগ্য মেলা। চার'শ বছর ধরে চলতে থাকা এ মেলায় এক সময় লাঠির আগা বা মাথায় চমর (চুল) বেঁধে নিশানা উড়ানো হতো। এ উপলক্ষে চলতো লাঠিয়ালদের প্রতিযোগিতা। গ্রাম থেকে গ্রামে ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়া হতো মেলায় অংশগ্রহনের জন্য। লাঠি খেলা দেখতে ভিড় করত এখন গ্রামের মানুষ এখনো নিশানের মেলা ঘুড়ি মেলায় রূপান্তরিত হওয়ায় এবং হারিয়ে যাচ্ছে এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ লাঠিখেলা।

গাবতলীর পোড়াদহ মেলা

বগুড়া তথা পূর্ব বগুড়ার অন্যতম বৃহত্তম মেলা পোড়াদহ মেলা। একদিনের মেলা এটি। শুধু বগুড়ার কেনো উত্তরবঙ্গের আর কোথাও এক দিনের এতো বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয় না। পূর্ব বগুড়া বিশেষ করে মেলার আশেপাশের অঞ্চল সমূহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিকটি এই মেলার সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। কত লোক হয় এ মেলায়? কেউ বলেন দু'লাখ, কেউ বলেন তিন লাখ, কেউ বা বলেন চার/পাঁচ লাখ। প্রায় দেড় বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যে মেলা বসে সে মেলায় চার/পাঁচ লাখ লোক হওয়াই স্বাভাবিক। বগুড়া জেলার গাবতলী থানা। গ্রামের নাম মহিষাবান। গ্রামের নাম মহিষাবান হলেও মেলা স্থল মহিষাবান মৌজা নামে পরিচিত।

পোড়াদহ মেলার পাশে অবস্থিত বটগাছের নিচে প্রার্থণারত বিভিন্ন স্তরের নারী-পুরুষ। এ মেলাকে অনেকেই সন্ন্যাসী মেলা বলে।

www.pathagar.com

পোড়াদহ মেলার একাংশ, গাবতলী

পোড়াদহ মেলার ঐতিহ্যবাহী বাঘাড় মাছ। দুর্লভ ও সুস্বাদু এ মাছটির দাম তাই বেশি। ২০১২ সালে ৬২ কেজি ওজনের বাঘাড় মাছ বিক্রি হয়েছিল ৬২০০০ হাজার টাকায়।

www.pathagar.com

পোড়াদহ মেলায় বিক্রির জন্য কাঠের আসবাবপত্র

বগুড়া শহরের করতোয়া নদীর ওপর ফতেহ আলী ব্রীজ পার হয়ে সোজা পূর্ব দিকে বগুড়া-চন্দনবাইশা পাকা সড়কের ১২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করার পর পাওয়া যায় মেলার স্থল। গাবতলী থেকে আসা যায় মেলায়। গাবতলি বাগবাড়ি পাকা সড়কে দক্ষিণে ৭ কিলোমিটার দূরত্বে বগুড়া-চন্দনবাইশা সড়ক ক্রস করেছে পাঁচ মাইল নামক স্থানে। পাঁচ মাইল থেকে ৩ কিলোমিটার পুবে গোলাবাড়ি। গোলাবাড়ি ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে হাট,বাজার, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, পশু হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রয়েছে গোলাবাড়িসহ আশেপাশের গ্রামগুলোতে পল্লী বিদ্যুৎ। রাস্তা ঘাট পাকা হওয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে হয়েছে আমূল পরিবর্তন। গোলাবাড়ি পার হয়ে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে বগুড়া-চন্দনবাইশা সড়ক ভেদ করে উত্তর থেকে দক্ষিনমুখী ছোট একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীর নাম সুখদহ। কেউ কেউ অবশ্য গাড়িদহও বলেন। নদীর ওপর নির্মিত হয়েছে এক বেইলি ব্রীজ। ব্রীজের পশ্চিম পাশে রাস্তার ওপর ছিল বিশাল দুটি বটবৃক্ষ। বছর কয়েক আগে গাছ দু'টি কেটে ফেলা হয়েছে। চারদিকে ধুধু প্রান্তর। এই জায়গাটিরই নাম পোড়াদহ। এক সময় এখানে নদীর ধারে মড়া পোড়ানো হত এবং জায়গাটি ছিল অনেক গভীর। তাই নাম হয়েছে পোড়াদহ।

নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় মরিচ এবং সরিষার খেত। দক্ষিণ পাশের জমিগুলো খালি পড়ে আছে। সেখানেই বসেছে মেলা। মেলার উত্তর পাশে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নিচু জমি। অনেকটা শুকনো বিলের মত। বর্ষার সময় পানিতে ডুবে থাকে প্রায় দেড় দু'মাস।

প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষ বুধবার মেলা বসে এখানে। লোকে বলে 'পোড়াদহ মেলা'। খোঁজ নিয়ে জানা গেল 'পোড়াদহ' নয় এর আসল নাম 'সন্ন্যাসীর' মেলা।

www.pathagar.com

মেলার আগের দিন সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো হয়, এবং পুজো উপলক্ষ্যে পরের দিন বুধবার মেলা বসে। হিন্দু, মুসলমান সব ধর্মের লোকই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে মানস করে। মানস করে তারা নানা ভোগ দিতে আসে ঠাকুরকে। মঙ্গলবার দিন পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ভোগ দেয়া হয় ঠাকুরকে। এদিন সাধারণত হিন্দুরাই আসেন ভোগ দিতে। মুসলমানরা আসে মেলার দিন। হিন্দুরা সাধারণত কবুতর, মিষ্টি, কলা, দুধ, ক্ষির ইত্যাদি ভোগ দেন। মুসলমানরা দেন কবুতর, চিনি, সন্দেশ, বাতাসা ইত্যাদি। ঠাকুর সে ভোগে তৃপ্ত হয়ে মানতকারীর আশা পূরণ করে। কেউ বিফল হয় না।

কীভাবে এই পুজো এবং মেলার সৃষ্টি সন্ন্যাসীর পূজার সেবাইত ও সেক্রেটারি সত্তরোর্দ্ধ শ্রী গণেশ চন্দ্র পাল-এর পুত্র অধ্যাপক ননী গোপাল পাল মেলা প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসী ঠাকুরের থানে বসে সে সম্পর্কে জানালেন :

> আনুমানিক দুইশত বা আড়াই শত বছর পূর্বে স্থানী গাড়ীদহ নদীতে রাতে কয়েক জন মৎস্যজীবী নদীতে মাছ ধরার সময় হঠাৎ তাদের জাল নদীতে আটকে যায়। পরের দিন পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও তারা জাল তুলতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় তারা হাল ছেড়ে দিয়ে যখন নদীর পাড়েই রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন এক জেলে স্বপ্নে দেখতে পান, নদীর ভেতর থেকে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর উঠে এসে তাকে বলছে 'সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো করলেই তাদের জাল উদ্ধার হবে'। ঘুম ভেঙ্গে গেলে অন্য জেলেদের একথা বলার পর স্থানীয় পালদের সাহায্যে এখানে তারা সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুজো করে। এরপর তাদের জাল উদ্ধার হয়। এই পুজোর দিনটি ছিল মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার। জাল উদ্ধারের কথা খুব দ্রুত চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে অনুযায়ী অনেকেই এখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মানস করে এবং পুজো দিতে আসে। এই পুজো উপলক্ষ্যেই পরদিন বুধবার মেলা বসে।

মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে উপস্থিত আরেকজন বলেন :

মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার বিকেলে নদী থেকে এক সন্ন্যাসী উঠে এসে এখানকার বটবৃক্ষের নিচে সারারাত এবং বুধবার সারাদিন তার আসনে বসে থাকতেন এবং সন্ধ্যায় নদীতে নেমে যেতেন।[৬]

তার উদ্দেশ্যে লোকজন অনেক মানত নিয়ে আসত। সেই থেকে মেলার সৃষ্টি।

এই মেলার উৎপত্তি সংক্রান্ত আরেকটি মত হলো :

বাংলার ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ভবানীপাঠক এই মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীপাঠকের আস্তানা ছিল এখানে। তিনি তার সন্ন্যাসীদের নিয়ে এখানে একটি মেলা প্রতিষ্ঠা করেন।[৭]

বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কথা সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও তার বিখ্যাত উপন্যাস 'খোয়াবনামা'য় ভবানীপাঠকই এই মেলার প্রতিষ্ঠাতা বলে তথ্য দিয়েছেন।

আরও জনশ্রুতি রয়েছে যে, প্রায় দেড়শ বছর আগে বগুড়ার গাবতলী উপজেলার মহিষাবান ইউনিয়নে ইছামতি নদীর শাখা (খাল) সংলগ্ন পোড়াদহ স্থানে বটগাছের

www.pathagar.com

নিচে সন্ন্যাসী মেলার আয়োজন করতো সনাতন হিন্দু ধর্মালম্বীরা। একসময় এ অঞ্চলে পোড়াদহ মেলা মাছের মেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইছামতি খালের পশ্চিম পাশে ধূ ধূ মাঠের মধ্যে মানুষের সমাবেশ হয়। মহিষাবান পোড়াদহ মেলার সন্ন্যাসী পূজা কমিটির সভাপতি শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদারের ভাষ্যমতে, 'সর্ম্পূণ ব্যক্তি মালিকানার জমিতে এ পোড়াদহ মেলা হয়।' আগ্রহী লোকবল দিয়ে মেলা পরিচালনা করা হয়। মেলা পরিচালনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি আজিজার রহমানের মতে, 'এ মেলায় যে লোকসমাগম হয় তা দেশের আর কোন স্থানে হয় না। মেলায় আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে আনন্দ করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।'

মেলায় সাধারণত যেসব পণ্য ওঠে তার অন্যতম হলো মাছ এবং কাঠ। সে কারণে অনেকেই এ মেলাকে মাছ এবং কাঠের মেলা বলে থাকে। মেলায় দেড় থেকে দু'মণ ওজনের বাঘার মাছসহ রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল প্রভৃতি বড় বড় মাছের আমদানি হয়ে থাকে। বরিশাল এবং চট্টগ্রাম থেকেও মাছ আসে। তবে যমুনার বাঘার মাছ এখানকার প্রধান আকর্ষণ। মেলায় আগত প্রায় সকলেই মাছ এবং মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরে। এ বছর আমরা মেলায় ৬৫কেজি ওজনের একটি যমুনার বাঘার মাছ দেখতে পাই। এছাড়াও পাঁচ কেজি ওজনের মৎস্য মিষ্টি এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। মেলায় যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা, বিভিন্ন রকম খেলনা এবং হরেক পণ্যের আমদানি হয়। এক সময় নাকি এ মেলায় ঘোড়াও বিক্রি হতো।

এছাড়াও অত্র এলাকার বিশেষ করে গাবতলী, ধুনট, সারিয়াকান্দি, শাজাহানপুর, বগুড়া সদর, সোনাতলা প্রভৃতি উপজেলার প্রায় অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এ মেলা থেকেই সংগ্রহ করেন। তাই এই এলাকার মানুষ জনের কাছে পোড়াদহ মেলা অন্যরকম গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে মেলার আশেপাশে গ্রামগুলোতে এসময় উৎসব নেমে আসে। জামাই, ঝি, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই মেলা উপলক্ষ্যে দাওয়াত করা হয়। এ এলাকায় ঈদ বা পূজায় জামাই, ঝিকে দাওয়াত না করলেও মেলায় ঠিকই করতে হয়।[৮]

মহিষাবানের বউমেলা

বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার একটি গ্রাম মহিষাবান। সাতাশ পাড়ার এই গ্রামে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বউমেলা। 'বউ' শব্দটির মধ্যেই এ মেলার মূল আকর্ষণ বা তাৎপর্যটি নিহিত। 'বউ'রা অর্থাৎ নারীরাই এ মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তারাই ক্রেতা এবং বিক্রেতা।

স্থানীয় পোড়াদহ মেলার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় মহিষাবানের বউমেলা। এই বউমেলার সঙ্গে রয়েছে পোড়াদহ মেলার এক অবিচ্ছেদ্য সংশ্লিষ্টতা। মূলত পোড়াদহ মেলাকে কেন্দ্র করেই মহিষাবানের বউমেলার উৎপত্তি। বগুড়া জেলার একদিনের সর্ববৃহৎ মেলা পোড়াদহ মেলা।

www.pathagar.com

মহিষাবানের বউমেলা, গাবতলী।

মেলায় মেয়েদের হাতে চুড়ি পরিয়ে দিচ্ছেন চুড়ি বিক্রেতা

www.pathagar.com

পোড়াদহ মেলা অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাসের শেষ বুধবার অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার। পূর্ববগুড়ার জনগণের মাঝে পোড়াদহ মেলা এক সর্ববৃহৎ উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পোড়াদহ মেলার আশেপাশের গ্রামগুলোতে রয়েছে এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এখানকার প্রতিটি বাড়িতেই পোড়াদহ মেলাকে কেন্দ্র করে কাছের দূরের সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী, জামাই-ঝি কে নেমন্তন করা হয়। পোড়াদহ মেলার স্থান মহিষাবান গ্রামের প্রান্তসীমায় বলে এই গ্রামবাসীদের কাছে পোড়াদহ মেলার আবেদন আরও বেশি। তাই মহিষাবান গ্রামসহ আশেপাশের প্রতিটি গ্রামেই হাজার হাজার নারী পুরুষের সমাগম ঘটে। পুরুষেরা যায় মেলা করতে, নারীরা যেতে পারে না সেখানে, কিংবা সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় সেটি পুরুষদের মেলা বলে। অথচ তারাও এসেছে মেলার আনন্দ উপভোগ করতে। পুরুষেরা মেলা করতে পারবে অথচ আমরা পারবো না কেন? এই অভাববোধ থেকেই মহিষাবান গ্রামের পালপাড়ায় পাল নারীরা প্রথম বউমেলার আয়োজন করে পোড়াদহ মেলার পরদিন। অতিথি নারীরা এতে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। সেই থেকে স্থানীয় এবং অতিথি নারীদের সমন্বয়ে মহিষাবানের বউমেলার যাত্রা শুরু। যেহেতু পোড়াদহ মেলার দিন সমস্ত দোকানদার এবং সবাই এই মেলা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, সেহেতু তারা (পাল নারীরা) পরের দিন বৃহস্পতিবার বউমেলার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেভাবেই প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এই 'বউমেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ঠিক কখন থেকে কিংবা কোন তারিখ থেকে এ বউমেলা শুরু হয় তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেন না। কেউ বলেন পোড়াদহ মেলার প্রায় সমান বয়স এ মেলার। কেউ বলেন একশ বছর। ১৯৯৬ সালে নিশিকান্ত পাল (৯২) আমাকে জানিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি এ মেলা দেখে আসছেন। ১৯৯৭ সালে তিনি মারা গেছেন। এবার মেলায় এসে ইতিহাস বিকৃতির তথ্য মিললো, অনেকেই বলছেন মেলার বয়স বাইশ বছর। আসলে হবে বর্তমান স্থলে বাইশ বছর। কিন্তু বর্তমান স্থল বা স্থান শব্দটি ব্যবহার না করে মেলা কমিটির দু'একজন তরুণ সদস্য প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে মেলার বিশ-বাইশের বছরেরই তথ্য দিচ্ছেন। চেয়ারম্যান সাহেবকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, "ওরা না জেনেই অমনটি বলছে"।

পাল নারীদের দ্বারা উৎপত্তি ও বিকশিত হয়ে দীর্ঘদিন পালদের জায়গাতেই (পালপাড়ায়) বউমেলার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে লোক সমাগম বেশি হওয়ায় এবং পালদের জায়গার অভাব দেখা দেয়ায় মেলার স্থান পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে মেলার নির্দিষ্ট স্থানের অভাব দেখা দেয়ায় একেকবার একেক জায়গায়, যখন যেখানে ফাঁকা জমি বা মাঠ পাওয়া যায় সেখানেই মেলা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৯০ সাল থেকে মহিষাবান গ্রামের মধ্যপাড়ায় গোলাবাড়ি সড়ক সংলগ্ন বর্তমান স্থানে নিয়মিতভাবে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বগুড়া শহরের চেলোপাড়া (গোলাবাড়ি রোড) থেকে সোজা পূর্ব দিকে গোলাবাড়ি বাজার পর্যন্ত ১২ কি. মি। গোলাবাড়ি থেকে দক্ষিণে মহিষাবান মধ্যপাড়া দেড় কি.মি.। বগুড়া শহরের বনানী থেকেও সোজা মহিষাবান গ্রামে আসা যায়। দু'দিক দিয়েই পাকা রাস্তা। অন্যান্য সময় বাস না চললেও পোড়াদহ মেলার সময় চেলোপাড়া থেকে বাস চলে। তবে সারা বছরই দু'পথে সিএনজি চালিত অটোরিকসা চলে। ভাড়া বিশ টাকা।

www.pathagar.com

এ মেলার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় :

* এ মেলায় শুধু মেয়েরা আসে এবং মেয়েরাই কেনাবেচা করে।
* কোনো পুরুষ মেলায় প্রবেশ করতে পারে না।
* সব বয়সের নারীরাই মেলায় আসে।
* ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো বাধা নেই।
* নারী অধিকারের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত এ মেলা।

শুরুতে এ মেলায় শুধুমাত্র 'বউ'রাই (বিবাহিত নারী) আসতে পারতো। অবিবাহিতা নারীরা মেলায় আসতে পারতো না। এ কারণেই মেলার নামটি হয়েছে বউমেলা। অবিবাহিতা নারীদের মেলায় আসার বিষয়টি তখন সমাজ স্বীকৃত ছিল না। বর্তমানে বিবাহিতা/অবিবাহিতা সবাই আসে। কোনো বিধি নিষেধ নেই।

মেলার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে পুরুষেরা। তবে এবার বেশ কিছু মহিলা আনসারও দেখা গেল। সূর্য ওঠার পর পরই সব বয়সের মেয়েরা মেলায় আসতে থাকে। বউ-ঝি'রা আসে একটু বেলা হলে সংসারে কাজ কর্ম সেরে। আসে স্থানীয় এবং অতিথি সবাই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা মেলা চলে।

খাউড়ার মেলা

পোড়াদহ মেলার এক সপ্তাহ পর গাবতলী উপজেলার খাউড়া নামক স্থানে দিনব্যাপী এ মেলা হয়। নানা পণ্যসামগ্রীর সমাহার নিয়ে এ মেলা বসে। গ্রামীণ জীবনযাত্রায় এ মেলায় লোক সমাগম হয়। তবে তা পোড়াদহ ও বউমেলার জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যায় নি।

ইছামতির তীরে বউমেলা

ধুনট পৌরসভার একটি গ্রাম সরকারপাড়া। শতভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস। গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে বহমান ইছামতি নদী। সবুজ ঘেরা ছায়া সুনিবিড় শান্তির গ্রামটিতে প্রতি বছর দূর্গা পূজা উপলক্ষ্যে দশমীর দিনে ইছামতির তীরে বউমেলা বসে। মেলার প্রধান দর্শক ও ক্রেতা হিন্দু মহিলারা। হিন্দু মহিলাদের পাশাপাশি মুসলমান নারী এবং সব ধর্মের শিশু ও কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সবাই এ মেলায় আসে। ধুনট সদর থেকে পূর্ব দিকে মেলার দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার। ওই রাস্তার প্রায় এক কিলোমিটার জুড়ে উপচে পড়া মানুষের ভীড়, রিকশা, ভ্যান আর মোটর সাইকেলের দীর্ঘ সারি। মানুষের ভীড়ে থেমে যায় যানবাহনের চাকা। ঠেলাঠেলি করে পথ পাড়ি দিতে হয় মেলায় আগত লোকজনকে। গ্রামীণ সড়ক জুড়ে মানুষের কোলাহল। শিশুর হাতে মেলার বাঁশি। হাওয়ায় ভাসা রঙ্গিন বেলুন। নব সাজে বধূ'র ঘোমটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সিঁথির সিঁদুর।

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গা পূজাকে ঘিরে সরকারপাড়া হয়ে ওঠে এক উৎসবমুখর গ্রাম। মেলায় হিন্দু ধর্মালম্বী লোকজনের পাশাপাশি অন্য ধর্মের মানুষেরও কোন কমতি নেই। মুহুর্মুহু উলুধ্বনি, শাঁখের

www.pathagar.com

আওয়াজ, ঢাক-কাঁসের তালে আরতির নাচ, ধুপের সুরভিত ধোঁয়া, বাতাসে নাড়ু-সন্দেশ-মিষ্টির গন্ধ, সাউণ্ড বক্সের হাই ভলিউমে মেলায় উৎসবের আমেজ। সব অপশক্তি বিনাশ করে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় দেবী দূর্গা মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে মেলার আয়োজন। ইছামতির জলে প্রতিমা বিসর্জনের বিষাদের সুরকে শত শত নারী মুছে দেয় নানা রঙ্গের শাড়ীর আঁচলে।

অর্ধদিবস এ মেলার সময়কাল। বিজয়াদশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের বিষাদের সুরের মূর্ছনার মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি হয়। সরকারপাড়ার মেলা না দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে গ্রামীণ মেলা শুধু নারীকেন্দ্রিক হতে পারে। এ মেলা যেন অপরূপ নারীর প্রতিচ্ছবি। ললাটে চন্দনের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, লাল বেনারশি পরে গ্রামের বধূ যেন নবরূপ ধারণ করেছে মেলার আনন্দে। পূজা কমিটির সহসভাপতি উজ্জল দাস, সহসাধারণ সম্পাদক আনন্দ সরকার, সহকোষাধ্যক্ষ সুজন সরকার, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক বিজয় সরকার, নিলয় সরকার বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে মেলা বেশি জমেছে। কারণ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো ও আবহাওয়াও অনুকূলে। মেলায় বসে বারোয়ারি দোকান। খই, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, জিলাপি মিষ্টিসহ অনেক খাবারের দোকান। আছে বাঁশি, বেলুন, ঝুনুঝুনিসহ হরেক রকম শিশুতোষ খেলনার আয়োজন। মেলা উপলক্ষ্যে দই, শিরনি, পায়েস, নারিকেলের নাড়ু আর খৈয়ের ম-ম গন্ধে আমোদিত মেলার আশেপাশের বাড়িগুলো। মেঠোপথে গ্রামের কিশোর কিশোরিরা বাঁশের বাঁশিতে পোঁ পোঁ সুর তুলেছে গাল ফুলিয়ে। মহিলারা মেলা থেকে চুড়ি, দুল, ফিতা, টিপসহ রকমারি প্রসাধনী কিনে নিয়ে যাচ্ছে মনের আনন্দে। বউমেলার এ অপূর্ব দৃশ্য সত্যিই ভোলার নয়। প্রতিমা বিসর্জনকে ঘিরে একটি দিনে হাজারো মানুষের পদভারে মুখরিত হয়েছিল সরকারপাড়া গ্রাম।

সরকারপাড়ার এই মেলাটি বউমেলা নামে পরিচিত হলেও এটি বগুড়ার জেলার গাবতলী উপজেলার মহিষাবানের বউমেলার মত নয়। মহিষাবানের বউমেলাটি শুধুমাত্র মহিলাদের মেলা। কিন্তু সরকারপাড়ার বউমেলা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মেলা।

মহাস্থানের চৈত্র সংক্রান্তির মেলা

বারুণি স্নান উপলক্ষ্যে চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাস্থানে তিনদিনের একটি বিরাট মেলা বসে। চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু বৈশাখের তারিখে শেষ। করতোয়ায় এ সময় যদিও তেমন কোনো পানি থাকে না। তবুও মেলা বসে করতোয়া তীরেই। নদীতে গর্ত খুঁড়ে ঘটি দিয়ে পানি তুলে হিন্দু পুণ্যার্থীরা তাদের স্নান সারেন। আগে নাকি এ মেলা একমাস থাকতো। এমন তথ্যই দিলেন মেলায় আগত এক প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি এসেছেন সিরাজগঞ্জের তাড়াশ থেকে। প্রতিবছরই আসেন। প্রথম এসেছিলেন তার বয়স যখন আট বছর তখন পিতার সঙ্গে। এখন প্রায় সত্তর পেরিয়েছে তবুও আসেন। এখানকার বারুণি স্নানে সব পাপ ধুয়ে যায় বলে ছুটে আসেন। তাই একা আসেন নি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন। এ রকম হাজারো পুণ্যার্থীর আগমনে মুখরিত করতোয়া তীর। অনেক পুণ্যার্থীরা নিজেরাই কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে নদীতে জলাধার সৃষ্টি করছেন। তারপর সেখানে অবগাহন না হলে ঘটি দিয়ে জল তুলে মাথায় ঢালছেন। যদিও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আছেন দেখা গেল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য।

www.pathagar.com

রাস্তার পাশ দিয়ে মহাস্থান কলেজ মাঠ ঘিরে বসেছে মেলা। মেলায় হরেক পণ্য। তবে মসলাই বেশি। পেঁয়াজ, আদা, রসুন, তেজপাতা, কালোজিরা, কালো এলাচ, সাদা এলাচ, দারুচিনি প্রায় প্রতিটি দোকানে। মিষ্টির দোকানগুলোতে উপচেপড়া ভিড়। গুড়ের জিলাপি, চিনির জিলাপি, কদমা, বাতাসা, রসগোল্লায় ঠাসা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাবার সঙ্গে খেলনা কেনা নিয়ে ব্যস্ত। প্রধান খেলনা ঘুড়ি। নানান আকারের ও রঙের ঘুড়ি লাল, নীল, সাদা, হলুদ কোনোটা বা একটার মাঝেই তিন চার রং। অনেক ঘুড়ি আকাশে উড়ছে। বাচ্চারা তাই দেখে নিজেরটা নিয়ে ছুটছে। মেলার শেষদিন অপরাহ্নে দেখা গেল পুণ্যার্থীরা বাড়ি ফেরার সময় মিষ্টি মন্ডা, মিঠাই, অথবা বাচ্চাদের জন্য খেলনা, কাগজের ঘুড়নি অথবা ঘুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছে কেউ বাসে চড়ে, কেউ বা বাসের ছাদে এবং কেউ বা ভটভটিতে।

মহাস্থানের সন্ন্যাসীর মেলা

বৈশাখের শেষ বৃহস্পতিবার মহাস্থান মাযারকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে শত শত বাউল-সন্ন্যাসী আশেকানরা আসে মেলায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। তাই এ মেলাকে কেউ বলে বাউল মেলা, কেউ বলে সন্ন্যাসীর মেলা, কেউ বা বলে গাজার মেলা। মেলায় এক রাতে শত শত মণ গাজা বিক্রি হয় বলে এমন নাম। মেলার প্রধান পণ্য গাজা। প্রকাশ্যেই বিক্রি হয় গাজা প্রশাসনের সামনেই। এদিন নাকি গাজা সেবিদের ঈদের দিন। প্রশাসনের বিধি-নিষেধ থাকলেও তা কেউ মানে না 'বলে আজকের দিন হলো গাজায় দমের দিন। গাজায় দম না দিলে কী দমের সন্ধান মেলে? দমে দমে হরদম।' তাই বোধ হয় ভোর হওয়ার আগেই কয়েক ট্রাক গাজার একটিও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। চার-পাঁচজন থেকে ছয়-সাত জন, আট-দশ জন কোথাও বা বিশ থেকে পঁচিশ জনের দল গোল হয়ে খঞ্জনি, ডুগি বা একতারা নিয়ে বাউল গানের আসর বসিয়েছে। এ রকম আসরের সংখ্যা কত? কয়েক শত নয় কয়েক হাজার পেরিয়ে যাবে। প্রতিটি আসরেই গানের সঙ্গে মহিষের শিংয়ের মতো কলকিতে চলছে গাজায় দম। জটাধারি দাড়ি গোঁফে অনেকের চেহারাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রতিটি দলে দু'একজন, কোথাও তিন থেকে চারজন জটাধারি অথবা একাধিক মহিলা বাউল আছেই। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মেলায় আসা শত শত তরুণ-যুবা দর্শক। এরাই হই হই রৈ রৈ এবং নাচানাচি করছে বেশি। অনেক সন্ন্যাসীকে দেখা গেল খালি গায়ে লোহার বালা হাতে বিচিত্র রকমের লাঠি নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মেলায় গাজা ছাড়াও অন্যান্য যে সব পণ্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয় এরমধ্যে মহাস্থানের কটকটি, শুকনা মিষ্টি, গুড়ের জিলাপি, চিনির জিলাপি, কদমা, বাতাসা, খাজা, মুড়ি-মুড়কি ইত্যাদি।

মাযারের বাইরে ঘুপচি ঘাপচিতে চলছে জুয়া খেলা। কোথাও কোথাও ঘরের মধ্যে। মাযারের পশ্চিমে দিনের বেলায় যে সব ঘর রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয় সে সব ঘরের অনেকটাতেই দেখা গেল আপত্তিকর কিছু। এমনিতেই আমি ঘুম কাতুরে মানুষ। সারারাত জেগে থাকায় ভোরবেলার দিকে গাজার ধোঁয়ায় আমার বমি আসতে লাগলো। ফজরের আযানের সময় দেখা গেল অনেকেই মেলা স্থল ত্যাগ করছেন। ভোর হতে হতে দেখা গেল দু'তিন লাখ লোকের মেলা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। টলমল শরীর নিয়ে আমি বাসায় ফিরে আসলাম।

www.pathagar.com

মহাস্থানগড়ে সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীদের মেলায় গান পরিবেশন করা হয়

শেরপুরের কেল্লা-পোষী মেলা

বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন কুসুমদি ইউনিয়নের কেল্লা-পোষী নামক দুটি গ্রামের মিলন স্থলে গাজী পীরের থান মতান্তরে মাদারপীরের থান কেন্দ্র করে এ মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। স্থানীয় নামানুসারেই এ মেলার নামকরণ হয়েছে কেল্লা-পোষী মেলা। বৈশাখের শেষ রবিবার থেকে এ মেলার লগ্ন শুরু হয় তবে মেলার সমাগম ঘটে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় রবিবার থেকে আর এ মেলা চলে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত। স্থানীয় গ্রামবাসীর কাছে এ মেলা জামাই মেলা নামেও পরিচিত।

এ মেলার প্রধান পণ্য মাছ ও কাঠ। শেরপুরের আশেপাশে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মেলা উপলক্ষ্যে নতুন পুরাতন সবধরনের জামাইকে দাওয়াত করা হয়। জামাইরা বউ বাচ্চাসহ শ্বশুর বাড়ি আসে। শ্বশুর-শাশুড়ি জামাইয়ের হাতে টাকা দেন। জামাই মেলা থেকে বড় মাছ ও মিষ্টি কিনে শ্বশুর বাড়ি আসে। অবশ্য জামাইকেও খরচ করতে হয়। শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা সবার জন্য জামাইকে খরচ করতে হয়। কে কতো খরচ করতে পারে শ্বশুর-জামাইয়ে চলে তার প্রতিযোগিতা।

এ মেলার উদ্ভব এবং নামকরণ নিয়ে লোকমুখে প্রচলিত আছে নানান গল্প। প্রধানত গাজী পীরের মাহাত্ম্য জনসম্মুখে উপস্থাপনের নিমিত্তে এ মেলার আয়োজন।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. মো : নুরুল ইসলাম, পিতা : মৃত. নজিব উল্লাহ মন্ডল, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ রহিমাবাদ দক্ষিনপাড়া, ডাকঘর : ডেমাজানী, ইউনিয়ন : আড়িয়া, উপজেলা : শাজাহানপুর, পেশা : শিক্ষকতা, পদবী : প্রভাষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম.এ, বয়সঃ ৪৮, তাং ১৩/০৫/১১ ইং

২. শ্রী মন্মত চন্দ্র বর্মন, পিতা : শ্রী সুধীর চন্দ্র বর্মন, বয়স : ২৪ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষা : অনার্স, গ্রাম : আড়াইল, পো : চাঁপাপুর, থানা : আদমদিঘি, সংগ্রহ : ২৯/০৮/১১

৩. মোঃ ইব্রাহিম, বয়স : ৩৫, গ্রাম : ছাইহাটা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া। শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর।

৪. শ্রী শৈলেন চন্দ্র বর্মন, পিতা : ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মন, বয়স : ৪৪, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : মাটিহাঁস, পো : কুমিড়া পুণ্ডিত পুকুর, ইউনিয়ন : ভাটরা। **সংগ্রহের তাং** : ১০/০৩/১২

৫. শ্রী সুদেব চন্দ্র বর্মন, পিতা : শ্রী বিস্ট চন্দ্র বর্মন, বয়স : ৪২, শিক্ষা : নিরক্ষর, পেশা : কৃষি, গ্রাম : মাটিহাঁস, পো : কুমিড়া পুণ্ডিত, ইউনিয়ন : ভাটরা। সংগ্রহের তাং : ১০/০৩/১২

৬. মোঃ মোখলেছুর রহমান (৫০), গ্রাম : জামুন্যা, শাজাহানপুর, বগুড়া। সংগ্রহ তাং ১৩/০৫/২০১১

৭. মোঃ জাকির হোসেন (৪০), গ্রাম : লক্ষীকোলা, শাজাহানপুর, সংগ্রহ তাং- ১৪/০৫/১১ইং, সময়- ২.০০।

৮. মোঃ আব্দুল বাছেদ (৫০), গ্রাম : মহিষাবান, গাবতলী, বগুড়া। পেশা : কৃষি।

৯. মোঃ সাহাব উদ্দিন (৬০), গ্রাম : গোলাবাড়ি গাবতলী, বগুড়া, পেশা : অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক।

১০. মোঃ মোতাহার হোসেন (৫০) চেয়ারম্যান-মহিষাবান ইউনিয়ন।

১১. মোঃ রফিকুল আলম (৫৫), ধুনট, বগুড়া। পেশা : সাংবাদিক।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. খৎনা (মুসলমানি)

সাধারণত মুলসমান ছেলেদের বয়স ৪/৫ হলে তাদের খৎনা বা মুসলমানি করানো হয়। এটি একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান। খৎনার দিন সংশ্লিষ্ট ছেলেকে সকাল বেলা গোসল করানো হয়। এরপর হুজুর এসে দোয়া-দরুদ পড়ে তাকে ফুঁ দেন। ঘরের মেঝে বা বারান্দায় একটি বড় পিঁড়িতে ছেলেকে বসিয়ে দেয়া হয়। এরপর ছেলের চাচা বা মামা সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একজন দু'হাত দিয়ে ছেলের চোখ ধরে আরেক জন পেছনে বসে দু'হাত পা শক্ত করে ধরে থাকে। আর মুহূর্তের মধ্যেই ওস্তাদ (বগুড়ার কোথাও কোথাও এদেরকে যেমন সারিয়াকান্দি, ধুনট, গাবতলী গুটকাও বলা হয়) তার ধারালো চাকু বা ছুরি দিয়ে লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলে। চামড়া কাটা হয়ে গেলে ছেলের কান্না শুরু হলে আত্মীয়-স্বজনরা সবাই তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। এরপর তাকে একটি বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয় এবং তাকে নানান খাবার দেয়া হয় যেমন চালভাজা, নারকেল ইত্যাদি। আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশির মধ্যে বিতরণ করা হয় পায়েস। ওস্তাদকে পাঁচশ থেকে এক হাজার টাকা, এছাড়াও লুঙ্গি বা গামছা দান করতে হয়। ওস্তাদ মাঝে মাঝে এসে ঘা দেখে যান এবং তেলপরা দেন। আজকাল অবশ্য খৎনার দিন থেকেই শিশুকে এন্টিবায়োটিক দেয়া হয়। কেউ কেউ ডাক্তারকে দিয়েও খৎনা করান। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনো ওস্তাদ বা গুটকার প্রচলনই বেশি।

২. চেহলাম (চল্লিশা)

বগুড়ায় চেহলাম কে চল্লিশা বলা হয়। কোনো মুসলমান মানুষ মারা গেলে ইসলামী বিধান মতে চল্লিশ দিনের মধ্যে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে চল্লিশা বলে। বগুড়ায় তিন ধরনের চল্লিশা হতে দেখা যায়। বড়, ছোট ও মাঝারি। বড় চল্লিশায় সাধারণত দশ-বারো হাজার হতে পনেরো বিশ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। মাঝারি চল্লিশা দুই', তিনজন হাজার থেকে আট-দশ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। দেড়-দুই হাজার লোকের নিচের লোক খাওয়ানোকে ছোট চল্লিশা বলা হয়। চল্লিশায় সাধারণত সকাল থেকে কোরান খতম চলে। এরপর মিলাদ শেষে দুপুরে জুম্মার নামাজের পর লোকজনকে খেতে দেয়া হয়। সাধারণত শুক্রবার দিনেই চল্লিশা করা হয়। চল্লিশার দিনে সাদা ভাতের সাথে গরুর মাংস, মাছ দিয়ে আলুঘাটি এবং পাতলা দই থাকে। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও ধুনট এলাকায় অবশ্য মাংস রান্না হয় পিটুলি দিয়ে। চালের আটা আলুর সঙ্গে মাংসের মধ্যে দিয়ে পিটুলি হয়। এটি খেতে খুব সুস্বাদু।

৩. গোছ আকা বা রাখা

আদমদিঘি উপজেলায় প্রচলিত লোকাচারের মধ্যে অন্যতম হলো গোছআকা বা রাখা। শ্রাবণ মাসে আমন ধান লাগানোর আগে প্রথম যেদিন ধানের বীজ জমিতে লাগানো

www.pathagar.com

হবে সেদিন জমির মালিক তার নিজের জমিতে কয়েকটি গোছ দিয়ে ধান লাগানো শুরু করে। এই সময় যার জমি তার পরিবারের যেকোন পুরুষ সদস্য জমিতে গোছ রাখতে পারে। গোছ রাখার জন্য একটি ছোট পাট গাছ এবং একটি কালো কচুর দরকার হয়। প্রথম যে গোছটা দেওয়া হয় তার সাথে পাট এবং কচু গাছ সহকারে জমির মাস্তানা (উত্তর-পূর্ব কোণে) কোণায় রোপন করা হয়। তারপর তার সাথে ৫টা কিংবা ৭টা গোছ দেওয়া হয়। এর সাথে জমির মাটিতে তেল সিঁদুরের তিনটা ফোঁটা দেওয়া হয়। ঐদিন গেরস্তের বাড়িতে নানা রকমের খাবারের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে কিছু খাবার বাধ্যতামূলক ভাবে খেতেই হবে যেমন পাটের শাক, ভুনা (চাল দ্বারা তৈরি এক প্রকার খাবার) ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এমন বাধ্যতামূলক না মানলেও সাধারণত পাটের শাক সব বাড়িতে দেখা যায়।

শ্রাবণ মাসে আমন ধান লাগানোর আগে প্রথম যেদিন ধানের বীজ জমিতে লাগানো হবে সেদিন জমির মালিক তার নিজের জমিতে কয়েকটি গোছ দিয়ে ধান লাগানো শুরু করে। এই সময় যার জমি তার পরিবারের যেকোন পুরুষ সদস্য জমিতে গোছ রাখতে পারে। গোছ রাখার জন্য একটি ছোট পাট গাছ এবং একটি কালো কচুর দরকার হয়। প্রথম যে গোছটা দেওয়া হয় তার সাথে পাট এবং কচু গাছ সহকারে জমির মাস্তানা (উত্তর-পূর্ব কোণে) কোণায় রোপন করা হয়। তারপর তার সাথে ৫টা কিংবা ৭টা গোছ দেওয়া হয়। এর সাথে জমির মাটিতে তেল সিঁদুরের তিনটা ফোঁটা দেওয়া হয়। ঐদিন গেরস্তের বাড়িতে নানা রকমের খাবারের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে কিছু খাবার বাধ্যতামূলক ভাবে খেতেই হবে যেমন পাটের শাক, ভুনা (চাল দ্বারা তৈরি এক প্রকার খাবার) ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে এমন বাধ্যবাধকতা না মানলেও সাধারণত পাটের শাক সব বাড়িতে দেখা যায়।

৪. গোয়াল পূজা

আষাঢ় মাসের ৭দিন গেলে আমুত (অম্বসূচি) লাগে। এই আমুত আড়াই দিন থাকে। এই আড়াই দিনের শেষ দিনেই গোয়াল পূজার আয়োজন করা হয়। গোয়াল পূজা আসলে গোরক্ষনাথ দেবতার উদ্দেশ্যে করা হয়। পূজার দিন সকালে মাটি দিয়ে গোয়ালের উত্তর দিকে বা মাস্তানা কোণায় (উত্তর-পূর্ব কোণে) গোরক্ষনাথের থান করা হয়। পূজার উপচার হিসেবে বাঁশের পাতা, কলমি শাকের আগা, ফুল, কলার পাতা, তুলসী পাতা, বেল পাতা, গাড়া ঘাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পরিবারের যে কোন সদস্য এই পূজা করতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরাই করে থাকে। পূজার নৈবেদ্য দেওয়া হয় আলো চাল, গুড় আর কলা দিয়ে। পূজার মন্ত্র হিসেবে গরু বাছুরের মঙ্গল কামনায় উচ্চারণ করা হয়। কেউ কেউ আবার গীতার দু একটি শ্লোক উচ্চারণ করে থাকে। পূজার দিনে কোন কোন বাড়িতে নিরামিষ খাবারের আয়োজন করা হয় এবং পায়েস রান্না করা হয়। ঐ দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি যেয়ে পূজার ফুলগুলো মাটিতে পুঁতে আর পায়েস খায়। পূজার ফুলগুলো গোয়ালের দুয়ারে পুঁতানো হয়। গর্ত করার জন্য কোদাল ব্যবহার করা হয়। কোদাল দিয়ে যখন মাটি খোড়া হয় তখন তিনজন মিলে বা তিনজনের হাতের

www.pathagar.com

স্পর্শে ৩কোপ দেওয়া হয়। তারপর যে কোন একজন ভালো করে গর্ত করে। এরপর ফুলগুলো গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। পুঁতার সময় কোন একজন রাখাল বালক মাথা দিয়ে তিন বার গর্তে মাটি নামিয়ে দেয়। তারপর সবাই মিলে মাটি নামিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এরপর পূজার প্রসাদ হিসেবে আতপ চালের সাথে গুড় আর কলা মিশিয়ে এক ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। একে চাউল মাখা বলে। তারপর সবার হাতে হাতে পায়েস দেওয়া হয়। এভাবে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি চলতে থাকে গোয়াল পূজার প্রসাদ খাওয়ার ধুম।

৫. গাই দেওরান

নন্দীগ্রাম উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় তাদের বাড়িতে কোন গরুর বাছুর হলে প্রথম প্রথম বাড়ির কোন সদস্য ঐ গরুর দুধ খায় না। কারণ গাই দেওরান না হলে ঐ গরুর দুধ খাওয়া যাবে না। কোন বাড়িতে গরুর বাছুর হলে তার ৭দিন বা প্রথম সপ্তাহের প্রথম রবিবারে যে গাইয়ের বাচ্চা হয় সে গাইকে গোসল করানো হয়। তারপর বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা বা বাড়ির বধূ যে কেউ একজন সকালে কিছু না খেয়ে আমের সার (আম্র পল্লব), ধান, দূর্বা, ইঁদুর মাটি, শিল, তেল, সিঁদুর দিয়ে গরুকে এবং বাছুরকে বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড় করিয়ে গাই এবং বাছুরের মাথায় তেল সিঁদুর দেওয়া হয়। বাছুরকে গাইয়ের সামনের পায়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনের পায়ের মাঝখন দিয়ে বের করা হয়। আর গাই ও বাছুরের মুখ এক জায়গায় করে দুধ ঢেলে দেওয়া হয় নিচের ঘটে। এই সময় একটি ছড়া উচ্চারণ করা হয় 'হটো হটো হটো পারশন গাঁয়ে (যে গাঁয়ের গাই) ঘাস নাই মুখ করো খাটো'।

৬. শেরপুরের মনসা বা পদ্মাপূজা

শ্রাবণ মাসের শেষ অথবা ভাদ্র মাসের প্রথম মঙ্গলবার শেরপুর শহরের সান্যালপাড়ায় বিরাট জাকজমকভাবে পদ্মা বা মনসা পূজা করা হয়। চন্দ্র (৬০)।

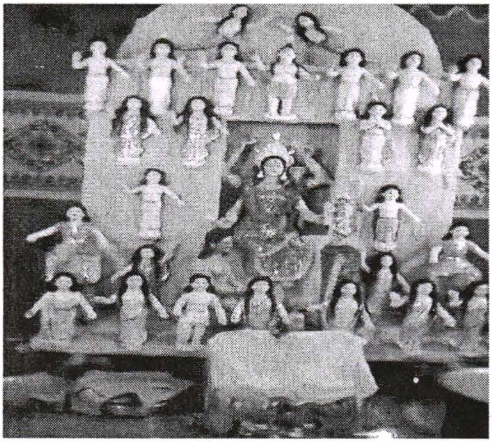

মনসা পূজা

www.pathagar.com

এ পূজাকে কেন্দ্র করে এখানে ছোট-খাটো একটি মেলাও বসে। এখানে যেভাবে মনসাপূজা হয় বগুড়ায় বা উত্তরবঙ্গের আর কোথাও এভাবে মনসা পূজা হয় না বলে জানালেন পুরোহিত নিবারণ এখানকার মনসা পূজায় একসঙ্গে ২৬টি মূর্তি ওঠে। মূর্তিগুলোর কেন্দ্রস্থলে থাকে মনসা। চারপাশে আছে-পদ্মা বা মনসার মাথার ওপরে শিব, শিবের মাথার ওপরে (দুপাশে) নাগ ও নাগিন, তার নিচেই আছে অষ্টপক্ষমুণি, জরৎকারুমুণি, আস্তিকমুণি, বাসুকিনাগ, নারদমুণি, বঙ্কনাগ, কমলা, সনকা, লক্ষিন্দর, বেহুলা, সাইসদাগর, যুবরাজ, কালিয়দমনকৃষ্ণ, চাঁদসদাগর, গদা, নেতাইধোপা, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ প্রমুখ। মনসার আসন-হাঁস, চাঁদসদাগরের আসন-হাতি। দুধ-কলা সহ মৌসুমি ফলমূল সহযোগে (কাঁঠাল ব্যতীত) পূজায় ভোগ দেয়া হয়।

৭. গোরক্ষনাথের পূজা

যোগীর ভবনের ফিল্ডওয়ার্ক শেষ করে এরপর পুরোটিম রওনা হই যোগীর ভবনের অদূরে অবস্থিত আরেক পুরাকীর্তি ও দর্শনীয় স্থান গোরক্ষনাথের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। বেলা ৩টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছে যাই। ৯ শতক জমির উপর এই মন্দিরটি নির্মিত। বাঁশঝাড়ে ঢাকা এই মন্দিরের উপর দিয়ে মাটির স্তর পড়ে গেছে। বাইরে থেকে মাটির ঢিবি ছাড়া আর কিছু অনুমান করা যায় না। কাছে গেলে গুহার মত ছোট্ট একটি মুখ পাওয়া যায়। বড় মানুষদের পক্ষে সেই মুখ দিয়ে ভিতরে যাওয়া অনেক কষ্ট সাধ্য। তবুও শরীরের কিছু অংশ ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও গোরক্ষনাথের একটি মূর্তি চোখে পড়ে। গোরক্ষনাথের এই মন্দিরকে স্থানীয় লোকজন ঘোপার মন্দিরও বলে থাকে। গোরক্ষনাথ মূলত কৃষকের গোয়াল ঘরের দেবতা। গরুর সুরক্ষা ও মঙ্গল কামনায় গোরক্ষনাথের পূজা করা হয়। গাই বিয়ালে গাইয়ের শাল দুধ দিয়ে ক্ষীর রান্না করে গোরক্ষনাথের মন্দিরে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। এখনো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই গাইয়ের শাল দুধের ক্ষীর রান্না করে ভোগ দিয়ে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দা জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান জানান- আগে যুগীর ভবনে অবস্থিত কানুছ কুয়ার পানি দ্বারা এই মন্দিরের দেবতা গোরক্ষনাথের পূজা করা হত। এখনো এখানকার মাটি ভেজা থাকলেও চুলা জ্বালাতে কোন অসুবিধা হয় না। শুকনো মাটিতে যেমন জ্বলে ঠিক তেমনই জ্বলে থাকে। যদিও আমরা ভেজা মাটিতে জ্বলতে থাকা চুলা দেখতে পাই নি।

সোয়া কেজি চাল, পরিমাণ মতো চিনি এবং ঐ দিনের গাই দোয়ানো সম্পূর্ণ দুধ। এগুলোর সমন্বয়ে মন্দিরের সামনে থাকা ছোট ছোট চুলায় ক্ষীর রান্না করে গোরক্ষনাথের নামে উৎসর্গ করে তার পাদমূলে রাখতে হয়। এবং সেখান থেকে নিয়ে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করতে হয় দেবতার ভোগ হিসেবে। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা এই ভোগ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

এরপর ঝৈলতলা বধ্যভূমি, খ্যাতা দিঘি হয়ে ধনসুখা ধাপ পরিদর্শন করে বিকেল পাঁচটায় এসে দত্তবাড়ি পৌছাই। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঝৈলতলা বধ্যভূমি স্বাধীনতা বিরোধিদের বধ করার স্থান হিসেবে পরিচিত।

www.pathagar.com

৮. মুঠ আকা (রাখা)

সারিয়াকান্দির অন্যতম লোকজ কৃষি আচার হলো মুঠ আকা। ফাল্গুন মাসে জমিতে প্রথম কাউন ছিটানোর দিন এ আচার পালিত হয়। সাধারণত চরাঞ্চলেই এ আচার পালিত হয়। যে দিন জমিতে কাউন বপন করা হবে তার আগের দিন রাতে একটু আতপ চাল এক বাটি পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। রাতে জাত লাউ দিয়ে (একটু লবণ, মরিচ, তেঁতুল ও গুড় দিয়ে) খাট্টা এবং কাউনের আতপ চালের ক্ষীর রান্না হয়। সকালে জমিতে গিয়ে সূর্য ওঠার আগে জমির চারদিকে এক পাঁক লাঙ্গল চালিয়ে জমির মাঝখানে এসে দাঁড়ানো হয়। এরপর ভেজা আতপ চাল গুড় দিয়ে কলাপাতায় করে মেখে কৃষক এবং তার সঙ্গে আসা দু'তিনজন একসঙ্গে বসে খেয়ে নেয়। খাওয়া শেষে একটুখানি চাল ও গুড় হালের গরু কে খেতে দেয়া হয়। একইভাবে ক্ষীর ও খাট্টা খাওয়া হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ গোলাম রব্বানী, বয়স : ৫৫, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : ভাটরা, নন্দিগ্রাম, বগুড়া। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এ পাস।

২. মোঃ ইব্রাহিম, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : ছাইহাটা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর।

৩. শ্রী সঞ্জয় চন্দ্র বর্মন, পিতা : শ্রী সুবোধ চন্দ্র বর্মন,বয়স : ১৯ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষা : এইচ.এস.সি পাস, গ্রাম : পারশন, পো : চাঁপাপুর, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহ : ০১/০৯/১১

৪. শ্রী অতুল চন্দ্র সরকার, পিতা : মৃত নকুল চন্দ্র সরকার, বয়স : ৩৬ বছর, পেশা : স্কুল শিক্ষক, শিক্ষা : এইচ.এস.সি, গ্রাম : কয়ার পাড়া, পো : বাশো, থানা: নন্দীগ্রাম, সংগ্রহ : ০২/০৯/১১

৫. মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, পিতা : মৃত হাজী পরামানিক, বয়স : ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বাক্ষর পেশা : কৃষি, গ্রাম : পীড়াপাট, পোস্ট : আড়োলা, ইউনিয়ন : পাইকর, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

২. মোঃ খোরশেদ আলম প্রামাণিক, পিতা : আহম্মদ প্রামাণিক, বয়স : ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর, পেশা : কৃষি, গ্রাম : রজাকপুর, পোস্ট : হাজরাদিঘী, ইউনিয়ন : পাইকর, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া, ১৬/০৩/১২

৬. মোঃ মোজাম্মেল হক (৬০) দেবডাঙ্গা গ্রোয়েন বাঁধ, মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি। পেশা : কৃষি।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

১. আলুঘাঁটি

আলুঘাঁটি শুধু গাবতলী নয় সমগ্র বগুড়াতেই অত্যন্ত প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী খাবার। তবে গাবতলী অঞ্চলের মানুষ এই ঘাঁটিকে নিজেদের বলেই মনেকরে। যেকোন অনুষ্ঠান পালা পার্বণে আলুঘাঁটি থাকতেই হবে। ভাত আলুঘাঁটি হলে অন্য কোন খাবার বিশেষ করে পোলাও বিরানি মুখেই তুলতে চায় না। আলুঘাঁটির সাথে বগুড়ার আরেক ঐতিহ্য দই থাকতেই হবে। ভাত-আলুঘাঁটি আর দইয়ের সম্মিলনে পরিপূর্ণ উদর পূর্তিতে আর কোন বাধাই থাকে না। আলুঘাঁটি ছাড়া কোন খানা-দানার অনুষ্ঠান এ অঞ্চলে পূর্ণতা পায় না।

আলুঘাঁটির উপকরণ

ক. গরু বা খাসির মাংস। গরুর মাংসই বেশি প্রাধান্য পায়।

খ. আলু

গ. পেঁয়াজ, মরিচ ও মসলা সবকিছুই পরিমাণ মত দিয়ে আলুঘাঁটি রান্না করতে হয়।

২. বরির/বরের (কুল) আচার

বরের আচার তৈরি করার জন্য গাছ থেকে ডাগর বর নামানো হয়। এরপর তা ডালা বা চালুনে করে রোদে শুকানো হয়। বরগুলো যখন শুকিয়ে লাল বা খয়েরি বর্ণ ধারণ করে তখন তার অবস্থা কিছুটা চুপসিয়ে যায়। এরপর বরগুলো পানিতে ধুয়ে বোটাগুলো ছাড়িয়ে লবণ, তেল, মসলা, মরিচ এবং গুড় (আখের বা খেঁজুর) দিয়ে জ্বাল করা হয়। তারপর তা বয়ামে করে রেখে দিনে দিনে খাওয়া হয়।

৩. দুধপিঠা

দুধ পিঠা তৈরির জন্য পরিমাণ মতো দুধ আর চালের আটার পিঠার প্রয়োজন হয়। দুধ ঘন করে জ্বাল দেওয়া হয়। তারপর তারমধ্যে চালের আটার তৈরি পিঠা বা কিছুটা আটা মিশিয়ে ঘন করে জ্বাল দিয়ে ঘন রসের পিঠা তৈরি হয়। এই পিঠা খেতে অনেক রসমালায়ের মতো লাগে।

৪. রসবড়া

রসবড়া নন্দীগ্রাম উপজেলার কিছু হিন্দু পরিবারে পিঠা হিসেবে বেশ জনপ্রিয় লোকখাবার। তবে সব বাড়িতে বা সবাই এই পিঠা বানাতে বা তৈরি করতে পারে না। যারা আগে থেকে এই পিঠা খেতে অভ্যস্ত তারাই এটি তৈরি করে থাকে। এই পিঠা তৈরির জন্য প্রধান উপাদান হলো মাসকলাই ডাল। পিঠা তৈরির জন্য পরিমাণ মতো ডাল নিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তা জাতাতে ডলে দু'ভাগ করে নেওয়া

www.pathagar.com

হয়। এরপর তা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে সেগুলো বেশি পানিয়ে নিয়ে উপরের কালো ডালের খোসা পরিষ্কার করে পাটাতে বেটে পেস্ট করা হয়। তারপর ঐ পেস্টগুলো একটা গামলাতে নিয়ে আরো ভালো করে ফাঁপা পেস্ট করা হয়। একটি নারিকেল ভেঙ্গে তার শাসগুলো দিয়ে গুড়ের সাথে জ্বাল দিয়ে নাড়ু বানানোর মত গোল গোল করা হয়। এরপর আগের মাসকলাই ডালের পেস্টগুলো চপ বানানোর মতো করে তৈরি করা হয় এবং তার ভিতর একটি করে নাড়িকেলের নাড়ু দেওয়া হয়। চপগুলো তেলে কড়া করে ভাজা হয়। ভাজার পর চপগুলো খেজুরের নতুন রসের পাতলা গুড়ের রসের ভিতর ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়ার এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পর তা তুলে খাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে ভাল যদি পরের দিন খাওয়া যায়। কারণ বাসি রসবড়া খেতে সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু।

৫. ছিন্নিপোড়া

ছিন্নি পোড়া এক ধরনের পিঠা। এই পিঠা নন্দীগ্রাম উপজেলার মুসলমান সমাজের মানুষেরা বেশি করে থাকে। এই পিঠা সাধারণত শীত কালেই বেশি তৈরি করা হয়। পিঠা তৈরির প্রধান উপাদানগুলো হলো চালের গুড়া, মসুর ডাল বাটা, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, লবণ, মসলা এবং সরিষার তেল। প্রথমে চালের গুড়ার সাথে উপাদানগুলো পানি দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হয়। এরপর মিশ্রিত ময়দা ভালো করে ছানিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তা চেপ্টা করে কলার পাতাতে করে রাখা হয়। এরপর নিচে একটি এবং উপরে একটি কলার পাতা দিয়ে গোরুর গোবরের শুকনো জ্বালানি দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগুন জ্বলতে থাকে এবং তা যখন লাল টকটকে হয় তখন খানিকক্ষণ রেখে ভিতরে দেখে বের করা হয়। পিঠা বের করে তার উপর সরিষার তেল দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এরপর তা সন্দেশের পিচের মতো করে কেটে খাওয়া হয়। এই পিঠা বেশ শক্ত হয় বলে অনেক দিন রেখে খাওয়া যায়। আর পুড়িয়ে তৈরি করা হয় বলে একে ছিন্নি পোড়া বলা হয়।

৬. কুসলিপিঠা

এই পিঠা সাধারণত চালের আটা দ্বারা তৈরি করা হয়। আলো চালের আটা গরম পানির সাথে মিশিয়ে কাই তৈরি করা হয়। এই কাই থেকে পরিমাণ মতো আটা নিয়ে ছোট গোল গোল করে বানিয়ে নেওয়া। তারপর তা রুটি বানানোর মতো করে বানিয়ে নেওয়া হয়। এরপর নাড়িকেলের নাড়ুগুলো রুটিগুলোর মধ্যে দিয়ে সিঙ্গারার মতো করে তৈরি করা হয়। কিন্তু তৈরির পর পিঠাগুলোর আকৃতি হয় ঠিক অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তারপর এগুলো দুধের সাথে সামান্য চালের আটা মিশিয়ে যে রস তৈরি করা হয় তার মধ্যে ডুবানো হয়। এরপর খানিকক্ষণ আবারো জ্বাল দিয়ে নামানো হয়। এই পিঠা গরম বা ঠান্ডা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। তবে গরম অবস্থার চেয়ে ঠান্ডা অবস্থায় বেশি ভালো লাগে।

৭. ভুনা

যত প্রকার লোকখাবার আছে তার মধ্যে ভুনা অন্যতম। এই ভুনা সাধারণত হিন্দু পরিবারের মানুষ বেশি পছন্দ করে। তাই এটা তৈরিতে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের

www.pathagar.com

নৈপূণ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ এই খাবারটার সাথে তাদের আচারের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। যেমন গোছরাখার (যেদিন প্রথম জমিতে ধান রোপন করা হয়) দিনে হিন্দু কৃষক পরিবারে ভুনা তৈরি করা হয়। এই ভুনা তৈরির কিছু প্রক্রিয়া আছে। তা হলো, প্রথমে পরিমাণ মতো চাল ভেজে নেওয়া হয়। তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। সারারাত পর সকালে তা উঠিয়ে পানি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর তা কয়রা/পাতিলে করে পেঁয়াজ, রসুন, মসলা, লবন, মরিচ, ঘি/তেল দিয়ে ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়। ভাজা হয়ে গেলে তা চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করা হয়।

৮. বগুড়ার দই

দই বগুড়ার খাদ্য সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অংশ। ভোজনের শেষে শেষপাতে দই মিষ্টি ছাড়া বগুড়াবাসী অতিথি পরায়ণতার পূর্ণাঙ্গতার কথা ভাবতে পারেন না। খাবার শেষে পাতে একটু দই নিয়ে পোলাওর সাথে মাখিয়ে না খেলে অনেকের খাবারের পরিপূর্ণতা পায় না।

শুধু দইকে কেন্দ্র করেই বগুড়া পেয়েছে আলাদা পরিচিতি। স্বাদে অতুলনীয় বগুড়ার দই দেশের জনপ্রিয়তা ছাপিয়েও দেশের বাইরে সুনাম অর্জন করেছে। বছরের অন্যান্য সময়ে বগুড়ায় শতাধিক দোকানে প্রতিদিন দই বিক্রি হয় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত। রমজান মাস ও বিভিন্ন উৎসবে বিক্রির হার কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দইয়ের শহর বলা হয় বগুড়াকে।

বগুড়ায় দইয়ের ইতিহাস প্রাচীন। শুরু হয়েছিল প্রায় ২০০ বছর আগে। শেরপুর উপজেলায়। ঘেঁটু ঘোষ নামে এক ময়রা প্রথম দই বানান। প্রথম দিকে টক দই হিসেবেই বেচাকেনা হতো। রং ও স্বাদ ছিল বিচিত্র। টক দই থেকে বংশ পরম্পরায় তা চিনিপাতা বা মিষ্টি দইয়ে পরিণত হয়।

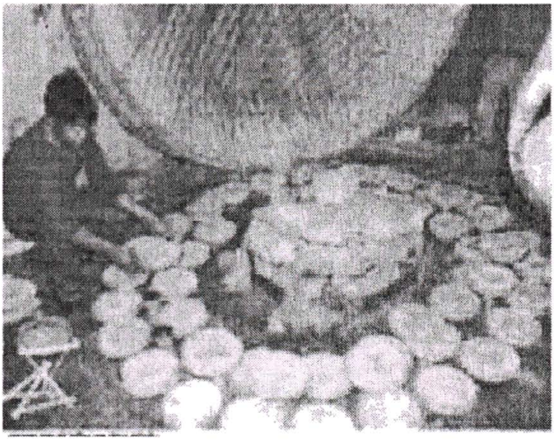

দই তৈরির দৃশ্য, বগুড়া সদর

www.pathagar.com

৬০ দশকে গৌরগোপাল পাল নামের এক ব্যবসায়ী বগুড়া শহরে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে সরায় দই তৈরি করেন। গৌর গোপালের এই দই-ই জনপ্রিয় হয় বগুড়া শহরে। ঐতিহ্যবাহী নবাব পরিবার ও সাতানী পরিবার এই দইয়ের স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশি বিদেশি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তখন এদের আতিথ্য গ্রহণ করলে তাদের বগুড়ায় এই অভিনব খাবার দই দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। গৌরগোপাল এদের জন্য দই তৈরি করে সরবরাহ করতেন।

সে সময় এই দইয়ের নাম ছিল নবাববাড়ির দই। গৌরগোপালের প্রতি মুগ্ধ হয়ে নবাব পরিবার তাকে কিছু জমি দান করে বসবাসের জন্য। এখনও নবাব বাড়ির পাশে গৌরগোপাল দধি ভান্ডার দই বিক্রি করছে।

পরবর্তীতে বগুড়ায় আরও অনেক দই প্রস্তুতকারকের নাম চলে আসে। মহরম আলীর দই, বাঘোপাড়ার রফাত আলীর দই, এশিয়া সুইট মিটের দই, শেরপুরের সাউদিয়ার দই, জলযোগের দই, শম্পার দই ও বৈকালীর দই উল্লেখযোগ্য।

দই প্রস্তুতে সে সময় ছোট মাটির পাত্রে দই বাসানো হতো। পরবর্তীতে ছোট ছোট মাটির পাত্রে দই বসানো শুরু হয়।

দইয়ের স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে রয়েছে নানা মতবাদ। বগুড়া দইয়ের জনপ্রিয়তার কারণে অনেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দইয়ের কারিগর নিয়ে দই প্রস্তুত করছে। কিন্তু বগুড়ার দইয়ের মত স্বাদ পাওয়া যায় নি।

অনেক দই বোদ্ধাদের ধারনা এখানকার মাটি, জল বায়ুর একটা যোগসূত্র রয়েছে দইয়ের স্বাদের বিশেষত্বে। অনেকে বলেন তেঁতুল কাঠ ব্যবহার করলে দই ভাল স্বাদের হয়। অধিকাংশ সময় দই বানাতে আম বা অন্য কাঠও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শতাধিক দইয়ের কারখানায় দই প্রস্তুত হলেও স্বাদের ভিন্নতার কারণে একেক দোকানের দই একক রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি যে দইয়ের চাহিদা রয়েছে এশিয়া সুইট মিটের দই। এছাড়া মহরম আলীর দই, চিনিপাতা দই, আকবরিয়ার দই, গৌর গোপালের দই, সেলিম হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টের দই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বগুড়ার প্রায় প্রতিটি রেস্টুরেন্টে দই প্রস্তুত বা সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয় গ্রাহকের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে। দই পূর্বে সরায় করে বিক্রি হলেও পরবর্তীতে সরার পাশাপাশি ডুঙ্গিতে করেও দই প্রস্তুত হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক দোকান বড় হাড়ি বা খোরা ও ছোট মাটির কাপে দই প্রস্তুত করে বিক্রি করছে।

এখন কয়েক প্রকার দই প্রস্তুত হচ্ছে। ক্রেতাদের স্বাদ ও সাধ্যের কথা চিন্তা করে। দামের প্রকারভেদও রয়েছে। সাধারণত প্রতি দইয়ের হাঁড়ির দাম ১১০ টাকা, স্পেশাল দই ১৪০-১৬০ টাকা। টক দই ৮০-৯০ টাকা, ডায়াবেটিক দই ৯০-১২০ টাকা। বগুড়ার একটি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট সেলিম হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। এখানে আজ থেকে বছর সাতেক আগে এক ধরনের স্পেশাল দই বানানো হতো। দইয়ের ভেতরে থাকতো রসমঞ্জুরী। খেতে সু-স্বাদু এ দইটির প্রচলন ছিল শহর ছাড়িয়ে গ্রামঞ্চলেও, কিন্তু পরবর্তীতে দামের কারণে জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এ দইটির প্রস্তুত বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এশিয়া সুইট মিটের দই বিখ্যাত। এ দই বিদেশেও গিয়েছে আত্মীয়-বন্ধুদের হাত ছুঁয়ে। বেশ কয়েকবার ভাল দই বানানোর জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি

www.pathagar.com

পুরস্কৃতও হয়েছে। বগুড়ায় দইয়ের জনপ্রিয়তার কারণে তা ইতোমধ্যেই স্থান করে নিয়েছে দেশের মানুষের খাদ্যতালিকাতেও। তাই নানা আকারের, নানা দামের বগুড়ার দই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সব স্থানে।

৯. লাচ্ছা ও চিকন সেমাই

বগুড়ার চিকন সেমাই দেশে বিদেশে সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতি রোজার ঈদে চিকন সেমাই'র কদর বেড়ে যায়। শহর ছাড়াও শহরতলীর অনেক স্থানে চিকন সেমাই প্রস্তুত হয়। বেড়েছে কর্মসংস্থান বিশেষ করে নারীরা এ পেশায় জড়িত হন বেশি।

বগুড়া শহরতলির বেজোড়া গ্রামসহ, শহরের কাটনার পাড়া, কালিতলা, ফুলবাড়ি, জয়পুরপাড়া, বারপুর, এরুলিয়া, মাদলা, নারুলী, বানদিঘি, ঝোপগাড়িসহ বিভিন্ন গ্রামে চিকন সেমাই তৈরি হয় প্রায় সারা বছর। চিকন সেমাইয়ের চাহিদা প্রচুর। অনুকূল পরিবেশ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক থাকলে দিনে প্রায় ২০০ কেজি সেমাই তৈরি করতে পারে কারিগর। এখানে খাঁচি (২৫ কেজিতে ১ খাঁচি) হিসেবে দৈনিক একজন ১৫-১৬ খাঁচি সেমাই তৈরি করে থকে।

ঘন দুধে চিনি, গরম মশলা, বাদাম ও কিশমিশ সহযোগে এই সেমাই প্রস্তুত হয়। লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুতপ্রণালী বেশ কঠিন। দক্ষ কারিগর ছাড়া এ সেমাই প্রস্তুত করা যায় না। বেশ কয়েকটি স্তর পেরিয়ে লাচ্ছা সেমাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। সু-স্বাদু এই সেমাই দুধ ছাড়াও ঘি, চিনি, কিশমিশ ও বাদাম সহযোগে প্রস্তুত করা যায়।

লাচ্ছা সেমাইয়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় এর ইতিহাস বেশ পুরানো। প্রথমে এ সেমাই ছিল ধনীদের খাবার। পরবর্তীতে সাধারণের মাঝে এ সেমাই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে এ সেমাই উচ্চবিত্ত এবং অভিজাত শ্রেণির খাদ্য হিসেবে গণ্য হতো। এটি বাংলাদেশে পাওয়া যেত না। কলকাতাতে পাওয়া যেত। সৌখিন ব্যক্তিরা কলকাতা থেকে আনিয়ে খেতেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কলকাতা ও হুগলী থেকে কিছু অবাঙালি লাচ্ছা বানানোর কারিগর বগুড়া শহরে আসেন। যারা বেকারি ব্যবসার সাথে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি বেকারি ব্যবসার সাথে জড়িত না থেকেও লাচ্ছা সেমাই তৈরি করতো।

আরও জানা যায় সে সময় লাচ্ছা সেমাই অত্যন্ত গোপনে হতো। বিশেষ করে বগুড়াবাসী যাতে এ সেমাই প্রস্তুতপ্রণালী না জানে। সেজন্য অত্যন্ত গোপনে লাচ্ছা সেমাই বানাতেন সে সময়কার অবাঙালি কারিগররা। যারা উৎসাহিত ছিলেন, এ সেমাই বানাতে ইচ্ছুক ছিলেন তারা এ সেমাই তৈরির কৌশল ও পদ্ধতি শিখতে সেই অবাঙালি কারিগরদের কাছে যেতে হতো। কারিগররা শর্ত জুড়ে দিতেন যে ঘরে লাচ্ছা তৈরির আগে ময়দা খামির করার কৌশলে তাদের লোক ছাড়া অন্যকোন প্রাণী থাকতে পারবে না। এসব শর্তে অনেকে লাচ্ছা সেমাই বানানো শিখে নিতেন। ঘি ও ডালডা দিয়ে লাচ্ছা সেমাই তৈরি হতো। অনেকে বলেছেন, ডালডায় তৈরি লাচ্ছা সেমাই অনেকে খেতে পছন্দও করতেন না। তারা মনে করতেন ঘি এর তৈরি লাচ্ছা সেমাই ভাল। বর্তমানে ঘি, ডালডা, সায়াবিন তেল দিয়ে লাচ্ছা সেমাই ভাজা হয়।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অবাঙালি কারিগরদের পাশাপাশি বাঙালি কারিগরদের উদ্ভব ঘটে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সৈয়দপুর অবাঙালি কলোনির কারিগররা বগুড়ায় এসে কারিগরদের দেখানো পদ্ধতিতে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করতে আসত। এছাড়া তারা পুরো রমজান মাস মহাজনের অস্থায়ী কারখানায় থেকে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করত। এসময় স্থানীয় বাঙালিরা সৈয়দপুর থেকে আসা ব্যক্তিদের কারিগরের হেলপার হিসেবে কাজ করতো।

এক সময় ঐ ব্যক্তিরা তৈরির কৌশল শিখে দক্ষ হয়ে ওঠে। তারা নিজেরা দোকান নিয়ে প্রকাশ্যে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করতে থাকে। স্বাধীনতা উত্তর বগুড়ায় গত ত্রিশ বছর যাবৎ লাচ্ছা সেমাইর মানে উন্নয়ন ঘটে। এরমধ্যে বগুড়ার স্বনামখ্যাত আকবরিয়া গ্রান্ড হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও বেকারির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এরপর শ্যামলী ও ঢাকা বেকারির লাচ্ছা সেমাই তৈরি ও বিক্রিতে এগিয়ে আসে। লাচ্ছা সেমাইয়ে নানা পরীক্ষা চলে। স্থানীয়ভাবে লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুতের ও স্বাদের কারণে শুধু ঈদ মৌসুমেই নয় বগুড়া জেলার থানা, পাড়া, মহল্লায় প্যাকেটজাত করেও বিক্রি করা শুরু হয়।

বর্তমানে বগুড়ায় লাচ্ছা তৈরির কারিগর প্রায় তিন হাজার। এরা শুধু বগুড়াতেই যে লাচ্ছা সেমাই তৈরি করেন তা নয় বরং অনেকে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুত করেও অর্থ উপার্জন করছেন। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অনেক জেলা উপজেলা থেকে মহাজনরা এসে বগুড়া থেকে অনেক কারিগর মাসিক চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ করে নিয়ে যাচ্ছেন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি ঈদ মৌসুমে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মণ লাচ্ছা সেমাই তৈরি হয়। বগুড়া জেলায় এ সময় লক্ষ লক্ষ টাকার বেচাকেনা হয়। প্রায় ৪৫ বছর আগে বগুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নারীরা স্বামীর উপার্জনের পথ ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ঘরে বসে চিকণ সেমাই বানাতেন। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ছিল এই সেমাইয়ের ক্রেতা। ৭০ এর দশকের শেষের দিকেও এই সেমাইয়ের কদর গ্রামে এবং শহরে নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণির মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি শহরের মানুষের কাছে চিকণ সেমাইয়ের কদর বাড়তে থাকে। বগুড়া জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলাগুলোতেও এর চাহিদা ছিল প্রচুর। ৯০ দশকের মাঝামাঝি এর জনপ্রিতা বাড়তে থাকে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে ৮০ দশকের দিকে রহিম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মালিক আমির হোসেন বগুড়ায় চিকণ সেমাই বানানোর মেশিন তৈরি করেন। এরপরই বগুড়ার চিকণ সেমাই তৈরিতে বিপ্লব আসে। এর আগে হাতেই তৈরি হতো এই সেমাই। আমির হোসেনের তৈরি চিকন সেমাই বগুড়া ছাড়িয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের বাইরেও এটি যাচ্ছে। তবে চিকন সেমাইয়ের কারিগরি ঐতিহ্য বগুড়াতেই রয়ে যায়। অন্য জেলায় এই সেমাই তৈরি হয়, তবে এর কদর তেমন একটা নেই।

কনকনে ঠাণ্ডা। বগুড়ার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। যেমন ঘন কুয়াশা তেমনি ঠাণ্ডা বাতাস। প্রকৃতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তবুও সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সহকর্মী সিমন কুমার দত্তকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম। স্থান একই দত্তবাড়ি থেকে মহাস্থান। উদ্দেশ্য লাল মিয়ার কটকটির বিস্তারিত তথ্য জানা। লাল মিয়ার দোকানে বসে খাওয়ার জন্য দু'শ গ্রাম কটকটি অর্ডার দিয়ে লালমিয়ার নাতি

www.pathagar.com

ছামিউল্লার সাথে আলাপ জমালাম। ছামিউল্লাহ কটকটির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে না পারায় পাশের দোকানে বসা চাচা শাহ আলমের কাছে পাঠালো। আমরা শাহ আলমের দোকানে বসে লালমিয়ার কটকটির আদ্যপ্রান্ত ইতিহাস লিখে নিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাতের বেলা কারখানা চালু থাকে না। যা কিছু তৈরি হয় সব দিনের বেলা সকাল থেকে। বাধ্য হয়ে আগামিকাল আবার সকালে আসার কথা বলে ফিরছি ঠিক এই সময় লাল মিয়া স্বয়ং হাজির। তখন লাল মিয়ার সাথে তার নিজের দোকানে বসে কটকটি সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো তার ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তা পড়ে শুনলাম। চিনি বালির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা ছাড়া বাদ বাকি সবগুলো তথ্যই সঠিক বলে মন্তব্য করলেন। অতিরিক্ত শুধু আঠারো শতক এবং তার পূর্ব পুরুষ গোলাপদির নাম জানালেন। রাত নয় টার দিকে মহাস্থান থেকে অটোরিক্সা যোগে আমরা দু'জন বগুড়া শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

১০. মহাস্থানের কটকটি

শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মহাস্থান মাজার কেন্দ্রিক নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। তসবি, টুপি, আতর, ধুপকাঠি, গোলাপজল, ধর্মীয় বই পুস্তক ইত্যাদির পাশাপাশি মহাস্থানের কটকটির ব্যবসা অত্যন্ত জমজমাট। মহাস্থানের এই কটকটির জন্য এখানে রীতিমত কটকটি শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে। সারাদেশতো বটেই বিদেশি পর্যটক এবং প্রবাসীদের কল্যাণে মহাস্থানের কটকটি এখন বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে। মহাস্থানের সবচেয়ে পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী কটকটি হল লাল মিয়ার কটকটি।

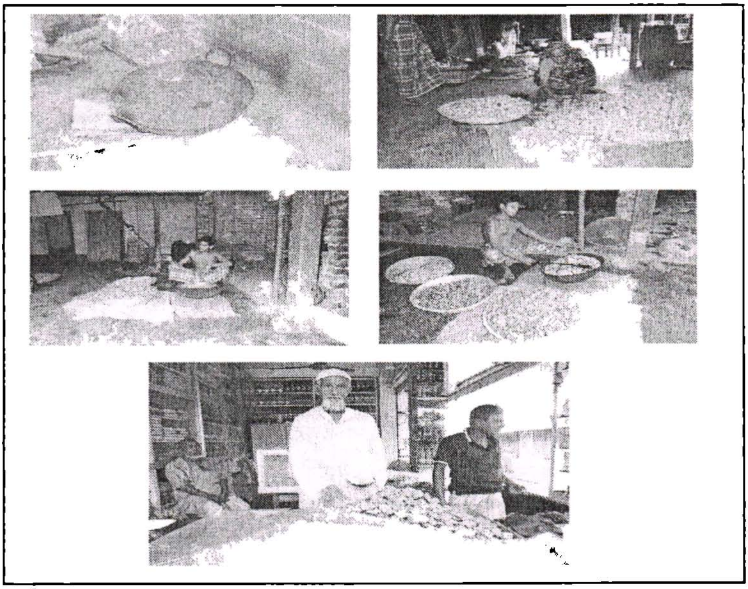

কটকটি বিক্রি করছেন লালমিয়া, মহাস্থান

www.pathagar.com

আঠরো'শ শতকের গোড়ার কথা। গোলপদি নামক এক দরিদ্র মুসলমানের দুই পুত্র জহর মাহমুদ ও দিল মাহমুদ। এদের মধ্যে জহর মাহমুদ মাযারের পাদদেশে পাতিল, বালতি কিংবা মুড়ির টিনের মতো উঁচু কোনকিছুর উপর বড় গামলা বা প্লেটে সাজিয়ে রেখে খাগড়াই এবং বাতাসার ব্যবসা করতেন। রোদ বৃষ্টিতে সমস্যা হওয়ার কারণে মাথার উপর ছোট্ট একটি খড়ের ছাউনি তুলে নেন। মাযারের দর্শনার্থীরা অল্প বিস্তর খাগড়াই, বাতাসা কিনে শিন্নি বা তবরাক হিসেবে মাযারে দান করত। এই খাগড়াই বাতাসার ব্যবসা করে জহর মাহমুদের সংসারে অভাব অনটন কখনোই ঘুচত না। কিন্তু তবুও তিনি ব্যবসাটি ছাড়েন নি। অনেকটা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় জহর মাহমুদ মারা যান। সংসারে তেমন কোন উন্নতি করতে পারেন নি। জহর মাহমুদের ছেলে মোহাম্মাদ আলী পৈত্রিক ব্যবসাটি চালিয়ে যেতে থাকেন। ঐ একই বাতাসা, খাগড়াই এর দোকান এবং ছোট্ট একটি ছনের ছাউনি আর মাযারের পাদদেশ। কিন্তু পৈত্রিক এই ব্যবসায় তার পক্ষে সংসার চালানো কষ্টকর হওয়ার ফলে এতে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করলেন। বাতাসা, খাগড়াই এর পাশাপাশি ময়দা দিয়ে তৈরি কটকটির উদ্ভাবন করেন মোহাম্মাদ আলী নিজেই। প্রথম দিকে ময়দা খামরি (খামির) করে টুকরো টুকরো করে কেটে রোদে শুকাতে দিত। তারপর চিনিবালুতে ভাজতো এরপর গরম করে গলানো গুড়ের মধ্যে ভিজিয়ে বিক্রি করত। কিন্তু সমস্যা হল বালুতে ভাজার কারণে ভোক্তার কাছে সমস্যা দেখা দেওয়ায় পরবর্তিতে সরিষার তেলে ভেজে ঝোলা গুড়ে ভিজিয়ে বিক্রি করা শুরু হয়। এই নতুন ধরনের মিষ্টান্নটি রোদে শুকানো এবং শক্ত হওয়ার কারণে খাবারের সময় মুখের ভিতর কটকট আওয়াজ হওয়ার জন্যই লোক মুখ থেকেই এর নামকরণ করা হয় কটকটি।

ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে ১৯৪০-১৯৪২ সালের দিকের কথা। কিন্তু মোহাম্মাদ আলীর হাতেও এই কটকটির ব্যবসাটি প্রসার লাভ করে নি। মোহাম্মাদ আলীর ছেলে লাল মিয়া তাদের আদি ব্যবসার হাল ধরেন এবং কটকটিতে নতুনত্ব আনার জন্য এর উপাদানে কিছুটা পরিবর্তন আনেন। লাল মিয়া ময়দার পরিবর্তে চালের আটা সরিষার তেলের বদলে পামওয়েল ও সয়াবিন তেল সেই সাথে কটকটিতে মসলা ব্যবহার শুরু করনে। ফলে কটকটি হয়ে ওঠে মুখরোচক ও সুস্বাদু। অতিদ্রুত এই কটকটির প্রসার ঘটতে থাকে। এটি আশির দশকের কথা। লাল মিয়া তার পৈত্রিক খড়ের ছাউনি বদলিয়ে টিনের ঘর তৈরি করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে নতুন উদ্যমে কটকটির ব্যবসা শুরু করেন।

প্রথম দিকে লাল মিয়ার কাছ থেকে কিছু বিক্রেতা ৫/১০ কে.জি করে কটকটি কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘাড়ে কিংবা বাঁকে নিয়ে ফেরি করে বিক্রি করত। এই খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই লালমিয়ার কারখানার শ্রমিক ছিল। পরবর্তিতে এই শ্রমিকদের অনেকেই লালমিয়ার কাছ থেকে কটকটি বানানো শিখে নিজেরাই কটকটির ব্যবসা শুরু করে। ফলে এই কটকটির প্রচার ও প্রসার আরো বেড়ে যায় এবং লালমিয়ার মতো অন্যরাও মাযারের সামনে কটকটির দোকান খুলে বসে। সেই সাথে শুরু হয় কটকটির গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রতিযোগিতা।

www.pathagar.com

বর্তমানে লালমিয়ার মতো নাসিরের কটকটি, হামু মামার কটকটি, জিন্নাহ কটকটি, মিলন কটকটি ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কটকটির এই নামকরণ মূলত মালিকের নামেই হয়ে থাকে।

বর্তমানে লালমিয়াসহ অন্যান্য কটকটি মাযারের দর্শনার্থী পূণ্যার্থীরা দেশের যে প্রান্ত থেকেই আসুক না কেন শিন্নি বা তবারক হিসেবে কিনে মাযারে বিতরণ করে এবং সাথে নিয়ে যায়।

লাল মিয়ার কটকটি প্রতিদিন বিক্রি ১০০-৩০০ কে.জি এবং শুক্রবারে এই বিক্রি বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০-৫০০ কেজিতে। প্রতি কেজির বর্তমান বাজার মূল্য ১০০ টাকা।

কটকটি তৈরির উপাদান

ক. চালের আটা

খ. ময়দা

গ. সয়াবিন, পামওয়েল, সরিষার তেল পরিমাণ মত

ঘ. গুড় পরিমাণ মতো

ঙ. তেজপাতা পরিমাণ মতো

চ. কালো জিরা পরিমাণ মতো

ছ. ছোট এলাচ

জ. দারুচিনি

ঝ. ঘি

ঞ. ডাল্‌ডা

১১. কাউনের ভুরভুরি

সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কাউন উৎপাদিত হয়। অসিদ্ধ কাউন ঢেঁকিতে পার দিয়ে এর আতপ চাল তৈরি হয়। এ চাল সামান্য একটু লবণ ও মরিচ দিয়ে মাটির হাঁড়িতে অল্পপানি দিতে রান্না করা হয়। আগুনের তাপে পাতিলে আটকে থাকা ভাত খেতে খুব সুস্বাদু। জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন কাউন যখন ঘরে আসে তখন সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই সকালের খাবার হিসেবে কাউনের ভুরভুরি রান্না করা হয়।

১২. কাউনের মলা

কাউনের আতপ চাল মাটির কড়াইয়ে ভেজে নিতে হয়। এরপর ভাজা চাল জাল দেয়া গরম পাতলা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় মজাদার মলা। এই মলা খেতে খুব সুস্বাদু।

১৩. হুড়াপুড়া খাওয়া

সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বুট কালাই উৎপন্ন হয়। কালাইয়ের গাছ পোক্ত হলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বিকেলের দিকে এ গাছ তুলে ফাঁকা জমির মধ্যে আগুন দিয়ে

www.pathagar.com

গাছ পোড়া দেয়া হয়। আগুনের তাপে কলাই কিছুটা সিদ্ধ হয়ে মড়মড়া হয়ে উঠে। গাছগুলো যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায়। তখন সবাই হুড়োহুড়ি করে আগুনের ছাইয়ের ভেতর পড়ে থাকা কলাই খুটে খাওয়া শুরু করে।

১৪. বাদামের পায়েস

সারিয়াকান্দির চরাঞ্চলে প্রচুর বাদাম উৎপাদিত হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যখন নতুন বাদাম ঘরে ওঠে, তখন কাঁচা বাদাম খোসা ছাড়িয়ে ঢেঁকিতে সামান্য থেতলা করে নিয়ে চিনি অথবা গুড় দিয়ে একটু চাউলের আটা মিশিয়ে রান্না করা হয়। বাদামের মৌসুমে অতিথির আগমন ঘটলে এ পায়েস দিয়ে আপ্যায়ন করা এখানকার বিশেষ রীতি।

১৫. চরের ভেতর ভূলক্যা খাওয়া

প্রায় সমগ্র শীত মৌসুম জুড়ে সারিয়াকান্দির চরের ভেতর প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ভূলক্যা খাওয়া হয়। সাধারণত স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাংসারিক ব্যক্তিরাও এ ভূলক্যা খাওয়ার আয়োজন করে। চরের ভেতর হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে গিয়ে রান্না করা হয়। সাদা-ভাত বা পোলাও, মাছ, মাংস, পায়েস ইত্যাদি রান্না হয়। রান্না শেষে বালির মধ্যে মাদুর বা কাপড় বিছিয়ে বসে সবাই মিলে একসঙ্গে খাবার খায়।

১৬. তেলপিঠা

বগুড়ার প্রতিটি উপজেলায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই শীত ও অন্যান্য মৌসুমে তেলেরপিঠা তৈরি হয়। চালের আটা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা করে গরম তেলে ভাজা হয়। গুড়ের তেলের পিঠা খেতে খেতে শরীর মাতিয়ে উঠে তখন কেউ কেউ তেলে ভাজা কয়েকটি শুকনা মরিচ চিবিয়ে খায়। এরপর আবার পিঠা খাওয়া শুরু করে। এভাবে ২০/২৫টি পিঠা কেউ কেউ খেতে পারে

১৭. বকনি/বগনি

বকনি তৈরির জন্য দরকার আউশ ধান। ভাদ্রমাসে যখন আউশ ধান ঘরে উঠে তখন নতুন ধানকে ডালায় করে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। ঢেঁকিতে কুটে আটা গুঁড়া করা হয় এ ধানের চাল কে। এরপর এই ধানেরই সিদ্ধচাল নিয়ে ভাত রান্না করা হয়। ভাত রান্নারচাল কলার পাতাতে কিছু ভাত ও কিছু চালগুঁড়া রেখে তা হাত দিয়ে মাখানো হয়। এভাবে ভাত ও চালগুঁড়া ভালভাবে মাখা হলে তা একটা হাঁড়িতে রাখতে হয়। পাতিলটা হবে নতুন মাটির হাঁড়ি। সব চালগুঁড়া ও ভাত পাতাতে মাখানো হলে তা হাঁড়িতে দেয়ার পর সামান্য পানি নিয়ে হাত ধুয়ে একটু পানি দিয়ে তা চেপে রাখতে হয়। এভাবে হাঁড়িটি ঢাকনা দিয়ে সারারাত রাখতে হয়। সকালে নাশতা হিসেবে খাওয়া হয় বকনি।

গ্রামাঞ্চলে এর খাওয়ার প্রচলন কমে এসেছে। আজকাল প্রায়ই এই ঐতিহ্যবাহী খাবার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে বাবার বাড়িতে মেয়েরা নায়রী বা বেড়াতে এলে বগনি অবশ্যই রান্না হতো। মেয়ে জামাইকে খাওয়াতে শাশুড়ি বিকেল থেকেই এই খাবারের

www.pathagar.com

আয়োজন করতে থাকে। গরমকালে মেয়েরা বাপের বাড়ি অনেকেই বেড়াতে যায় বগনি খাওয়ার জন্য। ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই বগনি রান্নার ধুম পড়ত।

সারারাত ভাত, চালের গুঁড়া পানিতে ভেজার কারণে এর গন্ধ থেকে এক ধরনের মাদকতা তৈরি হয়। দিনে রোদ যত চড়া হয় ততই এর গন্ধ খানিকটা বাংলা মদের মতো গন্ধ হয়। এই খাবার খেলে ঘুম পায়। শরীরে একই ধরনের অলসভাব আসে বলে জানান।

১৮. মুঠা

চালের গুঁড়া করা হয় ঢেঁকিতে। এরপর তা মাটির চুলায় সিমটা (পাটখড়ি) বা খড় দিয়ে হাঁড়িতে পানি গরম করে তাতে একটু লবন দিয়ে চালের গুঁড়া তাতে দেয়া হয়। লাকড়ি দিয়ে তা নেড়ে নামানো হয়। এরপর হাতের মুঠোতে নিয়ে মুঠা তৈরি করা হয়। এরপর অন্য একটি হাঁড়িতে পানি গরম করে তাতে মুঠোগুলো ছেড়ে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর নামিয়ে ঠান্ডা করে তা লালি বা নতুন খেঁজুর গুড়ের হালকা পাকানো গুড় (ঝোলা গুড়) দিয়ে খাওয়া হয় এটি। নতুন ধানের চাল দিয়েই এই পিঠা তৈরি হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ আসাদুল আকন্দ, পিতা : মৃতঃ ছামেদ আলী, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর, বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত, পেশা : কৃষি, ডেকোরেশন মিস্ত্রি, গ্রাম : মেন্দিপুর : পোস্ট : নারুয়ামালা, ইউনিয়ন : নারুয়ামালা, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

২. অলেকা রানি, পিতা : গুপীনাথ বর্মন, বয়স : ১৯, শিক্ষা : একাদশ শ্রেণি, পেশা : ছাত্রী, গ্রাম : খানপুর, পো : চৌমুহনী, থানা : দুপচাঁচিয়া সংগ্রহের সময় : ০৪/০৪/১২

৩. অর্চনা রানি, স্বামী : অতুল চন্দ্র বর্মন, বয়স : ২৮, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : কয়ারপাড়া, পো : বাঁশো, থানা : নন্দীগ্রাম, সাক্ষাতের সময় : ০২/০৩/১২

৪. মোছাঃ রাজিয়া বেগম, স্বামী : মোঃ আব্দুল হামিদ, বয়স : ৪৫, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, পেশাঃ গৃহিণী, গ্রাম : পারশন, পো : চাঁপাপুর, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহের তাং : ০৫/০৩/১২

৫. শশী বালা, স্বামী : মৃত নরেন্দ্র নাথ সরকার, বয়স : ৬০, শিক্ষা : ৪র্থ শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : পারশন, পো : চাঁপাপুর, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহের তাং : ০৬/০৪/১২, সময় : সকাল ৮.২০

৬. মোঃ লাল মিয়া, বয়স : ৬২ বছর, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ, গ্রাম : মহাস্থান, উপজেলা : শিবগঞ্জ।

৭. সবগুলো লোকখাদ্যের তথ্যদাতা : মোঃ আজাহার উদ্দিন (৫০), মথুরাপাড়া বাজার, সারিয়াকান্দি। তাং ১৭/০৭/২০১২

৮. মোঃ মনোয়ার হোসেন ফরিদ, (২৩), পিতা মোঃ কুমর উদ্দিন, গ্রাম : বয়রাকান্দি, ডাক : কুতুবপুর, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।

৯. মোঃ আনিছুর রহমান (৩৮), পেশা : শিক্ষক, ছাইহাটা বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সারিয়াকান্দি।

www.pathagar.com

লোকনাট্য

ক. বেহুলাপালা

সমগ্র যোগীর ভবন নিয়ে স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচলিত রয়েছে নানা কাহিনি। এর মধ্যে অন্যতম মিথ হলো বেহুলা কাহিনি। বেহুলা তার মৃত স্বামীকে এখানে এসেই জীবিত করেছিলেন। এখানকার জঙ্গলের মৃত সঞ্জীবনী কানছকূপের পানিতে বেটে বেহুলা তার স্বামীকে খাইয়েছিলেন। তার পরেই তার মৃত স্বামী প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। তাই শুধু কানছকূপ নয় পুরো যোগীর ভবন নিয়েই এখানে প্রচলিত রয়েছে বেহুলা কাহিনি। যোগীর ভবনে বৈদ্যনাথ পুষ্পচন্দ্র এবং আইন উদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই জানা গেল যোগীরভবন নিয়ে বেহুলা কাহিনির পালা গেয়ে বেড়ান যোগীর ভবনের পাশের গ্রাম পীড়াপাট গ্রামের অধিবাসী আবদুল গফুর পরামানিক। আইন উদ্দিনের সহায়তায় তাকে ডেকে আনা হলো যোগীর ভবনে। বেলা তখন প্রায় ২টা। পুষ্পচন্দ্রের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পালা শোনার ব্যবস্থা করা হলো। আবদুল গফুর শুরু করলেন বেহুলা লখিন্দরের পালা :

বেহুলা-লখিন্দরের (লক্ষিন্দরের) পালা

আইলরে জ্যোতিষা বামন গণনা গণিতে (২)
বাদশাহর বাড়ি যামো আমি গণনা গণিতে
ঐ
গণা পড়া যেমন তেমন দাওয়াত খাওয়া হইবে এ...এ
আইল রে জ্যোতিষা বামন গণনা গণিতে।
ঐ

সওদাগর মহাশয়, আপনি আমাকে কী জন্যে স্মরণ করেছেন?

আমি স্মরণ করছি, আমার ছয়টা পুত্র কালিদহ সাগরে, পদ্মাদেবীর চক্রান্তে আমার নৌকাডুবি হয়েছে। আমি পুত্রহারা হয়ে গেছি। আমি তোমাকে স্মরণ করেছি এ জন্য আমার ঔরসে ছনেকা রানির উদরে কোন পুত্র সন্তান আছে কী না?

ও... ও...ও পুত্র সন্তান?

না- না পুত্র সন্তান পুত্র সন্তান।

জ্যোতিষী তার ভাইকে জামাতি খাতা (কুষ্ঠি) আনতে বললেন, দেখলেন, বললেন, হ্যাঁ সওদাগর মহাশয় আপনার ঔরসে ছনেকা রানির উদরে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। কিন্তু মস্তবড় ফাঁড়া রয়েছে।

কী ফাঁড়া রয়েছে?

www.pathagar.com

ছেলের জন্য ছনেকা রানির দশমাস দশদিন পর প্রসবের যখন ব্যাথা উঠবে, তখন ধরণীতে সন্তান যখন জমিনে পড়বে, ছেলের বয়স যখন ১২ বৎসর হবে, তখন একটা ঘর, লোহার আসন, লোহার শাসন, লোহার ঘর নির্মাণ করে দিতে হবে, কালনাগিনি সাপকে পদ্মা দেবী দংশন করতে পারে।

গান

কর্মধর, কর্মধর কর্মধর বলি কে ডাকিল রে-

অতি সুকে শুয়া আছি, ডিসকো মিয়ার কাছে?

বিষুকর্ম্মা বুলে আমায় কে ডাকিল রে-

সওদাগর মহাশয় কি জন্যে আমাকে স্মরণ করেছেন।

তবে আমি এই জন্যে ডাকিছি, আমার ছয়টা পুত্র কালিদহ সাগরে হারায়ে গেছে। পুত্র বালা লখিন্দর। এর লোহার আসন, লোহার শাসন দিয়া একটা ঘর নির্মাণ করতে হবে। আর ছেলের আমার নাম লিখতে হবে।

ও-তাই।

সে নাম হবে সোনারবালা লখিন্দর, সোনার লখিন্দর।

চাঁদসওদাগর একদিন লখিন্দরকে স্কুলে ভর্তি করলেন। পণ্ডিতমশায়কে বললেন, এই ছেলেকে ভর্তি করান। এর নাম বালা লখিন্দর। সোনার লখিন্দর। পিতার নাম চাঁদসওদাগর। এদিকে বেনাসওদাগর তার মেয়েকেও স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতমশায়কে বললেন, আমার কন্যাকে ভর্তি করে নেন। নাম কি? নাম বেহুলা সুন্দরী। দু'জনে স্কুলে যাতায়াত করে। লেকাপড়া করে, ছুটি হয়। কিছুদিন পর স্কুল মাস্টার বাবু ছুটি দিয়া দিছে, মাস্টার বাবু ছুটি দিলে পরে বইপুস্তক জড়ো হয়া আছে। অলেন বাবু দেখতেছে বেহুলার বইয়ের মধ্যে দেখিছে লখিন্দর-লখিন্দর। লখিন্দরের বইয়ের মধ্যে দেখিছে বেহুলা সুন্দরী, বেহুলা সুন্দরী। অলেন বাবু হেড পণ্ডিতকে জানালে অলেন বাবুকে হেডপণ্ডিত বলে, তুমি লখিন্দরকে একান থেইকা বাইর কর‍্যা দাও।

গান

লখিন্দর বলছে-

ওই- আমায়-য়-য় বের করে দেয়- য়- য় ইসকুল হইতে, এ- এ। ইসকুলে বি বি- রি-রি লেকাপড়া- আ- আ- আমর ভাগ্যে হলো না, আমায়- আয়-আয় বের করে- এ- এ-এ দেয় ইসকুল হইতে- এ- এ- এ।

মনে বড় আশা ছিল- ও- ও- ও এই স্কুলে লেখিতে- এ- এ- এ-।

আমায় বের করে- এ- দেয়- এ- ইসকুল হইতে- এ- এ

বেহুলা সতী তখন বলছে-

বাদশাহর ছেলেক মারলে পরে বিপদ হয়্যা যাবে হে- হে-

মেরো না ধরো না অলেন, পায় ধরে বলি- ই- ই (২)

www.pathagar.com

এই বলিয়া চলে যায়।

বাড়ি গিয়ে লখিন্দর মাকে বলে-

আমায় বের করে দেয় ইসকুল হইতে- এ- এ।

ইসকুলেরই- লেকাপড়া- আ- আ- মা আমার ভাগ্যে হলো না।-না- না।

আমায় বের করে দেঁয় ইসকুল হইতে- এ- এ ওই ইসকুলের দুটি মেয়ে- এ- এ- অলেনকে ভালোবাসে- এ-এ- এ-

আমায় বের করে দেয় ইসকুল হইতে- এ- এ- এ।

মা : বাবা তোমার কোন দোষ আছে?

লখিন্দর : না, মা আমার কোন দোষ নাই, মা, মাস্টার বাবু বইপুস্তক জমা রেখে আমাগোরে ছুটি দিছল। বেহুলা সুন্দরীর বইয়ের মধ্যে দেকিছে লখিন্দর- লখিন্দর, হামার বইতে দেকিছে বেহুলা- বেহুলা। এই অপরাধ মা।

তাইলে অন্য ইসকুলেত ভর্তি করে দেই বাবা?

না তা হবে না। হামাকে একটা বড়শির শিপ দিতে হবে।

বড়শির শিপ তুমি কি করবা বাবা?

তোমার একে একে ছয় ভাই কালিদহ সাগরে তোমার বাবা বানিজ করতে গেয়ে হারায় গেল। ছয়টা পুত্র হারা হয়্যা গেছি বাবা। ছয়টা পুত্র বাবা। বালা লখিন্দর, তুমি বড়শি শিপ কি করবা? তুমি যে মাছ খাবার চাও, সেই মাছই কিনে দেওয়া হবি বাবা।

না- না আমাকে বড়শি শিপ দিতে হবে।

জাহাঁপনা জাহাঁপনা একে একে ছয়টা পুত্র আমার কালিদহ সাগরে বাণিজ করতে গেয়ে হারায় গেল, বালা লখিন্দর এখন বড়শি শিপ চাচ্ছে মাছ মারবে। না দিলে রাজ্য ছায়রা চলে যাবে।

ছনেকা রানিকে চাঁদসওদাগর বলছে- তাহলে ছনেকা রানি তুমি আমার পুত্রকে বড়শি শিপ দাও।

গান

ওরে- এ- এ আমার বাবার জামা ঘাটে

এ-এ- রে-এ বিদেশি- ই- ই বড়শি-ই-ই ফা-আ-আ- আ- লা- আ- ছ- মরে। ও-রে- রে- এ- ঘাট হইতে-

ওকি- কি- হায়- য়- হায়।

ওরে- এ ঘাট হইতে- ও মোর কইন্যা,

আ- আ- রে, ও কইন্যা, আ- অন্য ঘা

আ- আ- টে-এ- যাব, আ-আ ব না-

আ- আ- রে এ- এ- এই না ঘাটে

বইগা আ- আ- মি, মাছ মা-আ-রিব ও

মোরে ও কি-ই- হায়- গো- হায়-

বেহুলা সুন্দর বলছে-

www.pathagar.com

ও ও ওরে কোন শহরে- এ- এ- বাড়ি, তোমার রে- এ- এ- ও- বিদেশি- কোন-ন-শ-হ্-হ্-ও-রে- এ- এ- এ বা- আ- আ- ড়ী- ই- ই- ঘ- ও- ঘরও- রে-
ও-ও- ও-ওরে- কিই- এ- ই- ই- নাম
অ- অ- তোমা- আ- আ- রওরে
মা-তা-আ- পি-তা-আ-আর- ও-রে ও- ও- কি- হায় গো হায়।
ও-রে সত্য- করে ও- মোর বি-দে-শী-ই-ই-ই রে- ও-রে-এ-এ-এ-বিইদেশি- ই-ই, দেও-ওরে প-রি-ই-ই চয়- ও-অয়-ওরে কোন শহ্হরে- রে- বা-আ-ড়ি-ই-রে-এ-এ
কোন-এ-এ-ঘর- ও- ও-, ওকি- হায় গো হায়
বালা লখিন্দর বলছে-
ও-রে চাপাইনগরে- এ-এ বা আ-ড়ি
সোন্দরী রে-ও-ও-সোন্দরী-ই-ই-ই
চাম্পাইনগ-অ-অ-রে ঘ-র-ও-রে, ও-রে পি-ই-ই তার নাম-ম-টি চন্দ্র সওদাগর
আ-মা-মা-র নাম-ম ও-ওরে লখিন্দর
ও-কি-হায়-গো-হায়।
লখিন্দর- ও-কি-হায়-গো-হায়।
ওরে কোন- ন- শ-হ্রে-এ-এ বাড়ি সোন্দরীরে
ও-সোন্দরী- কোন শহ্-হ্-রেতে- এ-এ
তোর- ঘর-র-ও-ও-রে, কি-ই-ই নাম তোওমার-মা-আ-তা- পি-ই-তা-আ-র
ও-ও-ও তো-ও মা-আ-আ-র-র রে।
সওত্য ক'রে-এ-ও-মোওর কইন্যা-আ-রে-এ-এ-কইন্যা- আ-আ, দে-ও-রে-এ-এ- পি-অ-রি-ই-ই চয়ও রে-এ। (২)
বেহুলা বলছে-
ও-রে-রে উজানী-ই নগ-রে-এ-বাড়ি-বিদেএশি-ই-রে-এ-এ-এ-এ বিদেশি- উজা-আ-আ-নি-ই-ই- নগ-ও-ও-রে
ঘ-ওর-র-রে। ও-ও-রে পি-ই-তা-আ-র না-আ-ম-টি- বা-আ-সুয়া বেএই-না-আ-মা-আ-আ-র নাম-ম-ম-বেহুলা-আ
ও-ও-কি, হায়-য় গো-হায়।
ও-ওরে স-ওত্য কওরে-ও-মোর-বিইদেশি-রে-এ-এ-এ বিই-দেশি-ই, দি-ই-লাম প-ও-রিই চয়ওরে।
হায়রে স-ও-ত্য কওরে-ও-মোর-বিইদেশি-ই-ই-রে- বিই-দেশি-ই, দি-ই-লাম প-ওরি-ই-চয়ও-রে। ও-ও-কি-হায় গো।
লখিন্দর বলছে-
ও-রে- তোওমার রূ-উপে-পাগ-গল হ-ইয়া-রে-এ, ও-ও-বেহুলা-বড়শি-ই ফা-আ-লা-আ-ছি, ঘা-আ-টে, এ
হায়-রে সও-ওত্যি ক-ইর্যা, বল-ছি-রে কওন্যা-আ, তোওমা-য় করববো বিয়ে-ও-কি হায়-গো-হায়।
বেহুলা বলছে-

www.pathagar.com

ও-রে-আ-আ-মার আশা-আ-আ, ছাআ-ড়ো রে-এ লখাআই-রে-ও-লখাই-আ-আমা-র আ-আশা ছা-আ-ড়ো-ও-এ

ও-রে-এ, হিরামন-মানিক ও দিব-অ-অ, অ-অন্য-বিইয়া-আ ক-ওরো, ও-কি-ই হায়-হায়-অ-গো।

লখিন্দর বলছে-

ওরে-এ-টাআ-কা-র কাঙাল, ন-ই-কো, সোন্দরী, ও-ও-সোন্দরী-ই, টা-আ-কার কা-আ-আঙাল, টা-আ-কা, আ-আ-মার আ-আ-আছে, ওরে তোওমার রূ-উপে-এ, পা-আ-গল-ও, হয়-আ-আছি

ঘু-উ-রি দ্যাশ-বিদ্যাশ-এ-এ, ও-কি হায়-আ-য় গো-ও-হায়-আয়।

বেহুলা বলছে-

-ও-ও-রে, আ-মা-র বা-আ-আ-ড়ি,

যা-আ-ই-ও, ল-ও-খা-আ-ই-ই-রে

ও-লখাই, সোজা-আ-আস্তা- (রাস্তা)

দিয়া-আ, ও-ও-রে পা-আ-ড়ার

লো-ও-কে, সা-আ-লাম- রে- দিইবে

দু-উ-লা আ- ভা-আ-আ-ই বলিয়া-আ-আ

ও-কি, হা-য়-গো-ও-হায়-আয়।

আরে আমার বা-আ-ড়ি-ই, যা-আ-আ-ই-ও

ল-ও-খাই রে-এ-এ, বওসতে দি-ই-ব-পি-ই-ড়ি, ও-ও-রে- জল-পান-অ-অ-ক-রি-ইতে দিই-ব, হা-হামি, শাআইল্যা (পোলাও রান্নার এক প্রকার সুগন্ধি চাল) ধা-আ-নে-র চি-ই-ড়ি। ও-কি-ই-হায় গো-অ-অ।

ও-রে-এ শাআইল্যা ধা-আ-আ-নের-চি-ই-ড়ি, দি-ই-বো, ও-রে-ল-ওখা-আই

বি-ই-নি-নি (বিন্নি ধান) ধা-আ-আ-নের খ-ও-ই-ই।

ও-ও-রে, বা-আ-ড়ি-র গা-আ-ছের

শ-ও-ব-রী-রেক- অ- লা-রে, গা-আ-ম-ছা

বা-আ-ন্ধা-আ, দ-অ-অ-ই। ও-কি হায়-গো-হায়।

লখিন্দর বলছে-

ও-ও-রে তো-ও-মার বা-আ-ড়ি, গে-এ-লে ও সোন্দরী-ই-রে, ও-সো-ন্দ-রী-ই,

লো-ও-কে-ম-ও-ন্দ-ন্দ বল-ল-বে-এ, ও-রে

পা-আ-ড়া প-ও-ড়-শি- গা-আ-লি-রে দি-ই-বে, লু-উ-চ্চা (চরিত্রহীন) গু-উ-উন্ডা বই-ই-লে-রে। ও-কি-হায়-গো-হায়।

বেহুলা কথা বলছে-

লখাই তুমি আহলে এক কাম (কাজ) করো। তুমি বাড়িত যায়্যা তোমার বাবাকে বলো। আমি সতিত্বের কইন্যা। আমি তোমার সাথে গেলে আমার কলঙ্কিনি হবো। তুমি যায়্যা তোমার বাপের কাছে প্রস্তাব দেও। যে, বাইন্যা সওদাগরের বেটি বেহুলা সোন্দরীরে হামি বিবাহ করব। তাতে সে কি মত দেয়। হামি মত ঠিক দেব।

www.pathagar.com

চাঁদসওদাগরের কাছে লখিন্দরের দাদি এল। বলল- চাঁদসওদাগর, হামার লাতি (নাতি) লখিন্দর আজ সাত দিন হলে অনাহারে আছে। তাই বাড়িতেও থাকে না, ডুব (গোসল) ও দেয় না। ভাত ও খায় না।

চাঁদসওদাগর ও দাদি খোঁজ নিয়ে দেখেন, লখিন্দর বাগানে শুইতা (শুয়ে) আছে।

দাদি বলছে-

বাবা লখিন্দর। আইজ তুই সাত দিন হলে ঘরবাড়ি ছাইড়্যা বনে বসে আছু বাবা, তোর কি হয়ে বাবা।

আমার কিছু হয় নাই দাদিমা। তাহালে তুমি বাড়ি চল বাবা। খাদ্য খানা (খাওয়া) খাও।

না-দাদি। আমার বাবাকে বলো, সেই বাইন্যা সওদাগরের বেটি বেহুলা সোন্দরীর লগে যদি বিয়া পর্য্যা দেয়, তাহলে হামি এ রাজ্যে থাকব, নইলে এ রাজ্য ছেইড়্যা চইল্যা যাব।

বাবা চাঁনরে বাবা চাঁন বলে লখিন্দরের দাদি চাঁদসওদাগরকে বললেন,

কী- মা

বাবা, হামার তো হুঁশ নাই বাবা, কোনবা থেইকা বলে বাসু বেইনা আছে বাবা, তার বেটি বলে আছে বেহুলা সোন্দরী, তাইকে তোর ব্যাটা বিয়া করার জন্যি আগমন হয়েছে (ইচ্ছুক)। আজ সাতদিন হলে ডুবগোছল কিছু করে নি। বাগানে যায়া দেকি, শুতে আছে। হামাক বলল, দাদি বাইন্যা সওদাগরের বেটি (মেয়ে) বেহুলা সোন্দরীর সাথে যদি বিয়া করাতে পার তাহলে আমি এ রাজ্যে থাকব, নইলে অন্যরাজ্যে চলে যাব।

চাঁদসওদাগর বললে-

মা, সে জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না, এজন্য হামি ঘটক পাইঠে দিচ্ছি।

চাঁদসওদাগর ঘটক ডেকে পাঠালেন। ঘটক এলে তিনি বলেন, কোথায় ঘটক মহামায়া?

বলেন রাজামশাই।

যাও, এই মুহূর্তেই তুমি বাইন্যা সওদাগরের কাছে গিয়া তার কইন্যা সতি বেহুলার সাথে আমার পুত্র বালা লখিন্দরের বিবাহর প্রস্তাব নিয়ে যাও।

গান

ঘটক চলিল রে, ঘটক চলিল রে, এ-এ-এ
বাইন্যা সওদাগরের বাড়ি-ই চলি-ল-রে।
আর কতদূর যাইতে ঘটক (২)
আর কতদূর গে-এ-লো রে
ঘটক চলিল রে- ঘটক চলিল রে- রে
বাইন্যা সওদাগরের বাড়ি চলিল রে.

www.pathagar.com

বাইন্যা সওদাগর বলছে ঘটক মহাশয়

কী মনে করে আমার বাড়িতে এসেছেন

বাইন্যা সওদাগর বলেন-

ঘটক মহাশয় কী-ই মনে কইর‍্যা?

কোথা থেকে?

সেই চাম্পাই নগরে বাসু বাইন্যার ছোট ছেলে বলো লখিন্দরের সঙ্গে আপনার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছি।

ও-ও সেতো আমার বিয়াই। যাই হোক আপনি আপনার মনে যান, কাইলকা আমার বেয়াইকে প্যাঠা (পাঠিয়ে) দেন।

চাঁদসওদাগরের কাছে এসে বলল, রাজামশায়, আপনাকে কাইল সকালবেলা আপনার বিয়াই যাবার কছে।

পরদিন সকালবেলা গোসল করে খালি গা হয়ে চাঁদসওদাগর চলে যাচ্ছে বাসু বাইন্যার বাড়ি।

বিয়াই মহাশয় কাল ঘটক পাইঠে দিছলাম।

ও-হ্যাঁ।

বিয়াই মহাশয় একে একে ছয়টা মেয়েকে দিয়া আপনার ছয়টা পুত্রকে দিয়া বিয়া দিছলাম। ছয়টা পুত্রকে নিয়া আপনি বানিজ করতে গিয়েছেন। ছয়টা পুত্র আপনার কালিদহ সাগরে হারায়ে গেছে। আমি ছয়টা মেয়েকে বাড়িতে পালতেছি।

আমি সাপখোর বাড়িতে মেয়ে বিয়ে দিব না।

কি বিয়াই মহাশয় হামি সাপ খাই না কি?

না বিয়াই মহাশয় মানে, আপনার সম্পর্কে এ কথা শুনিছি। আপনার এখানে মেয়ে বিয়ে দিব না।

বিয়াই আমার বালা লখিন্দর আপনার কন্যাকে বিয়া করতে আগ্রহী হয়েছে।

আপনার মান আমি ক্ষতি করবা না বিয়াই মহাশয়। কিন্তু একটা শর্ত আছে?

কী শর্ত বিয়াই মহাশয়।

আমার মেয়ের ওজনে সেন্দুরা (সিঁদুর) দিতে হবে

গান

ওরে এতই সেন্দুর আমি কো-ও-থা-য় পা-আ-আ-ই। ও- ও- ও রে না হয় যদি না বিয়া তবে দ্যাশে-এ চ-ও-লে-এ যাই।

ও-তাওয়াই এ দিক আস্যা শুনা যা-ও-ও-, ওরে পিতা, তাহায় রাজি-ই হয়্যা-যাও।

তাওয়াই মহাশয় হামার বাবা আর কী-ই চাছে?

মা, তোমার বাবা যা চাছে, তা দেয়া হামার পক্ষে সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কেন সম্ভব হবি না তাওয়াই মহাশয়, এমন কি সম্পদ চাছে।

ও মা, তোমার ওজনে সেন্দুর চাছে।

তাওয়ই মহাশয়, আপনি কিছু সেন্দুর দিতে পারেন না?

হ্যাঁ মা, তা পারি, আমি দেশের রাজা, আমি কিছু সেন্দুর দিতে পারি, কিন্তু বকরী (বাকি/অবশিষ্ট) সেন্দুর হামি কোথায় পাব?

আমি সেটা পূরণ করে দেব।

বেয়াই মহাশয় আপনার এ শর্ত পূর্ণ করা গেল।

বাইন্যা সওদাগর বলছে-

বিয়াই হামার আর একটি শর্ত আছে?

চাঁদসওদাগর বলছে-

বলুন বিয়াই মশায় আর কী-ই শর্ত?

আমার মেয়ের ওজনে সোনা দিতে হবে।

ওরে এতই সোনা হামি কোথা-আ-আ-য় পা-আ-ই-, ওরে না- হয়-অ-য় যদি দেইল্যার বিয়া, দে-এ-শে চলে-এ-ও চলে যাই।

বেহুলা বলছে- ও- তাওয়াই, এদিক আইস্যা ও তাওয়াই শুইন্যা যাও, তাওয়াই এদকি শুইন্যা যাও-ও-ও, এদিক আইস্যা- শু-না-আ-আ-যা-আ-ও-ও।

ওরে পিতা যাহা করছে দাবি, রাজি হয়্যা যা-আ-আ-ও।

তাইয়ই মহাশয় হামার বাবা কি শর্ত দেছে।

মা, এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব হবে না।

কেন হবে না, তাওয়ই মহাশয়?

তোমার ওজনের সোনা দিতে হবে।

আমার ওজনে সোনা? আপনি কিছু সোনা দিতে পারেন না তাওয়াই মশায়?

আমি দেশের রাজা। কিছু সোনা আমি দিতে পারি, কিন্তু বকরী সোনা কোথা থেকে দিব।

আমি পূরণ করে দেব তাওয়ই মশায়

এ শর্ত আপনার পূরণ করা গেল

বিয়াই মহাশয়, আমার আরও একটা শর্ত আছে।

কী বিয়াই মহাশয়।

আমার বাড়ির সামনে একটা পুকুর খনন করে দিতে হবে। সেই পুকুর হবে দুধপুকুর।

গান

চন্দ্র সওদাগর বলছে

ও-ই-ওরে এতো-ও-ও দুগ্ধ- ও-ও

www.pathagar.com

আ-আ-মি কোও-থা-য়-য়-য় পাব

বিয়াই- এ-এ-তো-ও-ও দুগ্ধ-ও আ-আ-মি- কো-ও-ও-থা-

আ-য়-য় পা-আ-আ-ই।

ও-রে এ-এ, না-আ-আ-হয়-য়-য-ও-দি-ছে-ই-ই-লা-আ-র বি-ই-ই-য়া, দ্যা-এ-এ-এশে-এ চ-ই-ই-লা-আ- যা-আ-আ-ই।

গান

বেহুলা বলছে-

ও-ও-তাওয়াই, ও-তা-ও-য়া-আ-ই, এ-এ দি-ই-ই-ক শু-ই-ন্যা

যা-আ-আ-ও, তাওয়া-আ-ই,এ-দিক

আ-আ-ই-সা শুইন্যা-আ-যা-আ-ও। ও-রে-পি-ই-তা-য-ও-দি-না-না-হ-ও-য় রা-আ-জি

তু-ও-সি-রা-আ-জি, হ-ও-য়্যা যা-আ-ও।

তাওয়াই মশায়- হামার বাবা আবার কী-ই শর্ত ধরিচে?

মা, তোমার বাবা, তার বাড়িতে একটা দুধের পুকুর খনন করে দিতে চাচ্ছে

বেহুলা বলছে

তাওয়াই মশাই, আপনি কি কিছু দুগ্ধ দিতে পারেন না?

পারি মা, আমি দেশের রাজা। কিছু দুগ্ধ হামি দিবার পারি। বকরী দুগ্ধ হামি কোথায় পাব?

বেহুলা বলছে-

আমার স্তনের দুগ্ধ দিয়া পুকুর খনন করে দিব।

চন্দ্র সওদাগর বলছে বিয়াই মহাশয়, আপনার তৃতীয় শর্তও পূরণ করা হবে।

তাহলে বিয়াই মশায় বিবাহর দিন ধার্য?

বাসু বেইন্যা বলছে-

ঠিক আছে- আগামী মঙ্গলবার বিবাহের দিন ধার্য।

বিয়ে হয়ে গেল। বেহুলা তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্চে-

গান

বেহুলা : বিদায় দেন, বিদায় দেন আম্মা গো

বিদায় দেন আমা-আ-আ-রে, ও-ও-ও

আ-আম্মা-রে-এ-এ-এ-এ- বিদা-আ-আ-দে-এ-এ-ন-আ-আ-মা-রে-রে।

ও-ও-গো-গো-বি-ই-দা-আ-আয় যা-আ-ব-, প-ও-ও-রে-র দে-এ-শে।

ও-ও-রে- হায়-গো-হায়।

মা : ও-ও-রে বি-দা-য়-দি-ই-ই-লা-আম-আ-আম,-প্রা-আ-নে-এ-এ-এ-র আ-আ-ম্মা-আ-গো

www.pathagar.com

ও-ও বেহুলা বি-ই-দা-আ-য় দি-ই-ই-ব, রে-এ তো-ও-রে।

তো-ও-মা-য়, আ-আ-মি-ই, বি-ই-দা-আ-আয়, দি-ই-আ-আ-মা-আ-আ

ক্যা-এ-ম-নে- র-ও-ও-বো- ঘ-ও-ও-রে।

ও-রে-ও-কি-ই-হা-য়-গো-হায়।

দশো-ও-মাস-ও-দশো-ও-দি-ন-ও-রে-এ-এ-ও-বেহুলা, আখিইলা-আ-ম (রাখিলাম)-উদ-ও-ও-রে-রে-এ-এ

আ-আ-রে, আরেক পাঞ্জর (পাঁজর) ভিজিয়া গেছে-এ মা-ঘো- (মাঘ মাসের শীত)-ও-মা-ই-স্যা-আ-শী-ই-তে-গো।

ও-কি-হায়-গো-হায়।

ও-রে-বিদায় দিই-বো-ও-ও-

প্রা-ণে-র-এ-এর আম্মা-আ-রে-ও-ও-বেহুলা, বি-ই-দা-য়-দি-ই-ব তো-ও-রে। এ-এ।

ও-ও-রে, আরাক (আরেক) পাঞ্জর ভিজিয়া গেছে মা-আ-অওক্তো (রক্ত) আ-আ-র পোঞ্জে (পুঁজ)-ও-ও-কি-ই-ই, হায়-গো-ও-হায়-য়-

ও-রে- অক্ত পোঞ্জব মুইছা বেহুলা-আ-রে-এ

ও-বেহুলা-আ-আ, থুইয়া দিইছি-ই-ই-কোলে-

ও-রে-লোক্কো-লোক্কো (লক্ষ লক্ষ) চুমা খাছি

মা-আ-আ, বদন-ও-ও-কমলে-ও-ও-কি-ই

হায়-গো-হায়।

আরে-এ-এ-বিদায়-য়-য়- দি-ই-লাম প্রা-আ-ণের

আম্মা-আ-ম্মা-আ গো, ও-আম্মা-আ-আম্মা বি-ই-দায় দি-ই-লাম তোরে। আ-রে-রে খু-উ-শী-ম-ওনে, যা-ও-ও-রে মা-ধন, শশুরেরও না দ্যাশে-এ-এ-ও-কি- হায় গো-ও-ও।

ও-রে, ছোট, ছাপও দেওর যদি-ই থাকে।

ও-মা-আ-আ, তা-আ-রে সে-এ-বা-আ করিও-ও-রে

হায়রে ছোট- ছাপও ননদ যদি-ই-থাকে

ও-মা-আ-আ, তা-আ-রে-সে-এ-বা,

ক-ও-রো। ও-কি-ই-হায়-গো-হায়।

আ-রে-এ-শউর-শাউরী (শ্বশুর-শাশুড়ি)

যদি-ই- থাকে-মা-আ-ও...ও-ও-মা-জান

তা-আ-রে-এ সে-এ-বা-ক-ও-ও-রো (২)

ও-কি-হায়-গো-হায়।

ও-রে-স্বামীর-যদি-গা-ও (শরীর)

www.pathagar.com

ঘা-আ-মে মা-আ-ও, বেহুলা-অঞ্চলে-এ-(আঁচলে) মুছি-ও-ও- (২)

ও-কি-হায়-গো-ও,-ও

বেহুলা বাসু বেইন্যার বিদায় নিচ্ছে-

বিদায় দেন বিদায় দেন আ-আ-ব্বা-আ-গো

ও-আব্বা-বিদায় দেন আ-মা-আ-রে-এ-এ।

হায়রে খুশি মনে দেও-ও-বিদায়-যা-আ-আ-ব

প-ও-রের-দ্যাশে-এ-এ।

ও-কি-হায় গো-ও-ও।

বাসু বেইন্যা বলছে-

বিদায়-য় দি-ই-লাম, প্রা-আ-ণের আম্মা গো-ও-বেহুলা বিদায়-য়-য়-দিলাম

তো-ও-রে-এ-এ হায়রে খুশী মনে বিদায় দিলাম। কইর‍্যা কিন্যে-আ-খা-আ-ই-ও।

ও-কি-হায়-য়-গো-ও-হায়।

বেহুলা শ্বশুর বাড়িতে এলো-

ছনেকা রানি বালা লখিন্দরকে বলছে-

বাবা, তুমি-ই-বিয়া কইর‍্যা লি-আ-আলে (নিয়ে এলে) বাবা, তোমার দুলংকার বাড়িতে যাওয়া লাগবি বাবা।

দুলংকার বাড়ি যাব মা?

গান

ও-রে-বিদায়-য়-দেও বেহুলা-আ-রে-বেহুলা

আ-ও-বেহুলা। বিদায়-য় দেও আ-আ-মা-আ-রে-এ, ওরে খু-উশি মনে-এ-দেও-ও বিদায়-য়

যা-আ-আ-ব- বাণিজ কর-র-ও-তে।

ও-কি-হায়-গো-হায়।

মা- তাহলে আমি যাব। কিন্তু মা- হামি বিয়া করে লি-আচ্চি সতিত্যেরি কইন্যা,

হামাগের বাসর ঘর সাজা দাও (সাজিয়ে দাও)

মা ছনেকা রানি বলছে- না বাবা, তা হবে না।

ছনেকা রানির কোন কথা শুনতে চায় না লখিন্দর। মা তার ছেলের জন্য বাসর ঘর সাজায়।

বেহুলাকে ডেকে বলে মা, বেহুলা সোন্দরী শোন, পদ্মা দেবী আমার ছেলেকে সর্প দিয়ে দংশন করাতে চাচ্ছে। কালনাগিনি সাপ ছাড়বে। আইজগা রাইতে তুমি চেতন থাইকো মা।

www.pathagar.com

পদ্মা দেবী কালনাগিনি সাপকে তৈয়ার করল।

আর যথার মোশা

ওরে গায়ের ময়লা তুইল্যা পদ্মা এ মোশা (মশা) বানালো-রো

ও-রে গায়ের ময়লা তুইল্যা (পরদা) পদ্মা দেবী এ মোওশা রে (২)

গায়ের ময়লা বানালো

বলি ধীরে ধীরে-এ-এ-এ, মোশা তখন কইরাছে গমন-ও-ও-রে

গায়ের ময়লা তুইল্যা পদ্মা দেবী এ মোশা

ছা-আ-ড়ি-লো-ওরে-এ-এ-গায়ের ময়লা

বলি, আর কতেক দূর-র যাইতে মোশা

আর-ক-ও-তে-এ-ক দূর গেল রে-এ-এ-এ।

গায়ের ময়লা।

বলি, ধীরে-এ-এ ধীরে মোশা তখন বাসর-র-ও-রে ঢু-উ-কি-লো-ও-রে

গায়ের ময়লা তুইল্যা পরদা (পদ্মা) (জোরের সঙ্গে)

দেবী এই মোশা ছা-আ-ড়িল-রে-এ-গায়ের ময়লা।

বলি, ধীরে ধীরে পরদা দেবী (পদ্মা দেবী) কালনাগিনিরে ক-র-র-ল-স্ম-র-ণ-ও-রে-এ-এ-এ,

ধীরে ধীরে- কালনাগিনি যাইবার লা-আ-গিল-রে-এ, ধীরে ধীরে।

বলি, আর কতেক দূর হইতে কালনাগিনি আর কতেক দূর যায়-ও-রে। ধীরে ধীরে।

কাল-না-আ-গি-নি-যাইবার-ও-লা-আ-গি-ল- রে-এ-এ, ধীরে ধীরে।

বলি নোহার আসন নোহার শাসন (লোহার)

নোহার বাস ঘর-ও-রে।

ধীরে ধীরে, কাল না-আ-গি-নি, বা-আ-স-স-ও-রে ঢুকিল রে-এ-এ- ধীরে ধীরে।

পরদা দেবী বলছে-

হে, কালনাগিনি এক্ষণ পরযন্ত বালা লখিন্দরকে সর্প দগংশন করা হলো না কেন?

ক্যামন করে আমি দংশন করব মা পদ্মাদেবী। বেহুলা সতী তার স্বামীকে খেদমত করতেছে, সে চেতন আছে, কেমন করে আমি দংশন করব। পদ্মাদেবী বললে তাই-ই।

বিষের দেবী কালনাগিনি বিষের আছড় দিল বেহুলার চোখে। বেহুলা তখন গভীর ঘুম আইস্যা গেল।

গান

কালনাগিনি কাঁদছে- বলছে-

হামার কোন দোষ নাইরে লখিন্দর। দোষ ও পরদা মায়েরও-রে-এ-এ-এ-আহা-রে

ওহো-রে-এ-এ- কান্দে-এ-কান্দে কালনাগিনীরে

www.pathagar.com

ও-ই-ওরে এ-কো ঠোকর-দু-ই-ও ঠোকর-রে
লখিন্দর-রে- ও-রে তিন-ও-ঠোকরর
দি-ই-লাম রে-এ-এ, আহারে ওহো-রে-এ-এ। কান্দেরে কান্দে-এ কালনাগিনি-রে-এ
তিনও ঠোকর চাইরও ঠোকর রে-ল-ও-খি-ন্দর
ওই-ওরে-পঞ্চম ঠোকর দি-ই-লা-ম-রে-এ
আহা-রে- ওহো-রে- কান্দেরে কান্দে-এ-এ
কালনাগিনি কান্দেরে-এ।
ছয়-ও-ঠোকরের কালে-এ-এর ল-ও-খি-ন্দর-ও-র তোর আঙ্গুলে দংশিলাম রে-এ।
আহা-রে, ওহো-রে-এ। কান্দে কান্দেরে কালনাগিনি-রে-এ।
লখিন্দর বলছে- একী অবস্থা। কী-ই কামড়াচ্ছে।

গান
ওঠো ওঠো বেহুলা স-ও-তী-ই
আঙ্গুলেতে কাম-ড়ালো-ও কী-ই
শোনো-ও-ও-রে বেহুলা-আ-স-তী-ই
আঙ্গুল হইতে ও-কালের বিষ-ষ- গোছাতে (হাঁটুতে) উঠিয়া-আ-আ গে-এ-ল-ও
তবু-ও- বেহুলা না পা-আ-ইল- চৈতন।
ওঠো-ওঠো বেউলা সতী-ই-আঙ্গুলেতে
কামড়ালো-ও-কী-ই-ই
শোনো ওরে বেউলা সতী-ই-ই
বিষের অঙ্গ জইল্যা জ-ও-ই-ল্যা মরি-ই-ই।
শোনো ওরে বেউলা সতী-ই
শোনো ওরে বেউ সতী-ই, আঙ্গুলেতে
কামড়ালো-ও-কী-ই (২)
আঙ্গুল হইতে ও কালের বিষ কোমরে উঠিয়া গেল
তবু বেউলা না পাইল চৈতন।
ওঠো ওঠো বেউলা সতী-ই-ই
আঙ্গুলে কামড়ালো কী-ই
শোনো ওরে বেউলা সতী-ই
আঙ্গুল হইতে ও কালের বিষ বুকেতে উঠিয়া গেল-ও-ও-ও
তবু বেউলা না পাইল চৈতন।

www.pathagar.com

ওঠো ওঠো বেউলা সতী
আঙ্গুলেতে কামড়ালো ক-ই-ই
শোনো ওরে বেউলা সতী-ই।
আঙ্গুল হইতে ও কালের বিষ-ষ
চৌউখেতে (চোখে) উঠিয়া-আ-আ গেল
তবুও বেউলা না পা-আ-ই-ল চৈতন
সোনার অংগ শরীল (শরীর) হামার
কালা বরণ হয়্যা গেল-ও-ও-ও
শোনো ওরে বেউলা সতী-ই-ই
আঙ্গুলেতে কামড়াছে কী-ই-ই
শোনো ওরে-বেউলা-সতী-ই-ই।
আঙ্গুল হইতে ও কালের বিষ-মস্তকেতে উঠিয়া গেল-ও-ও-ও
তবু-ও বেউলা না-পা-আ-ইল চৈতন।
ওঠো ওঠো বেহুলা সতী-ই-ই
আঙ্গুলেতে কামড়াছে কী-ই-ই
লখিন্দরের শরীর নিষেষ্টাভাবে পড়ে গেল
বেহুলার চোখ থেকে কাল নিদ্রা ছুটে গেল।
বেহুলা জেগে বলছে-কী অবস্থা।
স্বামী আমার ছিল শিথানে, পড়ে আছে পৈতহানে (নিচে)
তার আঙ্গুল কেন অক্ত (রক্ত)

গান

ও-ঠো- ওঠো প্রাণের পতি-ই-ই (কেঁদে কেঁদে)
শিথানেতে মমের (মোম) বাতি-ই-ই-ই
তুমি জ্বলাও (জ্বালাও) আ-আ-মি-দে-এ-খি।
পতি আমার কয়না কতা (কথা)
বাজিল মনের বেথা (ব্যাথা) (২)
ওঠো-ওঠো প্রাণ-ও-পতি-ই-ই
শিথানেতে দুধের বা-আ-টি-ই-ই
তুমি-ই- খা-আ-ও, আমি-ই-দে-এ-খি।
ওঠো ওঠো প্রাণের পতি-ই-ই
শিথানেতে মহন বাঁশি (মোহন বাঁশি)
তু-ই-মি বা-জা-ও-ও-আ-আ-মি- শুউনি।

www.pathagar.com

বেহুলা কেঁদে কেঁদে বলছে

ও-রে-আ-আ-রে-এ, এই-এই নি-ই-শী-থ (নিশীথ) রাতের

কা-আ-লে-এ-এ, ও ভগবান শেষ হয়ে গেল-আমার খালিরে।

ছনেকা রানি জেগে উঠলেন, বললেন, জাহাঁপনা- জাহাঁপনা আমার পুত্র ও পুত্রবধু আছে সেই নোহার বাসর ঘরে।

পুত্র বধু কেন কান্দে নিশীথ রাতে।

তুমি আওয়াল (আড়াল) ভাবে শোন কী দশা

শ্বশুর তখন যাচ্ছে আওয়ালভাবে।

বেহুলার কান্না শুনে সে বলছে-

ও-রে-এই নি-শী-থ-ই- আতেরও কা-আ-আ-লে, ও-বৌমা কি-সে-র-ও-কা-ন্দন

আমি শু-উ-নিরে।

বেহুলা বলছে-

ও-রে- এই নিশী রা-ই-তের-ও-গো কালে,
ও আব্বা শ্যাষ হয়্যা গেল আমার (খা-লি...রে)
ও-রে মুছিয়া ফাঁকে সিঁথির সেন্দুর,
ও বৌমা ছেইলাকে-এ-এ- না-আয়া-দিবি
ও-রে এই-ই নিশীথ রাইত তোর ভাগ্য হলে-এ-এ-এ।
ও বৌমা ছেইলাকে না দিবি সেন্দুর-ও-ও-রে।
ওরে বুঝলে না বুঝলে এ-না-গো বুঝলে
আ-আ-ব্বা না বোঝে-এ-এ-মোরে-রে।
ওরে নোহার আসন, নোহার শা-আ-সন
ও-ও-আ-আ-ব্বা নোহা-আ-আর বাসর ঘর-ও-রে।
ওরে এই-ই- বা-আ-স-রে-ও-ও-পতি গো-গো-হায়- হায়
ও আব্বা পথে খা-আ-লো কালনা-আ-গি-নি-সা-আ-পে। এ-এ
কী-ই-ই শো-ও-না-আ-লে-এ-এ-এ- শো-না-আ-লে-এ-
ও-মাও ধন পাষাণে-এ-এ-ভাংগ-ওবো-গো মা-থা-আ-আ-রে।
ও-রে-ছয়টি পুত্র হারারে ভ-গ-ও-বা-আ-ন
ও-ভগবান, ও-কা-লি-ই-দা-হ-সা-আ-গ-রে।
ওরে-শ্যাষা পুত-অ-অ-হা-আ-রা-রে ভগবান।
ওরে-ও ভ-গ-ও-বান নোহার বা-আ-সর-ও-ঘর ও-ও-রে।
হায়-রে-কী-ই-লো, আ-আ-রে-কী-ই-হ-ই-লো- ও-রে
ও ভ-গ-বা-আ-ন-স-ও-র্ব-ওনা-শ-শ।
ও-হ-ই-ল-ও-রে

বেহুলাকে উদ্দেশ্য করে বলছে-

ও-ওরে ফেজ করা শু-উ-নি, চি-র-ও-ও-ল (চিরল)

www.pathagar.com

-গো-দাঁ-আ-তি (দাঁতি)
ও-বউ-উ-মা, তো-ও-ম-রা, স্বা-আ-মী
খা-য়-কা গো জাত-ও-রে। (স্বামী খাগি)
তোম-রা-আ-আ-হইলে-এ-বাইন্যার-আ-র মেয়ে-ই-য়্যা (২)
বেহুলা বলে কেঁদে কেঁদে
গান-
ও-গো-ও-কো-ও-থায়-আ-আ-ছো
বে-এ-নদ-ও (ওজা) ও-ও-ঝা-আ।
এ-স-ও বেনদ আমার বা-আ-ড়ি-ই-ই
যে ভাল কওরিবে পওতিক (পতিকে) দান করিব আমি, আমার বাপের জমিদারী-ই-ই
ওগো-ও-ও-কোথায় আছ-ও-বেনদ-ও ওজা, আ-আ-আ
এসো বেনদ আমার বা-আ-ড়ি-ই-ই-ই।
ওই- আমায় ডাক দিয়েছে বেনদও বলি বাড়ি ন'খালি (২)
যার হওয়েছে কাশের ঝুড়ি অরে সে অস্ত্র করি (২)
সাপে কাটা উনী (রোগী) পারে তার খোয়ায়
মারব-রে বারিন ও খালী
আমায় ডাকদিল কে বেনদ বলে-এ-এ
বাড়ি নখালী। (২)
মা-কে আমায় বেনদ ওজা বেনদ ওঝা
বলে কেড়া সরণ (স্মরণ) করেছ মা।
বেহুলা কেঁদে বলছে-
বাবা, বাবা- আমি সেই বেহুলা সতী।
ও-মা-বেহুলা সতী। তুমি আমায় কেন স্মরণ করেছো।

বাবা-বাবা, নোহার আসন, নোহার শাসন, নোহার বাসর ঘরে কালনাগিনি সাপ আমার স্বামী বালা লখিন্দরকে দংশন করেছে। তাকে তুমি আরোগ্য করে দাও বাবা।

মা-নোহার আসন, নোহার শাসন, নোহার বাসর ঘরে তোমার স্বামী বালা লখিন্দরকে দংশন করছে তাক (তাকে) তুমি ভালা করতে চাচ্চ মা। (চাইছ)

না- বাবা আরোগ্য করে দিতেই হবে।

গান-

কোন কোন সাপনের বিষ উজান-উজান ধায়রে, কোন কোন সাপনের বিষ।
আঙ্গুল হইতে কালের বিষ, গোছার পানে গেল-রে-এ
কোন কোন সাপনের বিষ উজান উজান ধায় রে, কোন কোন সাপনের বিষ।
আঙ্গুল হইতে হাঁটুর মাঝে গেলো-রে কোন কোন সাপনের বিষ।

www.pathagar.com

কোন কোন সাপনের বিষ উজান উজান ধায় রে-এ- কোন কোন সাপনের বিষয়,
আঙ্গুল হইতে কালের বিষ সাপের বিষ কোমরের মাঝে গেলো-রে-এ-এ-এ
কোন কোন সাপনের বিষ; উজান উজান ধায়রে, কোন কোন সাপনের বিষ।
আঙ্গুল হইতে কালের বিষ বুকের মাঝে গেলোরে-এ-এ কোন কোন সাপনের বিষ। উজান উজান ধায়রে, কোন কোন সাপনের বিষ, আঙ্গুল হইতে কালের বিষ চোক্ষের পানে গেলোরে-এ-এ।
কোন কোন সাপনের বিষ উজান উজান দায়-রে, কোন কোন সাপনের বিষ।
আঙ্গুল হইতে কালের বিষ মস্তকপানে গেলো-রে-এ-।
কোন কোন সাপনের বিষ উজান উজান দায়-রে, কোন কোন সাপনের বিষ।
মস্তকপানে গেলো বিষ-এ-এ-এ লখিন্দর মারা গেলো রে-এ,
কোন কোন সাপনের বিষ উজান উজান দায়-রে-এ-এ, কোন কোন সাপনের বিষ।

মা বেহুলা তোমার পতিকে আমি আরোগ্য করতে পারলাম না মা।

বেহুলা বলছে-

বাবা, বাবা, তাহলে কি আমার পতির প্রাণরক্ষা পাবে না।

মা, তুমি যখন আমাকে বাবা বলে ডেকেছো, তাহলে, মা তোমার শ্বশুরের বাড়ি থেইক্যা কলাগাছ কাইট্যা লিয়া আর তোমার বাপের বাড়িত থেইক্যা বাঁশ কইট্যা লিয়া, তোমার শাশুড়ির কাছ থেইক্যা তোমার স্বামীক ভিক্ষা লিয়া তুমি শক্তভাবে একটা ভুলা (ভেলা) তৈয়ার করে নিয়ে তোমার পতিক লিয়ে দেবলয়নগরে. চলে যাও। ওটি (ওখানে) যায়্যা পদ্মা দেবীর দাসী আছে, তাকে মাসিমা-মাসিমা বলে ডাকতে পার-তাহালে তোমার পতিকে বাঁচবে।

গান

ও-ও-রে- আমার বাবার বা-আ-আ-ড়ি শ-ও-রে, কা-আ-টি ওইনা
শ্বশুরের ক-লা-র গাছ-ও-ও-রে, ওরে শক্তভাবে-এ, বা-আ-ন-লাম,
ভু-উ-রা-আ (ভেলা), ও-ভগ-ও-বান কী বলি-এ-এ-ব-ও-মো-ও-রে-রে।

চাঁদসওদাগর ছনেকা দেবীকে বলছে- আমার পুত্রবধুর থেইক্যা আমার পুত্রকে নিয়ে আস। শ্মশানে নিয়ে যাব।

বেহুলা কেঁদে বলছে-

আম্মা, আম্মা গো, আপনার পুত্রকেতো শ্মশানে নেওয়া হবে না মা। আমাকে আমার স্বামীকে ভিক্ষা দাও। মা, আমি আমার পতিকে নিয়ে চলে যাব সেই দেবালয় নগরে, তোমার ছেলের জীবন রক্ষা করতে।

গান

ঐ পঁচা পঁচা কলার ভুউরা মাগনাতি যায় কতেক দূর। যা-আ-ব-ও

www.pathagar.com

আ-আ-মি দেবা-আ-লয় নওগও-রে-এএ-তে-হে (২)

সওদাগর ও বৈদেশি সওদাগরও রে-এ-এ (২)

দেবালয়নগরে ভেলা চলছে। পথে দুই সওদাগর। ভিনদেশি নাও, বেহুলাকে দেখে তারা বলছে-

গান

ওরে কোন শহরে-এ-এ বা-আ-আড়ি-ই-গো

তোওমার-আ-আ-র, ওগো কইন্যা কোওন শ-ও-হর-রে, ঘর-ও-ও-রে।

ওরে সত্য কইর‍্যা কইও ও-মো-ও-র কওইন্যা। ও-ও-কইন্যা, দেও-ও-প-ও-রি-চয়-ও-রে, ওরে-ও-এ-এ কী-ই-নাম, তোওমার-ও কইন্যা কী-ই বা-আ-আ পিইতা-ম-তা-র না-আ-ম (নাম) ও-ও-রে।

বেহুলা বলছে-

ও-রে-উজানি নওগ-ও-রে- (নগরে) বা-আ-ড়ি গো-ও-আ-মা-আ-র, ও-রে-এ-এ, ওইনা-উ-উ জা-আ-নি-ই, ন-গ-ও-র-ও-রে ঘ-ও-র-ও-রে (ঘর)।

ও-ও-রে পি-ই-তা-আ-র-না-আ-আ-ম-টি, আ-বা-সু-আ বে-ই-ন্যা, ও-ও-বি-ই-দে-ইশি (বিদেশি) আ-মা-র-আ-র, না-আ-ম- বে-হু-উ-লা-আ-আ-রে

ও-ও-রে ম-ও-র (মৃত) স্বা-আ-আ-মী লয়্যা-গো (নিয়ে) আ-আ-ছি।

ও-ভগ-ও-ও-বান। যাব দে-আ-বা-আ-ল-য়, ন-ও-গ-ও-রে-এ-এ-এ।

পথিমধ্যে বেহুলা সোন্দরী দেকে- এক ধোপিনী-ই কাপড় কাঁচিচ্ছে (কাচছে)। তার ছেলেটা খুবই দুরন্ত। কতা শোনে না। ধোপিনী-ই পুত্রের ঘাড় মইটক্যা থুইয়্যা দিছে পাটের নিচে। আবার কাপড় কাচা শ্যাষ হতি-ই ও-ক (ওকে) জীবিত করে লিয়ে চলে যায়। বেহুল তিন দিন তাই লুকায়্যা দেকে। সে দেকে এই ধোপিনীতো জাদু জানে। সে ভুড়া থেইক্যা নেমে আইস্যা ধোপিনীর পায়ের কাছে পড়ে। তার কাছে পতি লখিন্দরের প্রাণ ভিক্কা (ভিক্ষা) চায়। সেই ধোপিনীর নাম নেতাই। বেহুলা সোন্দরীর কতা শুনে তার দয়া হয়। সে বেহুলা সতীকে দেবপুরীত নিয়ে রাজি হয়।

বেহুলা দেবালয়নগরে যায়, গিয়ে মাসিমা মাসিমা বলে ডাকতে থাকে।

তুমি কে?

মা, আমি সেই উজানিনগরের বাসু বেইন্যার বেটি (মেয়ে/কন্যা)। আমার নাম বেহুলা সোন্দরী।

আমার তো কোন বনের বেটি নাই কোনটি (কোথাও বোনের মেয়ে) তুমি কে। তোমায় তো চিনি না আমি।

আমার মা বলছিল দেবালয় নগরে তোর মাসিমা আছে। কোন বিপদে পড়লে তার কাছে গেলে উদ্ধার পাবা।

কি জন্য এটি আচ্চ? (কেন এখানে এসেছ)

www.pathagar.com

মা, নোহার আসন, নোহার শাসন, নোহার বাসর ঘরে আমার স্বামীকে কালনাগিনি সাপ দংশন করছে, তাকে ভাল করে দিতে হবে।

মাসি বলছে- তুমি যখন আসছ মা ডুব-গোসল দাও। খাদ্য-খানা খাও।

না মাসিমা আমার স্বামী যতক্ষণ ভাল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ডুব-গোসল, খাদ্য-খানা কিছুই করব না।

ঠিক আছে বেহুলা। তুমি এখানে থাক। আমি পদ্মাদেবীর কাছে যাই। বিবরণ শুনি।

মাসি দৌড়াতে দৌড়াতে পদ্মা দেবীর কাছে এল।

পদ্মা দেবী বলছে-

কী কারণে দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে এলে?

উজানি নগরের বাসু বেইন্যার মেয়ে বেহুলাসতী আমার বোনের বেটি (বোনের মেয়ে) তারে কালনাগিনি সাপে দংশন করছে। আরোগ্য করতে হবে।

পদ্মাদেবী এ কথা শুনে শিবকে ডাকতে লাগল। বলল, বাবা, উজানীনগরের বেহুলার স্বামী লখিন্দরকে আমি কালনাগিনি দিয়ে দংশন করাইছি। সেই বেহুলা তার স্বামীকে নিয়া দেবালয়নগরে আসছে আরোগ্যর জন্য, কী করা হয়।

শিব তখন বলছে-

মা, বেহুলা সোন্দরী যদি তার শ্বশুরের কাছ থেকে মনসার পূজা নিতে পারে তাহলে আরোগ্য হবে।

পদ্মা তার মাসিকে এ কথা বলে পাঠালো। মাসী এসে বেহুলাকেও পদ্মার সংকল্পের কথা জানালো। আমি তোর স্বামীকে ভালো করে তুলব, যদি আমার মনসা মার পূজা চাঁদসওদাগরের কাছ থেকে নিতে পারিস।

বেহুলা সোন্দরী বালা লখিন্দরের লাশ ওখানে রেখে দৌড়ে এলো তার শাশুড়ির কাছে। বলল, আব্বাকে বল, আমি আমার স্বামীর জীবন বাঁচাতে পারি, যদি সে মা মনসার পূজা দিতে পারে।

ছনেকা রানি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল-

জাহাঁপনা, জাহাঁপনা, একে একে ছয়টা পুত্র আমার কালিদহ সাগরে বিসর্জন দিয়েছে নোহার আসন, নোহার শাসন, নোহার বাসর ঘরে আমার বালা লখিন্দরের সর্প দংশন হইল। আমার ছেলের জন্য মনসা পূজাটা দেও (দাও)। না করলে নইলে আমি পুত্র বধূকে নিয়ে এই গভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

চাঁদসওদাগর বলছে- ছনেকা রানি, ছনেকা রানি, তুমি গভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মরো না, আমি মনসা দেবীরে পূজা দিব, তবে ডান হাত দিয়ে না, বাঁ হাত দিয়ে পিছন দিয়ে পূজা দেব।

মনসাপূজার জন্য চাঁদসওদাগরকে নিয়ে দেবালয়নগরে গেল। মনসার পূজা দিল।

গান

সাপুড়ে এসে লখিন্দরকে ঝাড়ছে-

কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ।

www.pathagar.com

মস্তক হইতে কালের বিষ চোক্ষের (চোখের) পানে আইল রে-এ-এ,

কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ।

মস্তক হইতে কালের বিষ গলার পানে আইল-রে-এ-এ, কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ। (২)

মস্তক হইতে কালের বিষ বুকের পানে আলো (আসল)-রে কোন কোন সাপনের বিষ-ই-ষ।

কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামল-রে-এ (২) মস্তক হইতে কালের বিষ কোমরেতে (কোমরের) নামল-রে-এ কোন কোন সাপনের বিষ।

কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ। (২)
মস্তক হইতে কালের বিষ হাঁটুর পানে গেলোরে-এ-এ-এ
কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ, মস্তক হইতে কালের বিষ গোছার মধ্যি গেলোরে-এ-এ,
কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ মস্তক হইতে সাপের বিষ পায়ের পানে গেলো রে। কোন কোন সাপনের বিষ-ই-ষ।
কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ।
পায়ের পানে ছিল বিষ, জমিনেতে পলো রে (পরল রে)

কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ।

জমিনেতে গেল বিষ, উগী (রোগী) ভাল হইলরে-এ, কোন কোন সাপনের বিষ ধীরে ধীরে নামলরে-এ কোন কোন সাপনের বিষ-ই-ষ।

বেহুলাকে মাসি বলছে, এখন তুমি ডুব গোসল দিয়ে খাদ্য-খানা খাও
বেহুলা বলছে-
না মা, আমি এখন খানা-খাদ্য খাইতে রাজি না।
কেন মা খাবে না।

বেহুলা কেঁদে বলছে মা- আমার ছয়টা ভাসুরকে নিয়ে আমার শ্বশুর কালিদহ সাগরে বানিজ করতে গিয়েছিল। তারা ডুবে ম'লো, সেই ছয়টা ভাসুরক (ভাসুরকে) আমি চাই। মাসি একে একে মণ্ডপ থেকে ছয় ভাসুর নিয়ে এলো।

অবশেষে ছয় ভাসুর, পতি ও শ্বশুর শাউড়ি নিয়ে আপন দেশে ফিরাত আ'লো (এলো)।
এর নাম বেহুলা সতীর পালা।

পালাকারের পরিচয়

আব্দুর গফুর পরামানিক (৭০)। বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার পীড়াপাট গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম কর্মতূল্য ফকির। ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের যাত্রাগান, পালাগান তাকে আকৃষ্ট করত। যৌবনে পেশা হিসেবে কৃষি কাজকে বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের মধ্যভাগে এসে জীবিকার তাগিদে পালা গাইতে শুরু করেন। শীতকালে বগুড়া জেলার আশেপাশে এলাকাসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দল নিয়ে পালাগান করতে যেতেন।

www.pathagar.com

বয়স বাড়ার কারণে দূরদূরান্তে যেতে পারেন না। তিনি বেহুলা লখিন্দরের পালা, সত্য নারায়নের পালা, মনসার পালা, ফতেহ্ আলীর পালাসহ বিভিন্ন পালা গেয়ে থাকেন। একতারা, দোতরা, খঞ্জনি, ইত্যাদিই তার গান গাওয়ার যন্ত্রপাতি।

অসুস্থতার কারণে তিনি পুরো গীতটি দুই দফায় দুই দিনে গেয়ে শুনিয়েছেন। প্রথম দিন ৮ জুলাই ২০১১ এবং পরবর্তীতে ১৫ জুলাই পালা শুনিয়েছেন। অবশ্য ১৫ জুলাই দ্বিতীয় কিস্তিতে বেহুলা পালার বাকি অংশ সংগ্রহ করতে এলে সেদিন তিনি বেহুলার বাকি অংশ ছাড়াও একটি বউবন্ধক পালাও শুনিয়ে দেন।

তিনি পালার গান গাইতে শুরু করলে বারান্দায় আশেপাশে বিভিন্ন বয়সের মানুষের আগমন ঘটে। খোকা, আজিজার, ইসরাইল, রমেসা, আঞ্জেলা, প্রমুখ এসে পালাগান শোনেন।

খ. বউবন্দকপালা

পালা-১

বউবন্ধক পালার বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কাহিনির বিস্তার ঘটেছে উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর জেলার ভাষা, আচার অনুষ্ঠান ও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশকে ঘিরে। মূলত ঐ অঞ্চল থেকে ধান কাটার মৌসুমে আসা কামলাদের মাধ্যমে বউবন্ধক পালাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। সারাদিন কামলা খাটার পর সন্ধ্যার সময় অবসরে তারা বউবন্ধকসহ আরো নানা পালা ধীরে ধীরে বগুড়া অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে। ধীরে ধীরে এটি পূর্ব বগুড়াসহ নানা অঞ্চলের গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কথা ও গানের সমন্বয়ে এই গীতটি সকলের মুখে ফিরতে থাকে। এই পালাটি বাড়ির উঠোনে বা খোলা জমিতে বৃত্তাকারে বসে গীত হয়। পালা পরিবেশনার কোন মঞ্চ থাকে না। পালাকারদের গোলাকার অবস্থানের চারদিকে তিন চার হাত জায়গা ফাঁকা রাখা হয়, এখানে পালা বাদ্যযন্ত্রের দোহার বসে। তারপর দর্শকরা গোলাকার হয়ে বসে পালা উপভোগ করে। অভিনেতাদের অবস্থান থাকে একটু দূরে। দর্শকদের মাঝখান দিয়ে অভিনেতাদের যাতায়াতের পথ থাকে আগমন ও প্রস্থানের জন্য। পালা পরিবেশনার সময় বাঁশি, হারমোনিয়াম, ঢোল, মন্দিরা, খোল, ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে দোহারগন গান গেয়ে থাকেন। অভিনেতাগণ তাদের নির্ধারিত গোলাকার বৃত্তে ঘুরে ঘুরে পালায় অভিনয় করেন।

এই পালায় অভিনীত চরিত্রের চিত্রায়নে পুরুষ অভিনয় করে। নারী চরিত্রে পুরুষই নারী সেজে অভিনয় করেন।

অভিনেতাদের বেশিরভাগ পোশাক পরিচ্ছদ উজ্জল রং এর কাপড় দিয়ে তৈরি। প্রসাধনের ক্ষেত্রে তারা ঠোঁটে রং, চোখে কাজল, গালে গোলাপি রুজ পাউডার ব্যবহার করে থাকে।

বগুড়ার কাহালু উপজেলায় দুইটি বউবন্ধক পালার সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি পিড়াপাট ইউনিয়নের বাগইল গ্রামে, আব্দুল গফুর পরামানিক (৭৩) এর গীতপালা।

www.pathagar.com

অন্যটি যোগীর ভবন গ্রামের পুষ্প চন্দ্রের (৭২) নিকট থেকে প্রাপ্ত বউবন্ধক পালার কাহিনি।

পুষ্পচন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পালাটিতে গুরু সেবায় শিষ্যের কর্তব্যপরায়ণতারই প্রমাণ মেলে। এই পালাতে গুরু সেবায় ব্যয়ভার মেটানোর জন্য দরিদ্র শিষ্য নিজের স্ত্রীকে অন্যের কাছে বন্ধক রেখে অর্থ জোগাড় ও অন্ন জোগাড় করে। গুরুর সন্তুষ্টি লাভই পরমধর্ম। গুরুদের তার শিষ্য বাসুয়াকে ডেকে নিয়ে শিষ্য রঙিলার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য রওনা হলেন। রঙিলা জানতে পারল গুরুদেব তার বাড়িতে আসবে। তাই সে শাহার নামে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেল। ধনীব্যক্তি শাহার কঠোর নিষেধ কাউকে চাউল ভিক্ষা দেয়া যাবে না।

রঙিলার অনেক অনুনয় বিনয়ে কোমলপ্রাণ শাহার স্ত্রী বাধ্য হয়ে তাকে চাউল ভিক্ষা দেয়। পথে রঙিলার সঙ্গে শাহার দেখা হলে শাহা সন্দেহবশতঃ বাসুয়ার ঝোলা পরীক্ষা করে তার বাড়ির কাটারিভোগ চাউল দেখতে পায়। সে রঙিলাকে ভর্ৎসনা করে চাউল কেড়ে নেয়।

গুরুদেবের কাছে ছোটবেলায় গুরুমন্ত্র নেয়ার পর প্রথম দেখা হওয়াতে গুরুদেরকে চিনতে পারে না রঙিলা। পরে বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণে চিনতে পেরে গুরুভক্তি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘরে অন্ন নেই। গুরুকে কিভাবে সেবা করবেন। উপায়ান্ত না দেখে রঙিলা ছুটে যায় শাহার বাড়িতে। বলে ভিক্ষা না দাও কিছু চাউল আর টাকা ধার দাও। শাহা জানতে চায় পরিমান। রঙিলা ৫ সের চাউল ও ৫ টাকা ধার চায়। চতুর শাহা কিছু বন্ধক ছাড়া চাউল ও টাকা দিতে রাজি হয় না। তখন সাধু সেবা করার জন্য রঙিলা কোন উপায় না দেখে তার প্রাণ প্রিয় স্ত্রী কিরনকে শাহার কাছে বন্ধক রাখে। এই সুযোগে শাহা একটি সাদা কাগজে ৫ টাকার বদলে ৫০০০ হাজার টাকা এবং ৫ সের চাউলের বদলে ৫ মণ চাউল ধার নেওয়ার কথা লিখে নিরক্ষর রঙিলা কে দিয়ে টিপ সই নিয়ে নেয়। রঙিলা খুশি মনে বাড়ি গিয়ে তার গুরুর সেবা করে। অন্যদিকে চতুর শাহা চিন্তা করে বুদ্ধি বের করে যে সাদা কাগজে যাহা লেখা আছে রঙিলা তা কোন দিন শোধ করতে পারবে না তাই সে রঙিলার স্ত্রী কিরণ কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। এদিকে টাকা ও চাউল জোগাড় করে রঙিলা তার স্ত্রী কে ফেরত নিতে শাহার বাড়ি আসে। পাঁচ হাজার টাকা ও পাঁচ মণ চাউল পরিশোধের কথা শুনে নিরুপায় রঙিলা বাড়ি ফিরে যায়। শাহা কিরণকে বাড়িতে আটকিয়ে রেখে চাপ দিতে থাকে কিরণ বুদ্ধি করে সময় বাড়াতে থাকে এবং বিয়ের চুক্তি বাবদ কিছু শর্ত শাহাকে দেয়। কিরণ শাহাকে বলে তার স্ত্রী সাহানিকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে। শাহার সব সম্পত্তি কিরণের নামে লিখে দিতে বাধ্য করে। শাহা কিরণের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে কিরণের নামে সব কিছু লিখে দেয়। এ দিকে রঙিলা টাকা ও চাউল জোগাড় করে শাহার বাড়ি আসলে কিরণ শাহাকে বিয়ে করতে অপরাগতা জানান। রঙিলার সাথে কিরণ বাড়ি ফিরে গিয়ে সুখে সংসার করতে থাকে। অন্যদিকে সহায় সম্পত্তি ও স্ত্রী কে হারিয়ে শাহা বনে চলে যায়।

www.pathagar.com

পালা-২

এক ভিক্ষুক ভিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজার বাড়ি ভিক্ষা করতে আসে। রাজবাড়িতে যাবার পর রানির সাথে ভিক্ষুকের দেখা হয়। রানি আগমনের উদ্দেশ্য জানার পর বলল, রাজা তোমাকে দেখলে তোমার ভিক্ষার ঝুলি কেড়ে নিবে। তুমি রাজবাড়ির পথ দিয়ে না গিয়ে প্রসাদের পিছনের পথ দিয়ে চলে যাও। রাজা কিন্তু রাগি এবং কৃপণ এরপর রানি জিজ্ঞোস করে বাবা তোমার ঝোলায় কী আছে। ঝোলায় আর কী থাকবে মা। এই ঝোলার মধ্যে আছে হরি নামের মালা। আর দুইডা বউ আছে বাড়িতে। তখন ঐ রাজার বউ দুই সের হিঙ্গল ধানের চাউল (শ্যাইল্যার ধানের চাউল/পোলাও চাল) আর দুইডা ট্যাকা দিল।

...রাজার বউ কচ্ছে বাবা হামার স্বামী গরিব মিসকিনকে দেকপার পারে না। ফকিরের ঝোলা কাইড়া ল্যায়। বাদশার নাম নিমকখর বাদশা। তুমি খেতের আইল ধইর‍্যা (আইলা ঘাটা) পার হয়া সট কইর‍্যা চইলা যাও।

...নিমকখর বাদশা মুকের আগত পরছে (সামনে পড়া বা মুখোমুখি হওয়া)। নিমকখর বাদশা কচ্ছে এই সাজুর ব্যাটা তুই কোনটি গেছলু?

...বাবা জাহাঁপনা আমি দরবারেত ভিক্ষা চাবার গেছনু। রাজার বাড়িত ভিক্ষা চাবার গেছনু।

...রাজা বললো তোর ঝোলামাটা হামাক দেওয়া লাগবি।

ভাই, বাদশা নামদার। হামার ঝোলা লিয়্যা কি করবেন। ঝোলা ছিড়্যা। বাদশাহ্ ঝোলা কেড়ে নিতে চায়।

সাজু বলে, ঝোলা নিয়া কী করবেন জাহাঁপনা। হামার দুইডা বউ ঘরে শুতে বসে থাইক্যা খায়। বাজার থেকে কাপড় লিয়া আইস্যা দেই। অগ্যোর একজনাক বন্দক থুয়ে দেই। সকনি সে (বালা বাইন্যা দিবি)।

...রাজা ঝোলা কাইড়্যা লিবি।

...পাড়ার মধ্যে বউ দুট্যা হামাক কেউ খুচে দিবার লয়।

...ভিক্ষুক তার বউদের বলছে বাদশাহ্ নামদার জোর করে হামার ঝোলা কাইড়্যা নিছে।

...ভিখারি কান্দিচ্ছে আর বলছে-

...-ওরে এ-এ-এ হাতে ধরি, পায়ে ধরি, জোড় হাতে মিন্নতি ই-ই করি। দয়া করে ও রে রাজা দে মোর ঝোলাড্যা।

...ওরে তুইতো হলু বারে লয়া ধনীই ই-ই-ই ক্যা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিস না।

... আয়া-আ-র ঝোলা হামি তোক দেমু।

...রাজা বলে, তুই এক কাম কর, তোর বউর কাছে (কিরনশরি) যায্য বলিস কিছু বন্দক থুয়ে ঝোলা লিয়ে যাওয়া লাগবি।

...সাজু কানতে কানতে বাড়িত যাচ্ছে। দুই বউ (রইঙ্গা ও কিরনশরি) আস্তাত (রাস্তা) দাঁড়ায়্যা আছে। কান্দিছে আর কচ্ছে-

www.pathagar.com

... রানিমা চাউল আর চুপকরিয়ে আরও দিল মোরে দুইট্যা ট্যাকা।

...আ-আ আজি আস্তায় আসার সোমে ঝোলাড়া নিল কাড়িয়া।

...ভিক্ষুক তার স্ত্রী (কিরনশরি) কে বলছে তোকে বন্দক রাইখ্যা গুরু সেবা করবো।

বড় বউ আর স্বামী বুদ্ধি করে ছোট বউকে বন্দক দিতে নিকমখর বাদশার কাছে গেল।

ঝোলা আনতে বউকে নিয়ে রাজার বাড়ি রওনা হয় সাজু। রাজার বাড়ি পৌঁছায়ে রাজ দরবারে বাদশাহর সামনে কিরনশরিকে বন্দক রাখতে চায় এমন আবদার জানালো। বিনিময়ে ভিক্ষার ঝোলা ফেরত চায়। রাজা দেখেন ভিক্ষুকের বউ সুন্দরী। বাদশাহ তার মুহুরিকে বললো ভিক্ষুর বউ দেখনেওয়ালা। সোন্দরী। মুহুরিকে ডেকে রাজা ভিক্ষুককে পাঁচ সের চাউল আর পাঁচ টাকা দিতে আদেশ করলেন।

কেরু মুহুরি ভিক্ষুককে বলল হামি বউ বন্দক দানি করতে পামো না।

... মুহুরি বলে পাঁচ মন চাউল আর পাঁচঘড়া ট্যাকা দিয়া তোর বউকে ছাড়া লিয়া যাস।

...কেরু মুহুরি প্রস্তাবদেয় বাড়ি গিয়া টাকা পয়সা জোগাড় করে বউকে নিতে আইস। বউকে বন্দক দিয়ে স্বামী চলে যাচ্ছে। বউ কাঁদছে আর বলছে

...আজি কান্দিয়া কান্দিয়া স্বামীধন যাইচ্ছে। সরিরে লিবার জন্য টাকা পয়সা লিয়া স্বামীধন আইসরে নিতে।

... আজি কান্দিয়া কান্দিয়া স্বামীধন যাইচ্ছে চলিয়ে-এ-এ-এ-এ। টাকা পয়সা যোগাড় করেরে স্বামীধন আইস রে নিতে।

...বহু দুঃখে ভিক্ষুকের বউ কাঁদছে।

...নিমকখর বাদশাহ ভিক্ষুকের বউ কিরনশরিকে বলছে কিরনশরি আইজ হইতে তুমি আর হামি। হামরা দুজন আর কেউ লয়। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

...কিরন বলছে হবি-ই-বারে হবি। আবার কিরনশরি বলছে বিয়ে যদি হামায় করিস তবে অষ্ট অলংকার ভেড়া ভেড়ি, সাড়ে তিনবিঘা ভিওও (ভূমি-জমি), দিঘি পুস্করিনী, জোত জমি সম্পূর্ণ হামার নামে লিকে দিবার পারলে নিকা বসমু।

...ওরে-রে-এ আরও নিমু রে এ-এ গলার মালা- আ-আ-আ- আরও নিমু বারে কানের মাড়কি (মাকড়ি)। তারপরে তে ও মোর বাদশাহ ভূসবো স্বামী।

...ওরে-এ-এ আরও নিমু রে দাবনার বাজু-উ-উ-উ

... আরও নিমু বারে হাতের চুড়ি-ই-ই-ই তা-আ-র-প-রেতে-তে ভূসবো রে-স্বা-আ-মী।

...ও-ও-ওরে আরও নিমো বারে কোমরের বিছা-আ-আ।

...আরও নিমো বাদশাহ পায়ের চারঘোছি (খাড়ু)। তার পরে এ-এ-এতে ও মোর বারে বুঝবো রে স্বামী। ওরে-এ-এ আরও নিমু বারে ভেড়াভেড়ি-ই-ই-ই।

...আরও-ও-নি-ই-মু-উ-বা-রে এ-এ- জমা-আ-আ- জ-মি-ই-ই।

www.pathagar.com

তার-র প-র-এ-এ তে- বুঝব-রে স্বা-আ-আ-মী। বাদশাহ শোনার পর বলছে কিরনশরি-ই- তোমাক হামি সব দিমু।

...বাদশাহ কিরনশরির চাহিদা মাফিক সব লিখে দিয়েছে। গয়না দিয়েছে। কিন্তু কিরনশরি নিমকখর বাদশাকে বলছে। এবার হামি তোমাক বিয়্যা করবো রে স্বামী।

... শহরে নিমকখর বাদশাহর জমিজমা সংক্রান্ত মামলা আছে। তাকে হাজিরা দিতে শহরে আসতে হবে।

বাদশা বলছে।

...আজি বিটিংপত্র সাজিয়া আন তা-আ-ড়া তা-আ-ড়ি। ও রে-রে ঢা-আ-আ-কা-র মা-হ-রেত আ-আ- ছে মামলারে। কোটের ফৌজদারি।

...ওরে-রে বোগড়া শহরেত-আ- আ-ছে মামলারে। কোটের ফৌজদারি। এদিকে সাজু বড় বউ রাইঙ্গা তার স্বামীকে চাহিদা মত টাকা পয়সা ও চাউল দিয়া বাদশাহ্র বাড়ি পাঠাচ্ছে। ছোট বউর বন্দক ছুটিয়ে আনতে।

...এদিকে বাদশাহ্র বিয়ের খবর বড় রানির কাছে গেল। রানি বলল তুমি যে কিরনশরিকে বিয়ে করছ ওর গলায় তো ঘ্যাগ আছে।

...বাদশাহ্ বলছে কৈ ঘ্যাগ? আমি কিরনশরিকেই বিবাহ করিব। বাদশাহ্ কিরনশরি কে বিয়ে করে। রানি জানতে পেরে কাছে গিয়ে বলে, তুমি রাজার সাথে বিয়া বসিচ্চ কেন? তোমার এটি বিয়ে বসলে সতিন ঘর হবি। রাজা শহরে নি গেলে রানি গোপনে কিরনশরিকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। নতুন রানি বনবাসে বসে কাদঁছে আর বলছে-

...ওরে-এ-এ সাত দিন হলো খা-ই-নি। কান্দেরে এ-এ-রে মোন প্রাণ-পিয়ারা। দয়া করে-এ-এ-ও মোর ভূজায় মা দে-মোরে-এ-এ খাবার-র। রাজা শহর থেকে এসে নতুন রানিকে খুঁজে পায় না। জানতে পারে নিমকখর বাদশাহ্ শহরে যাবার পর নতুন রানি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কিছু দিন পর রাজা ও রানি বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে গান শুনতে পায়। রাজা বুঝতে পারে এটি কিরনশরির গলা। রাজা মন্ত্রীকে আদেশ করেন নতুন রানিকে রাজবাড়িতে নিয়ে আসতে। এ দিকে স্বামী টাকা পয়সা যোগাড় করে বউকে নিতে আসে সাজু। রানি সুযোগ বুঝে সাজু ভিখারির কাছে কিরনশরিকে ফেরত দেয়।

... এভাবেই শেষ হয় বউবন্ধক পালা।

গ. লছিমনপালা

বগুড়া থিয়েটারের উদ্যোগে বগুড়া পৌর পার্কে অনুষ্ঠিত পাঁচদিন ব্যাপী বৈশাখি মেলার শেষদিন রাত ন'টায় একতা নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় লছিমনের পালা পরিবেশিত হয়। রাতে আমরা পালাটির পরিবেশনা দেখি এবং রেকর্ড করি। কিন্তু এর শিল্পী কলাকুলশীদের সার্বিক তথ্য এবং পরিবেশনা রীতি সম্পর্কে আরও তথ্যের প্রয়োজনে পরদিন সকাল ১০টায় আমি (আল-জাবির) একতা 'নাট্যগোষ্ঠী'র ঠিকানা-বগুড়া সদর উপজেলার মানিক চকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সকাল সাড়ে দশটায় সেখানে পৌছি এরপর শিল্প কলাকুশলীদের সঙ্গে কথা বলি। নিচে লছিমন পালার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলো :

www.pathagar.com

লোকনাটক সংগ্রহের নিমিত্তে করতোয়া নদীর পূর্বাংশে বগুড়া সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের মানিকচক এবং কর্ণপুর গ্রামে মূলত যে স্থান থেকে বগুড়ায় 'লছিমন পালা'র নব উন্মেষ ঘটে সেই স্থানটিকে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিভূমি রূপে গ্রহণ করা।

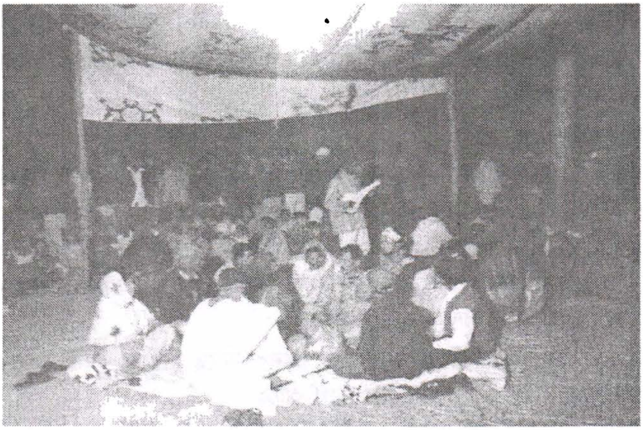

লছিমন পালা পরিবেশনা, বগুড়া সদর

পুণ্ড্রনগরে যুগে যুগে সমগ্র বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর আগমন সাধিত হয়েছে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী বহন করে নিয়ে এসেছে আপন আপন সংস্কৃতি। মিশ্রন ঘটেছে সকল ঐতিহ্যের; হয়তো এমনই এক জনগোষ্ঠী কোনো এক সময়ে 'লছিমন' নামক মনহরিণী রমণীর জীবনগাঁথা কোনো এক লোকাকীর্ণ আসরে পরিবেশন করেছিল। আর সেই থেকে নাট্যরস আস্বাদি বগুড়াবাসী এই 'লছিমন পালা'কে নিজেদের সংস্কৃতির অংশ করে নিয়েছিল; যা আজও রজনিব্যাপী লোকালয়ে পরিবেশিত হয়ে চলেছে।

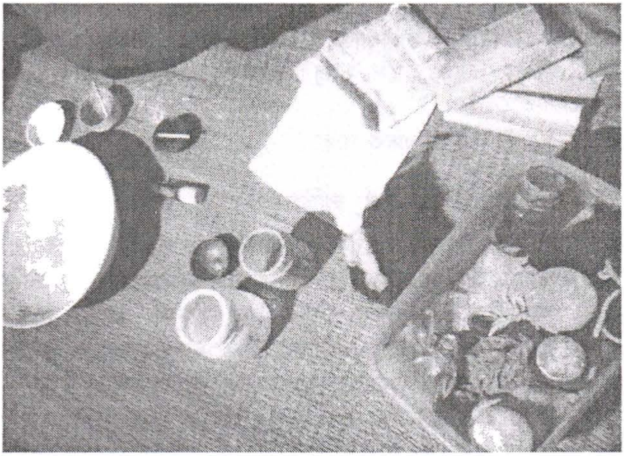

লছিমন পালার রূপসজ্জার উপকরণ

www.pathagar.com

লোকনাট্যের ক্রমবিকাশের ধারা বৈশিষ্ট্যদৃষ্টে 'লছিমনে'ও পরিবর্ধন-পরিমার্জন ঘটেছে কালে কালে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে 'লছিমন' মধ্যযুগেরই নাট্যনিদর্শন। বিকাশ লগ্নে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিবেশিত হলেই অত্র অঞ্চলের গায়েন কর্তৃক উপস্থাপনে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হয়ে থাকে। কাহিনিতে তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত না হলেও কমেছে আদি রসের আধিক্য। বর্তমানে এর পরিবেশনাতে মৌলিক গানের পাশাপাশি হঠাৎই শোনা যায় সিনেমার গানের কলি; তবে তা কেবল ক্ষণিকের নিমিত্তে (লছিমনের পাইলদার আব্দুল মান্নানের ভাষ্যানুযায়ী এটা হচ্ছে "পাবলিক ডিমান্ড; হামাকেরে গানের মোদ্দে এ্যনা (একটু) ছিনেমার গানের টুং-টাং দেই, তাত্ (সে জন্য) দর্শক ভিন্ন টেস্ট পায়। তদুপরি উত্তরাধুনিকতায় উপনিত হয়েও 'লছিমন'-এর স্বাতন্ত্রতা অক্ষুন্ন রয়েছে সুরে, কাহিনিতে সর্বপরি আঙ্গিকে।

লছিমন অভিনয়ের নির্দিষ্ট কোন কাল পরিদৃষ্ট হয় না। তবে ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে এ গানের আসর অবশ্যই বসে থাকে। এ নিয়মটা হয়ত হিন্দু প্রভাবজাত কিন্তু কালপ্রভাবে আজোবধি সে ধারা অক্ষুন্ন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দিক থেকে অনুকূল পরিবেশেই সাধারণত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লছিমনও প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশে উপস্থাপিত হয়। সাধারণত বর্ষাকালের পর, বিশেষ করে নতুন ফসল ঘরে তোলার পর থেকে গ্রামাঞ্চলে লছিমনের আসর বসা শুরু হয়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি ছাড়াও সাধারণত পূজা-পার্বণ, নবান্ন-অন্নপ্রাশন, বিয়ে বাড়ি, বৈশাখি মেলা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে অন্যসব লোকনাট্যের মতন লছিমন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এমনকি লছিমনপালা পিপাসু সৌখিন ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ সময় এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন। আগে লছিমন সন্ধ্যায় বা একটু রাত্রে শুরু হয়ে পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত চলতো। কিন্তু বর্তমানে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠানের সময়কে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। অবশ্য এখনো সারা রাতব্যাপী লছিমন পালা পরিবেশিত হয়।

দল পরিচিতি : দলের নাম : একতা নাট্যগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৯ সালে, স্থান : গ্রাম : মানিকচক, ইউনিয়ন : রাজাপুর, উপজেলা : বগুড়া সদর, জেলা : বগুড়া, দলের প্রতিষ্ঠাতা : লবানু সর্দার, দলের ম্যানেজার : আফসার আলী, দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা : ১২ জন, দলের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১৭ জন

দলের কথা

মধ্যবয়সি, আপনভোলা, গান পাগল মানুষটির নাম লবানু। যেখানেই গান-বাজনার আসর সেখানেই তিনি, তা নিজ গ্রাম মানিকচকেই হোক বা দু-চার-দশ গ্রাম দূরেই হোক তিনি হাজির হয়ে যেতেন। এমনই এক আসরে জয়পুরহাটের কালাই থেকে আসা দলের এক নতুন আঙ্গিকের নতুন স্বাদের কাহিনির পরিবেশনা দেখলেন। মুগ্ধই শুধু হলেন না ঠিক করলেন নিজেই তৈরি করবেন এই পালার দল। তার এ উদ্যোগে জুটলো আরও কতক ক্ষ্যাপা, তাদের মধ্যে ছিলো আফসার আলী, আব্দুল মান্নান, রফিকুল ইসলাম, ইউনুস, আকবর আলী, আজিজুর রহমান, টুকু, জাহিদুল প্রমুখ।

www.pathagar.com

সাতদিন টানা রাতের পর রাত অক্লান্ত শ্রমে আয়ত্ত করলেন নিজের অঞ্চলের কথ্যভাষায় 'লছিমন'-এর মহিনী সুর, চিত্তাকর্ষক প্রণয়কাহিনি আর দেহের ছন্দময় চলন। সেই থেকে অন্যকোন দল নয় বরং নিজেরাই বিমহিত করে চললেন তাদের অনবদ্য পরিবেশনা দিয়ে...

কাহিনি বিন্যাস

পর্যবেক্ষণকৃত দলের লছিমন পালার প্রারম্ভেই যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে গদ বাজায়। এরপর দলের গায়েন দাঁড়িয়ে 'আসর বন্দনা' পরিবেশন করে। আসর বন্দনায় সূর্য, হিমালয় পর্বত, পবিত্র মক্কার কাবা এবং কোরানের নামে বন্দনাগীত পরিবেশন করা হয়।

এরপর গায়েন দেশের নামে বন্দনাগীত পরিবেশন করে। 'দ্যাশ বন্দনায়' উচ্চসুরে দেশের বিভিন্ন গূরুত্বপূর্ণ স্থান, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দেশের মহিমা ঘোষণা, বীরত্বগাঁথা দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, আসর বন্দনায় গায়েনের সঙ্গে দলের সকলে মিলে পাইল দেয় এবং সমগ্র বন্দনায় নারী চরিত্ররা গায়েনের পাশেপাশে নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করে আসর।

বন্দনা শেষে মূল ঘটনা অভিনিত হয়। 'লছিমন'-এর কাহিনিতে কোনো দৃশ্য বিভাজন নেই, নেই কোনো বিরতি। তবে কিছু বাঁক সুস্পষ্ট। আর এই বাঁকই হয়তবা কাহিনির গাঁথুনি।

এক দৈববাণীর মধ্য দিয়ে কাহিনির আরম্ভ। কাঙ্কন বাদশা স্বপ্নে সেই দৈববাণী শোনে যে তার রাজ্য ধ্বংস হবে। মরিয়া হয়ে বাদশা দেশ ছেড়ে বনবাসে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। বনের মধ্যে বাদশার আগমনে তাঁর অসাবধানতায় ধ্যানী দরবেশের ধ্যান ভঙ্গ.হয়। দরবেশ বাদশাকে অভিশাপ দেয়। তবে সে অভিশাপ খণ্ডানোর শর্তও দেয়, তা হলো- বাদশার একমাত্র পুত্র আলম সাধুকে সাত দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে এবং বাসরসজ্জা ব্যতিরেকেই বারো বৎসরের জন্য দূর লঙ্কায় বাণিজ্যে পাঠাতে হবে; তবেই হবে রাজ্য রক্ষা। দরবেশের শর্ত মেনে কাঙ্কন বাদশা তার পুত্র আলম সাধুর বিয়ে দেন লছির বাদশার নবযৌবনা রূপবতী কন্যা লছিমনের সঙ্গে। কিন্তু বিধির অমোঘ লিখন বাসর রাতেই স্বামীকে বিদায় দিতে হয় নববধু লছিমনের। মিলনবাসনায় কাতর থেকে যায় দু'জনেই।

বৎসর অতিবাহিত হয়, একদিন বাণিজ্য নগরে ঢোল পরে- অত্র রজনিতে লছিমনের মিলনসজ্জায় এক ভাগ্যবান পুত্রের জন্ম হবে। মিলনবাসনায় অধির আলম সাধুর প্রার্থনা কাতরতায় উপস্থিত হয় দৈবী পাখি বিলঙ্গ। পাখিতে সওয়ার হয়ে লছিমনের ঘরের দরজায় সে হাজির হয় নিমেষেই। স্বামীকে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর কাছে পেয়ে বিলম্ব ব্যতিরেকে প্রণয় অভিসারে মিলিত হয় লছিমন। ভঙ্গ হয় দরবেশের শাপমোচন শর্ত; বিধায় পুনরায় নতুন এক অভিশাপ ভর করে সতী লছিমনের। আলম এসেছিলো সকলের অগোচরে। এই মিলনে লছিমন সন্তান সম্ভবা হয়। স্বামীর

www.pathagar.com

অবর্তমানে সন্তান, নিশ্চই এ অসতী; এই অপবাদে রাজ্য ছাড়া করা হয় লছিমনকে। লছিমন পথ-মাঠ পেরিয়ে চলে আসে নির্জন বনে। বনে তার ঠাঁই হয় কাঠুরিয়ার ঘরে। জন্ম হয় পুত্র লালমনের। কিন্তু বিধির অমোঘ লিখন জন্মের পর সন্তানকে বুকে আগলে রাখা হলো না লছিমনের। দাই চুরি করে শিশু লালমনকে তুলে দিলো হারামি বাদশার হাতে। সেই নিঃসন্তান বাদশা লালমনকে তার নিজের সন্তান রূপে প্রতিপালিত করতে থাকলো। এদিকে সন্তান হারিয়ে উন্মাদপ্রায় লছিমন পথে পথে খুঁজে ফেরে সন্তানকে। পিতার দেয়া শর্ত পালন করে বারো বৎসর পরে বাণিজ্য শেষে দেশে ফেরে আলম। কিন্তু ঘরে ফিরে দেখে লছিমন নেই; জানতে পারে লছিমনকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের ঘটনা। নিজেকে অপরাধী করে নিজেই। সে পথে বেরিয়ে পরে লছিমনের সন্ধানে। অন্যদিকে পাগলিনী লছিমন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পথে বালক লালমনের কাছে একমুঠো অন্নের আবদার করে। লালমন তার ব্যবস্থাও করে, কিন্তু লালমনকে দেখে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে লালমনকে সোহাগ ভরে মাতৃস্নেহে নিজের আহার খাইয়ে দেয়। লালমনও এই প্রথম অনুভব করে মাতৃস্নেহ। কিন্তু হারামি বাদশার বেগম হিংসাপরায়ণ হয়ে বন্দিকরে লছিমনকে। আলম সাধু স্ত্রী-পুত্রের খোঁজ করতে করতে দরবেশ বাবার মাধ্যমে সন্ধান পায়। দেখা পায় পুত্র লালমনের। তার কাছ থেকে জানতে পারে লছিমনের খবর। পুনরায় দরবেশের বানে হারামি বাদশাকে বধ করে উদ্ধার করে লছিমনকে। মিলন হয় স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের।

সমগ্র কাহিনিতে এক অবলা, সতী, নিষ্কলঙ্কা নারী হওয়া সত্ত্বেও চরমতম দুর্বিষহ জীবনের প্রতিবন্ধকতা পারি দিতে হয় লছিমনকে। এর মাঝেই যেনো খুঁজে পাওয়া যায় শাশ্বত বাঙালি নারীর জীবনচরিত।

চরিত্রাবলী

সম্পূর্ণ পালা পরিবেশন করতে মোট ২৩টি চরিত্রের আগমন ঘটে। এর মধ্যে পুরুষ চরিত্র ১৪টি এবং নারী চরিত্র ৭টি ; এছাড়াও পশু-পাখি চরিত্রও আছে ২টি। চরিত্রগুলো হলো :

পুরুষ চরিত্র	নারী চরিত্র	পশু-পাখি চরিত্র
১. বয়াতি (মূল গায়েন)	১. খেমটি	১. বাঘ
২. কাঙ্কন বাদশা	২. কাঙ্কন বাদশার বেগম	২. বিলঙ্গ পাখি
৩. দেওয়ান জি (কাঙ্কন বাদশার)	৩. লছিমন	
৪. লছির বাদশা	৪. লছির বাদশার বেগম	
৫. দেওয়ান জি (লছির বাদশার)	৫. দাইমা	
৬. দরবেশ	৬. হারামি বাদশার বেগম	
৭. আলম সাধু	৭. খড়িকাটানি	
৮. হারামি বাদশা		
৯. লালমন বাদশা		

www.pathagar.com

১০. নীলমন
১১. খড়িকাটা
১২. মাঝি (২ জন)
১৩. মুন্সি
১৪. মুন্সির ছেলে

শিল্পী পরিচিতি

নিচে শিল্পীদের নাম, 'লছিমন'-এ চরিত্র, 'লছিমন'-এ অভিনয়কাল, ধর্ম, পেশা ইত্যাদি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

অভিনয় শিল্পী

ক্রম	অভিনীত চরিত্র	অভিনয় শিল্পী	নিজ বয়স	অভিনয়কাল	ধর্ম	পেশা
১	বয়াতি (মুল গায়েন)	আব্দুল মান্নান	৪৫ বছর	১৮ বছর	ইসলাম	দিন মজুর
২	কাঙ্কন বাদশা	আজিজুর রহমান	৫৫ "	"	"	শিক্ষকতা
৩	লছির বাদশা	আকবর আলী	৪৫ "	"	"	গৃহস্থালি
৪	দেওয়ান জি (কাঙ্কন বাদশার), মাঝি, লেলপু, দাইমা, মুন্সির ছেলে	জাহিদুল হক	৪২ "	"	"	ব্যবসা (চা বিক্রেতা)
৫	দরবেশ, খড়িকাটা, মুন্সি	আব্দুল গাফ্ফার	৪০ "	"	"	চাকরি
৬	আলম সাধু, লালমন বাদশা	জাহিদুল ইসলাম টুকু	৪২ "	" (মাঝে বিরতি ১১ বছর)	"	চাকরি
৭	নীলমন, বাঘ	ইসরাইল	২৮ "	১০ বছর	"	শ্রমিক
৮	লছিমন	শহিদুল ইসলাম	৩০ বছর	১২ বছর	ইসলাম	ব্যবসা
৯	খেমটি, ভাবী, হারামি বাদশার বেগম	কবেজ	৩৮ "	১৫ "	"	রিক্সা চালক
১০	কাঙ্কন বাদশার বেগম	পারভিন	৩৫ "	২ "	"	গৃহিণী
১১	বিলঙ্গ পাখি	মোফাজ্জল	৪৮ "	১৮ "	"	ব্যবসা

বাদক ও পাইলদার বা দোহার

ক্রম	বাদ্যযন্ত্র	বাদক ও পাইলদার	নিজ বয়স	অভিনয়কাল	ধর্ম	পেশা
১	দোতরা	আব্দুল মান্নান	৪৫ বছর	১৮ বছর	ইসলাম	দিন মজুর

www.pathagar.com

২	ঢোল	মোঃ জেল্লার	৪০ "	১৮ "	"	কৃষক
৩	প্রেমজুড়ি	মোঃ মন্টু	৫০ "	১৮ "	"	রিক্সা চালক
৪	জুড়ি	মোফাজ্জল	৪৮ "	১৮ "	"	ব্যবসা
৫	খমক	আব্দুল জব্বার	৫২ "	১৮ "	"	কৃষক
৬	পাইলদার	চাঁন মিয়া	৫৫ "	১৮ "	"	ভ্যান চালক

অভিনয় রীতি

বাঙলা লোকনাট্যের অভিনয় রীতিতে প্রাচীন যুগে থেকে আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত অভিনয় করার জন্যে কোন মঞ্চ বা বিশেষ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হতো না। সাধারণত বাড়ির উঠানে, নাট্যমণ্ডপ অথবা বাড়ির বহিরাঙ্গিনায় নিতান্ত সাধারণ পরিবেশে অতিসাধারণ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদিসহ এর অভিনয় চলতো। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে মূলে থাকতো একজন সরকার বা সূত্রধর। এরপর মূল গীতক, বাদক, নর্তক, পাইল, দোহার জুড়ি, ভাঁড়, পরমপুরুষ বা বিবেক।

মূল কাহিনি শুরুর আগেই কতকগুলো নিয়ম পালন করা হয়। এর মধ্যে প্রথমেই মূল সরকার বা সূত্রধর আসরে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বা বিনীতভাবে প্রস্তাবনার আকারে সেদিনের অভিনীত পালা সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে অবহিত করেন। সূত্রধরের প্রস্তাবনার পরপরই শুরু হয় বাদ্যযন্ত্রীদের ঐক্যতান। এরপর সূত্রধর বা নর্তক-নর্তকী বন্দনা পরিবেশন করে; বন্দনার পরে শুরু হতো পালার কাহিনি। মূল পালা বা কাহিনির অভিনয়েও নানা ফর্মের প্রচলন দেখা যায়, যেমন– অভিনয়, নাচ, গান, বাদ্য, হাস্য-কৌতুক। এসব মিলিয়ে কাহিনির অভিনয় শেষ হয়।

লোকনাট্যের এ রীতিকে নিম্নরূপ একটি ছকে উপস্থাপন করা হলো :

'লছিমন' পালার অভিনয় রীতি

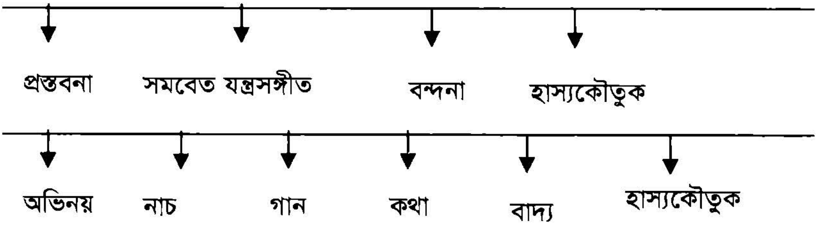

মঞ্চ

'লছিমন'-এর মঞ্চ ও মঞ্চ ব্যবহারেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সাধারণত 'লছিমন'-এর মঞ্চ গোলাকার, ভূমিসমতল এবং এর দৈর্ঘ্য ১০-১৫ ফুট হয়ে থাকে। সচরাচর ভূমিসমতল মঞ্চে 'লছিমন'-এর অভিনয় হয়ে থাকে। দর্শকরা বৃত্তাকারে মঞ্চের চারপাশে উপবেশন করে। কোথাও কোথাও বৃত্তমঞ্চের অদূরবর্তী স্থানে চারপাশে কাপড়ের ঘের দেওয়া

www.pathagar.com

একটি সাজঘর (কাপড় পরিবেষ্টিত) থাকে। প্রধানত যারা চরিত্রানুগ রূপসজ্জা গ্রহণ পূর্বক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, তারা ঐ কাপড়ের ঘের থেকে বেরিয়ে আসে। অভিনয় শেষে অভিনয়কারীগণ দোহার স্থানেই বসে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, 'লছিমন'-এর মঞ্চ যেমন ভূমি সমতল হয় তেমনি কখনো কখনো মাটি দিয়ে উঁচু করেও মঞ্চ তৈরি করা হতো এবং মঞ্চের উপরে কাপড়ের ছাউনি টানানো হতো। যেখানে এ ধরনের উঁচু মঞ্চ ছিলো না সেখানে মাটিতে গোল বৃত্ত এঁকে আসরের আয়োজন করা হতো।

সূচনালগ্ন থেকেই লক্ষ করা যায় যে, 'লছিমন'-এর মঞ্চসজ্জা জাকজমকপূর্ণ নয় বরং অত্যন্ত সাধারণ এর সজ্জা। প্রথমদিকে সাধারণত মধ্যে ১০-১৫ ফুট জায়গা রেখে দর্শকরা গোল হয়ে বসতো। অনেক সময় মাথার উপর কোন ছাউনিও থাকেতো না, চারিদিকে খড় বিছিয়ে কখনোবা বাড়ি থেকে মাদুর বা আসন নিয়ে এসে পালা অনুষ্ঠিত হতো।

'লছিমন'-এর মঞ্চ সজ্জা

'লছিমন'-এর মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত সাদামাটা। মঞ্চনাটক বা টিভি নাটকের মতো 'লছিমন'-এর মঞ্চসজ্জায় অঢেল টাকা খরচ হয় না। সংলাপের মাধ্যমেই 'লছিমন'-এর অভিনেতারা মঞ্চকে কখনো বাড়ি, হাটবাজার, কখনো রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন সময় খুব বেশি প্রয়োজন হলে একটি চেয়ার অন্যথায় একটি টুল কিম্বা পিঁড়ি ব্যবহৃত হয়। 'লছিমন'-এর মঞ্চ ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য রীতি হলো- অভিনেতা যখন অভিনয় করবে তা আগেই সংলাপের মাধ্যমে (স্বগতোক্তি) প্রকাশ করে। যেমন : আলম সাধু লছিমনের ঘরের দরজার সামনে আসলে সে বলবে- 'এইতো লছিমনের ঘরের দরজায় এসে গেছি। খোলো গো আমার লছিমন, দরজা খুলে দেখ আমি তোমার স্বামী।' তারপর তাকে অদৃশ্য দরজায় আঘাত করে ডাকবে এবং যাকে ডাকা হচ্ছে সে দরজা খোলার আগে বলবে- 'বাইরে দরজায় কেউ মনে হয় আমাকে ডাকছে। আমি জানি না কে আমাকে ডাকছে- যাই আমি একবার দরজা খুলে দেখি।' এভাবে আবার স্থানের পরিবর্তন বুঝাতে সংলাপ প্রয়োগ করে ও যন্ত্রে সৃষ্ট আবহ্‌ সঙ্গীতের পরিবর্তন করে বোঝানো হয়।

মঞ্চপকরন্‌ (প্রপস্‌)

লছিমনে প্রপস্‌ হিসেবেও বেশি কিছুর ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। প্রধান প্রপস্‌ হিসেবে দেখা যায় তরবারি (এই অস্ত্রটিকে অবশ্য দলের পালা পরিবেশনকারীরা 'ক্রিজ' নামে বলেছে)। কুড়াল এবং বড় আকারের সারাশি।

আলোকসজ্জা

লছিমন পালার আলোর ব্যবহার তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। পল্লি অঞ্চলে লছিমন-এর আলোকসজ্জাতে তাই তেমন বিশেষ কিছু করা হয় না। সূচনালগ্নে মশাল জ্বালিয়ে,

www.pathagar.com

কখনো মাথার উপরে বাঁশের ডগায় হারিকেন টাঙ্গিয়ে নয়তোবা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে হ্যাজাক বা উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে লছিমন পালার আয়োজন করা হতো।

বর্তমানে হ্যাজাক কিম্বা বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহৃত হয়। দলটিও এই সাধারণ আলোকসজ্জাতেই তাদের পালা পরিবেশন করে। কেবলমাত্র দু'টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত পালাটি পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে হ্যালোজেন বাল্বের আলোতেও 'লছিমন' পরিবেশন করা হয়।

রূপসজ্জা

পর্যবেক্ষণকৃত লছিমন-এর দলের একজন রূপসজ্জাকারি আছেন, তিনিই সকল চরিত্রের রূপসজ্জা করিয়ে দেন। দলের রূপসজ্জাকারির নাম আজিজুর রহমান। তিনি দলের শুরু থেকেই এই দায়িত্ব পালন করছেন। সযত্নে সকল শিল্পীর রূপসজ্জা করিয়ে দেন তিনি, বিশেষ করে লছিমনের। রূপসজ্জার উপকরণ হিসাবে 'লছিমন'-এ ব্যবহার করা হয় :

১. জিংক অক্সাইড
২. সিঁদুর
৩. আইভ্রু
৪. পুঁতির মালা
৫. ইমিটেশনের (চকচকে) চুড়ি
৬. রোল গোল্ড এর মালা
৭. লিপিস্টিক
৮. কাজল
৯. নাকফুল
১০. কানের দুল
১১. ক্রেপ
১২. লম্বা পরচুলা ও দাড়ি
১৩. মুখোশ
১৪. চুলের সাথে কাপড়ের ফুল যা কেশী নামে তাদের কাছে পরিচিত।

জিংক অক্সাইড ও সিঁদুর মিশ্রণ করে গোলাপী রং তৈরি করে তা ফাউণ্ডেশন হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রুজ বা শেডের পরিবর্তে সিঁদুর ব্যবহার করে।

সাধারণত রূপসজ্জায় স্বাভাবিকের চেয়ে গাঢ় রং বেশি ব্যবহার করে থাকে। চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝাতে মুখাবয়বে বিভিন্ন চিহ্ন দেয়া হয়। যেমন : আলম সাধুর বাম গালে মানিক তিলক দেয়া হয়। শ্রেণি বা পদবি বোঝাতে কপালের বাম পার্শ্বে সাদা, লাল এবং কালো এই তিনটি রঙ দিয়ে লম্বা আঁচড় দেয়া হয়। যিনি বাদশা হন তাঁর থাকে তিনটিই, দেওয়ানের থাকে দু'টি সাদা এবং লাল, বাদশাজাদার থাকে মানিক তিলক।

পোশাক

'লছিমন' পালার পোশাক অত্যন্ত সাধারণ। যন্ত্রীদল বা দোহার সাধারণত তাদের নিত্য ব্যবহার্য পোশাকই পরিধান করে। দলের অন্য অভিনেতারা লুঙ্গি, হাফহাতা গেঞ্জি,

www.pathagar.com

শার্ট-প্যান্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, গামছা, চাদর পরিধান করে থাকে; এছাড়া নারী চরিত্রে অভিনয়কারীদের পোশাকের উপকরণগুলো হলো : শাড়ি, ব্লাউজ, ওড়না ইত্যাদি। বাদশা এবং বেগম চরিত্র মাথায় মুকুট ব্যবহার করে। দরবেশ চরিত্র বড় আলখেল্লা এবং মাথায় টুপি পরে।

ব্যতিক্রম ঘটে বড় কোনো বায়নার ক্ষেত্রে, তখন ভাড়া করা হয় জাকজমক এবং জৌলুসপূর্ণ পোশাক।

বাদ্যযন্ত্র

লোকনাট্য 'লছিমন'-এর বাদ্যযন্ত্র অত্যন্ত অপরিহার্য অংশ। বাদ্যযন্ত্রের সবই থাকে লোকবাদ্যযন্ত্র। পর্যবেক্ষণকৃত পালায় ব্যবহৃত হয়েছে দোতরা, ঢোল, প্রেমজুড়ি, জুড়ি, খমক ইত্যাদি। ঘটনার উত্তেজনা, রস, স্থান কালের পার্থক্য বোঝাতে এসব যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট 'গদ' কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কখনোবা শুধু হাড়ি-পাতিল বা থালা-বাসনের সাহায্যেও বাদ্যযন্ত্রের কাজ চলতো।

পর্যবেক্ষণকৃত 'লছিমন'-এর প্রধান পাইলদার আব্দুল মান্নান অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই সমগ্র পালায় দোতরা বাজিয়েছেন। এক কথায় তার দোতরার সুর মুর্ছনায় দর্শক বিমহিত হয়েছিল। আরেকজনের কথা না বললেই নয় তিনি চাঁন মিয়া। কণ্ঠই যার সুরলহরি।

লছিমন পালার বাদ্যযন্ত্রসহ বাদক ও পাইলদারবৃন্দ

বর্তমানে যারা লছিমন চর্চা করে যাচ্ছে তারা নিতান্ত নেশার বশেই বা শৌখিনভাবে অভিনয় করছে। লছিমন সম্ভাবনাময় লোকনাট্য আঙ্গিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই; যা যুগ যুগ ধরে বাঙালি লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার কে আরো সমৃদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। গবেষণা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি পদক্ষেপের তাগিদবোধ আরো প্রবল হলে লছিমন' বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির এক মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণকৃত দলের শিল্পীদের সমবেত সাক্ষাৎকার :

প্রশ্ন : আপনাদের এ দলের নাম কি?
মান্নান : একতা নাট্যগোষ্ঠী।

প্রশ্ন : আপনারা কি বংশানুক্রমিকভাবে লছিমন নাট্যের সাথে যুক্ত?
মান্নান : না হামরাই পরথম।

প্রশ্ন : এখন এ দলে কতজন শিল্পী আছে?
মান্নান : ১৬-১৮ জন।

প্রশ্ন : সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কতজন শিল্পী নিয়ে লছিমন পালা অভিনয় করা সম্ভব?
জাহিদুল : সর্বোচ্চ ৩০ জন, সর্বনিম্ন ৮ জন।

প্রশ্ন : লছিমন পালা অভিনয় করা কি আপনাদের পেশা?
জাহিদুল : না, পেশা লয়। হামাকেরে অন্য পেশা আছে।

প্রশ্ন : এটা কি পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না?
মান্নান : যায়; কিন্তুক একনকার বাজারের কারণে তা সম্ভব হোইচে না।

প্রশ্ন : লছিমনের নাচে এবং সংলাপে কিছু অশ্লীলতা দেখা যায়, তা কি বর্জন করা সম্ভব।
জাহিদুল : হ সম্ভব। তবে রসের জন্যে মাঝে মাঝে চুটকি মারা লাগে।

প্রশ্ন : লছিমন অভিনয় করার সময় আপনারা কি কোন লিখিত স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করেন?
কবেজ : না।

প্রশ্ন : তাহলে যেগুলো অভিনয় করলেন সেগুলো কিভাবে করলেন?
কবেজ : হামরা ওস্তাদের কাছে শিকছি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, লছিমন পরিবেশনের কি নির্দিষ্ট সময় আছে?
মান্নান : হ আছে। সাধারণত ধান উটলে মানে বিশেষ কইরে শীতের সুময় লছিমন বেশি হয়।

প্রশ্ন : আপনারা যে ভাষায় লছিমন অভিনয় করেন, সে ভাষা কি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের?
মান্নান : জ্বি, এটাত বোগরার ভাষা বেশি কওয়া হয়।

প্রশ্ন : লছিমন পরিবেশনের সময় সিনেমার গান করলেন, তা কি পূর্বপরিকল্পিত না উপস্থিতভাবে?
মান্নান : পাবলিকের জন্যে দেই, পূর্বপরিকল্পিত না, উপস্থিতভাবেই।

প্রশ্ন : সিনেমার গান কেন ব্যবহার হয়, লছিমনের নিজস্ব গানও তো আছে?
মান্নান : পরিবেশের উপরে নির্ভর করে সিনেমার গান ব্যবহার করি, এ্যাডা পাবলিক ডিমান।

(আলোচনার এক পর্যায়ে লছিমন চরিত্রের অভিনেতা উপস্থিত হয়। প্রশ্ন করি তাকে)

প্রশ্ন : আজকে যে লছিমন পালা করলেন এটা কি হঠাৎ করেই?
শহিদুল : হ। তয় ইহার্সেল করে করবার পারলে জিনিসটা আরও ফুটে উঠলোনি।

প্রশ্ন : লছিমন কি করলে টিকে থাকবে বলে মনে করেন?

www.pathagar.com

মান্নান : যদি লছিমন টিকে রাখা হয়, অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষের কাছে আসে তালে লছিমন টিকে থাকবার পারে।

প্রশ্ন : লছিমন নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি?

মান্নান : আমাদের পরিকল্পনা, যাতে লছিমন বাঁচা থাকে তাই নতুন ছেলে ছোকরাকেরে শেকানো।

প্রশ্ন : লছিমন করা নিয়ে কি কখনো সমস্যায় পড়তে হয়?

কবেজ : না তেমুন কোন সমস্যা হয় না। তবে সবার এক সাথে সময় করাডাই ব্যাপার।

প্রশ্ন : পুরুষ কেন মহিলা সেজে অভিনয় করে মেয়েকে দিয়ে করান না কেন?

শহিদুল : অল্প বয়সি মেয়েরা সাধারণত লছিমনে আসপার চায় না। আর তাছাড়া বড় বাঁধা হচ্চে লছিমনে নারীর অভিনয় সমাজে সমস্যাও হয়, বাঁধাও দেয়। লছিমন পুরথমে পুরুষ ছোকরা দিয়ে হছিলো। এজন্যে আগের ইতি (রীতি) মাইনা (মেনে) এখুন পর্যন্ত পুরুষই লেডিস সাইজ্যা অভিনয় করে।

মান্নান : হামাকেরে ছবি যে লিলেন তা কি বইয়েত ছাপাবেন?

কবেজ : ছাপালে দেখায়েন কোল্যাম।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী বৈদ্যনাথ (পুষ্প চন্দ্র), পিতা- শ্রী রঘুনাথ চন্দ্র, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর, পেশা : কৃষি, গ্রাম : পীড়াপাট, পো : আড়োলা, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

২. মোঃ আইন উদ্দিন, পিতা- লোকমান হোসেন, বয়স : ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: পঞ্চম শ্রেণি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : যুগীর ভবন, পো : যুগীর ভবন, উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

১. পাতা লুকালুকি খেলা

এই খেলায় ছেলেমেয়ে উভয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলায় একজনকে বুড়ি নির্বাচন করা হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনির্দিষ্ট। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৮/১০ জন অংশগ্রহণ করে। খেলার সময় খেলোয়াড়রা থাকে একটা গোলাকার বা চারকোণা দাগের মধ্যে। আর বুড়ি থাকে ঐ দাগের বাহিরে। খেলোয়াড়রা খেলার সময় বুড়িকে জিজ্ঞেস করে 'কিস কিসানি কিসের পাতা?'। বুড়ি তখন যে কোন এক গাছের নাম বলে। যেমন আম পাতা, জাম পাতা ইত্যাদি। তখন খেলোয়াড়রা এক দমে ঐ গাছের নাম বা কিতকিত ধরে গাছের পাতা আনতে যায়। এই সময় কেউ যদি না বলে বা কে বলছে না তা দেখার জন্য এবং তাদের স্পর্শ করার জন্য বুড়ি তাদের সাথে সাথে পরোক্ষ করে। যখন সুযোগ পায় তখন সে ছুঁয়ে দেয়। আর যাকে ছুঁয়ে দেয় সে আবার বুড়ি হয়।

২. ইচিং বিচিং খেলা

এই খেলাটি ছড়া নির্ভর খেলা। ছড়ার প্রথম চরণ থেকেই খেলার নামকরণ করা হয়েছে। খেলার সময় ছড়াটি উচ্চারণ করতেই হবে এবং সেই সাথে খেলাও চলতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চক্রাকারে হাঁটু মুড়ে বসে সামনে +মাটিতে দু'হাত উপুড় করে রাখে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন 'প্রধান' হয়, সে-ই ছড়া আবৃত্তি করে। প্রধান খেলোয়াড় ছড়ার এক একটি শব্দ বা শব্দাংশ উচ্চারণের সাথে সাথে এক একটি হাতের পাঞ্জা স্পর্শ করে। ছড়ার শেষ শব্দটিতে যার যে হাত স্পর্শ করে সে হাত তুলে মাথায় রাখে। ছড়ার পুনঃপুন আবৃত্তির দ্বারা শেষ হাত পর্যন্ত তুলতে হয়। ছড়াটি হলো-

ইচন বিচন ডারকা মাছ
পাত ফালালো মাগুর মাছ
মাগুর মাছটা লড়েচড়ে
কাক্কা আস্যা ঠোকর মাড়ে
চলো কাক্কা হাটে যাই
গাই দুইয়া ভাই খাই
গায়ের নাম চোমরা
মষের নাম ভোমরা
এ্যালপাত ব্যালপাত
সবক্ষনাশে হরি তোলো এক হাত।

www.pathagar.com

ইচিং বিচিং খেলছে কয়েজন শিক্ষার্থী

৩. হা-ডু-ডু খেলা

হা-ডু-ডু বাংলাদেশের সব অঞ্চলে প্রচলিত খেলা। জনপ্রিয়তার জন্য এ খেলাকে বাঙালির জাতীয় খেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। হা-ডু-ডু খেলায় দু'টি দল থাকে এবং প্রত্যেক দলে আটজন করে খেলোয়াড় থাকে। অবশ্য এর কমবেশিও হতে পারে। বগুড়া অঞ্চলে এ খেলা বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়। দলের খেলোয়াড় একের পর এক

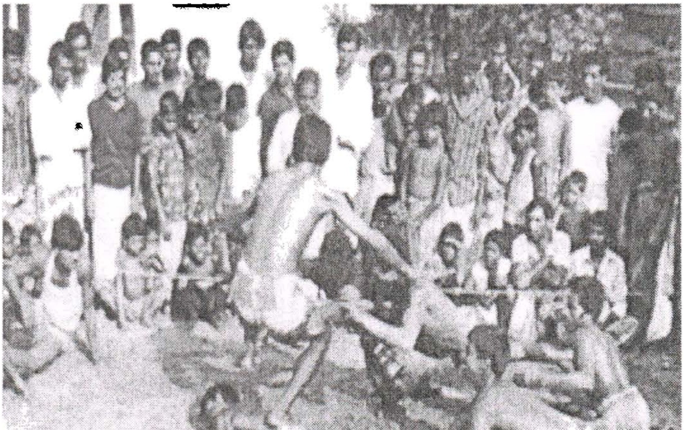

হা-ডু-ডু খেলার দৃশ্য

www.pathagar.com

একদমে ছড়া আবৃত্তি করে বিরুদ্ধপক্ষের চিহ্নিত স্থানে গিয়ে প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁতে চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে দম শেষ হওয়ার আগে যদি সে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে তবে সে পরাজিত হয়। অন্যদিকে বিরুদ্ধপক্ষের কাউকে স্পর্শ করে নিজেদের চিহ্নিত স্থানে ফিরে আসতে পারলে বিরুদ্ধপক্ষের সে খেলোয়াড়ের পরাজয় হয়। এভাবে কোনো একটি দলের সকল খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের যে কোনো একজন খেলোয়াড় মাঝরেখা থেকে শ্বাস বন্ধ করে অপরপক্ষের দলের কাছে যায় কাউকে স্পর্শ করে ফিরে আসতে। বগুড়ায় একে গুড্ডু গুড্ডু খেলা বলে। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে ডুক ডুক, টাক-টিক, গুড্ডু গুড্ডু, টিক টিক প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি দিয়ে থাকে। হা-ডু-ডু খেলার উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিপক্ষের খেলোয়াড়কে মেরে স্বপক্ষের খেলোয়াড়কে জীবিত করা। যখন কোনো একপক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা যায় তখন একটি গেম হয়। যাকে বগুড়া বলা হয় এক গেইম। সারা বছরই হা-ডু-ডু খেলার প্রচলন কম বেশি দেখা যায়। ঈদুল-ফিতর, ঈদুল-আযহা, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, বিজয় দিবস ও পূজা পার্বণ উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক হা-ডু-ডু খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৪. লাফালাফি খেলা

একজন উপুড় হয়ে থাকে। অপরজন তার পিঠের ওপর হাত রেখে লাফ দিয়ে যাবার সময় নিচের ছড়াটি সুর দিয়ে বলে। ছড়াটি বলতে ভুল করলে কিংবা লাফ দেবার সময় শরীরে কোন অংশ তার গায়ে লেগে গেলে পঁচা বা বাতিল হয় এবং তাকে প্রথমজনের স্থানে যেতে হয়। ছড়াটি নিম্নরূপ–

হাঁসের বাচ্চা চই চই
ও ছুঁড়ি তোর বাড়ি কই
বাড়ি হামার অংপুর (রংপুর)
খাস কী? চানাছুর।
চানাছুরের দাম কত?
আটা আনা, চ্যার আনা

একই খেলার প্রচলিত অপর আরেকটি ছড়া হলো-

হামার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা
কানে পড়ি দুল
ভালোবাসার ফুল
ওই পাড়ার সেলিনা
তার সাতে খেলিনা
তার সাতে আড়ি
যাই না ওগের বাড়ি
ওই হামাগের দোতলা বাড়ি
কাক ডাকে সারি সারি
মাগো তোমার পায়ে পরি
পুতুল অ্যানে দ্যাও খেলা করি।

www.pathagar.com

৫. পাতাখেলা

সাধারণ একটি খোলা মাঠে এ খেলার আয়োজন করা হয়। এ খেলায় কমপক্ষে দু'তিনটি গুণীদল থাকে। খেলা শুরুর পূর্বে গুণীদল নিজেরা যার যার অবস্থান ঠিক করে নেয়। লোকজ এই গুণীদলকে ঘিরে গুণীদলের নেতারা বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থা নেয়।

পাতা খেলার দৃশ্য, গাবতলী

তারপরই খেলা শুরু হয়। বৃত্তের কেন্দ্রে গুণীদলের নেতা এবং আয়োজক কমিটির সদস্যারা দাঁড়িয়ে উপস্থিতি দর্শকদের মাটিতে বসে ডান হাত মাটিতে রাখতে বলে। মাটিতে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থানকারী গুণীরা একসঙ্গে মন্ত্র পড়তে থাকে। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে হাত রাখা তুলারাশির লোকেরা দিকবিক জ্ঞান শূন্য হয়ে মাটিতে হাত রাখা অবস্থায় বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে ছুটতে থাকে। বৃত্তের কেন্দ্রে প্রবেশ করা মাত্রই গুণীরা এদের ধরে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে মন্ত্রের পানি ছিটিয়ে দিয়ে তাদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনে। এভাবে 'পাতা' বাচাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর আসল খেলা শুরু হয়। এরপর গুণীরা যে যার অবস্থানে যায় এবং পাতারা বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। গুণীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কেন্দ্রে অবস্থিত পাতার ওপর বাণ মারতে থাকে। যার মন্ত্রশক্তি যত বেশি 'পাতা' তার দিকেই ছুটে চলে। এভাবে মন্ত্র শক্তির প্রতিযোগিতা চলে। যে গুণীদল জয়ী হয় তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

৬. মাদারের লাঠিখেলা

ভা-রবাড়ি ইউনিয়নের ভূতমারি গ্রাম ধুনট উপজেলার একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। এ গ্রামের প্রান্তসীমা থেকে শুরু হয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলা। ভূতমারির পাশের গ্রাম কাজিপুর উপজেলার ছালাভারা ও কুনকুনিয়া গ্রাম। এ গ্রামে প্রতিবছর

www.pathagar.com

জ্যৈষ্ঠ মাসে মাদারের বাঁশ তোলা হয়। এ বাঁশ তোলা উপলক্ষ্যে প্রায় চার পাঁচদিন ধুনট ও কাজিপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে মাদারের বাঁশের সঙ্গে লাঠিখেলা হয়। এ লাঠিখেলাকে মাদারের লাঠিখেলা বলে। ভূতমারি গ্রামের হযরত আলী (৪০)'র নেতৃত্বে তার দল এ লাঠিখেলায় অংশ নিয়ে থাকে। হযরত আলী লাঠিখেলা ছাড়াও ছুরি খেলা, দড়ি খেলা, চাকু খেলা, আগুন খেলা ইত্যাদি নানা খেলায় পারদর্শী। তিনি ভা-ারবাড়ি গ্রামের কৃতিসন্তান বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম চলচ্চিত্র পরিচালক জনাব আবু সাঈদ পরিচালিত 'শঙ্খনাদ' চলচ্চিত্রে মাদারের দল নিয়ে লাঠিখেলা প্রদর্শন করেন। অত্র এলাকার জনগণ হযরত আলীকে একজন পাকা লাঠিখেলোয়াড় বলে জানে। হযরত আলী নিজেই বলেন, 'ছোট বেলা থেকেই লাঠিখেলায় অংশ নিই। ভালো লাগতো বলে খেলতাম। আর মাদারের সময় লাঠি না খেললে শরীর কসমস করে। তাই চার পাঁচদিন দলের সাতে একটানা খেলি'।

প্রায় ২০/২৫ মিটার দূরত্বে একটি গোল দাগের ভেতর ২ বা ৪ জন খেলোয়াড় দুটি বড় (সাধারণত ৭ ফিট) এবং দুটি ছোট (৩/৪ ফিট) মাপের লাঠি নিয়ে নানান শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনের মাধ্যমে একে অপরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং অপর পক্ষ তা প্রতিহত করে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সাধারণত ২০-৩০ মিনিট একটি গ্রুপের খেলা চলে। হযরত আলী একাই চার/পাঁচটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রুপে খেলে থাকেন।

৭. গোল্লাছুট

এই খেলায় দু'টি দল। উভয় দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪ থেকে শুরু করে ১০/১৫ জন এক সাথে খেলতে পারে। খোলা মাঠ বা বাগান খেলার প্রশস্ত স্থান। এই খেলায় যে কোন একদল আগে খেলবে আর অপর দল তারা তাদের চারপাশে গোলাকারভাবে দাঁড়াবে। যারা প্রথম খেলবে তারা মাটিতে একটা ছোট গোলাকার দাগ দেয়। এই গোলাকার দাগের মধ্যে প্রধান খেলোয়াড়ের একটি পা থাকবে। আর তার অপর খেলোয়াড় তার হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান খেলোয়াড়কে ধরে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা সুবিধামত যে যার স্থান নিয়ে দাঁড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে যাদের হাত ছুটে যাবে তারা দ্রুত দৌড়ে যাবে দূরের দিকে। বিপক্ষ দলের লক্ষ্য এদের ছুঁয়ে বাধা দেওয়া। দৌড়ের কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। বিপক্ষ দলের কেউ ছুঁলেই খেলোয়াড় মারা পড়ে। তারপর যেখানে ছুঁয়েছে সে স্থান থেকে ঐ খেলোয়াড়কে তিন লাফে কেন্দ্রে আসতে হবে। যদি আসতে পারে তাহলে তারা আবার খেলা শুরু করবে। আর যদি না পারে তাহলে আগে যারা খেলছিল তারাই খেলবে। প্রধান কেন্দ্র ছেড়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান খেলোয়াড়কেও ছুটতে হয়। যারা সফলকাম হয় তারা আবার খেলা শুরু করে। এই খেলায় শ্বাসরোধ করতে হয় না। এই খেলায় সাধারণত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে।

৮. কানামাছি খেলা

প্রথমে তিনজন করে হাত ধরাধরি করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় খেলোয়াড় বণ্টন করা হয়। এরপর যে শেষে উঠতে পারে না সে বুড়ি হয়। এরপর তার চোখ গামছা বা ছোট

www.pathagar.com

কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। দু'চোখ বাঁধায় তার ভূমিকা হয় অন্ধ বা কানার মত। অন্যরা চারদিক থেকে তার গায়ে টোকা বা লঘু ধাক্কা দিয়ে মাছির মত অত্যাচার করে। খেলার এ পদ্ধতি ও ধর্ম থেকে কানামাছি নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। খেলার সময় যারা টোকা দেয় বা ধাক্কা দেয় তাদের যদি কানামাছি ধরতে পারে এবং সঠিক নাম বলতে পারে তাহলে সে আবার বুড়ি হয়। আর যদি নাম সঠিক না বলতে পারে তাহলে তাকেই আবার বুড়ি থাকতে হয়। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

৯. বউছি খেলা

বউছি দু'পক্ষের সংঘবদ্ধ খেলা। দু'দলে সমান সংখ্যক (প্রায় ৮/১০ জন) খেলোয়াড়। সমতলভূমিতে ১৫/২০ হাত ব্যবধানে দুটো ঘর কাটা হয়, একটি বউঘর অপরটি খেলোয়াড়দের ঘর। খেলোয়াড়রা যে ঘরে থাকে সে ঘরের আকৃতি হয় চারকোণাকৃতি আর বউঘর হয় গোলাকৃতি। খেলোয়াড়দের ঘর থেকে বউ ঘরের সোজা লম্বা একটা দাগ দেওয়া হয়। এই লম্বা দাগের দু'পাশে দু'পা ফাঁক করে লাইন হয়ে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা দাঁড়ায়। আবার কেউ কেউ বউঘর এবং খেলোয়াড়দের ঘরের আশপাশে সুবিধা মত জায়গা করে দাঁড়ায়। টস বা আপোশে কোন দল প্রথম খেলার সুযোগ পাবে তা স্থির করা হয়। দলের মধ্যে অধিকতর চালাক ও সামর্থ্য খেলোয়াড় 'বউ'বা 'বুড়ি'বসে। সমস্ত খেলায় বউয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বউঘর থেকে তার নিজের খেলোয়াড়দের ঘরে আসতে পারলেই এক পয়েন্ট হয় বা এক ঘাড়ে হয়। তাই প্রতিপক্ষের লক্ষ্য হলো বুড়িকে স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের ঘরে আসতে না দেওয়া। বুড়িকে ঘরের বাইরে স্পর্শ করতে পারলে তাঁরা দান পায়। বিপক্ষরা যেমন সতর্কভাবে পাহারা দেয়, বুড়ি তেমনি সতর্কতার সহিত দৌড় দেয়। বিপক্ষের অবরোধ ভেঙে দেওয়ার জন্য স্বপক্ষের যে কোন একজন খেলোয়াড় শ্বাস রেখে 'ভাল্ কিত কিত...-'ছি ধরে তারা করে। এ থেকেই খেলাটির নাম 'বউছি' খেলা হয়েছে। ছি দিয়ে কাউকে স্পর্শ করে দম রেখেই যদি তাঁর ঘরে ফিরে আসতে পারে তাহলে উক্ত খেলোয়াড় মরা হবে। আর যদি আগেই শ্বাস ছেড়ে দেয় তাহলে সে নিজেই মরা হবে। দম শেষ হয়ে গেলে প্রয়োজনবোধে সে বুড়ির ঘরে আশ্রয় নিবে। এই খেলায় যে এক বার মরা হবে সে ঐবার খেলা না শেষ হওয়া পর্যন্ত জীবিত হতে পারে না। এভাবে এই খেলা চলতে থাকে।

১০. লুকোচুরি বা লুকালুকি খেলা

এই খেলায় দলের যে কোন একজন বুড়ি হয়। আর তা নির্বাচন করা হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায়। এটা সম্পন্ন হয় তিনজন করে খেলোয়াড় তাদের হাত ধরে। একে বাটা বলে। এই প্রক্রিয়ায় যে কোন একজনকে বুড়ি করা হয়। বুড়ি যেকোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে আর অন্যান্য খেলোয়াড়রা যে যার মত আত্মগোপন করে। সবার যখন লুকানো শেষ, তখন বুড়ি বলে 'টু দিব না গু খাবু'। এরপর যারা আত্মগোপন করে তাদের মধ্যে সবাই বা যেকোন একজন বলে 'টু...'। তখন বুড়ি তাদের খুঁজতে থাকে। যাকে আগে দেখতে পায় তাকে বলা হয় 'এক টিপ' তারপর যাকে দেখতে পাবে তাকে বলা হয় 'দুই টিপ' এভাবে পর্যায় ক্রমে বলে থাকে। এভাবে যদি সবাইকে বলে তাহলে

www.pathagar.com

যাকে 'একটিপ' বলা হয়েছে সে পরে বুড়ি হয়। আর যদি সবগুলো খেলোয়াড়কে দেখতে পাওয়ার আগে যেকেউ তাকে স্পর্শ করে 'তাওয়া' দেয় তাহলে তাকে আবার বুড়ি থাকতে হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

১১. একে ঋতু খেলা

এই খেলায় যে কোন একজন বুড়ি হয়। এই বুড়ি নির্বাচন করা হয় তিন জনে হাত ধরে বিশেষ প্রক্রিয়ায়। তারপর খেলা শুরু হয়। যে বুড়ি হয় তাকে উপুর হয়ে দু'হাত দিয়ে পায়ের পাতা স্পর্শ করে। এরপর অন্যান্য খেলোয়াড়রা একে একে তার পিঠের উপর দিয়ে লাফ দিতে হয় আর ছড়া বলতে হয়। লাফ দেওয়ার সময় যদি কোন খেলোয়াড়ের শরীর বুড়ির শরীর স্পর্শ করে তাহলে সে আবার বুড়ি হবে। আবার ছড়া বলার সময় ছড়ার কোন অন্তর ভুল হলেও তাকে বুড়ি হতে হবে। এই খেলার সময় যে ছড়া উচ্চারণ করা হয় তা হলো এরকম-

একে ঋতু খেলার দৃশ্য, নন্দীগ্রাম।

একে ঋতু
দুয়ে ডবল টু
তিনে ঘোড়ায় চড়ি
চারে চার সাত্তা ধিন ধিন ধিন
পাঁচে কদম ফুলের ঝুমকা
ছয়ে ছয় রাস্তায় ছিলিপ কাটি
সাতে মাথা ঘোড়ে বন্ (৩)
আটে আসেন তো দুলাভাই
বসেন তো চিয়ারে
শরপত গুলিতে কি কি লাগে

www.pathagar.com

১ সের পানি সোয়া সের চিনি
খাবার বস্যা টানাটানি।
নয়ে ইস্কা আলা বাবাজি
১ পোয়া জিলাপি
জিলাপি খাতে মিষ্টি লাগে
টেকা দিতে দুক্কু লাগে
টেকার উপর লেখা আছে এ বি সি ডি।
দশে দাসী পাড়ার পড়শি (৩)

১২. বুড়োবু খেলা

এই খেলাতেও একজন বুড়ি নির্বাচন করা হয়। সাধারণত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই খেলা বেশি খেলে থাকে। খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। তবে নিম্নে তিন জন আর উধের্ক্ষ ততোধিক। খেলার সময় বুড়ি থাকে বাইরে আর অন্যান্য খেলোয়াড়রা থাকে দাগের মধ্যে। খেলা চলার সময় বুড়ি সবসময় দাগের বাহিরের খেলোয়াড়দের স্পর্শ করার চেষ্টা করে। এই খেলা কিছুটা প্রশ্নোত্তরমূলক খেলা। খেলার সময় খেলোয়াড়রা বুড়িকে ছড়ায় ছড়ায় প্রশ্ন করে যেমন– বুড়োবু?

কিরো বু।

নৌকা আচে

কার ঘাটে?

দাদার ঘাটে।

কি লিয়া?

সুনু পাউডাল লিয়া,ভাঙা চিয়ার লিয়া, ডিঙি লিয়া ইত্যাদি।

এভাবে প্রতিবার কোন না কোন জিনিসের নাম বলে আর সে অনুযায়ী খেলোয়াড়রা শরীর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে। এগুলো অঙ্গভঙ্গি দেখানো সময় যদি কেউ না পারে তা হলে তাকে বুড়ি হতে হয়। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

১৩. বদন/গাদল খেলা

খোলা জায়গায় নির্দিষ্ট ছক কেটে বদন বা গাদল খেলা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই খেলাকে দাঁড়িয়া বান্দা খেলাও বলা হয়। বালক বালিকা এমনকি বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ খেলায় ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে। ফলে দ্রুত দৌড়ের চেয়ে কৌশল প্যাঁচের উপযোগিতা অধিক। সাধারণত ৪/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এ খেলায় ছক বাঁধা ঘর থাকে। মাটির উপর দাগ কেটে ঘরের সীমানা নির্দেশ করা হয়। দুই ধরনের দাগ কেটে এই খেলার কোট তৈরি করা হয়। একটা সোজা লম্বা আর আরেকটা পাতাল। এই লম্বা দাগের মাঝে মাঝে মাপ অনুযায়ী দাগ করা হয়। এর ফলে প্রত্যেক ঘরকে চার কোণা মনে হয়। এই দাগের লম্বাটি বলা হয় লহরি এবং প্রত্যেক দাগের শেষ মাথাকে চতা বলা

www.pathagar.com

হয়। আর প্রথম যে ঘরটা তা হলো বদন ঘর বা গাদল ঘর। এর বিপরীত পাশের ঘরকে বলা হয় নুনার ঘর। খাড়া এবং পাতাল দাগে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা দাঁড়িয়ে বাধা দেয়। যে দল প্রথম খেলা শুরু করে তারা সবাই প্রথমে বদন ঘরে থাকে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সব খেয়ে বদন ঘরে এসে বদন বা গাদল বলতে হবে। তবে একটা বিষয় হচ্ছে নুনা না খেয়ে কেউ গাদল দিতে পারবে না। বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে কোন একজন বদন দিতে পারলেই এক পয়েন্ট হয়। কিন্তু বিপক্ষের হাতে যে কোন একজন ছোঁয়া গেলে তাদের খেলা শেষ হয় এবং অপর পক্ষ খেলার সুযোগ পায়।

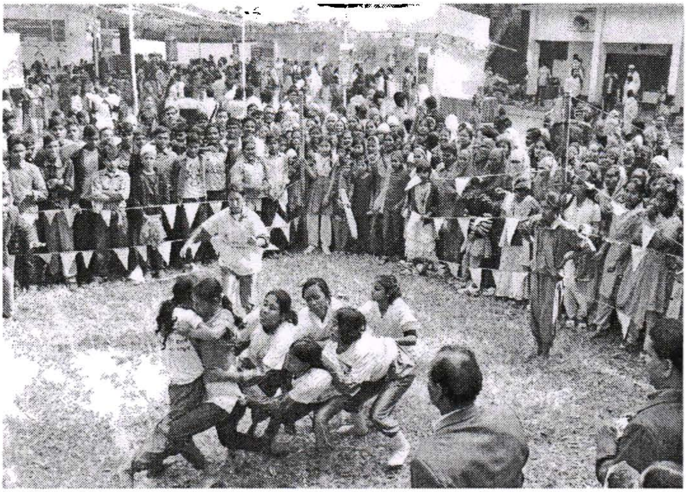

গাদন খেলছে কয়েকজন শিক্ষার্থী

১৪. আইস্কোপ বাইস্কোপ

এটি ছড়া নির্ভর খেলা। এসব ছড়ার খেলা স্কুলের ছুটির সময় বা টিফিনের সময় খেলে থাকে। এই খেলায় দুটি ছেলে মেয়ে সামান্য দূরত্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত উঁচু করে ধরে, অন্যরা সারি বেঁধে ঐ হাতের তলা দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে আর সবাই মিলে 'আইস্কোপ বাইস্কোপ' ছড়াটি আবৃত্তি করে। ছড়ার শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দু'জন বালক বালিকা নিকটতম কোন বালক বালিকাকে ধরে ফেলে। এরপর তাকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় ঐ দু'জন বালক বালিকার নেওয়া গোপনীয় নামের কোনটা সে নিতে চায়। তারপর যে নামটি নিতে চায় সে নামটি যে দলনেতার তার পক্ষের খেলোয়াড় সে হয়ে যায়। এভাবে সব খেলোয়াড় যখন দু'দলে ভাগাভাগি হয়ে যায় তখন খেলার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। এরপর 'হাতে না পঞ্চম' খেলার মত মাটিতে ১০/১৫ হাত অন্তর দুটি দাগ দেওয়া হয়। আর দুটি দল দুই দাগের পাশে দাঁড়ায়। এরপর প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়ের সাংকেতিক নাম দিয়ে থাকে তাদের দলনেতারা। নামগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নায়ক। নায়কার নাম, ফুলের নামই ব্যবহার হয়। এরপর শুরু হয় হয় চোখ ধরে মূল খেলা। এক দলনেতা

www.pathagar.com

অপর দলের যেকোন একজনের চোখ দু'হাতে এমনভাবে ধরে যাতে দেখতে না পায়। এরপর সাংকেতিক ভাষায় তার একজন খেলোয়াড়কে ডাক দেয়। সে এসে চোখ ধরা খেলোয়াড়ের মাথায় আলতো করে টোকা দিয়ে যায়। এরপর ঐ খেলোয়াড় নিজের জায়গায় গিয়ে বসলে চোখ ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর সে যদি সঠিক জনের নাম বলতে পারে তাহলে সামনে এক লাফ দিবে আর না বলতে পারলে যে টোকা দিয়েছিলো সে এক লাফ দিবে। এভাবে তারা একপক্ষ আরেক পক্ষের দাগে পৌঁছবে। আর যার খেলোয়াড়গুলো সব আগে পৌঁছবে সে জয়ী হবে। এই খেলার ছড়াটি হলো-

শিক্ষার্থীরা উপেন্টিবাইস্কোপ খেলছে।

আইস্কোপ বাইস্কোপ
টেন টেন টাইস্কোপ
আচ (রাজ) বাড়িতে যাইতে
পান সুবারি খাইতে
পানের আগা
মরিচ বাটা
ইসক্রুপ দিয়া চাবি আটকা

১৫. এত্তকোণা ট্রেনের গাড়ি

এই খেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। এই খেলায় একজন বুড়ি হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা অনির্দিষ্ট, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ৫/৬ জন অংশগ্রহণ করে। খেলার সময় যে বুড়ি হয় তাকে মাটিতে বসে একহাত বাড়িয়ে দিয়ে রাখতে হয়। আর অন্যান্য খেলোয়াড়রা ঐ হাতের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হতে হয় এবং ছড়া উচ্চারণ করতে হয়। ছড়াটি হলো-

www.pathagar.com

এক্তুকোনা ট্রেনের গাড়ি
দিল্লি যাবো তাড়াতাড়ি
ও ভাই তোরা বাঙালি
পুটির মাছের কাঙালি
খলসা মাছের লোকাচোকা
ফুল ফুটবে চোকাচোকা
ফুলের আগায় কলি
জগডুম্বুর গলি
সাইকেল বাজে কিরিং কিরিং
বাবুদের দোকানে
পাক্কা দালানে
মা দেবে খোপা বেঁধে
বাবা দিবে বিয়ে
বর এসে নিয়ে যাবে
উলু উলু দিয়ে।

খেলার সময় ছড়া বলা ভুল হলে কিংবা বুড়ির হাতের সাথে পা স্পর্শ করলে সে আবার বুড়ি হয় ।এভাবে চলতে থাকে খেলা।

১৬. আতাপাতা খেলা

এ খেলা ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলা। সাধারণত এটি মেয়েদের খেলা। ছেলেমেয়ে এ খেলা বিজোড় সংখ্যক খেলতে পারে। ৫, ৭, ৯ এরকম সংখ্য নিয়ে এ খেলা হয়। তিনজন করে ছেলেমেয়ে এক হাত সামনে এগিয়ে দিবে। হাতের পাতা উল্টো থাকবে।

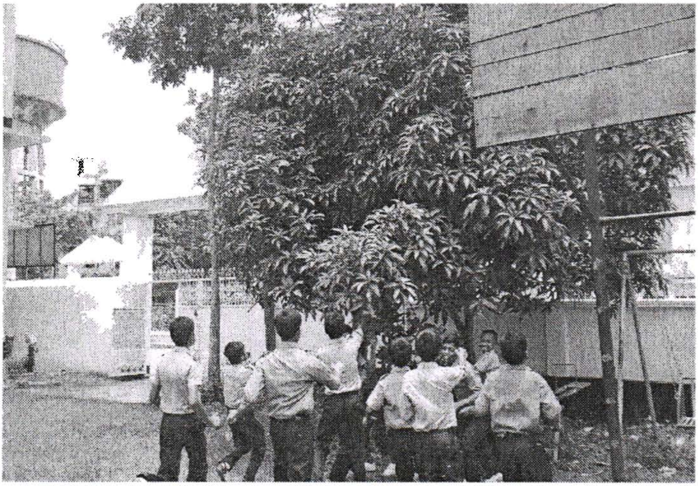

শিক্ষার্থীরা আতা পাতা খেলা খেলছে

www.pathagar.com

ওয়ান টু থ্রি বলবে একজন। এইভাবে বেটে নেয়ার সময়ের মধ্যে হাত তিনটি উল্টে যাবে। যার হাত অন্য রকম হবে। অর্থাৎ ওই দুটো হাতের বিপরীতে হবে তখন সেই খেলোয়াড়ই বুড়ি হবে। বুড়ির কাজ হলো পাতা নির্বাচন করা। যেমন– বুড়ি বলবে আমপাতা, জামপাতা ইত্যাদি। প্রত্যেকে খেলোয়াড়ের কাঠি দিয়ে একে নেয়া গোলাকার নিজস্ব ঘর থাকবে। বুড়ি পাতা আনতে বললে খেলোয়াড়রা তাদের নিজ নিজ ঘর থেকে দৌড়ে বুড়ির চাহিদামতো পাতা নিতে দৌড় দিবে। খেলোয়াড় পাতা নিয়ে আগে দৌড়ে নিজ ঘরে পৌঁছোলে পাতা তার ঘরে বুড়িকে প্রদর্শনের জন্য রেখে দিবে। শেষ খেলোয়াড়ের দিকে বুড়ির দৃষ্টি থাকবে। এভাবে দলের সব খেলোয়াড় যার যার ঘরে পাতা নিয়ে অবস্থান করবে। শেষে যে খেলোয়াড় আসবে তাকে তার ঘরে পৌছানের আগেই বুড়ি তাকে ছুঁয়ে দিবে। ছুঁয়ে দেয়া খেলোয়াড় ঐ খেলায় বাতিল বা আউট হয়ে যাওয়া খেলোয়াড়ই বুড়ি হয়ে যাবে। পূর্বের বুড়ি সাধারণ খেলোয়াড়ের মতোই খেলবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে খেলা এগিয়ে যাবে। পাতা খেলা খেলার সময় এমন স্থান নির্বাচন করতে হয় যেখানে নানা ধরনের বৃক্ষের বা লতাপাতার সমাবেশ থাকে। খেলায় বুড়ি যে কোন গাছ বা লতাগুলোর কথা উল্লেখ করে থাকে। সাধারণ খেলোয়াড় তা খুঁজে নিয়ে আসে। এটি বগুড়ায় মেয়েদের মজার খেলা। এরা আমোদের সাথে এ খেলা খেলে থাকে।

১৭. এলটিং বেলাটিং

এটিও গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের খেলা। এলাটিং বেলাটিং খেলায় মেয়েরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। মাটির উপর মাঝখানে কাঠি দিয়ে একটি রেখা টানা হয়। শুরুতে একদল দাগের দিকে দু 'কদম এগিয়ে ছড়ার প্রথম চরণ এলাটিং বেলাটিং মাই ফোরটিন বলে। আবার পিছনে সরে আগের জায়গায় দাঁড়াতে হয়। দ্বিতীয় দলের খেলোয়াড়দের একজন করে এগিয়ে এসে বলে 'কি হইল।' এভাবে দুইপক্ষই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে। আবার যখন ছড়াটি বলে তখন দলের একজন খেলোয়াড়কে ধরে টানাটানি শুরু করেন সেই খেলোয়াড়কে ধরে রাখতে বা টেনে নিতে পারলে প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ হয়।

১৮. নুনতা খেলা

নুনতা একটি দলবদ্ধ খেলা। মাটির উপর গোলাকার বৃত্ত একে খেলার ঘর তৈরি করতে হয়। খেলার শুরুতে এ ঘরের ভেতর দলনেতা থাকে। সে প্রথমে ঘরের বাইরে থাকে। অন্যরা ঘরটা দখল করে থাকে বৃত্তের বাইরে থেকে দলনেতা নুনতা নিয়ে ছড়া কাটতে থাকে। দলনেতাকে কেউ কেউ বুড়িও বলে। বুড়ি বলে "নুনতা বলো রে" দলের অন্য খেলোয়াড়রা তখন সুর করে একসঙ্গে বলে ওঠে "এক হলো রে" বুড়ি বা দলনেতা আবার একই কথা বলে। খেলোয়াড়রা একতাবদ্ধ হয়ে সুর করে বলে ওঠে দুই হলো রে। এভাবে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, শেষবার সাত বলে ওঠে এবং বলে আমার ঘরে কে........ রে? দলের অন্য খেলোয়াড়রা বলে উঠে "আমি রে"। তখন বুড়ি আবার বলে "কি খাস?" অন্যরা বৃত্তের মধ্যে থেকে বলে উঠে "নুন খাই।" তখন বুড়ি আবার বলে "নুন খালু (খেয়েছিস) নুনের দাম দিবু (দিবি) না?" অন্যরা ঠোট উল্টে বলে "ছাই

www.pathagar.com

দিমুরে ছাই” বলে একসঙ্গে ছুটে বেড়িয়ে যায় দল থেকে। বুড়ি ফাঁকা বৃত্তে প্রবেশ করেই লম্বা শ্বাস নিয়ে ওদের ছোঁয়ার জন্য তাড়া করতে থাকে। বুড়ি যে শ্বাস নিচ্ছে এবং তাতে ছেদ পড়ছে না তার জন্য ছড়া বা শব্দ করতে থাকে। বুড়ি যাকে প্রথমে ছোঁবে তাকে টেনে ধরে নিয়ে আসে বৃত্তে বা ঘরে এবং তাকে দলভুক্ত করে নেয়। সে বুড়ির সঙ্গে নুনতা গাইতে থাকে। এভাবে বাইরের সবাইকে একে একে দলে নিয়ে আসবে বুড়ি। সবশেষে বুড়ির ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে বাইরে থাকবে, সেই হবে পরের বারের খেলার বুড়ি। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

১৯. খোলা চালা/ চাড়া খেলা

বগুড়ার প্রায় সকল স্থানেই এ খেলার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ৬-১৮ বছরের বালক ও কিশোররা তাদের অবসরে এ খেলা খেলে থাকে। খেলার প্রধান উপকরণ ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো অংশ আঞ্চলিকভাবে যার নাম চাড়া বা খোলা। এ খেলার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হয় না। খোলা মাঠে স্কুলের আঙ্গিনার ধারে,. নদীর পাড়ে এমনকি ঘরের উঠানেও খোলা চালা খেলা হয়। ছেলেরা ২ থেকে ১০ জন পর্যন্ত একসাথে এ খেলা খেলে। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চাড়া থাকে এবং পর্যায়ক্রমে প্রথম জনের নিক্ষেপিত খোলাকে লক্ষ্য করে নিজেদের খোলাগুলো ছুঁড়ে মারে, এরপর প্রথম জন অর্থাৎ যার খোলাকে লক্ষ্য করে এ প্রতিযোগিতা সে তার হাতের আঙ্গুলে দিয়ে পরিমাপ করে সবচেয়ে নিকটতম খোলার খেলোয়াড়কে দেয়া হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ। এ বীজ সাধারণত হয়ে থাকে তেঁতুলের অথবা বড়ইয়ের অথবা বাবলার। কখনো বা আম, কাঁঠাল বা জামের বীজ বিনিময়েও এ খেলা খেলা হতো।

২০. রং খেলা

স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ের দল/ শিশুরা রঙ খেলার প্রেক্ষিতে এ খেলার আয়োজনে করে। ৪-৫ জন একসাথে হলেই তারা রঙ নিয়ে মজার খেলা খেলে। একজনকে বুড়ি বানিয়ে বাকিরা তার নির্দেশে নির্দিষ্ট রঙের খোঁজ করে। খোঁজ করার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হলো খেলা শুরুর আগে মাটিতে দাগকেটে একটা বর্গাকার কিংবা বৃত্ত তৈরি করা হয়। একজনকে বুড়ি/বুড়া ছককাটা ঘরের বাইরে রেখে বাকিরা ছক কাটা ঘরে অবস্থান নেয়। এরপর বুড়া/বুড়ি রঙ খোঁজার জন্যে ঘরে অবস্থানরত খেলোয়াড়দের নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ামাত্র সকলে রঙ খোঁজার জন্য একদমে ছুটে যায় রঙ খুঁজতে। যদি কেউ পথে দম ছেড়ে দেয় বুড়ি তাকে ছুঁয়ে দেয় তবে সে দলছুট হয়ে যাবে এবং বুড়িতে পরিণত হবে, আর বুড়ি অন্য সব খেলোয়ারদের সাথে মিলে যায়। এভাবে নানান বর্ণের রঙের সাথে যেমন শিশু-কিশোরদের পরিচয় ঘটে একই সাথে শারীরিক ও মানসিক বিকশ ও ঘটে।

২১. লোকটিস

বগুড়া অঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিমবগুড়ায় উচ্চারণের বিকৃতিতে ন-বর্ণ-ল বর্ণে রূপ নেয়, অনুরূপ খ-বর্ণ ক বর্ণে পরিণত হয়ে যাবে। তাই এখানে লোক শব্দ ‘নোখ’ অর্থে উচ্চারিত/ব্যবহৃত আর ‘টিস’ শব্দটি টিকা তথা টার্গেট অর্থে ব্যবহৃত। এ খেলার প্রধান

www.pathagar.com

উপকরণ মার্বেল। এক মার্বেল দিয়ে অন্য মার্কেলকে নখের সাহায্যে টার্গেট করে আঘাত করা হয় ফলে এ খেলাকে নোখটিক বা লোকটিস বলা হয়। ২-৫ জন খেলোয়াড়র এ খেলা খেলে। গ্রামের বালকদের মধ্যে এ খেলার প্রচলন বেশি। মার্বেলগুলো দেখতে যেমন চমৎকার তেমনি মজবুতও হয়। প্রত্যেকের টার্গেট থাকে অন্যের মার্বেলকে লক্ষ্য করে নিজের মার্বেল দিয়ে সজোরে আঘাত করতে। কখনো কখনো সেই আঘাতে মার্বেলগুলো ভেঙে অর্ধেক হয়ে যায়।

২২. কপালটিস

এই খেলায় দুইটি দল থাকে। দলের সর্দার প্রতিটি দলের সদস্যদের কিছু গুপ্ত নাম দেন। নামগুলো ফুল, ফল, দেশ, গাছ প্রভৃতির নামে হয়ে থাকে। দুই দল মুখোমুখি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। এক দলের সর্দার অন্যদলের একজনের চোখ বন্ধ করে ধরে রাখে এবং তার নিজের দলের একজনের গোপন নাম ধরে ডাকে। যার নাম ডাকা হয় সে এসে চোখ বন্ধ করে রাখা ব্যক্তির কপালে টোকা দিয়ে যায়। এরপর চোখ খুললে বলতে হয় কে তার কপালে টোকা দিয়েছে। যদি বলতে পারে তবে যার কপালে টোকভ দেওয়া হয় সে দল থেকে বাদ যায়। আর যদি বলতে পারে তবে প্রতিপক্ষের দিকে এক লাফে যতো দূর যেতে পারে ততো দূর গিয়ে তাকে বসানো হয়। এভাবে প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করতে পারলে খেলা শেষ হয়। খেলাটিতে যৌথ জীবনের প্রতি সংহতি জানানোর প্রয়াস লক্ষণীয়।

২৩. চেংটুপান্টি খেলা

এ খেলায় ৪/৫ জন অংশ নিয়ে থাকে। মাটিতে ছোট একটি গোল দাগ দিয়ে তার সাথে লম্বালম্বি ছোট একটি গর্ত খোড়া হয়। এখানে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ একটি কাঠি আড়াআড়ি রেখে দেয়া হয়। একজন খেলোয়াড় দুহাত লম্বা পরিমাণ একটি পান্টি বা লাঠি নিয়ে গর্তের কাঠিটিকে উপর দিকে তুলে মারে। বাকি খেলোয়াড়রা বিভিন্ন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা যদি উড়ন্ত কাঠিটি ধরতে পারে তাহলে কাঠি চালনাকারি মারা পরে। আর যদি ধরতে না পারে কাঠিটি যেখানে পরে কাঠি চালনাকারি সেখানে এসে কাঠিটি হাতে নিয়ে শূন্যের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে হাতের লাঠি বা পান্টি দিয়ে আঘাত করে। কাঠিটি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে উড়ে যাবার সময় শূন্যে কেউ ধরে ফেললে কাঠি চালনাকারি মারা পরে। ধরা না পড়লে কাঠিটি যেখানে পরে সেখানে একটি চিহ্ন করে সেখান থেকে পূর্বের জায়গায় যেখানে দাঁড়িয়ে কাঠি চালনাকরা হয়েছে সে পর্যন্ত- গাইধন, ধলি, চক্কর, চালি, পান্ডব, বিরিণ বলে হাতের লাঠি দিয়ে গুণতে থাকে। প্রতিবার সবগুলো সংখ্যা বলা সম্পন্ন হলে সে প্রতি পূর্ণসংখ্যার জন্য ১ পয়েন্ট করে পাবে। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

২৪. গাড়াগাড়ি খেলা

সাধারণত চরের ভেতর নদীর ধারে নরম কাদামাটিতে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড় ২/৩ জন। রাখাল ছেলেরা চরে গোরু ছেড়ে দিয়ে নদীর ধারে এ খেলা খেলে থাকে। এ খেলায় প্রতিটি খেলোয়াড়ের হাতে একটি পান্টি থাকে। একজন প্রথমে

www.pathagar.com

কাদায় হাতের পান্টি বিশেষ ভঙ্গিতে ছুঁড়ে মারে। দ্বিতীয় জন তার ওপর ছুঁড়ে মারে। তারপর তৃতীয় জন। কেউ কারো পান্টি মাটিতে শুয়ে ফেলতে পারলে তার জিত হয়।

২৫. নুনচুরি খেলা

চরের ভেতর নরম বালিতে এ খেলা হয়। খেলোয়াড় ২ জন। নরম বালিতে পাশাপাশি দু'টি সমমাপের গর্ত খোঁড়া হয়। গর্ত খোঁড়া শেষ হলে একটি গর্ত থেকে আরেকটি গর্তে সংযোগের জন্য নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ করা হয়। এরপর টস করে একজন হয় চোর আরেকজন হয় মালিক। মালিক তার গর্ত বালি দ্বারা পূরণ করে। চোর তার গর্ত থেকে নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে বালি (অর্থাৎ নুন) চুরি করতে থাকে। আর মালিক তার গর্ত থেকে ভরাট করা বালি (অর্থাৎ নুন) দু'হাতে সরাতে থাকে। এভাবে যে যত বেশি বালি বা নুন সরাতে পারে তার জিত হয়।

২৬. নৌকাবাইচ খেলা

সারিয়াকান্দির যমুনা ও বাঙ্গালি নদীতে প্রতি বছরই নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার সময় হেইও হেইও আর ডঙ্কার তালে তালে সারিগানও গাওয়া হয়। আমাদের সংগৃহীত ৩টি সারিগান লোকসঙ্গীত অংশে প্রদত্ত হয়েছে।

২৭. সাতচাড়া

সাতচাড়া খেলতে দু'টি দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড়ের প্রতিযোগিতামূলক খেলা। ভাঙা মাটিরহাড়ি কলসির ভাঙা টুকরো দেয়াল বা পাকা মেঝে বা শিলপাটার পিছন দিকে ঘষে ঘষে গোলাকার আকৃতির চাড়া তৈরি করা হয়। সাত টুকরা চাড়া পরপর উপর নিচ সাজিয়ে রাখা হয়। যে দল দান পায়, সে দলের একজন খেলোয়াড় ৮/১০ হাত দূর থেকে একটির বার বা টেনিস বল বা শক্ত কাগজের গোলাকার বস্তু দিয়ে দূর থেকে আঘাত করে চাড়ার দিকে তাক করে সাজানো স্তম্ভটি ভেঙে দেয়ার চেষ্ট করে। স্বপক্ষের খেলোয়াড় বলটি কুড়িয়ে তাদের আঘাত করতে থাকে। আঘাত বাঁচিয়ে ভাঙা স্তম্ভ জোড়া দিতে পারলে তারা খেলার দান পায়। আর আঘাত করতে পারলে সে মারা পড়ে। এভাবে সবাই মারা পড়লে এক পয়েন্টে আক্রমণ করে তা ভেঙে দেয়ার প্রতিযোগিতা চলে। আক্রান্ত দল তা লাভ করে। সাতচাড়া খেলার এটাই নিয়ম। একটি দল শত্রু পক্ষকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এভাবে খেলা এগিয়ে যেতে থাকে।

২৮. লাঠিখেলা

এটি সাধারণত বড়দের খেলা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামাঞ্চলের সুঠামদেহী পুরুষেরা এ খেলা খেলে। আনুমানিক ভাবে এ খেলা শুরু হয়। অত্যন্ত কৌশলগত এ খেলায় পক্ষ ও বিপক্ষ দল থাকে। একপক্ষ অন্যপক্ষকে যোজন ঘায়েল করে। এ খেলার সময় একদল অন্যদল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এ খেলার সময় নানা রকম মন্ত্রও উচ্চারিত হয়। এ রকম একটি মন্ত্র হলো :

www.pathagar.com

মাড় মাড় মাড়
কাট কাট কাট।
ঘট ঘট ঘটাং
কট কট কটাং।
মট মট মটাৎ
পট পট পটাৎ।
সুড়ৎ করে লাফাৎ।

২৯. অশকশ খেলা

ছোট ছেলে-মেয়েদের জনপ্রিয় খেলা এটি। এ খেলায় দলনেতা থাকে তাকে বুড়ি বলা হয়। এ খেলার নিয়ম হলো একটি ছন্দোবদ্ধ ছড়া আওড়াতে থাকবে খেলার অন্য সদস্যরা। বলতে থাকবে অশ কশ সিঙ্গারা বুলবুলি মস্তক" বলে খেলোয়াড়রা আঙ্গুল দেখাতে থাকবে। তখন বুড়ি আবার ছড়া মিলিয়ে আবৃত্তি করবে। ছড়া মিলে গেলে সেই হবে পর্যায়ক্রমে এর বুড়ি এবং তখন তার হাতকে টেবিলে রাখতে হবে এবং অন্যরা সে হাতে চড় বা থাপ্পড় মারতে থাকে যদি বুড়ি কারো থাপ্পড়কে ছুঁতে না পারে তবে সাময়িকভাবে খেলা শেষ হয়ে যায়।

৩০. কুতকুত বা এক্কা দোক্কা

বগুড়া প্রায় সব অঞ্চলে এ খেলা খুব জনপ্রিয়। কোন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তার পরিচয় সোনাতলার স্কুলের মাঠে বা বাড়ির উঠোনে এ খেলা খেলতে দেখা গেছে। মাটি বা মেঝের উপর কাঠি বা চকমাটি বা খড়ি দিয়ে দাগ কেটে এ খেলা খেলতে হয়। এ খেলার উপকরণ মাটির হাঁড়ি, ঢাকনা, বা কলসির ভাঙা টুকরো নিয়ে পাকা মেঝে বা দেয়ালে ঘষে গোলাকার বা চৌকাকার আকৃতি করা হয়। এই টুকরোটিকে অনেকে ঘুটিও বলে থাকে। এ খেলার চিত্রের মধ্যে দিয়ে বোঝানো যায়।

৬	৬
৫	
৪	৪
৩	
২ ১	

চিত্র-১

৬
৫
৪ ৪
৩
২
১

চিত্র-২

চিত্রের ঘরগুলির ক্রমিক নাম এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌক্কা বা পঞ্চা। দলবদ্ধভাবে অথবা দু'জনে মিলে এ খেলা খেলতে পারে প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে এ খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। খেলার শুরুতে বাইরে থেকে এক এক ঘরে চাড়া বা ঘুটি ছুঁড়ে ফেলে এক পায়ে ভর করে ঘরের দাগ লাফ দিয়ে পার হয়ে ডানপায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঘষা দিয়ে ঠেলে সেটি বাইরে নিয়ে আসতে হয়। ঘরের বাইরে (চিত্র দেয়া ছক) গেলে

www.pathagar.com

সে দান হারাবে আবার নির্দিষ্ট ঘরে চাড়া ছুঁড়ে রাখতে না পারলেও সে দান বা খেলা থেকে বঞ্চিত হবে। বিশ্রাম ঘর বা দমফেলার ঘর ছাড়া অন্য ঘরে দু'পা একত্র মাটিতে ফেললে খেলা আউট হয়ে যাবে। পা অথবা চাড়াও যদি ছকের ঘরের দাগের উপর পড়ে তবেও আউট। অর্থাৎ যতক্ষণ চাড়া নিয়ে ঘরের ভেতরে খেলোয়াড় থাকে,ততক্ষণ এক পায়ের উপর ভর করে খেলোয়াড় লাফিয়ে লাফিয়ে খেলবে। প্রথম খেলোয়াড় আউট হলে দ্বিতীয় বালিকা বা পর্যায়ক্রমে যে থাকবে। সে দান হারালে আবার প্রথম খেলোয়াড় তার অসমাপ্ত জায়গা বা খেলা থেকে আরম্ভ করবে। এভাবে চক্রাক্রমে খেলা চলতে থাকে। কোন একজন খেলোয়াড় সব ঘরে চাড়া রেখে ফিরিয়ে আনতে পারলে অর্থাৎ কোন ভুল না করে খেলা এগিয়ে নিতে পারলে ৬ নং ঘরের বাইরে তাকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে চাড়া বা ঘুটি ঘরের দিকে ফেলতে হয়। তাদের তাক করা ঘুটিটি যে ঘরে ঠিকমত পড়বে খেলোয়াড় তার অধিকারিনউ হবে। আবার সেই ঘুটি ঘরের বাইরে পড়লে সে দান হারাবে। এভাবে সব ঘর দখলে আনতে পারলেই সেই খেলোয়াড় জয়ী হয়। জেতা ঘর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ডিঙিয়ে চলতে হয়। একই ঘরে পরবর্তীতে অন্যরাও দখলে আনতে পারে। যে পিছিয়ে পড়ে তার আবার খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এ খেলার কৌশল হলো পায়ের উপর ভর দিয়ে হাতের নির্ভুল নিশানা দিয়ে খেলতে হয়।

৩১. বাঘ বকরি

এটি ছক একে খেলতে হয়। মাটি বা কাঠের পিঁড়ি বা জলচৌকি বা বেঞ্চিতে দাগ কেটে খেলা হয়। কৌশল নির্ভর এ খেলা কে অনেকে বাঘবন্দি যুদ্ধের খেলাও বলে। বাঘ বকরির ছকে ক, খ, গ, ঘ চিহ্নিত স্থান ছাড়া সরল রেখার যে কোন সংযোগ স্থলে বাঘের ভূমিকায় দু'টি ঘুঁটি বসে। ক, খ, গ, ঘ চিহ্নিত চারস্থানে ৫টি করে মোট ২০টি ঘুঁটি বসে। দু'জন খেলোয়াড় এটি খেলে। তাদের ঘিরে অন্য যারা থাকে তারা দর্শক। দু'জন খেলোয়ড়ের একজন বাঘের চাল দেয়, অন্যজন ঘুঁটির চাল দেয়। সরলরেখা বরাবর ঘুঁটির বিপরীত পাশে শূন্য ঘর পেলে বাঘ লাফ দিতে পারে, এতে একটি ঘুঁটি মারা পড়ে বা বাতিল হয়। কিন্তু পরপর দুটি ঘর ঘুঁটি দখলকরে রাখলে বাঘ তা ডিঙিয়ে যেতে পারবে না।

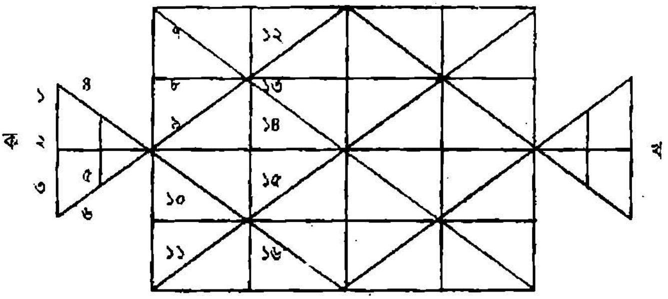

বাঘবন্দি ঘর

www.pathagar.com

তার চলারপথ বন্ধ হয়ে যাবে। ঘুঁটির চালে বাঘ মরবে না, শুধু ঘুঁটিগুলি আত্মরক্ষা করতে পারে। পালাক্রমে ঘুঁটি চালতে চালতে বাঘের চলে বন্ধ করতে পারলেই প্রতিপক্ষ, দলের বিজয় নিশ্চিত হবে। কিন্তু বাঘ সব ঘুঁটি খেয়ে ফেললে তার জয় হবে। এভাবে খেলা এগিয়ে যাবে।

৩২. ষোলঘুঁটি খেলা

ষোল ঘুঁটি খেলা অবসর সময়ের খেলা। এ খেলায় খেলোয়াড় থাকে দু'জন। কৌশলধর্মী এ খেলা পুরুষের জনপ্রিয় খেলা। শোনা যায় জমিদার শ্রেণির মানুষের কাছে এ খেলা প্রথম জনপ্রিয় হয়। পরবর্তীতে তা সাধারণের খেলায় পরিণত হয়। বাঘবন্দির ঘরের মতো এ খেলার ঘর এক হলেও সকর্তার সঙ্গে এ খেলা খেলতে হয়। অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ খেলা এটি। এ খেলায় ইটের টুকরো, কাঠের টুকরো দিয়ে ঘুঁটি তৈরি করা হয়। চিত্রে ক, পার্শ্বে খেলোয়াড়ের ঘুঁটির স্থান ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ও ১৬ সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে। খ, পাশের খেলোয়াড়কে একইভাবে নিজের ঘরের ঘুঁটি সাজিয়ে নিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। এরপর সুবিধামতো আগে এবং পিছনে চাল আছে। উভয় খেলোয়াড় চারসারের ঘুঁটি মারতে পারে। কেবল লাফ দিয়ে চালের সুযোগ এল ঘুঁটি মারা পড়ে। ঘুঁটি মেরে একদলের ঘর শূন্য বা তার চালের গতি রোধ করতে পারলে খেলার জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়।

৩৩. পলান পলান

পলান পলান খেলায় দলের একজনকে প্রধান করা হয়। তাকে রাজা " নামে অভিহিত করা হয়। লটারি পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে বণ্টন হয়। কখনো এক, দুই, তিন বা ইন পিন সেপটিপিন এসব বলে। যার দিকে শেষ শব্দটি যাবে সে চোর। রাজা চোরের চোখ বন্ধ করে রাখবে। দলের আর সবাই নিজেদের সুবিধা মতো লুকিয়ে থাকবে। রাজা চোখ খুলে দিলে চোর লুফিয়ে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করবে। আত্মগোপনকারীদের যে কোন একজনকে চোর খুঁজে পেলে সেই-ই খেলার পরবর্তী চোর। যদি চোরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আত্মগোপনকারী খেলোয়াড় দৌড়ে অবস্থার আগেই রাজাকে ছুঁয়ে দেয় তবে তার অবস্থার পরিবর্তন হবে না। এভাবে সকলে সুবিধা মতো রাজাকে ছুঁতে চেষ্টা করবে। এভাবে পালাক্রমে চোরের চোখ রাজা বন্ধ করবে এবং খেলা চলতে থাকবে।

৩৪. গোলাপ টগর খেলা

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে এ খেলা খুব জনপ্রিয়। দলবদ্ধ এ খেলায় জোড় সংখ্যার ছেলেমেয়ে খেলে থাকে। সমান সংখ্যক দুই দলের প্রতিযোগিতায় এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়দের একজন করে দলনেতা থাকে। তাকে রাজা বলে। ১৫-২০ হাত দূরত্বে দু'টি দল মুখোমুখি অবস্থান নেয়। খেলার শুরুতে এক দলের রাজা চুপিসারে তার দলের খেলোয়াড়দের ফুল বা ফলের নাম রাখে। তারপর সে অন্য দলের যে-কোন একজন খেলোয়াড়ের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে সুর করে বলতে থাকে আয়রে আমার গোলাপফুল" বা আয়রে আমার গোলাপজাম। তখন নিজের দলের প্রতীকী নামধারী

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট ফুলের খেলোয়াড়টি সাবধানী পা ফেলে এগিয়ে প্রতিপক্ষের একজনের কপালে যাতে প্রতিপক্ষ ঐ খেলোয়াড় বুঝতে বা চোর ধরতে না পারে মৃদু টোকা দিয়ে নিজ অবস্থানে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বসে থাকবে। তখন ঐ দলের সবাই মাথা নিচু করে পড়তে থাকবে। যে খেলোয়াড়ের কপালে টোকা দিয়েছে সে অন্যপক্ষের সামনে গিয়ে সাবধানী চোখে পর্যবেক্ষণ করে সনাক্ত করার চেষ্টা করবে। সফল হলে সে সামনের এগিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বসবে।

তথ্যনির্দেশ

১. নাম : শ্রী প্রণয় চন্দ্র সরকার, পিতা : শ্রী প্রদিপ চন্দ্র সরকার, বয়স : ১০ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : কুন্দুগ্রাম, পো : ঐ, থানা : আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৬/০৮/১১

২. নাম : রওশন, বয়স : ১০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা-৪র্থ শ্রেণি, গ্রাম : কাহালু, উপজেলা-কাহালু, জেলা- বগুড়া।

৩. মেরিনা খাতুন (১৪), সপ্তম শ্রেণি, ভান্ডারবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়, সংগ্রহ তাং-২৮,০৯,১১

৪. ১. মোঃ মাসুদ রানা (৪৩), গ্রাম : ভূতমারি, ভাণ্ডারবাড়ি, ধুনট, পেশা : অধ্যাপনা, আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, চালিতাভাঙ্গা, কাজিপুর।

৫. হযরত আলী (৪০), গ্রাম : ভূতমারি, ভাণ্ডারবাড়ি, ধুনট, পেশা : কৃষি, শিক্ষা-পঞ্চম শ্রেণি : সাক্ষাৎকার তাং ২১-০৫-২০১২.

৬. মোছাঃ শারমিন আক্তার, পিতা : মোঃ ভুট্টু প্রাং, বয়স : ৯ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষা : ৪র্থ শ্রেণি, গ্রাম : মাটি হাঁস, পো : হাট কড়ই, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহের তাং : ২০/০৮/১১, স্থান : মাটিহাঁস প্রাইমারী স্কুল . (১-৫ পর্যন্ত খেলার তথ্যদাতা)

৭. মোছাঃ আয়শা আক্তার মিতু, পিতা : মোঃ আজিজুল হাকিম, বয়স : ১০ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষা : ৪র্থ শ্রেণি, গ্রাম : মাটিহাঁস, পো : হাটকড়ই, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহের তাং: ২০/০৮/১১ (৬-১৫ পর্যন্ত খেলার তথ্যদাতা)

৮. কুমারী প্রিয়সী রানি, পিতা : শ্রী বিরবল চন্দ্র বর্মন, বয়স : ১১ বছর, পেশা : ছাত্র শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : পারশন, পো : চাঁপাপুর, থানা : নন্দীগ্রাম সংগ্রহের তাং : ২৯/০৮/১১ (১৫-২০ পর্যন্ত খেলার তথ্যদাতা)

৯. শায়লা (১৪), ইয়াছমিন (১৫), বিথী (১৩), সোনিয়া (১৪), আকলিমা (১৪), তাহমিনা (১৫), অষ্টম শ্রেণি, বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

১০. রাসেল (১৪), আরিফ (১৩), রানা (১৪), সোহেল (১৫), সাগর (১২), রকি (১২), অষ্টম শ্রেণি, মালতিনগর প্রাইমারী উচ্চ বিদ্যালয়।

১১. সুবাসচন্দ্র পাল (৪০), পিতা- সুদেবচন্দ্র পাল, আড়িয়া বাজার, শাজাহানপুর। সংগ্রহ তাং- ১৪/০৫/১১ইং

১২. মনির (১০), ৫ম শ্রেণি, দেবভাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল।

১৩. জগদিশ বাউল (৭০), দেবডাঙ্গা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

১৪. আনিছা (১৫), মর্জিনা (১৪), বর্ষা (১৩), চৈয়তি (১৪), আঞ্জুমান (১২), আরিফিন (১৫), পেশা : ছাত্র। ছাইহাটা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

www.pathagar.com

১৫. সুরজিৎ (৪০), লাঠি খেলোয়ার, দেবডাঙ্গা, সারিয়াকান্দি।
১৬. ইলিয়াছ (১৪), শাকিব (১৭), রাজন (১৮), সোহাগ (১৫), রমজান (১৮), মোশারফ (১৮) সংগ্রহ তাং- ০৭/১২/১১ইং
১৭. সাবরুল (১১) ও মোমিন (১০) ৫ম শ্রেণি, দেবডাঙ্গা প্রাইমরী স্কুল।
১৮. সাবরিনা (১৫), আম্বিয়া (১৭), কাজল (১৬), সোনিয়া (১৮), আমিনা (১৭), বালুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়। সংগ্রহ তাং-০৭/১২/১১ইং,
১৯. সোহেল রানা (১০), শাহিন (৮), আকাশ (১১), সাথী (১০), সাদিয়া (১২), নাদিয়া (১০) বালুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়। সংগ্রহ তাং-০৭/১২/১১ইং
২০. সোহেল (১৩), আনিছ (১৫), আকাশ (১৪), কাজল (১৩), সাইম (১৪), নীরব (১২), আরমান (১৫), পেশা : ছাত্র। সোনাতলা পাইলট হাই স্কুল।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

১. মিস্ত্রি/ছুতার

যারা ঘরের বা কাঠের কাজ করেন বগুড়ায় তাদেরকে ছুতার বলা হয়। বগুড়ায় সাধারণত তিন ধরনের ছুতার দেখা যায়। এক ধরনের ছুতার ঘরের আসবাবপত্র যেমন- খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল, কাঠের বক্স, ওয়ারড্রপ, ড্রেসিংটেবিল ইত্যাদি তৈরি করে। আরেক ধরনের ছুতার ঘর ছাউয়ানোর কাজ করে এবং আরেক ধরনের ছুতার আছেন যারা কেবল মাত্র কৃষি উপকরণ যেমন : লাঙ্গল, জোয়াল, মই, নাংলে ইত্যাদি তৈরি করেন। এ অঞ্চলে সাধারণত এক ধরনের ছুতার অন্যধরনের কাজ করে না। তবে যারা সব কাজে পারদর্শি তারা নিজেদের প্রয়োজনে সবধরনের কাজই করেন। বগুড়া শহরের সূত্রাপুর, কালিতলা, শেরপুর রোড, জলেশ্বরীতলা এবং শহরের বাইরে শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, নন্দিগ্রাম, আদমদিঘি, শিবগঞ্জসহ বগুড়ার সব উপজেলা সদরেই প্রচুর ফার্নিচারের দোকান গড়ে ওঠায় এসব এলাকায় ফার্নিচারের বিভিন্ন কারখানা গড়ে ওঠেছে। এসব কারখানায় দিনমজুরের ভিত্তিতে প্রায় কয়েক হাজার কাঠমিস্ত্রি কাজ করেন।

শেরপুর এলাকার কাঠমিস্ত্রি জয়নাল জানান- সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা বা ছয়টা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করে একজন মিস্ত্রি তিনশত টাকা মজুরি পান। অভিজ্ঞ মিস্ত্রির দাম একটু বেশি।

২. খুলু

যারা ঘানিগাছের সাহায্যে তেল তৈরি করেন তাদেরকে বগুড়ায় খুলু বলা হয়। বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে এখানো কিছু ঘানিগাছ চোখে পড়ে।

দেবডাঙ্গার খুলু পাড়া

সারিয়াকান্দি উপজেলার দেবডাঙ্গায় এখনো একটি পাড়া আছে যা খুলুপাড়া নামে পরিচিত। এ পাড়ায় এক সময় অনেকগুলো ঘানিগাছ ছিল। বর্তমানে যমুনা নদী ভাঙনের ফলে এবং যান্ত্রিক তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানকার ঘানিগাছ কমে দু'টিতে এসেছে। এ পেশার লোক পেশা বদল করে অন্য পেশা ধরেছে। এরা ঘানিগাছে সাধারণত সরিষাই কেবল ভাঙায়। অবশ্য সবসময় সরিষা পাওয়া না গেলে ভেন্ডা, পিতরাজ, তিল ইত্যাদি থেকে তেল তৈরি করে। ঘানিগাছের ক্ষেত্রে এরা গোরু ও মানুষকে ব্যবহার করে থাকে।

৩. তাঁতি

বগুড়া জেলা তাঁত নির্ভর এলাকা না হলেও এ অঞ্চলের আদমদিঘি, শেরপুর, ধুনটে বেশকিছু তাঁতশিল্প গড়ে ওঠেছে। এসব তাঁতশিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত সাধারণত মালিক-শ্রমিক সবাইকে এলাকায় তাঁতি বলা হয়। আদমদিঘির তাঁতের কম্বল এখন প্রায় সারাদেশে বিক্রি হচ্ছে। শেরপুরের মির্জাপুরে কাতান ও বেনারসি পল্লী গড়ে ওঠেছে।

www.pathagar.com

ধুনটে তাঁতে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, মশারি, ইত্যাদি তৈরি হয়। একসময় বগুড়ায় তাঁতশিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল কিন্তু এখন তা অনেকটাই বিলুপ্ত হতে চলেছে।

৪. জেলে

পূর্ব বগুড়া নদী-নালা, খাল-বিল, বিধৌত বলে এ এলাকায় প্রচুর জেলে সম্প্রদায়কে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে সারিয়াকান্দি, ধুনট এবং সোনাতলার নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোতে প্রায়ই জেলেপাড়া চোখে পড়ে। এ রকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জেলেপাড়া হলো- মথুরাপাড়ার জেলেপাড়া, গোসাইবাড়ির জেলেপাড়া, হাটশেরপুরের জেলেপাড়া, দেবডাঙ্গার জেলেপাড়া ইত্যাদি। এসব জেলেপাড়ায় প্রায় দশ-বারো হাজার জেলে সম্প্রদায় বাস কর। এরা যমুনা ও বাঙ্গালি নদীতে সারা বছর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। উপরিউক্ত সবক'টি জেলেপাড়া কমবেশি নদী ভাঙনের শিকার।

বার বার নদী ভাঙনের ফলে এদের অনেকেই অন্য পেশা গ্রহণ করেছে। যেমন– মথুরাপাড়া ও দেবডাঙ্গার জেলে সম্প্রদায়ের অনেক ছেলে- মেয়েই একটু আধটু পড়ালেখা করে ঢাকা শহরে গার্মেন্টসে কাজ নিয়েছে। কেউ কেউ আবার বগুড়া শহরে রাজমিস্ত্রির জোগালদার বা দিনমজুরের কাজ করছে। কেউ কেউ বগুড়া শহরের শহরতলি সাবগ্রাম বা বেজোড়া গ্রামে বাড়িও করেছে। যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তারাই কেবল স্থানীয় এলাকায় পড়ে রয়েছে।

মথুরাপাড়ার জেলেপাড়া- মথুরাপাড়া বাজারের পাশেই বাঁধের ওপর কয়েকটি জেলে পরিবার ছোট ছোট কুড়েঘর তুলে গাদাগাদি করে বসবাস করছে। এ গ্রামের নেপাল মাঝি জানান, 'কোথাও যাবার জায়গা নাই বলেই এটি পরে আচি। কী করমু কুটিযামু। বাপ-দাদার ভিটে মাটি নদীত ভাঙ্গে গ্যালেও তো-নিজের দ্যাশ। তাই এটি পরে আচি। নিজের বা পরিবারের প্যাটের ভাতটা তো জুটে'।

মথুরাপাড়া ও দেবডাঙ্গার জেলেদের সমন্বয়ে একটা সমিতি আছে। এই সমিতির প্রায় সত্তর জন সদস্য। এরা প্রত্যেকেই একহাজার টাকা করে চাঁদা নিয়ে একটি বড় জাল বানিয়েছে। এই জালের নাম ব্যাড় বা বেড় জাল। প্রায় তিন'শ ফুট লম্বা এবং বিশ ফিট চওড়া এ জাল। এ জাল দিয়েই তারা সবাই মিলে যমুনা নদীতে মাছ ধরে। বর্ষার সময় এ জাল দিয়ে নদীতে তারা প্রায় স্বাধীনভাবে মাছ ধরে। অন্য সময় শুধু নদীর লীজ নেয়া জলাভূমিতে তারা কেবল মাছ ধরতে পারে।

নদীতে কেমন মাছ পাওয়া যায়? এমন প্রশ্নের উওরে নেপাল মাঝি জানান 'নদীত একুন আর আগের মুতো মাচ নাই। বড় মাচ তো নাই বললেই চলে। দশ/বারো বছর আগেও আগুন-পুষ মাসেত আগে ব্যাড় জালের খ্যাপ দিলে দু'টে অ্যাভা দশ-বারো কেজিত থাক্যা শুরু করে আধমন-একমন ওজনের বাঘার তো থাকতোই সাতে অন্য মাচও থাকতো। অ্যাকুন সারাবচর অ্যাভা বাঘারের দেকা পাইনে। অন্য মাচও খুব একটা নাই।'

আগে তো বর্ষার সময় যমুনা নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যেত এখন কেমন পাওয়া যায়?

'অ্যাকুন একটু আধটু পাওয়া যায়। তয় আগের মুতো না। আগে নাও ভর্তি করে ইলিশ মার্যা আনতাম। অ্যাকুন সারাদিন খ্যাওয়ালে আট/দশটা ইলিশ পাওয়াই মুশকিল।'

মাছের দাম ঠিকমতো পান?

www.pathagar.com

'দামের কতা আর কি কমু বাবা। ব্যানা উটেও নোদ ধারোত আসা সব ব্যাপারীরে বোস থাকে। ঠ্যাংআলা ইচে আমাংগো থাক্যা দুই-তিনশ ট্যাকা কেজি দরে কিনে ন্যায়া বোগড়ে আর ঢাকাত নাকি হাজার বারো'শু ট্যাকা দরে ব্যাচে। আমরা য্যাঙ্কা আচি স্যাঙ্কাই। আংগো দিকে ক্যারা তাকাবো।'

৫. কামার

জেলায় প্রায় সর্বত্রই কামার দেখতে পাওয়া যায়। এরা দা, বটি, কুড়াল, কোদাল, খন্তা, কাস্তে, বেকি, শাবল, ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। কামাররা হাপরের সাহায্যে পুরনো লোহা গলিয়ে নতুন হাতিয়ার তৈরি করে। লোহা গলানোর ক্ষেত্রে তারা কাঠকয়লা ব্যবহার করে। এ কাঠকয়লা তারা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করে। বগুড়া জেলা ধান ও পাট সমৃদ্ধ জেলা হওয়ায় এ দু'মৌসুমে কামারা কাস্তে ও পাট কাটার বেকি তৈরিতে বেশি ব্যস্ত থাকে।

৬. কুমার

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরানো পেশাজীবী সম্প্রদায় হলো কুমার সম্প্রদায়। এরা মাটির হাড়ি-পাতিল, কলস, বাটি, সরা, ডুঙ্গি, থালা, বিভিন্ন মাটির খেলনা ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন। সারাদেশে যেমন : ধামরাই এর মৃৎশিল্প বিখ্যাত, তেমনি বগুড়া জেলায় আড়িয়াবাজার ও শেখরকোলার কুমার ও মৃৎশিল্প বিখ্যাত (মৃৎশিল্প উপ-অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

৭. মৌসুমি কামলা

বগুড়া জেলার ধুনট, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা এবং গাবতলী উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ অংশ মৌসুমি কামলা (দিনমজুর) হিসেবে কাজ করে। এরা সাধারণত ধানকাটা ও রোপনের সময় জেলার নন্দীগ্রাম, কাহালু, শিবগঞ্জ, আদমদিঘি, সিংড়া প্রভৃতি এলাকায় দল বেঁধে কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পরে। প্রতিটি দলে দশ-বারো জন কোনো দলে বা পনের-বিশ জন করে কামলা থাকে। এদের একজন দলপতি থাকে। দলপতি ধান কাটা বা রোপনের ক্ষেত্রে জমির মালিক পক্ষের সঙ্গে দর দাম নির্ধারণ করেন। বিঘা প্রতি ধান কাটা বা রোপনের চুক্তি হয়। ধান কাটার ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি হাজার বারো'শ থেকে দেড় দু'হাজার টাকা পর্যন্ত এবং রোপনের ক্ষেত্রে অনেকটা এর কাছাকাছি টাকা নির্ধারিত হয়। দলবেঁধে তাঁরা মালিকের বাড়িতে থাকে এবং নিজেরা রান্না করে খাবার খায়। এক বাড়ির কাজ শেষ হলে আরেক বাড়ির সঙ্গে চুক্তি করে কাজ নেয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. জয়নাল হোসেন, বয়স : ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : মিস্ত্রি, ঠিকানা : বারোদুয়ারীপাড়া, শেরপুর : বগুড়া।
২. সমীর সরকার বয়স : ৫০, পেশা : খুলু, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, গ্রাম : দেবডাঙ্গা সারিযাকান্দি।
৩. নেপাল মাঝি পিতা : অনিল মাঝি বয়স : ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, গ্রাম : মথুরা পাড়া, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

১. চোখ ঝাড়া

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চোখ ওঠলে সাধারণত নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়ে তিনবার চোখে ফুঁ দেয়া হয় :

আত তাড়া বাদ তাড়া
বগের গু ছ্যাড়া ব্যাড়া
চোখ উঠলে ফাঁড়া ফাঁড়া
এবার হবে কাম সাড়া।

২. হাড় ভাঙ্গার ঝাড়া

কারো হাত পা ভাঙলে বাটিতে কয়েকটি রসুন ছেচার সঙ্গে একটু সরিষার তেল গরম করে ভাঙ্গা স্থানে ধীরে ধীরে মালিশ করা হয় এবং নিচের মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়া হয় :

হাত ভাঙলো কটে
শ্যাওড়া গাচে
পাও ভাঙলো কটে
শ্যাওড়া তলে
শ্যাওড়া তলার ভূত
তর ধরমু দুদ।

৩. বিছানায় প্রস্রাবের ঝাড়া

যে সকল ছেলে-মেয়ে রাতে ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করে তার প্রস্রাব বন্ধের জন্য তাকে সকাল বেলা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রেখে নিচের মন্ত্র পড়ে সমস্ত শরীরে ঝাড়া (ফুঁ) দেয়া হয় :

ফুস ফুস ফুস
করে হুঁশ হুঁশ
চুনুত চুনুত চোনা
এইবার বন্দ (বন্ধ) হবে সোনা।

৪. প্যারালাইসিস রোগের ঝাড়া

রাত প্রায় ৯টা বাজে। হেমন্তের শীতল পরশ। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে প্রকৃতি। শিশির ভেজা লাল-নীল রঙের সামিয়ানা চাঁদের আলোতে ধূসর দেখাচ্ছে। তার নিচে

www.pathagar.com

কবরের আয়তনে চারকোণে খুঁটির ন্যায় মাটিতে গেড়েছে কলাগাছ। গাছের চারপাশে পুরাতন নানা রঙের সুতি শাড়ির কান্ডারি। তারই ভিতর মাটিতে বিছানো খড়। কাঁথা বিছিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ (প্যারালাইসিস) নারীকে শুয়ে রেখে চলছে চিকিৎসা। উত্তর পাশে রোগীর মাথার কাছে মাটিতে পুঁতে রেখেছে লোহার তৈরি ত্রিশুল। দক্ষিণ পাশে কান্ডারির বাইরে বসেছে গ্রামের ৬/৭ জন মানুষ। তারা কবিরাজের বলা কথায় জারি গান করছে। গানের তালে নৃত্য করে ৫ জন কিশোরী কান্ডারির চারপাশ ঘুরছে। এমন আজব চিকিৎসা দেখার জন্য এলাকার নারী পুরুষের ছিল ভিড়। দুই মাসের মধ্যে রোগ নিরাময় হবে বলে চিকিৎসক ঘোষণা দিয়েছেন। বগুড়ার ধুনট সদরপাড়ায় রোগীর বাড়িতে আজব চিকিৎসার আয়োজন করা হয়েছে। ওই পাড়ার হাবিবর রহমানের স্ত্রী আছফুল খাতুন (৫২)। এক ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জননী। আছফুল খাতুন ৮/৯ মাস ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। তার দুটি পা অচল হয়ে পড়েছে। চলা-ফেরা করতে পারেন না। নানা স্থানে চিকিৎসা করানোর পর স্বামী-সন্তানেরা যখন তার চিকিৎসার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। ঠিক সেই মুহুর্তে এই চিকিৎসকের (কবিরাজ) আবির্ভাব। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সূত্র ধরে তিনি আছফুলের চিকিৎসা করতে চান। তার কথা মতোই তৈরি করা হয়েছে কান্ডারি।

তার ভিতর শুয়ে রেখে দিচ্ছেন চিকিৎসা। দুই মাসের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ৪৫ দিনের চিকিৎসা চলছিল কবিরাজ প্রতিদিন এশার নামাজের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চিকিৎসার সময় বেছে নিয়েছেন।

গত ২২ নভেম্বর/১২ সরেজমিন এই আজব চিকিৎসা দেখতে রোগীর বাড়িতে গিয়ে জানা যায়, যারা কবিরাজের সাথে চিকিৎসা কাজে অংশ নিয়েছেন তাদের আগে থেকেই বলে দেওয়া আছে কি করতে হবে। কবিরাজ কখনো আল্লাহর নামে, কখনো মা ফাতেমা নামে, আবার কখনো কালি মাতার নামে জারি গান করে চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা কাজে ব্যবহারের জন্য কান্ডারির ভিতর রোগীর পাশে আগরবাতি, গোলাপজল, মোমবাতি ও কুলাতে রাখা কয়েক মুঠো চাল। কবিরাজের হাতে তাল পাতার পাখা। কান্ডারির চারপাশ ঘুরে কবিরাজ গান ধরে, নেমে যাও, নেমে যাও, নুলার বাও, ভাটির দিকে নেমে যাও....। মা ফাতেমার দোহায় লাগে নেমে যাও....। এমন সব নানা কথা দিয়ে তৈরি গানের এক চরণ কবিরাজ বলে দেন। পাশে বসা পাঁচ দোহার বলে পরিচিত পুরুষ মানুষগুলো সাথে সাথে ওই চরণগুলো গেয়ে যান। গানের তালে আখি খাতুন, রিক্তা, জান্নাতি ও সুমি খাতুন নৃত্য করে রোগীর চারপাশ ঘুরছে। সাতপাক শেষ হলে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করে কবিরাজ রোগীর শরীরে ঝাড়া ফুঁক দিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করেন। এভাবেই থেমে থেমে গভীর রাত পর্যন্ত চিকিৎসা চলে। চিকিৎসা কাজে চরম ব্যস্ততার মাঝেও কৌশলে কবিরাজ মসলিম উদ্দিনের (৫০) সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। তিনি জানান, বগুড়ার ধুনট উপজেলার গজিয়াবাড়ি গ্রামে তার বাড়ি। বাবা আব্দুল গুনি মল্লিক। কবিরাজ নিজেকে কৃষি শ্রমিক পরিচয় দেন। প্রায় ৩০ বছর ধরে কবিরাজি চিকিৎসা করেন। তার চিকিৎসায় নুলা রোগে (প্যারালাইসিস) আক্রান্ত প্রায় ৩০০ জন রোগী সুস্থ হয়েছে। এ এলাকার মানুষ তাকে খুব একটা চিনেন না। তবে সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোরসহ দক্ষিণাঞ্চলে তার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে বলে জানান।

www.pathagar.com

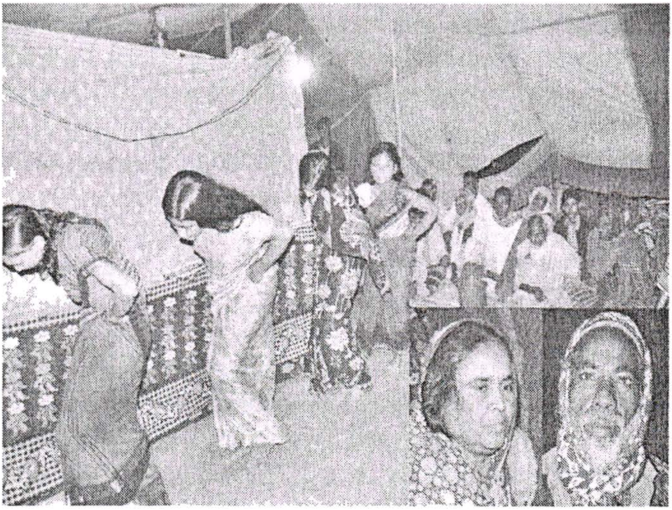

বগুড়ার ধুনটে প্যারালাইস্সি আক্রান্ত এক নারীকে হাতুড়ে কবিরাজের চিকিৎসা

বগুড়ার ধুনটে প্যারালাইসিস আক্রান্ত এক নারীকে ঝাড়ফুঁক দিচ্ছে হাতুড়ে কবিরাজ মসলিম উদ্দিন

একই গ্রামের আব্দুল বারিক তার ওস্তাদ। তবে ওস্তাদ কোথায় থেকে কবিরাজি চিকিৎসা শিখেছেন তা তিনি জানেন না। তিনি বলেন, এটা বিষ বাসড়ি নুলার বাও। ডাক্তার চিকিৎসা করেছে। তাই এ রোগ ভাল হতে একটু সময় লাগবে। ঝাড়া-ফুঁকের পর যে ওষুধ দেওয়া হবে তা নিয়মিত খেলে হয়তো রোগী চলনসই হয়ে উঠবেন, তবে একেবারেই যে ভালো হবেন এর কোন গ্যারান্টি নাই। আছফুল খাতুন জানায়, প্রায়

www.pathagar.com

৭/৮ মাস আগে হঠাৎ করে তার শরীরের নীচের অংশে ব্যথা অনুভব হয়। এরপর ধীরে ধীরে দুই পা অবশ হয়ে গেছে। অনেক চিকিৎসা করে ভাল হয়নি। এখন সে চলাফেরা করতে পারছে না। দুই পায়ে ভর করে সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তবে গত কয়েক দিনের কবিরাজি চিকিৎসায় রোগ একটু ভাল হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আহফুলের স্বামী হাবিবর রহমান বলেন, 'পাড়া-প্রতিবেশীরা জানায় স্ত্রীর নুলা রোগ (প্যারালাইসিস) হছে। তাই চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছি। চিকিৎসার খরচ বাবদ কবিরাজ ২০ হাজার টাকা চেয়েছেন। এরমধ্যে যাতায়াতের খরচ বাবদ কিছু টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। 'উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হোসনে ফিরোজা বলেন, এটা অপচিকিৎসা। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। মানুষের বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তারা প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নানা কারণে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু কোনটিতেই এমন চিকিৎসা দেওয়ার বিধান নেই।'

৫. সাপে কাটার ঝাড়া

কাউকে সাপে কাটলে তাকে ফাঁকা উঠানে একটি চৌকির ওপর শুইয়া দিয়ে চৌকির চার কোনায় চারটি কলাগাছ পুঁতে ওঝা হাতে গামছা পেঁচিয়ে চৌকির চারপাশে ঘুরে ঘুরে সেই গামছা দিয়ে রোগীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে জোরে জোরে বাতাস করতে থাকে। ওঝার দু'জন সহযোগী এ সময় ছুরি দিয়ে মাটিতে জোরে জোরে আয়তকার ও বর্গাকার দাগ দিতে থাকে এবং সেই দাগের মাঝে একের পর এক ক্রস (×) চিহ্ন দিতে থাকে অন্য ২/৩ জন সহযোগী চৌকির চারপাশে নাচতে থাকে। সাপে কাটার এর রকম একটি মন্ত্র হলো :

শিব শিব শিব
ওরে জটা ধারি শিব
ওরে, মনসা পদ্মা কালিনাগ
আয় ছুটে আয়
তর বাপ ডাকে আয়
ডমরু বাজে ঢাক বাজে
বাজে ঢক্কা
তর বাপে নাচে
নাচে কালিনাগ।
ওরে কালি উজান থ্যাকা ভাটিত যা
আকাশের বিষ পাতালে যা
যদি বিষ উজান বস
পদ্মা শিবের মাথা খাস।

৬. চুঙ্গি লাগান

সাধরণত কোমর ব্যথায় চুঙ্গি লাগান হয়। যারা দীর্ঘদিন হলে কোমর ব্যথা বা বাতের ব্যথায় ভোগেন তারা সাধারণত এ চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। বেদে সম্প্রাদায়ের নারীরা এর চিকিৎসক। যেখানে ব্যথা সে জায়গায় বাঁশের একটি চিকন শলাকা দিয়ে প্রথমে

www.pathagar.com

ছোট্ট একটি ছিদ্র করে নিয়ে সেখানে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ বাঁশের চুঙ্গি (যার ভেতরে ফাঁপা থাকে) বসিয়ে তাতে মুখ দিয়ে ব্যথা স্থানের দূষিত রক্ত চুষে নেয়া হয়। এভাবে দু'তিন বার করার পর ব্যথাস্থলে ছিদ্রের ভেতর একটি গাছান্ত ঔষুধ দিয়ে বেধে দেয়া হয়। একে নাকি কোমর ব্যথা সেরে যায়। শরীরে অন্যস্থানে ব্যথা হলে সেখানেও একই পদ্ধতির চিকিৎসা দেয়া হয়। বর্তমানে এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটাই কমে এসেছে।

৭. দাঁতের পোকা তোলা

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দাঁত রোগাক্রান্ত হলে তাতে পোকা লেগেছে মনে করা হয়। এ পোকা তোলার জন্য বেদে সম্প্রদায়ের মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে এর চিকিৎসা করান। চিকিৎসা বলতে ছেলে-মেয়েদের তারা হা করতে বলেন। আর বিশেষ কৌশলে তারা সাদা তুলোর সাহায্যে দাঁতের ভেতর থেকে তরতাজা ছোট ছোট পোকা তুলে আনেন। এরপর কিছু গাছান্ত রস দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে দেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতি বগুড়ার গ্রামাঞ্চলে এখনো চালু আছে।

৮. চোখের পোকা তোলা

যাদের চোখ খচ খচ করে অথবা ব্যথা করে কিংবা চোখ লাল হয়ে থাকলে চোখে পোকা লেগেছে বলে মনে করা হয়। বেদে সম্প্রদায়ের মেয়েরা এর চিকিৎসা করে থাকে। সাদা তুলার সাহায্যে হাতের বিশেষ কৌশলে তারা চোখের ভেতর থেকে তরতাজা ছোট ছোট পোকা বের করে আনেন। কারো অবিশ্বাস হলে বের করে আনা পোকাগুলো তারা উপস্থিত লোকজনকে দেখান। বর্তমানে গ্রামেগঞ্জে আধুনিক চিকিৎসাসেবা পৌঁছে যাওয়ায় এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটাই কমে এসেছে।

৯. মাথাব্যথা

প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হলে একে বলে আধকপালি মাথার বিষ। এ ক্ষেত্রে ঝাড়া দেয়া হয়। তাতে কাজ না হলে গাছন্ত ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। আধকপালি মাথার বিষের ক্ষেত্রে সাধারণত লবণ পড়া ও সরিষার তেল পড়া দেয়া হয়। মন্ত্রপড়া লবণ ও সরিষার তেল কপালে কিছুক্ষণ ঘষতে হয়। এক বা আধা ঘণ্টা পর ব্যথা চলে যায়।

১০. কাটা- ছেঁড়া

শরীরের কোনো অংশ কোনো কিছু দিয়ে কেটে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে রক্ত পড়তে থাকলে রক্ত বন্ধ করার জন্য দূর্বা ঘাস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয়। এতে কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অনেক সময় দূর্বা ঘাস পাওয়া না গেলে আকন্দ পাতার রস লাগিয়ে দিলেও তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়।

১১. জ্বিনের আছড় দুর করা

কাউকে জ্বিনে বা ভূতে ধরলে তাকে ঘরের মেঝেতে একটি পাটির ওপর শুয়ে দেয়া হয়। ওঝা এসে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণত একটি কূলায় এক পোয়া আতপ চাল, একটি খালি বোতল, একটি মুড়ে ঝাটা ও সাপটা, কিছু

www.pathagar.com

সরিষার তেল, কয়েকটি শুকনা মরিচ, ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে। রোগী আবোল তাবোল বলতে থাকলে প্রথমে মন্ত্রপড়া পানি রোগীর মুখে ছিটা দেয়া হয়। এরপর তার সঙ্গে সওয়াল চলে-

তোর নাম কি?
স্যাকরা।
তুই থাকোস কুটি?
পুব পাড়ায় তেঁতুল গাছোত।
তর দ্যাশ কুটি?
দ্যাশ নাই।
এই ভালো করে ক তর দ্যাশ কুটি?
এই বলেই ঝাটা দিয়ে পায়ে আঘাত করে।
কল্যাম তো দ্যাশ নাই।

এতে কাজ না হলে শুকনো মরিচ আগুনে পুড়ে রোগীর নাকের কাছে ধরা হয়। এক সময় জ্বিন দেশের নাম বলে। সে কেন এসেছে ইত্যাদি বিষয় জানতে চাওয়া হয়। তারপর তাকে চলে যেতে বলা হয়। চলে যেতে রাজি না হলে আবার শুকনা মরিচের ব্যবহার করা হয়। কোনো অবস্থাতেই সে চলে না গেলে তাকে সুযোগ মতো নাকের কাছে ধরে রাখা বোতলে তুলে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। জ্বিন তাড়ানোর উপকরণগুলোর মধ্যে আতপ চাল, শুকনা মরিচ, সরিষার তেল, পড়াপানি, ইত্যাদি পরদিন ভোরে নদীতে বা পুকুরে ফেলে দিতে হয়। জ্বিন তাড়ানোর একটি মন্ত্র।

জ্বিনের বাপ জিনের বেটা
জ্বিন ফালাইলো হলদে গুটা।
গুটা ধরে মারি টান
যদি থাকিস এই বাড়ির ঠান
আল্লা নবীর কিড়া
তোরে করমু বিড়া
যদি বাঁচতে চাস
এই ব্যাত থাক্যা আসমানে যাস।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

১. ভয় দূর করার মন্ত্র

অন্ধকার রাতে একা একা পথ চলার সময় মনে ভয় বা শঙ্কা দেখা দিলে নিচের মন্ত্র পড়ে ভয় দূর করা হয়।

ভয় গাচের গুটা
অণ্ড/রক্ত পড়ে ফোঁটা ফোঁটা

এটা তিনবার পড়ে যদি বুকে ফুঁ দেয়া হয় তাহলে ভয় দূর হয়ে মনে সাহস জাগে।

www.pathagar.com

২. পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র

তেল পিঠা ভাজার সময় কারো বদদৃষ্টি যদি পরে অর্থাৎ সে যদি চুলার দিকে তাকিয়ে নিচের মন্ত্রটি মনে মনে একবার বলে তাহলে পিঠা নষ্ট হয়ে যাবে। পিঠা আর ফুলবে না, সুন্দর হবে না।

ধাপ্পুর, ধুপ্পুর চুপ্পুড়
যেমন পিঠা তেমন চুপ্পুড়।

৩. কলা নষ্ট করার মন্ত্র

গাছে আধা পাকা কলা দেখে কেউ যদি এই মন্ত্র মনে মনে পড়ে তাহলে ওই গাছের কলা আর পাকবে না। যদি পাকে ও তাহলে কচড়া হয়ে যাবে।

ক. হলদে কলা পকাপাক
যেমন কলা তেমন থাক।

খ. রামে কাটিল কলা
লক্ষ্মণ দিল জাগ
যে বরণে কাটিল কলা
সে বরণে থাক।

৪. পোকার বাতাস দুর করার মন্ত্র

সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক লোকজন গরমের কারণে বিভিন্ন জায়গায় ঠা-া বাতাস খাওয়ার জন্য এখানে সেখানে বসে থাকার সময় তার গা-মাথা ঘুরে ওঠে এবং তার আর কোন জ্ঞান বা হুঁশ থাকে না। এমন সময় নিম্নোক্ত ঝাড়াটি তিনবার পড়ে মাথায় ফুঁ দিলে পোকার বাতাস লাগা ভালো হয়।

ইছে চল মিছে চল
চল চল হাত চল
যেটি আছে সাপের বিষ
সেই মুখে চলনা
থাকো সাপের বিষ
ডাইন, বাম চল চল
হাত চল লোহার ধর্ম
দোহাই কুওরু
কামজ্ঝার দোহায়
পোকা পতির পূজানা
কালিমার কামরুজ্ঝার দোয়ায়-

৫. গা-ব্যথার মন্ত্র

সারাদিন পরিশ্রম করার পর শরীরে নানান রকম ব্যথা অনুভব হয়। সেই ব্যথা হতে মুক্তি পেতে গ্রামের লোকজন এই মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ভরঙ্গ সুরঙ্গ সারঙ্গ
নিলা কল্লার বিষ পানি
হলে হক্কার ভক্কার কুল
ওহ বিষ পানি হলে
মোহাম্মদের রাসুল।

৬. কলা ভালো করার মন্ত্র

লক্ষ্মণ কাটিল কলা
রামে দিল জাগ
কাল কলা হলুদ বরণ হয়ে যাও।

তথ্যনির্দেশ

১. আবু তালেব (৪৬), পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

২. আবু তালেব (৪৬), পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

৩. আমেনা বেগম, বয়স ৮৬, পেশা : গৃহিণী, স্বামী- আবু কাসেম আকন্দ, গ্রাম : ভাটরা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

৪. মোঃ রফিকুল আলম (৫৫), পেশা : সাংবাদিকতা (প্রতিনিধি দৈনিক করতোয়া), ধুনট, বগুড়া।

৫. নিমাইচন্দ্র, বয়স : (৬৫)। গ্রাম : হরিনাথপুর, ধুনট, বগুড়া।

৬. মোঃ সাহাবুদ্দিন (৫০) গ্রাম- চালাপাড়া, ধুনট, বগুড়া পেশা-কৃষিকাজ, মাঝে মাঝে ওঝাগিরি করেন।

৭. আবুতালেব, বয়স : (৪৮), গ্রাম : মথুরাপাড়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

৮. মোঃ পণ্ডিত হোসেন সাকিদার (৫৮), পিতা মৃত- আব্দুল সাকিদার, গ্রাম : বয়রাকান্দি, কুতুবপুর, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

৯. মোঃ পণ্ডিত হোসেন সাকিদার (৫৮), পিতা মৃত- আব্দুল সাকিদার, গ্রাম : বয়রাকান্দি, কুতুবপুর, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

১০. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, গ্রাম : ঘোষপাড়া, শেরপুর, বগুড়া।

www.pathagar.com

ধাঁধা

আদমদিঘির সংগৃহীত ধাঁধা

ধাঁধা মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য। কিন্তু ধাঁধার আবেদন শিশুদের ছাড়িয়ে বড়দের আসরে ও প্রবেশের ক্ষমতা রাখে। আদিম মানুষ শিশুর মত সহজ সরল ছিল, তাই তারা তাদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে অবসর সময়ে বসে নানা ধরনের ধাঁধা চর্চা করতো। আর এভাবে বংশ পরম্পরায় মানুষ ধাঁধা শুনে আসছে বা চর্চা করে আসছে। আজ এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এইসব লোকঐতিহ্য ভিত্তিক সম্পদগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ' কর্মসূচির আওতায় সংগ্রাহক হিসেবে আমরা বগুড়া জেলার দুটি উপজেলায় সংগ্রহের কাজ করেছি. নিম্নের এই ধাঁধাগুলো তাই আমরা নির্দিষ্ট এলাকাতে ফিল্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছি। ধাঁধা বলার যে সময় বা পরিবেশ তা সংগ্রহের সময় পাই নি। তাই অনেকটা বলে কয়ে কথকের মুখ থেকে ধাঁধাগুলো সংগ্রহ করেছি। আদমদিঘি উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আমাদের সংগৃহীত ধাঁধাগুলো হলো :

১. গুপুত ঢ্যাং চার মাথা বার ঠ্যাং।
উত্তর : গরুর দুধ দোহন।

২. আতালা পাতালা গোয়া, হিট্টিতো গোয়া মাটিতো গোয়া।
উত্তর : দুধ দোহন

৩. গাছ শল্যা মাথাত কাঁটা
ফল লাল তার বিচি ফাটা।
উত্তর : খেজুর।

৪. খাড়া কর‍্যা রাখে
চিৎ কর‍্যা পারে
এমন করা করে গায়ের গয়না শুদ্ধ লড়ে।
উত্তর : পাটা।

৫. হাত আছে পাও নাই
গোটা মানুষ গিলা খায়।
উত্তর : শার্ট।

৬. ইট ঘুঘুর পিট টান
কোন ঘুঘুর আট কান।
উত্তর : ছাতা।

৭. পাঁচ মরদে তুলা দেয় ৩২ মরদের ঘাড়ে
লড়ভরা এক বুড়ি ট্যানা লিয়া যায় ঘরে।
উত্তর : হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে খাবার মুখে তুলে দেওয়া।

www.pathagar.com

৮. এক কাবারীর দুই চাল কবা (বলতে) না পারলে চড়্যা ভাঙমো গাল।
উত্তর : কলার পাতা।

৯. কাটলে লম্বা হয়
চাচলে মোটা হয়।
উত্তর : নালা।

১০. খাওয়ার আগে খায় কি?
চাওয়ার আগে পায় কি?
ছয় পায়ে চলে কি?
দক্ষিণ দিকে যায় কি?
উত্তর : বিস্‌মিল্লাহ্, সালাম, মাছি, পানি।

১১. মারলো ছিটকিৎ লাগলো পুটকি
অক্ত (রক্ত) বাড়ালো চোখের কোণাত।
উত্তর : চুলায় ভাত রান্না করা।

১২. যাক লিয়া সোমো (ঘুমানো)
তাই আসে নি। উত্তর : ঘুম।

১৩. যাক আনবা (নিতে) গেলাম
তাই সে আলো
তাঁক দেখ্যা লুকানো তাই গেল
তাঁকি আবার লিয়া আনো।
উত্তর : পানি।

১৪. হাতুর বাটাল ব্যাস খান
চোরে লিয়া গেল তিন খান
থাকে কয় খান।
উত্তর : একটিও না।

১৫. দিবা চাইয়া দেয় না
সে আবার কি
হামি তোমার তুমি হামার
তোমাক দেখ্যা দিমো কি?
এক দিমো ঘাঁটাখুলিত
এক দিমো পাড়াপড়শিক
তুমি হামার হামি তোমার
তোমাক দেখ্যা দোমো কি?
উত্তর : ঘোমটা।

১৬. তাই দিয়া তাই আন্দি (রান্না)
তাই দিয়া বসপার দেই

www.pathagar.com

আই দিয়া খাবার দেই।
উত্তর : পাট।

১৭. মাথা খাই চামড়া বেচি
হাড় জালায়।
উত্তর : পাট।

১৮. বনে (রোপন) না কাটে
খায় না ব্যাচে।
উত্তর : শোলা।

১৯. এক বার কলে (বলা) দুই বার দেয়
হোঁ কলে খস্যা লেয়।
উত্তর : সামাজ (খড়ের চাল তৈরির সময় ব্যবহার হয়)।

২০. লাভ দিয়া চড়নু
দুই হাত দিয়া ধড়নু
পাও লড়ানু যখন
কাম হলো তখন।
উত্তর : সাইকেল।

২১. গেছলাম আসামগঞ্জের হাটে
এক ছল্ দুই মায়ের প্যাটে।
উত্তর : দরজা।

২২. যাতে দৌড় আসতে ঢিল
পড়্যা আছে মহাবীর।
উত্তর : মানুষের পায়খানা।

২৩. কলে মাও মার খায়
না কলে বাপ কুত্তাও খায়।
উত্তর : কুকুরের খাওয়া ভাত।

২৪. ছিনারে ছিনারে কয় কতা
আরেক ছিনারে ধুনায় মাথা
আরেক ছিনারে কয় হামারি কতা।
উত্তর : একই ধরনের মানুষ।

২৫. আকাশেতে নুতুপুতু চৌডালেতে বাসা
আহারে গিলিবেনা ছাও ইকি তামোসা।
উত্তর : কুড়ার শিকার ধরা।

২৬. সিন্দংরে হোলাবোলা
কাজলে ৩২ তোলা
কেন কন্যা তুমি গাছ তলা।
উত্তর : কোচকড়ি।

www.pathagar.com

২৭. সমুদ্রের মধ্যে বাগের পাও
ছাগলে গিললো সাতশো নাও
আর গিললো বটাবটি
নবন গিললো সাতশো কোটি।
উত্তর : নৌকার মাঝির ব্যবসা।

২৮. গাছের নাম গুচরণ ফল ধরে ১৮ গরন
গুরু হয়্যা শিষ্যক প্রণাম করে তার কি কারণ।
উত্তর : প্রতিমা।

২৯. বাল ঝুমঝুম মধ্যে ফাটা
তাক দিয়া হয় দেবতার সেবা।
উত্তর : গম।

৩০. ছেলে নয় পেলে নয়
চুমু খায় মুখে
চোর নয় ডাকাত নয়
বর্ষা মারে বুকে।
মাতার উপর আগুন লাগলো
কলকাতা তার খবর হলো
মাতাপুর চোর ধরা পলো
নশরতপুর তার বিচার হলো।
উত্তর : হুক্কা।

৩১. হটিটি টি নেঙ্গুর দিয়া জল তোলে
ওভা আবার কি?
উত্তর : বাতি।

৩২. হিয়ালি কোন কোণী পর্বতে গাঁথা
প্যাটের মধ্যে ছাও গোনা যায় তার মাথা।
উত্তর : পদ্মের খোচা।

৩৩. প্যাটের মধ্যে ছাও
সেই ছাও গান করে
লাচে তার মাও।
উত্তর : পূজার ঘণ্টা।

৩৪. মাও যখন নানীর প্যাটত
হামি তখন শুটকী গছার হাটত।
উত্তর : কলা গাছের ভিতরের অংশ।

৩৫. উড়ে এসে জুড়ে পলো
দেখিতে পাহাড়
লক্ষ লক্ষ জীব মারে না করে আহার।
উত্তর : জাল।

www.pathagar.com

৩৬. ষোল হাত জলের নিচে
কাতল মাছ কাশে
এই শল্লোক ভাঙা দিবে আম (রাম) চন্দ্র দাসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

৩৭. গাছের নাম চক্রবর্তী
পাতার নাম রসিয়া
গাছের ফল গাছে থাকে
বোটা আসে খসিয়া।
উত্তর : ওল কচু।

৩৮. জন্মে কালো কর্মে সাদা
গলায় নোয়ার (লোহার) হার
চুপটি করে ঝাঁপিয়ে ওড়ে
মাথায় নেঙুর তার।
উত্তর : জাল।

৩৯. উত্তরে থ্যাকা অ্যালো পাখি হানফান কর‍্যা
নাড়া পাখি ধান খায় কলরব কর‍্যা।
উত্তর : ঢেঁকি।

৪০. উত্তর থ্যাকা অ্যালো ছুতার হানফান কর‍্যা
কাঠের আঙ্গা গোয়াত গেলো খসফে কেমন কর‍্যা।
উত্তর : জোঁক।

৪১. আগাশোত থ্যাকা পলো বুড়ি
হাতপাও তার আঠারো কুড়ি।
উত্তর : কেল্লা।

৪২. আগাশোত থ্যাকা পলো ধুম
ধুম পলো তার গোয়া শুং।
উত্তর : তাল।

৪৩. জঙ্গলত থ্যাকা বাড়ালো টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া।
উত্তর : কলার মোচা।

৪৪. উলুর মধ্যে থ্যাকা বাড়ালো
বারো চোদা খুলু।
উত্তর : শিয়াল।

৪৫. জঙ্গলত থ্যাকা বাড়ালো ফ্যাতেঙ্গা
ভাত ভরা মতেঙ্গা।
উত্তর : লেবুর রস।

৪৬. দশ মরদে ধাপড়ায়
দুই মরদে ধরে

www.pathagar.com

তালাপুর য্যায়া বিচার হয়
লক্ষ্মীপুর য্যায়া মরে।
উত্তর : উকুন।

৪৭. জলের তল দিয়া হরিণ চলে
দুই শিং তার তরতর করে
ছোট লোকে জবাই করে
বড় লোকে খায়
বিচার কর‍্যা দেখরে ভাই জাত কি যায়।
উত্তর : পানি ফল।

৪৮. ভাঙা ঘরে ফকির লাচে
লাচা ফকির মর‍্যা আছে।
উত্তর : খই।

৪৯. চিগড়া উঠা মেল্যা ধরে
দেয় যখন যায় তখন।
উত্তর : ফকির।

৫০. মিচ্চানা খুটি ধান ধরে
পুটি পুটি।
উত্তর : ডালিম।

৫১. এক থাল সুবারী
গুনতে না পারে ব্যাপারী।
উত্তর : আকাশের তারা।

৫২. আগাশোত তারা জলত খাড়া।
উত্তর : শাপলা।

৫৩. কৃষ্ণ বরন গাছ
রাধা বরন পাত
লিত্তি লিত্তি (প্রতিদিন) নতুন ফুল ফোটে
মধু নাই তাত।
উত্তর : শাপলা।

৫৪. যাচ্চু যা দিয়া যা।
উত্তর : দরজা।

৫৫. মামারা চল্যা গেছে
লাল লাঠিডা আকা গ্যাছে।
উত্তর : ডাটা শাক।

৫৬. হাড়ের বলদ চামেড় শিং
খ্যাদায় বলদ পারে নিন (ঘুম)
না খ্যাদায় বলদ যাতিইচে।
উত্তর : শামুক।

www.pathagar.com

৫৭. কাঠের গাই মাটির বাছুর।
উত্তর : খেজুর রস লাগানো।

৫৮. চাইনিজ টিপাটিপি
১ খোসের ২ বিচি।
উত্তর : বাদাম।

৫৯. চলে কিন্তু হাটে না।
উত্তর : টাকা।

৬০. এ ঘর থেকে ও ঘর যায়
হুপুর হুপুর ধুলা খায়।
উত্তর : সামটা (ঝাড়ু)।

৬১. লারে লারে লাল হয় যখন
ঢুকা দেয় তখন।
উত্তর : আগুন।

৬২. লাপিত (নাপিত) আলচে চুল কাটপার
ঘটক আলচে মেয়ে দেখপার
লাউ ব্যাপারী আলচে লাউ কিনবার।
উত্তর : বাড়ুক।

৬৩. কুষ্ঠির এরিবেরি ম্যাট্রিক পাস
ফল নাই ফুল নাই ধরে বারোমাস।
উত্তর : পান।

৬৪. আগা কেটে বাগা কেটে বসাইলাম চারা
ফুল নাই ফল নাই পাতাতেই ভরা।
উত্তর : পান।

৬৫. বেড়ার উপর বেড়া
যে কতে পারবে তার বাপ ভেড়া।
উত্তর : দাঁত।

৬৬. তেলে চকচক জলে ভাসে
হাড় নাই তার মাংস আছে।
উত্তর : জোঁক।

৬৭. খায় না দায় না পেট ভরা লাদি (গোবর)
গাছের মাতাত চড়্যা আছে ওসমানের দাদি।
উত্তর : পেঁপে।

৬৮. ফল আছে বোটা নাই
ঘর আছে দরজা নাই।
উত্তর : ডিম।

৬৯. গাছের উপর ফল
ফলের উপর গাছ।

www.pathagar.com

উত্তর : আনারস।

৭০. নাচতে পাখি অনুর ঝুনুর
বসতে পাখি ধ্যানদা
আহার করতে য্যাতে পাখি
নেজ থাকে বান্দা।
উত্তর : জাল।

৭১. হামি আছি ডালে তুমি আছো জলে
এক সাথে দেখা হবে মরণের কালে।
উত্তর : মাছ আর মরিচ।

৭২. মানে মানে মানে
মানে পুটকি ধর‍্যা টানে।
উত্তর : বিড়ি বা সিগারেট।

৭৩. তিনটা মহিলা একটা শাড়ি কিনেছে
তাদের সম্পর্ক ও শাড়ির দাম কত।
উত্তর : ৩০৩ (তিন সতীন)।

৭৪. পাটার উপর পাটা
৭ চোট দিলে নাহি যায় কাটা।
উত্তর : ছায়া।

৭৫. এলাঙ্গের কাঁটা বেলাঙ্গের ফুল
ঘুঘু ডাকে বহুদূর।
উত্তর : বিমান।

ধাঁধাগুলো সংগ্রহের সময় সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে বেশি সংগৃহীত হয়েছে। আবার অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনতে শুনতে ছোটরাও বলা শুরু করে। তাই দেখা যায় এক জায়গায় বসে অনেকগুলো ধাঁধা বের হয়ে আসে। তাই প্রথমে যে লজ্জা বা ভয় তা কিছুক্ষণ পরে কারো মধ্যে দেখা যায় না।

৭৬. কাঁচের ঘর
বস্যা আছে লাল বর।
উত্তর : হারিকেন।

৭৭. ছেলেরা খাড়া করে মেয়েরা লাড়্যা দেয়।
উত্তর : দেওয়াল।

৭৮. ঢেউয়ের উপর ঢেউ তার উপর
বস্যা আছে লাট সাহেবের বউ।
উত্তর : ছুতি পানা।

৭৯. ১ শিং ১২ ট্যাং কোন প্রাণীর আছে।
জলে বাস করে গাছে ডিম পারে।
উত্তর : জাল মাছ।

www.pathagar.com

৮০. ঘরের ভিতর ঘর।
উত্তর : মশারি।
৮১. এই আলো এই গেলো।
উত্তর : চোখ।
৮২. মুখ দিয়া খায় মুখ দিয়া হাগে।
উত্তর : বাদুর।
৮৩. আল্লার কি কুদরত লাঠির ভিতর শরবত।
উত্তর : আখ।
৮৪. সারা গুষ্ঠির এক পুটকি।
উত্তর : রসুন।
৮৫. ইল শুগালো (শুকালো) বিল শুগালো
গাছের আগালোত পানি।
উত্তর : ডাব।
৮৬. তিন অক্ষরে নাম তার জলেতে বাস করে
মধ্যেকার অক্ষর কাট্যা দিলে আকাশেতে উড়ে।
উত্তর : চিতল, চিল।
৮৭. এক গাছে এক ফল
পাকলে টল টল।
উত্তর : আনারস।
৮৮. আছে ফল দ্যাশে নাই
খাই ফল তার চোচা নাই।
উত্তর : শীল
৮৯. আকাশ থাক্যা পলো লোটা
লোটার গোয়াত তিন ফোঁটা।
উত্তর : তাল।
৯০. আকাশোত থাক্যা পলো বুড়ি
দুই ঝনে টান্যা তুলি।
উত্তর : ছেঁউতি।
৯১. টানলে ছোট না টানলে বড়।
উত্তর : বিড়ি।
৯২. এখান থাক্যা মারনু লাঠি
লাঠি গেল যুগল হাটি।
উত্তর : চর্ট লাইট।
৯৩. টি টি টি লাই দিয়া জল তোলে
তার নাম কি?
উত্তর : বাতি।
৯৪. বনেত থিয়া আনো গাই
স্বদে স্বদে দোবার যাই।
উত্তর : খলসানি (খলসুন)।

www.pathagar.com

৯৫. ইট্টুকুণি বড়ের গাছ
বর ঝুম ঝুম করে
টোনা পকি (পাখি) ঠোকোর দিলে
টুকুস কর্যা পড়ে।
উত্তর : লিওর (শিশির)।

গাবতলীর সংগৃহীত ধাঁধা

১. চাইরখানা হারা
মধুরভরা
বিনা সরার উপর কড়া।
উত্তর : গাভীর বাট/ওলান।

২. হারের গাই চামের শিং
নাচে তাক ধিন ধিন
নিজের রাজ্যে নিজেই রাজা
চায়না কভু কাউকে প্রজা।
উত্তর : মশা।

৩. সতী লারি আইলের ধারে
আল্লা আল্লা জিকির করে
প্যাট দিয়া খায়
মাথা দিয়া হাগে
সেই গু আবার
লাড়কির আগে।
(মাছ + কুজি) কুজি=পলো।
উত্তর : পলো।

৪. বাড়ির উপর বাড়ি
তার উপর আমের হাড়ি
তার ঐ পার মোর বাড়ি
তিন বারো আরো তেরো
মোর স্বামীর এই নাম
পার কর্যা দ্যাও বাড়িত যাম।
উত্তর : ষাট্যা।

৫. আড়া মোদ্ থেনে বাড়ালো টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া।
উত্তর : আনারস।

৬. এত্তু কোনা বুড়ি
কাপড় ফিন্দে আড়াই কড়ি।
উত্তর : রসুন পিঁয়াজ।

www.pathagar.com

৭. পিছল্যা ঘাটা
অন্ধ পুকুর
বত্রিশ ডাল
একটা পাতা।
উত্তর : দাঁত ও জিহ্বা।

৮. একটি নদীর দুইটি ধারা
মাঝখানে হলুদ
চারধারে সাদা।
উত্তর : ডিম।

৯. ঝুম ঝুমা ঝুম বাছুরে বুড়া
বাপ থাকতে ব্যাটা বুড়া।
উত্তর : মরিচ।

১০. তুমি থাকো ডালে
আমি থাকি জলে
তোমার আমার দেখা হবে
মরণের কালে।
উত্তর : মাছ-মরিচ।

১১. আল্লাহর কী কুদরত
লাঠির মধ্যে শরবত।
উত্তর : আখ।

১২. উঠতে পাখি ঝুমুর ঝুমুর
বসতে পাখি ধোনদা
আহার করিতে পাখির
ন্যাজ থাকে বান্দা।
উত্তর : জাল।

১৩. রাজার মিয়া গোছল করে
চুল ভেজে না
এমন আতার্য কতা
চোকে দেকি না
কও দেকি কী?
উত্তর : কচুরি পাতা, তাও কী চিনো নি?

১৪. হাত নাই পাও নাই
ছল ছলাইয়া যায়
কাটলেও রক্ত নাই

www.pathagar.com

মানুষ তারে খায়।
উত্তর : পানি।

১৫. চিৎ কইর‍্যা ফালায়া উপর কইর‍্যা করে
বৌয়ের গয়না শুদ্দা নড়ে।
উত্তর : শিল পাটা।

১৬. দিতের সময় কোচর মোচর
মদ্দে গেলেই হাসি।
উত্তর : চুড়ি।

১৭. চলিতে চলিতে মাতাটি হইল ভার
মাতাটি কেটে দিলে চলবে আবার।
উত্তর : উল রুল।

১৮. ইল শুকাইল বিল শুকাইল
গাছের আগালত পানি।
উত্তর : ডাব।

১৯. এক ঠ্যাং আলোক কইর‍্যা
চাইল্যা দিলাম ফচ্ কইর‍্যা।
উত্তর : সত্তা।

২০. দিয়া শুতনু
ব্যানা উইঠ্যা খুলনু।
উত্তর : খিল।

২১. পানির মোদে খোলা ভাসে
দুই শিং তার তরতর করে।
উত্তর : কানছ মাছ।

২২. উড়িতে ঝমঝম পড়িতে টিয়া
আহার করিতে যায় টিয়া
নেংটি বাইন্দ্যা থুইয়া।
উত্তর : তোড় = তেউড়ি জাল।

২৩. মাটির বাছুর ভাটের গাই
বছর অন্তর বিয়া খাই।

২৪. রিং রিং রিং
সারা গায়ে শিং
মায়ের পেটে বাচ্চা
বাচ্চার পেটে ডিম।
উত্তর : কাঁঠাল।

www.pathagar.com

২৫. এক বাড়িত গেছিল্যাম
এক খান ফল খাছিল্যাম
ফলের বোটাও নাই খোসাও নাই।
উত্তর : মিষ্টি।

দুপচাঁচিয়ার সংগৃহীত ধাঁধা

১. আছার দিলে ভাঙ্গে না
টিপ দিলে সহে না।
উত্তর : ভাত।

২. একটা বুড়ি
গাড়া গায়ে তার ফুসড়ি।
উত্তর : কাঁঠাল।

৩. হাত নাই পাও নাই
ছল ছলাইয়া যায়
সেই জিনিস সর্বলোকে খায়।
উত্তর : পানি।

৪. কাঠের গাই মাটির বাছুর
দুধ ছেঁকেছে মামা শ্বশুড়।
উত্তর : খেজুর গাছ।

৫. লাঠির উপর গুটি
গুটির ভিতর দানা
এর অর্থ ভাঙ্গা দিতে না পারলে
তোর বাপ মাও হবে কানা।
উত্তর : পদ্মবীজ।

৬. কাঁধে আসে কাঁধে যায়
বিনা দোষে মার খায়।
উত্তর : ঢাক।

৭. নকে আসে নকে যায়
হাটত গেলে প্যাট হয়।
উত্তর : তেলের বোতল।

৮. নামে আছে কামে নাই
কিনতে গেলে দাম নাই।
উত্তর : ঘোড়ার ডিম।

৯. এমন কোন পকর (পুকুর) আচে
চারিপাকে ঝোপ গেড়েছে।
উত্তর : চোখ।

www.pathagar.com

১০. এমন একটা আজব জিনিস
দেখে এলাম মাঠে
তিন মাথা ছয় কান
দশ পায়ে হাটে।
উত্তর : গরুর হাল।

১১. তুমি থাকো খালে
আমি থাকি ডালে
তোমার আমার দেখা হবে
মরণেরও কালে।
উত্তর : মাছ ও মরিচ।

১২. লাল নীল হলদা বরন
তিন ভাইয়ের একসাথে মরণ।
উত্তর : পান, সুপারী ও চুন।

১৩. দোল নড়ে দোলা নড়ে
নড়ে বাঁশের গাজা
হাতিত চড়িয়া যায়
মহা আজার (রাজার) বেটা।
উত্তর : ভূমিকম্প।

১৪. ঐ যে গেলো, এই যে আলো।
উত্তর : চোখ।

১৫. এক গাছের পাঁচ ফল
পাকেও না, খায়ও না
কেউ গাছটাতে চড়তেও পারে না।
উত্তর : হাতের আঙুল ও হাত।

১৬. এত্তকোণা মামা,
গাও ভরা তার জামা।
উত্তর : পেঁয়াজ।

১৭. পি পি পি
নেজ (লেজ) দিয়া পানি খায় তার নাম কি?
উত্তর : বাতি (ল্যাম্প)।

১৮. এক থাল সুবারী (সুপারী)
গুনতে না পারি।
উত্তর : আকাশের তারা।

১৯. আকাশে গুড় গুড়
পাথরের পাখা
সাত সমুদ্রের দুইটি পাতা।
উত্তর : চাঁদ, সূর্য।

২০. চতুর দিকে কাটা কাটা
মাঝখানে বস্যা আছে বাবুর বেটা।
উত্তর : আনারস।

www.pathagar.com

২১. ঘর আছে, দুয়ার নাই।
উত্তর : মশারি।

২২. হাত নাই, পাও নাই
আকাশে ওরে
সে বেটা পবনের সাথে যুদ্ধ করে।
উত্তর : গুড্ডি (ঘুড়ি)।

২৩. উপর কর‍্যা ফাল্যা, চিতর কর‍্যা করে
এমন করা করে, বউয়ের গয়না সুদ্দে লড়ে।
উত্তর : শিলপাটা।

২৪. আদারত (জঙ্গল) থাক্যা বাড়ালো টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া।
উত্তর : কলার মোচা।

২৫. দুই দিকে বাল মধ্যে লাল
স্বামী আছে যত দিন
দিতে হয় তত দিন।
উত্তর : সিঁথির সিঁদুর।

২৬. কালো ছাগলের গলায় দড়ি
সাঁঝ লাগলে তালাস করি।
উত্তর : কেরাসিনের বোতল।

২৭. খালে বসে, না খালে শোতে (শুয়ে পড়া)।
উত্তর : বস্তা।

২৮. দিলে আনিস না, না দিলে আনিস।
উত্তর : মই।

২৯. গাছটার নাম মোনমোহিনী
ফলের নাম রসিয়া
গাছের ফল গাছে থাকে
বোটা পড়ে খসিয়া।
উত্তর : কলার গাছ।

৩০. উত্তর থাক্যা আলো হাতি হানফান কর‍্যা
মরা হাতি মানুষ খায় গপ গপ কর‍্যা।
উত্তর : জামা।

৩১. দশের আগে বলছি কথা
হাজার ফুলের এক বোটা।
উত্তর : কদমফুল।

৩২. সেদিন গিয়েছিলাম ধাপের হাটে
দেখে এলাম আট পাও
দুই হাটু নেজ (লেজ) তার পিঠে।
উত্তর : দাঁড়িপাল্লা।

www.pathagar.com

৩৩. এক কাবারী দুই চাল
যাই না কতে পারবে তার চর‍্যা ভাঙমো গাল।
উত্তর : কলার পাতা।

৩৪. নামে আছে, কামে নাই।
উত্তর : ঘোড়ার ডিম।

৩৫. এক গাছের এক ফল
পাকলে পরে টল্ টল্।
উত্তর : আনারস।

৩৬. ভিতরে হলুদ, উপরে সাদা
এই শিল্লোক ভাঙা দিবার না পারলে
তোর হামি দাদা।
উত্তর : ডিম।

৩৭. উপরে হলুদ ভিতরে সাদা
এই শিল্লোক ভাঙা দিতে না পারলে
তোর হামি দাদা।
উত্তর : কলা।

৩৮. তিন অক্ষরে নাম যার
বনে বাস করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে জীবন নাশ করে।
উত্তর : বানর।

৩৯. চলতে চলতে তার মাথা হয় ভার
মাথাটা কেটে দিলে চলে সে আবার
উত্তর : পেন্সিল।

৪০. তিন ভাই যুদ্ধ করে
বুক ফেটে অক্ত (রক্ত) পড়ে।
উত্তর : কুঠার, কাঠুরা ও গাছ।

৪১. তিন অক্ষরে নাম যার সবার ঘরে রয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে খাবার জিনিস হয়
দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে বাদ্যযন্ত্র হয়
তৃতীয় অক্ষর বাদ দিলে মানুষকে কামড়ায়।
উত্তর : বিছানা।

৪২. বাগের (বাঘ) মতো নাফ দেয়
কুত্তার মতো বসে
পানিতে ছেড়ে দিলে
শোলার মতো ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

৪৩. নাল নীল হলুদ বরন

www.pathagar.com

দুই বীরের চৌদ্দ চরণ।
দেখে এলাম মধুপুর
দুই বীরে যুদ্ধ করছে একটাই নেঙ্গুর (লেজ)।
উত্তর : কাকড়া ও শিয়াল।

৪৪. এমন এক পালোয়ান
নাকে বস্যা ধরে কান।
উত্তর : চশমা।

৪৫. হাওয়ায় পাতা নরে
মাটির তলাত ডিম পারে।
উত্তর : গোল আলু।

৪৬. বাপ থাকতে বেটা বুড়া।
উত্তর : মরিচ।

৪৭. মুখ দিয়া খায়, চোখ দিয়া হাগে।
উত্তর : খলসুন।

৪৮. দিলে খায় না, না দিলে খায়।
উত্তর : গোয়াল।

৪৯. কাঁচাতে তেল তেলা
পাকলে পরে সিন্দুর
এর মানে ভাঙা দিতে না পারলে
তোর বাপ খাবে বড় বড় ইন্দুর (ইঁদুর)।
উত্তর : মাটির হাঁড়ি।

৫০. দেওয়ার সময় কান্দা কাটি, ভিতরে গেলে হাসি।
উত্তর : শাখা

৫১. উপর থাক্যা পলো ধুম
ধুম যাইয়া গোয়া শুঙ।
উত্তর : তাল।

৫২. জলেতে জন্ম, জলেতে বাস
জলেতে পড়লে সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ।

৫৩. ঢেউয়ের উপর ঢেউ
তার উপর বস্যা আছে লাট সাহেবের বউ।
উত্তর : কচুরি পানা।

ধুনটের সংগৃহীত ধাঁধা

১. হাটিতে হাটিতে মাতা হলো ভারি
আবার কাটিয়া দিলে হাটিতে পারি।
উত্তর : রুল বা পেন্সিল

www.pathagar.com

২. আমার একটা ঘোড়া আচে
যা দিবে তাই খাবে
পানি দিলে মারা যাবে।
উত্তর : চুলা বা হাস্যাল।

৩. অ্যাত্তুকুনা বুড়ি
নিত্তিখায় গুড়ি।
উত্তর : গরুবাধার খুঁটা।

৪. খায়না দায় না প্যাটভরা লাদি
গাচের মাতায় বসে আচে ওসমানের দাড়ি।
উত্তর : পেঁপে।

৫. হাটুত ন্যাংগট বাড়িত ঘুংঘর।
উত্তর : সুঁই।

৬. কাঠের গাই মাটির বাচুর
গলা কাটে দুদু খাই।
উত্তর : খেজুর গাছের ছড়ি।

৭. গাছের নাম ভূগোল মাতা
অ্যাকই ডালে অ্যাকই পাতা।
উত্তর : কচু।

৮. ঘরের ভিতর ঘর।
উত্তর : মশারি।

৯. গাছ পিছলে ফল দিগলে।
উত্তর : কলাগাছ।

১০. লতা নাই, পাতা নাই
আচে ফল দ্যাশে নাই
খায় ফল তার চুচা নাই।
উত্তর : শিল।

১১. হায় আল্লা করবো কি?
বুটা নাই তার ধরবো কি?
উত্তর : ডিম।

১২. অ্যাত্তুকুনা লাঠি অ্যাকা ব্যাকা
তারি উপুর বসে আচে বাবুর ব্যাটা।
উত্তর : সাইকেল।

১৩. মিচ্চিআনা পাকি
আল্লার দুস্ত
উপরে গুস্ত
ভিতরে গু।

www.pathagar.com

উত্তর : মুরগির গিলা।

১৪. অ্যাক হাত্তি পেসাব কললো
সারা পৃথিবী ভরে গ্যালো।
উত্তর : বৃষ্টি।

১৫. অ্যাক থালি সুবেরি
গুনতে লাগে ব্যাপারি।
উত্তর : তারা।

১৬. আজার ব্যাটা লককটা
খিল দ্যায় কটকটা।
উত্তর : শামুক।

১৭. বাপ থাকতেই ব্যাটা বুড়ে।
উত্তর : মরিচ।

১৮. গাছ ঝোকড়া
ফুল পুকরা।
উত্তর : ফিরিংগি।

১৯. থাকা ভালো পাওয়া ভালো না।
উত্তর : লজ্জা।

২০. চাচলে মোটা না চাচলে চিকন।
উত্তর : পুকুর।

২১. আমি তেমাদেক দেখতেও পাই চিনতেও পাই
কিন্তু তোমরা আমাক দেখতে পাওনা,
চিনতেও পাও না।
উত্তর : বোরখা।

২২. আরার ভিতর জাবড়া জুনা
দ্যাওরে বাপু চ্যাংরা কুনা।
উত্তর : সুপারি।

২৩. বত্রিশটা ভাল
অ্যাডা পাতা।
উত্তর : জিহ্বা।

২৪. আকাশ থাক্যা পড়লো নুটা
নুটার গুয়াত তিন ফুটা।
উত্তর : তাল

২৫. ইতি নালা উতি নালা
মদ্দে আছে বাগার সালা।
উত্তর : পানি সেচার জাত।

www.pathagar.com

২৬. অ্যাক বুড়ি পানিতে পরে
দুই বুড়ি টেনে তুলে।
উত্তর : পানি সেচার ছেনি।

২৭. শুড় আচে হাতি নয়
পাখা আচে পাকি নয়
মানষেক কামড়ায়
বাগ নয়।
উত্তর : মশা।

২৮. দুই ঠ্যাং ফাক করে
মদ্দে দিলাম টুক্যা
দিলাম যাতা
কাম হয়্যা গ্যালো ফস করে।
উত্তর : যাতায় সুপারি কাটা।

২৯. মুকনাই ডাকে ডাকে
পাখা নাই উড়ে বেড়ায়
প্যাট ছিড়ে আগুন বাড়ায়
উত্তর : মেঘ।

৩০. ঠেললে যায় না
না ঠেললে যায়।
উত্তর : শামুক।

৩১. অ্যাকটা বউ বাজার করাব্যার যায়া অ্যাকটা বাঘ, অ্যাকটা বোরকি, আর অ্যাকবিড়ে পান কিনলো। এগলে নিয়ে বউ বাড়িত যামানচে। মাঝখানে অ্যাকটা নদী পড়লো। ঐখানে অ্যাকটা ছুটো নৌকা। নৌকায় অ্যাক অ্যাক করে সব জিনিস পার করতে হবে। অ্যাক সঙ্গে পার করতে গেলে নৌকা ডুবে যাবে। অ্যাকুন কিভাবে জিনিস গুলা পার করা যাবে?

উল্লেখ্য অ্যাকটা অ্যাকটা করে পার করলে বাঘ ছাগলকে খাবে। ছাগল পান খাবে। যাতে বাঘ বোরকিক খেতে না পারে, বোরকি পান খেতে না পারে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এখন কোন জিনিস আগে পার করা যাবে?

উত্তর : প্রথমে বোরকিক নিয়ে যেতে হবে। তারপর বোরকিক রেখে পান নিয়ে যেতে হবে। এখন পান রেখে বোরকিক আবার এপারে নিয়ে এসে বোরকিক রেখে বাঘেক পার করতে হবে। কারণ বাঘ পান খাবে না। এখন পুনরায় বোরকিক পার করতে হবে। তাহলে তিনটাই রক্ষা পাবে।

নন্দীগ্রামের সংগৃহীত ধাঁধা

১. আমানন্দের বাড়ি দিয়া পেমানন্দের ঘাটা
গাছের ফল গাছত থাকলো ছিঁড়া আনলো বোটা।
উত্তর : তালার চাবি।

www.pathagar.com

২. দেখিতে সুন্দরো বটে মুখখানি কালো
শ্যামদাস বাবাজি কয়
শুলে আর উঠপার লয়।
উত্তর : মেয়েদের স্তন।

৩. ডাণ্ডা লড়ে খেজুর পড়ে।
উত্তর : বগরীর লাদি।

৪. বাগের মতো মারে লাপ
চুপটি কর‍্যা বসে,
পানির মধ্যে ফ্যালা দিলে
সোলা হয়্যা ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

৫. রাস্তা পথে দেকিছিলাম যারে
বুঝিনা তার কতা
ছের কাটলে সোনায় বুলি
প্যাট কাটলে হয় কালি
নেজ কাটলে হয় কাবু
এমন জনার দেকেছোকি হে বাপু?
উত্তর : কাবুলি।

৬. আকাশেতে ডকোমকো
পাতালেতে লেকা
এই লেকা লেকা গেলো
চান খাকোর বেটা
চান খাকোর বেটা লয়
উদুসার লাতি
এই মানে ভাঙ্গা দিতে
আশিন আর কাতি।
উত্তর : বিদ্যুৎ।

৭. গেচিলাম সিংড়ার হাটে
দেকা আলাম ঘাটে
এক ছল দুই মায়ের প্যাটে।
উত্তর : দরজার হাতা/খিল।

৮. ভিউ ফুল ফুল বিচন কালো
মুখ নাই তার জবান ভালো।
উত্তর : খাতা কলম।

৯. হাটিতে হাটিতে মাতা হলো ভার
মাতা কাটিয়া দিলে
চলিবে আবার।
উত্তর : পেন্সিল।

www.pathagar.com

১০. ধুম ধুম বিচনের পুঁরা
বাপ থাকতে বেটা বুড়া।
উত্তর : মরিচের গাছ।

১১. কালো কালো ভোমরা
কালো ঘাস খায়
আঁত হলে ভোমরা
থলের মধ্যে যায়।
উত্তর : খুর কাচি।

১২. বাপবেটা শ্বশুর জামাই
বেড়াতে যায়
তাল পড়ছে তিনটা
গাও দরে কয়টা কর‍্যা পায়?
উত্তর : ১ টা করে।

১৩. শোনো হে কন্যা বিবরণ
তিন আঁড়া এক বোঁকন
ইন্দুর হয়্যা বিলি (বিড়াল) মারে কিসেরই কারণ।
সমুদ্রের মধ্যে বাগের পাও
ছাগলে খালো ৭শ নাও
বউ গেলো বাপের বাড়িত
গুরুক খালো বাগে
কতা যদি হয় অভাগু
৫০ টেকা দিবো দণ্ড।
উত্তর : ভুলি।

১৪. খনের মধ্যে থেকা বাড়ালো সাপ
সাপের নেঙুর ধর‍্যা দিলাম দুই তিন পাক।
উত্তর : নাকের সর্দি।

১৫. ইট্টুকোণা পোকর
মাছ চুলবুল করে।
রাজার বেটার শক্তি নাই
মাছ ধরবার পারে।
উত্তর : ভাত রান্না করা।

১৬. ঘর বাড়ালো দুয়ার দিয়া
হামি বাড়ায় কুমিন্দা।
উত্তর : মাছ যখন তৈরা জালের মধ্যে পড়ে।

১৭. যাতে দৌড় আসতে ধীর
থুয়া আলাম বড় মহাবীর।
উত্তর : পায়খানা।

www.pathagar.com

১৮. মামারা আন্দে মামারা খায়
হামরা গেলে বন্দ কর‍্যা দেয়।
উত্তর : শামুক।

১৯. খিলালে কমে
না খিলালে অমনি থাকে।
উত্তর : খড়ের পালা।

২০. ভিতরে চিরা উপরে খায়।
উত্তর : হাঁস মুরগির গিলা।

২১. ছোটত নেজ বয়োসত খসে
বাগের লাকান হামকি দিয়া কুত্তার লাকান বসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

২২. সাগরে জন্ম যাহার
লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ।

২৩. প্যাট দিয়া খায় মুখ দিয়া হাগে
সেই গু তরকারিত লাগে।
উত্তর : কুজি/খলসানি।

২৪. লম্বা লম্বা ঠ্যাং
শরীল হলো ছিনো,
মানুষ ধর‍্যা খায়
বাগও লয় বগও লয়।
উত্তর : মশা।

২৫. লাত্তি দিলে প্যাট ভরে
সালাম করলে বাঁদ (বমি) করে।
উত্তর : জাঁত/বড় ছেউতি।

২৬. দুই ঠ্যাং ফাঁক কর‍্যা
মধ্যে ঠিক কর‍্যা
ঠাঁসি মারলো যখন
কাজ হলো তখন।
উত্তর : সুপারি কাটা জাঁতি।

২৭. এক থাক দুই থাক তিন থাক
তারি উপর বস্যা আছে মোহাম্মাদের বাপ।
উত্তর : সাইকেল।

www.pathagar.com

শাজাহানপুরের সংগৃহীত ধাঁধা

১. মুখ নাই মাথা টিপ দিলে কয় কথা খাচায় থাকে বন্দী হয়ে যেতে পারে না যথা তথা।

উত্তর : রেডিও।

২. হাতুড়ী বাটলি বাইশটা চোরে নিল বাইশটা চট পট বলে ফেলো বাকি থাকে কয়টা।

উত্তর : দুইটি এবং বাইশটা এক প্রকার যন্ত্র।

৩. এমন একটা দেশ চাই যে দেশে মাটি নাই, এমন আজব দেশের নাম কি বলতো ভাই।

উত্তর : সন্দেশ।

৪. দিনে করি শতেক বিয়া কাবিন নাহি হয়, ছেলে মেয়ের মালিক আমি কোনো কালে নাই।

উত্তর : মোরগ।

৫. নই আমি বৃক্ষ তবু শাখা আছে, মোরা সব সময় থাকি আমি মাথার উপর।

উত্তর : হরিণের শিং।

৬. গাছ নাই আছে পাতা, মুখ নাই বলে কথা বলতে না পারলে খাও আমার মাথা

উত্তর : বই।

৭. এক গাছে এক বুড়ি চোখ তার বারো কুড়ি, চোখ না কেটে খেলে গলায় লাগে যে সুড়সুড়ি।

উত্তর : আনারস।

৮. ঘর আছে দুয়ার নাই মানুষ আছে শব্দ নেই, ঘরের ছাদ মাটি চাপা আলো ঢোকবার জায়গা নাই।

উত্তর : কবর।

৯. কালো হরিণ থাকে করো জঙ্গলের ধারে দশজনে ধরে আনে দুইজনে মারে।

উত্তর : উকুন।

১০. শিশু কালে বস্ত্রধারী আর যৌবনেতে উলঙ্গ বৃদ্ধা কালে জটাধারী মাঝখানে তার সুড়ঙ্গ।

উত্তর : বাঁশ।

১১. কাঁচা খাও পাকা খেতে যে রসাল আমি? যদি খেতে বলি চটে হও লাল।

উত্তর : কলা।

১২. কোন শহর খুলতে মানা, তোমার কী আছে জানা?

উত্তর : খুলনা।

১৩. শুভ বসন দেহ তার করে মানুষের উপকার, চিতায় তারে পুড়িয়ে মারে মানুষ করে অত্যাচার।

উত্তর : মোমবাতি।

১৪. এক বুড়ির এক মুখ তিন মাথা, সকালবেলায় রোজই খায় লতাপাতা।

www.pathagar.com

উত্তর : উনুন।

১৫. শীতকালে যার নাইকো দাম, নিদাঘকালে অনেক দাম।
উত্তর : পাখা।

১৬. নারীর মহলে থাকি গায়ের রংটি সবুজ, নিত্য খেলে নেশা হয় ছোটরা খেওনা অবুঝ।
উত্তর : পান।

১৭. সকল জিনিস কাটলে পরে ছোট হয়ই, একটি মাত্র জিনিস কাটলে পরে বড় হয়।
উত্তর : পুকুর।

১৮. এক থাল সুপারী গুনতে পারে কোন ব্যাপারী, বলতে না পারলে সে হবে চুরি পরা নারী।
উত্তর : তারা।

১৯. তিন অক্ষরের নামে আছে এক দেশ, মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে খেতে লাগে বেশ
উত্তর : আসাম।

২০. হাত নাই পা নাই রসিক নাগর, অনায়াসে পার হয় অকুল সাগর।
উত্তর : সাপ।

২১. একটু খানি চুনকাম করা ঘর ভেঙ্গে গড়তে বললে গায়ে আসে জ্বর
উত্তর : ডিম।

২২. মাটি দিয়ে তৈরি আমার আমি দেখতে হলে শহরে যাও চলে।
উত্তর : ইট।

২৩. কান মলে দিলে তবু চলে তার হাত, পেট ভরে নাড়িভুঁড়ি চলে দিন রাত।
উত্তর : ঘড়ি।

২৪. কাঁচাতে তুলতুল, পাকাতে দল নেংটা হয়ে বাজারে যায় জিভে আসে জল
উত্তর : তেঁতুল।

২৫. লাথির পর লাথি খায় লাজ টজ্জা, নাই মাথা তবু উঁচু করে কোন শরম নাই।
উত্তর : ঢেঁকি।

২৬. মাথার মুকুট গোর রাল পেটের মধ্যে হাত পা, চলে কিন্তু নড়ে না এটা কি ভাই বলো না।
উত্তর : শামুক।

২৭. লম্বা সাদা দেহ তার মাথায় টিকি রয়, টিকিতে আগুন দিলে দেহ তার ক্ষয়।
উত্তর : মোমবাতি।

২৮. নিজ মুখে সে পরকে খাওয়ায় ভুলেও কভু সে নিজে নাহি খায়।
উত্তর : চামচ।

২৯. ছোট্ট এক পুকুর জল টলমল করে, সর্বনাশ হয় যদি কিছু তাতে পড়ে।
উত্তর : চোখ।

৩০. আকাশে বাতাসে আছি পৃথিবীতে নাই, চাঁদ আর তারায় আছি সূর্য তে নাই
উত্তর : আকার।

www.pathagar.com

৩১. জোরে যদি মারো তাকে জোরে জোরে কাঁদবে, কান্না থামাতে চাইলে হাত দিয়ে ধরবে।
উত্তর : ঘণ্টা।
৩২. ছুঁইলে হাটে না না ছুঁইলে হাটে প্রতিদিন দেখা যায় গীতাদের ঘাটে।
উত্তর : শামুক।
৩৩. ভগবানের তৈরি রাস্তা, মানুষের নাই সাধ্য হরেক রকম নাম বরতে মানুষ তা বাধ্য
উত্তর : রংধনু।
৩৪. বাজাইলে বাজে, সাজাইলে সাজে পাওয়া যায় হাটে, হাত থেকে পরে গিয়ে অঘটন ঘটে।
উত্তর : মাটির পাত্র।
৩৫. মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে মাকে দিলাম ঘাই, সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হলাম ভাই।
উত্তর : ম্যাচ।
৩৬. সাগরে জন্ম তার আকাশেতে ওড়ে, পর্বতের মার খেয়ে কেঁদে ঝরে পড়ে।
উত্তর : মেঘ।
৩৭. একলা তাকে যায় না দেখা সঙ্গী পেলে বাঁচে, আঁধার দেখে ভয়ে পালায় আলোয় ফিরে আসে।
উত্তর : ছায়া।
৩৮. মানুষের কাঁধে চড়ি, আমার পেটে চড়ে মানুষ, হাত আছে পা নাই, নহি কল্পনার ফানুস।
উত্তর : পালকি।
৩৯. আছারে ভাঙ্গে না পাছারে ভাঙ্গে না, টিপলে সয় না।
উত্তর : ভাত।
৪০. দূরে দূরে দেখি তারে পাই না সীমানা, কাছে গেলে দূরে রয়, থাকে সরে অজানা
উত্তর : আকাশ।
৪১. বলতে পারো এমন কি জীব আছে, একশত ঘর তার এক ভিটায় আছে।
উত্তর : মৌচাক।
৪২. বাড়িতে ঠুস, চাপে দুরমুজ।
উত্তর : ডিম।
৪৩. নিত্য আসে নিত্য যায়, কালো ও নীরব, নিত্য হায়।
উত্তর : রাত্রি।
৪৪. গলা জড়িয়ে আসে রসিক যুবতী, সকল লোকে মোর পেটে বসে বড় কষ্ট দেয় মনে।
উত্তর : কলসি।
৪৫. কোর্ট কাছারিতে বিচার শুনি, জন্ম আমার বনে, সকল লোকে মোর পেটে বসে বড় কষ্ট দেয় মনে।
উত্তর : চেয়ার।

www.pathagar.com

৪৬. বিনি সুতোর মোহন মালা কেউ দেখে না তারে, ইহার এমনি নিষ্ঠুর ধারা শেষ করে ছাড়ে।
উত্তর : প্রেম।
৪৭. জলেতে জন্ম যার, জলে ঘর বাড়ি, ফকির নহে ওঝা নহে মুখে ছাগল দাড়ি।
উত্তর : চিংড়ি।
৪৮. উটের মতো বুক টান, কোন জিনিসের চার কান?
উত্তর : চৌচালা ঘর।
৪৯. দিন রাত পড়ে থাকে লাথি মারলে চলে, গ্রামের মধ্যে থাকে সে কথা নাহি বলে।
উত্তর : ঢেঁকি।
৫০. বন থেকে বাহির হয় ওঝা, পাছায় লাঠি মাথায় বোঝা।
উত্তর : আনারস।
৫১. উপরে চাপ নীচে চাপ, মধ্যিখান থেকে বেরোয় সাপ।
উত্তর : জিহ্বা।
৫২. বাকলায় কড়ি, সারে খড়ি, আগায় তরকারি, না নিলে জেনে নাও এটা খুবই উপকারি।
উত্তর : পাট।
৫৩. এই দেখি এই নাই, রুপোলি লেজ দেহ নাই।
উত্তর : বিজলি।
৫৪. জন্মেতে দুই শিং পুরো মাসে নাই, মৃত্যুতে দুই শিং দেখেছো কি ভাই।
উত্তর : চাঁদ।
৫৫. টানলে পরে কমে যাবে, অবশেষে কিছুই না রবে।
উত্তর : বিড়ি।
৫৬. গুন গুনাইয়া গান করে, গায়ক না, সবার মাঝে চুরি করে চোর ও না।
উত্তর : মশা।
৫৭. এক গাছে তিন তরকারি, বলতে পার কোন ব্যাপারী।
উত্তর : কলাগাছ।
৫৮. হায় তরমুজ করি কি, বোঁটা নেই তার ধরবো কি।
উত্তর : ডিম।
৫৯. রাত্রিকালে আঁধারেতে যায় যার ঘরে, সে বাড়িতে সকল লোকে কান্নাকাটি করে।
উত্তর : চোর।
৬০. আকাশে ঝিকিমিকি চৌতালায় তার বাসা, যে কোন মানুষের খাইতে বড় আশা।
উত্তর : হুক্কা।
৬১. মাতব্বর নাম তার কেশবপুরে বাড়ি, লক্ষ্মীপুর ধরা পড়ে জীবন খানি মারি।
উত্তর : উকুন।
৬২. জলের মাঝে জন্ম হলো দই অক্ষরের প্রাণী, শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে হয় মহারানি।
উত্তর : মাছ।

www.pathagar.com

৬৩. পায়ে আঘাত করলেও করে নাকো রাগ, খেতে দিয়ে কেড়ে নিলে, তাও করে না রাগ।
উত্তর : ঢেঁকি।

৬৪. জীবন্তে মৌন থাকে মরিলে সে খায় ডাকে, মঙ্গলের তরে কেউ বা ঘরে এনে রাখে
উত্তর : শিলা।

৬৫. এক পেটে তিন মাথা মাঝে আগুনের গোলা, না বলতে পারলে খেতে হবে কানমলা।
উত্তর : উনান।

৬৬. একটি বুড়ির আছে শুধু বারোটিই ছেলে।
উত্তর : বৎসর।

৬৭. রক্তে ডুবু ডুবু কাগজের ফোঁটা, যে বলতে না পারে সে এক নম্বরের বোকা।
উত্তর : কচুপাতা।

৬৮. কলের মধ্যে দিলে পা, ভাগ্যের লিখন হবে তা।
উত্তর : কপাল।

৬৯. দশ শির এক মুণ্ডু সে নয় রাবণ, সকলে খাইতে দেয় তাহার ব্যঞ্জন।
উত্তর : ঝিঙে।

৭০. সবার ঘরে, সবার কাছে আমার যে থাকা, ছয়মাস সাথে থাকি, সবার কাছে আমার যে থাকা।
উত্তর : হাতপাখা।

৭১. দিন গুনি, সপ্তা গুণি, আরো গুনি মাস, এমনি করেই কাটাই আমি পুরো বারো মাস।
উত্তর : ক্যালেন্ডার।

৭২. অনেকেই খায় না, কিছু লোকে খায়, বন্ধুদের না খাওয়ালে মানহানি খায়।
উত্তর : সিগারেট।

৭৩. দুই তক্তার নৌকাখানি বারো দাঁড় বায়, জলের মধ্যে না গিয়ে শুকনা দিয়েই যায়।
উত্তর : মই।

৭৪. নতুন জামাই স্নান করে, মাথায় তার ছাদ, যতো খুশি জল ঢালো ভেজে না তার কাঁধ।
উত্তর : কচুগাছ।

৭৫. খেয়ালে ভোজন, ধেয়ানে স্নান, এক সাথে তিন কাজ করে কোন জন। মাছরাঙ্গা পাখি, অন্ধ বাগান বন্ধ্যা গাছ ফুল ফোটে বারো মাস।
উত্তর : আকাশ ও তারা হাত নেই পা নেই কে এই নাগর পেট দিয়ে পার হয় জঙ্গল ও সাগর। উত্তর : সাপ।

৭৬. কাঁচাতে মানিক ফল গড়াগড়ি যায়।
উত্তর : ডুমুর।

৭৭. জন্ম দিয়ে বাপ মা হয়ে গেল পর, যার ছেলে সে নিয়ে গেল পড়শি কেঁদে মর।
উত্তর : কোকিলের বাচ্চা।

৭৮. লেজ ধরে টান মারলে টপ টপিয়ে পড়ে, গায়েতে আগাত লাগে আছে অনেকের ঘরে।
উত্তর : পাত কুয়ো থেকে পানি উঠানো।

৭৯. কোন দিন দেখেনি কেউ, হয় না কখনো রেগে গেলে লোকে বলে কথাটা জেনো।
উত্তর : ঘোড়ার ডিম।

www.pathagar.com

৮০. লুকোবি কালো মুখ খোলের মাঝে, মাতা কেটে আজ তোরে লাগাবো কাজে।
উত্তর : কচ্ছপ।

৮১. থাকলে বালো হয় কিন্তু পাওয়া বালো নয়, না বলতে পারলে সে আমার বউ হয়।
উত্তর : লজ্জা।

৮২. ডাক দিয়ে ভয় দেখায় আলো দিয়ে পথ দেখায়।
উত্তর : ঠাঠা ও বিজলি।

৮৩. ফুটার মাঝে খুঁটো দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে মানুষ, যে না বলতে পারে সে একটা বনমানুষ।
উত্তর : দরজার খিল।

৮৪. ঘেউ ঘেউ করি না চুপচাপ বাড়ি দিই, পাহারা শরীর মোদের ঠান্ডা যে রয় বলতে পারো কাহারা :
উত্তর : তালা।

৮৫. ছয় পা বারো হাঁটু জাল ফেলেছে মাছ নেই, জল নেই ডাঙ্গাতেই থেকেছে।
উত্তর : মাকড়সা।

শেরপুরের সংগৃহীত ধাঁধা

১. মাটির হাড়ি কাঠের গাই, বছর বছর দুয়াই খাই।
উত্তর : খেজুর গাছ

২. তুমি থাকো ডালত হামি (আমি) থাকি খালত, তুমার হামার দেখা হবি মরণের কালত।
'উত্তর : মরিচ ও মাছ।

৩. একটুখানি পুকুরটা পিতলের ছাউনিটা, মেঘ নাই বৃষ্টি নাই তবু পড়ে পানি।
উত্তর : চোখ।

৪. এট্টুখানি পুকুরটায় ইচার গাড়া ভরা, একটা ইচা টিপ দিলে সব ইচা মরা।
উত্তর : ভাত।

৫. এট্টুখানি পুকুরটায় কৈ ভগ-ভগ করে, এ্যাকনা ব্যাটার সাহস লাই লাফ দিয়া ধরে।
উত্তর : ফুটুন্ত ভাত।

৬. ছোট ছোট ছোলপোল (শিশু) দুধ ভাত খায়, বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করবার যায়।
উত্তর : কুঠার বা কুড়াল

৭. হাত আছে মাথা নাই, পেট আছে তার ভুরি নাই।
উত্তর : শার্ট।

৮. ঢেউয়ের উপর ঢেউয়ের মাঝে বসে আছে লাট সাহেবের বউ।
উত্তর : কুচুরি পানা।

৯. এক ঘরে এক খাম বলো তার কি নাম?
উত্তর : ছাতা।

১০. জলে ভাসা কৃষ্ণ, নাই হাড় আছে মাংস।
উত্তর : জোঁক।

www.pathagar.com

১১. মাঠের থেকে আসলো সাহেব কোট প্যান্ট পরে, কোট প্যান্ট খুলতে গেলে চোখে কান্না ধরে।
উত্তর : পেঁয়াজ।

১২. তিন অক্ষরের নাম যার জলে বাস করে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে উড়ে।
উত্তর : চিতল।

১৩. গাছটা গজারী পাতাটা ইলমা, ধরে কামরাঙ্গা, পরে কালিজিরা।
উত্তর : তিল।

১৪. কালিদাসের ফাঁকি ৩৬ থেকে তিন-শ গেলে কত থাকে বাকি।
উত্তর : তেত্রিশ (শ,ষ,স বাদ যাবে)

১৫. এক থাল সুপারী গুনতে পারবে কোন বেপারী।
উত্তর : তারা।

১৬. অল্প দিলে চদি বদি বেশি দিলে বিষ, কালিদাস পণ্ডিতে বল্যা গেছেন আন্দাজ মত দিস।
উত্তর : লবণ।

১৭. হাতুড় বাটাল বাইশড্যা, চোরে নিলো তিনড্যা বাকি থাকে কয়ড্যা।
উত্তর : একটাও না।

১৮. এক লোকের বাড়িত ঘটক আসিচে মিয়ে দেখার জন্য, নাপিত আসিচে ছেলের চুল কাটার জন্য আর লাউয়ের ব্যাপারি লাউ কিনবার আসিচে। তিনজনকে এক কথায় কিভাবে বিদায় করবেন। কন দেকি?
উত্তর : বাড়ক।

১৯. ঘর আছে দুয়ার নাই, মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর : কবর।

২০. এক কুড়ি বার ভাই এক ঘরেতে থাকে, সকল ভাইয়ের এক নাম একই নামে ডাকে, দুইবার জন্মে ছেলে বিনা বাপ মায়।
উত্তর : দাঁত।

২১. পাঁচ অক্ষরের ইংরেজি নাম, সবার ঘরে আছে, প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে সবার মাথায় আছে, প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে সর্বত্র আছে।
উত্তর : চেয়ার।

২২. দুই অক্ষরে তলিয়ে গেলে ঠিকানা কিছু নাই জোর গলাতে ডাকলে তাতে একটু সাড়া পাই।
উত্তর : ভাবি (চিন্তা)।

২৩. লাল মিয়া হাটে যায়, লিত্তি একটা থাপ্পড় কায়।
উত্তর : মাটির হাড়ি।

২৪. কালিদাসের কতা একটা তেঁতুল গাছে কয়টা পাতা।
উত্তর : তিনটা।

www.pathagar.com

২৫. উপর হইতে পড়লো বুড়ি কাঁথা কম্বল লইয়া ভাসতে ভাসতে যায়রে বুড়ি কানাই নগর দিয়া।
উত্তর : তাল।

২৬. চারদিকে বেত কাঁটা মধ্যে বসে সাপ বেটা।
উত্তর : আনারস।

২৭. সাগরে যার জন্ম নগরে তার বাস মায়া ছুঁলে হয় পুত্রের সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ।

২৮. নাকটি চেপে বসে, কানটি ধরে টেনে, জগৎখানা ঘুরে বেড়ায় বল না সে কে?
উত্তর : চশমা।

২৯. আমি যাকে আনতে গেলাম তাকে দেখে ফিরে এলাম সে যখন চলে গেল তাকে নিয়ে এলাম।
উত্তর : বৃষ্টির পানি।

৩০. আছে ফল দেশে নাই, খাই ফল তার খোসা নাই।
উত্তর : শিলা।

৩১. তেরো মাস বয়সেতে হয় ছোলের মা, ছোল হয় গণ্ডায় গণ্ডায় এভা কেমন মা?
উত্তর : কলা গাছ।

৩২. ছোট ছোট ছেমরি কাপড় পরে সাদা শাড়ী, নায় না খায় না তবু এত সুন্দরী।
উত্তর : রসুন।

৩৩. তিন অক্ষরে নাম যার গৃহ মধ্যে রয়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে খাদ্য বস্তু হয়, শেষের অক্ষর বাদ দিলে কোমরেতে রয়, কও দেখি সুন্দরী সেডা কি বস্তু হয়।
উত্তর : বিছানা।

৩৪. হাত নাই পাও নাই দেশে দেশে ঘুরে, অভাব হইলে তার জন্য লোকে অনাহারে মরে।
উত্তর : টাকা।

৩৫. দিনের বেলা ঘুমায় থাকে, রাতের বেলা জাগে, ঘর নাই বাড়ি নাই পরের ভিক্ষা মাগে।
উত্তর : চাঁদ।

৩৬. মা রইল নানীর পেটে আমি গেলাম বাবুর হাটে।
উত্তর : কলা

৩৭. ঝাপরী ঝাপরী গাছটি, ফল ধরে বারটি, পাকলে হয় একটি।
উত্তর : বৎসর।

৩৮. শুড় দিয়া করি কাজ নই আমি হাতী, পরের উপকার করি আমি তবুও খাই লাথি।
উত্তর : ঢেঁকি।

৩৯. চার পায়ে বসি আমি, আট পায়ে চলি, বাঘ নয় কুমির নয় আস্ত মানুষ গিলি।
উত্তর : পালকি।

৪০. নিজে মুখে সে পরকে খাওয়ায়, ভুলে কভু নিজে নাহি খায়।
উত্তর : চামুচ।

www.pathagar.com

৪১. এমন জিনিসের নাম কও সকলেই খায়, পেট ভরে না কোন কালে, তবু না চাইলেও খায়।
উত্তর : আছাড়।

৪২. হাত আছে পা নাই মাথা তার কাটা, আস্ত মানুষ গিলে খায় বুক তার ফাটা।
উত্তর : শার্ট।

৪৩. আজব এক জিনিস দেখে এলাম মাঠে, আট পা তার দুই হাঁটু লেজ আছে তার পিঠে।
উত্তর : দাঁড়িপাল্লা।

৪৪. ইড়িং বিড়িং তিড়িং বাই চোখ দুটো তার মাতা নাই।
উত্তর : কাঁকড়া।

৪৫. আগায় খস খস গোড়ায় মৌ, যে বলতে না পারবে সে পবন ঠাকুরের বউ।
উত্তর : কুসার বা আখ বা গেন্ডারী।

৪৬. হরির উপর হরি, হরি শোবা পায় হরিরে দেখিয়ে হরি হরিতে লুকায়।
উত্তর : পদ্ম, ব্যাঙ, সাপ, পানি।

৪৭. আপনার পাওনা দিয়ে গেলাম, আমার পাওনা বাকি রইল ভাই টাকা চাই না পয়সা চাই না পাওনা শুধু চাই।
উত্তর : সালাম।

৪৮. চলে কিন্তু হাটে না কি জিনিস তা বল না? ঠাকুর নয় দেবতা নয় চড়ে মাথার উপর।
উত্তর : টাকা ও পয়সা।

৪৯. গরমে রাখলে গোলে যাবে, ঠান্ডায় রাখলে কঠিন হবে। বরফ কিন্তু নয়, আছে সবার ঘরে, বল দেখি লাগে কিন্তু খুব জরুরী কাজে?
উত্তর : মোম।

৫০. আম নয় জাম নয় গাছে নাহি ধরে, তবু সকল লোকে তারে ফল বলে জানে।
উত্তর : পরীক্ষার ফল।

৫১. ছোট ছোট ছেলেগুলি ভাঙ্গা নায়ে থাকে, আগুনের তাপ পেলে লাফায়া নাচে।
উত্তর : খই।

৫২. পরের ঘরে জন্ম আমার দেখতে আমি কালো তাই বলে কেউ ভুল করো না বাসতে আমায় ভালো।
উত্তর : কোকিল।

৫৩. ছোট এক পুকুরে পানি টলমল করে, সর্বনাশ হয় যদি কিছু তাতে পড়ে।
উত্তর : চোখ।

৫৪. সবুজ বুড়ি হাটে যায়, হাটে যাইয়া চিমটি খায়।
উত্তর : লাউ।

৫৫. খোসা আছে বোটা নাই, বলতো কি জিনিস ভাই?
উত্তর : ডিম।

৫৬. আচ্ছা বলত কোন জিনিস সিলেট থেকে চলে গেছে চিটাগাং? নড়ে চড়ে নাই।
উত্তর : রেল লাইন।

www.pathagar.com

৫৭. নাই মুখ নাই কথা টিপ দিলে কয় কথা।
উত্তর : রেডিও, টেপরেকোর্ডার এবং সিডি প্লেয়ার।

৫৮. কোন প্রাণী বেশি দিন বাঁচে।
উত্তর : কাছিম।

৫৯. দোল দোল দোলনি, ছোট বেলায় খেলুনি পাকলে সুন্দরী হবে ন্যাংটো হয়ে হাটে যাবে।
উত্তর : তেঁতুল।

৬০. চলিতে চলিতে তার চলা হলো ভার মাথাটি কাটিয়া দিলে চলিবে আবার।
উত্তর : পেন্সিল।

৬১. একটা কানি গাছে লাল বৌটি নাচে।
উত্তর : মরিচ।

৬২. চিল চিলি পাতা মোটা মোটা ডাল, ফলটি পাকা বিচিটি লাল
উত্তর : তেঁতুল।

৬৩. দুই মায়ের এক সন্তান বলেন দেখি তার কি নাম।
উত্তর : দরজার খিল।

৬৪. বাটির উপর বাটি তাকই হামরা চাটি।
উত্তর : চালতা ফল।

৬৫. ভাষা আছে কতা আছে সাড়া শব্দ নাই, প্রাণীর সাথে থেকেও তার নিজের প্রাণ নেই
উত্তর : বই।

৬৬. আকাশে মস্তক যার পাতালে আঙ্গুল, মাথার উপর আছে এক লেঙ্গুল প্রসারিয়া সূত্র যদি ভূমে হয় স্থিতি আনন্দেতে নরগন ধায় দ্রুত গতি।
উত্তর : তাল গাছ।

৬৭. তুমি আমি একজন দেখতে এক রূপ, আমি কত কথা কই তুমি কেন থাক চুপ।
উত্তর : নিজের ছবি।

৬৮. কাঁচা খাও পাঁকা খাও খাইতে রসাল, অন্যে যদি খেতে বলি চটে হও লাল।
উত্তর : ঘোড়ার ডিম।

৬৯. লথির পরে লাথি মারে, লাজ-লজ্জা নাই, মাতা তবু উঁচু করে, নাইকো শরম।
উত্তর : ঢেঁকি।

৭০. মরা দেহ হেঁটে যায়, আস্তা পাওটা গিলে খায়।
উত্তর : জুতা।

৭১. আকাশে আছি পাতালে আছি পৃথিবীতে নাই, চাঁদ আর তারায় আছি সূর্যেতে নাই।
উত্তর : আকাশ।

৭২. বাঘের মত লাফ দেয়, কুকুর হয়ে বসে, পানির বুকে ছেড়ে দিলে শোলা হয়ে ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ।

৭৩. তিন মাথা একমুখ ক্ষুধা লাগলে চায় না, যা দাও তাই খায় পেট তবু ভরে না।
উত্তর : চুলা।

৭৪. খোদার কি কুদরত লাঠির ভিতর শরবত।
উত্তর : কুশার বা আখ বা গেন্ডারী

www.pathagar.com

৭৫. হায় তরমুজ করি কি। বোঁটা নাই তার ধরি কি।
উত্তর : ডিম।

৭৬. দেখে এলাম মিয়া সাহেবের হাটে, এক ছেলে দুই মায়ের পেটে।
উত্তর : দরজার খিল।

৭৭. জলে রই স্থলে রই জল বিনা কিছু নাই।
উত্তর : বরফ।

৭৮. সাথে সাথে থাকি কিন্তু ধরবার না পারি, আলো পাইলে বাঁচি অন্ধকারে মরি।
উত্তর : ছায়া।

৭৯. সমুদ্রেতে জন্ম হামার (আমার) থাকি সবার ঘরোত (ঘরে) এট্টু (একটু) পানির পরশ পেলে যাইগো হামি (আমি) মোর‍্যা।
উত্তর : লবণ।

৮০. এক হাত গাছটার পাঁচ ফল ধরে।
উত্তর : পাঁচ আঙ্গুল।

৮১. এক গাছ এক বুড়ি চোখ তার বার কুঁড়ি।
উত্তর : আনারস।

৮২. জন্মে সাদা কর্মে কালা, গলায় লোহার হার লাফ দিয়ে আহার করে লম্বা লেজ তার।
উত্তর : জাল।

৮৩. ছোট বেলায় ঘোমটা দিয়ে যায়রে শশুর বাড়ি, যৌবনে হয় উলঙ্গ পরেন না আর শাড়ি।
উত্তর : বাঁশ।

৮৪. জলের মাঝে জন্ম হলো দুই অক্ষরের প্রাণী, শেষের অক্ষর বাদ দিলে হয় মহারাণি।
উত্তর : মাছ।

৮৫. লম্বায় কাটো গোল কাটো তলাতে কাটো ক্রমে ক্রমে বড় হবে নাহি হবে ছোট, কাটিলে সকল জিনিস ছোট হয়ে যায় এমন কি আছে কাটলে বড় হয়।
উত্তর : পুকুর।

৮৬. এক বুড়ি এক মুখ তিন মাথা নিত্য খায় ডাল, লতা, পাতা।
উত্তর : চুলা।

৮৭. পাঁচ মায়ে তুলে নিল বত্রিশ ছেলের ঘাড়ে দুরে ছিলো বুড়ো দাদি টেনে নিল তারে।
উত্তর : ভাত খাওয়া।

৮৮. চার কলসি দুধ ভরা, ঢাকনী ছাড়া উপুর করা।
উত্তর : ওলান/গাভির দুধের বান।

৮৯. আকাশে আছে পাতালে নাই, কি জিনিস নাম তার বল দেখি ভাই।
উত্তর : তারা।

৯০. খাবার মুখে চুপটি করে ডুবে থাকে জলে, মুখ আহার করতে এলে খুব করে টান ধরে।
উত্তর : বড়শি।

৯১. হাত নাই পাও নাই গায়ে খাড়ু, মুখ আছে জিহ্বা আছে খায় কেবল নাড়ু খোদার সৃষ্টি নয় জীব হিংসা করে, নাভী টান মারলে ভীষণ শব্দ করে।
উত্তর : বন্দুক।

www.pathagar.com

৯২. হাত আছে পা নাই কোন গলায় চিন, দুই হাত দিয়া আহার করে পাতালে পাড়ে নিন।
উত্তর : কাঁকড়া।

৯৩. পাও দিয়া মারে লাথি নাহি করে রাগ, খাবার দিয়া কাইড়া ল্যায় তাতে হয় খুশি যতবার দেখিবে সে করিবে নমস্কার, পেটে দেয় না আহার।
উত্তর : ঢেঁকি।

৯৪. মানুষ নয় প্রানী নয় পাছে পাছে ঘুরে, লাথি দিলেও সেও লাথি দেয় গায়ের জোরে।
উত্তর : ছায়া।

৯৫. পানির বস্তু নয় কিন্তু পানিতে রয়, সকলে তার বুকে আসে আর যায়।
উত্তর : নৌকা।

৯৬. যোগ নয়, সন্ন্যাসি নয়, মাথায় হুতাশন ছেলে নয় পেলে নয় ডাকে ঘন ঘন চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে কন্যা নয় পুত্র নয় চুমু খায় মুখে।
উত্তর : হুক্কা।

৯৭. পানিতে জন্ম তার পানিতে রয়, হাত নাই পাও নাই মানুষ খাবার চায়।
উত্তর : জোঁক।

৯৮. লোহার খুটি কাঁচের ঘর তার মধ্যে আলোর বর।
উত্তর : হারিকেন।

৯৯. থাল থাল বরিশাল থাল নিল চোরে, বৃন্দাবনে আগুন লাগাইলে কে নিভাইতে পারে।
উত্তর : সূর্য।

১০০. সব কিছু পাড়ি দিয়ে যায় নদীর কাছে গেলে থেমে যায়।
উত্তর : রাস্তা।

১০১. সাগরে জন্ম তার আকাশে উড়ে পর্বতে মার খেয়ে কেঁদে ঝড়ে পড়ে।
উত্তর : মেঘ।

১০২. পক্ষী নয় তবু তার আছে দুটি পাখা, লেজ মাথা সবই আছে আরো আছে ঢাকনা বুদ্ধি একটু খাটিয়ে বলো দেখি কি তা।
উত্তর : উড়োজাহাজ।

তথ্যনির্দেশ : আদমদিঘি

১. মোঃ মজিবর প্রাং, পিতা : মৃত খয়ের প্রাং, বয়স : ৬০, পেশা : কৃষি, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, গ্রাম : বরিয়াবাত্তা পো : আবাদ পুকুর, থানা : আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৫/০৮/১১। (১-২৪ ধাঁধার কথক)

২. শ্রী গোষ্ট চন্দ্র মোহন্ত, পিতা : মৃত কেশব চন্দ্র মোহন্ত, বয়স : ৬৩, পেশা : ব্যবসা (চানাচুর ভাজার দোকান) শিক্ষা : ৪র্থ শ্রেণী, গ্রাম : বরিয়াবাত্তা, পো : আবাদপুকুর, থানাঃ আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৫/০৮/১১ (২৫-৩১ ধাঁধার কথক)।

৩. শ্রী মতি সুরধ্বনি দেবনাথ, স্বামী : মৃত গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, বয়স : ৬৭, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বিহিগ্রাম, পো : চাঁপাপুর, থানা : আদমদিঘি। সংগ্রহঃ ১৫/০৮/১১।

৪. শ্রী যোগেশ চন্দ্র দেবনাথ, পিতা : মৃত রজনি কান্ত দেবনাথ, বয়স : ৮৫, পেশাঃ কৃষি, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বিহিগ্রাম, পো : চাঁপাপুর, থানা : আদমদিঘি, সংগ্রহ : ১৫/০৮/১১ (৩২-৫৩ ধাঁধার কথক)।

www.pathagar.com

৫. মোছাঃ মাবিয়া বিবি, স্বামী : মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন, বয়স : ২৬, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : এস.এস.সি, গ্রাম : কড়ুই, পো : ঐ, থানা : আদমদিঘি। সংগ্রহ : ১৫/০৮/১১।

৬. মোছাঃ মোমেনা বিবি, স্বামী : মোঃ সাহাদত হোসেন, বয়স : ৩৫, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : দশম শ্রেণি, গ্রাম : কড়ুই, পো : ঐ, থানা : আদমদিঘি। সংগ্রহ : ১৫/০৮/১১ (৫৪-৭৬ ধাঁধার কথক)।

৭. মোঃ তালেপ হোসেন, পিতা : মোঃ আত্তাজুল হোসেন, বয়স : ২৩, পেশা : রাজমিস্ত্রী, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধোনতলা, পো : নশরৎপুর, থানা : আদমদিঘি। সংগ্রহ : ১৬/০৮/১১ (৭৭-৯৪ ধাঁধার কথক)।

৮. শ্রী বিপ্লব কুমার প্রাং, পিতা : শ্রী বিরেশ্বর প্রাং, বয়স : ১৮, পেশা : ছাত্র, শিক্ষা: এইচ.এস.সি, গ্রাম : বরবড়িয়া, পো : নশরৎপুর, থানা : আদমদিঘি। সংগ্রহ : ১৬/০৮/১১ (৯৫ ধাঁধার কথক)।

তথ্যনির্দেশ: গাবতলী

১. মোছা : সাদিয়া আফরিন, পিতা : আব্দুস সামাদ, বয়স : ১৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতা: ৭ম শ্রেণি, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (১-১৫ নং ধাঁধার কথক)।

২. মো : আলমগীর হোসেন, পিতা : মো : আজগর আলী, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, পেশা : ভাঙ্গারী ব্যবসা, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (১৬-১৭ নং ধাঁধার কথক)।

৩. মো : মজনু সরদার, পিতা : মো : মোবারক আলী সরদার, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর, পেশা : দিন মজুর, গ্রাম : কামারচট্ট, পশ্চিম পাড়া, পোস্ট: পীর গাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (১৮-২১ নং ধাঁধার কথক)।

৪. মোছা : সাদিয়া আফরিন, পিতা : আব্দুস সামাদ, বয়স : ১৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতা: ৭ম শ্রেণি, গ্রাম : কালুভাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (২২-২৫ নং ধাঁধার কথক)।

তথ্যনির্দেশ: দুপচাঁচিয়া

১. তপল কুমার মন্ডল, পিতা : কালীপদ কুমার মন্ডল, বয়স : ৫০, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কৃষি। সংগ্রহের তাং : ০৫/০৪/১ (১-১৫ নং ধাঁধার কথক)।

২. প্রকাশ কুমার বর্মন, পিতা : পরিমল বর্মন, বয়স : ১৮, শিক্ষা : একাদশ শ্রেণি, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : খানপুর, পো : চৌমুহনী, থানা : দুপচাঁচিয়া। সংগ্রহের তাং : ০৪/০৪/১ (১৬-২৫ নং ধাঁধার কথক)।

৩. মোঃ রাহাত, পিতা : মোঃ রফিক,বয়স : ১৯, শিক্ষা : একাদশ শ্রেণি, পেশা : ছাত্র, গ্রাম : দেবখণ্ড, পো : তালোড়া, থানা : দুপচাঁচিয়া। সাক্ষাতের তাং : ০৫/০৪/১২ (২৬-৪৬নং ধাঁধার কথক)।

৪. সুবাস চন্দ্র বর্মন, পিতা : সুবল চন্দ্র বর্মন, বয়স : ২৮, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি, পেশা: দর্জি, গ্রাম : দামকুড়ি, পো : উনাহত সিংড়া, থানা : দুপচাঁচিয়া, সংগ্রহের তাং : ০৪/০৪/১২ (৪৭-৫৩ নং ধাঁধার কথক)।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ: ধুনট

১. মোছা : সাদিয়া আফরিন, পিতা : আব্দুস সামাদ, বয়স : ১৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতা: ৭ম শ্রেণি, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (১-১৫ নং ধাঁধার কথক)।

২. মো : আলমগীর হোসেন, পিতা : মো : আজগর আলী, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, পেশা : ভাঙ্গারী ব্যবসা, গ্রাম : কামারচট্ট পশ্চিমপাড়া, পোস্ট : পীরগাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (১৬-১৭ নং ধাঁধার কথক)।

৩. মো : মজনু সরদার, পিতা : মো : মোবারক আলী সরদার, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর, পেশা : দিন মজুর, গ্রাম : কামারচট্ট, পশ্চিম পাড়া, পোস্ট : পীর গাছা, ইউনিয়ন : রামেশ্বরপুর, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (১৮-২১ নং ধাঁধার কথক)।

৪. মোছা : সাদিয়া আফরিন, পিতা : আব্দুস সামাদ, বয়স : ১৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যাতা : ৭ম শ্রেণি, গ্রাম : কালুডাঙ্গা, পোস্ট : হাট ফুলবাড়িয়া, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া (২২-২৬ নং ধাঁধার কথক)।

তথ্যনির্দেশ: নন্দীগ্রাম

১. মোঃ আফছার আলী আকন্দ,পিতা : মৃত নফর উদ্দিন আকন্দ, বয়স : ৭৭, পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণি, গ্রাম : ঢাকইর, পো : নন্দীগ্রাম, থানা : নন্দীগ্রাম। সংগ্রহ : ২২/০৮/১১ (১-১৩ নং ধাঁধার কথক)

২. শ্রী চিত্তরঞ্জন প্রাং, পিতা : শ্রী তারিনি কান্ত প্রাং,বয়স : ৫৩, পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষা : নিরক্ষর, গ্রাম : বুড়ইল, পো : ঐ, থানা : নন্দীগ্রাম। সংগ্রহ : ২২/০৮/১১ (১৪-১৭ নং ধাঁধার কথক)

৩. মোঃ মোফাজ্জল হোসেন,পিতা : মোঃ তবিবর রহমান,বয়স : ৫৫, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা : এস.এস.সি, গ্রাম : দামরুল,পো : হাট কড়ই, থানা : নন্দীগ্রাম, সংগ্রহ: ২২/০৮/১১ (১৮-২৭ নং ধাঁধার কথক)।

তথ্যনির্দেশ: শাজাহানপুর

১. রাজিব (১৪), হুমায়ূন (১৪), বাদশা (১৫), রায়হান (১৪) মর্জিনা (১৪), নুসরাত (১৪) সংগ্রহ স্থান : ডেমাজানী উচ্চ বিদ্যালয়, ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া (১-৭৬ নং ধাঁধার কথক)। তাং-০৮/১০/২০১১ ইং।

২. আবু তালেব (১৫), ইউসুফ (১৪), ইয়াসমিন (১৫), ডলি (১৪), মামুন (১৫), হায়দার (১৬) এর সবাই নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী, মাঝিড়া উচ্চ বিদ্যালয়। সংগ্রহ তাং-১৪/০৫/১১ (৭৭-৮৫ নং ধাঁধার কথক)।

তথ্যনির্দেশ : শেরপুর

১. রাজিব (১৫), রঞ্জু (১৫), মহসিন (১৪), তৈয়ব (১৫), জাকির (১৪), বাতেন (১৫), এরা সবাই নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র। সংগ্রহ স্থান-শেরপুর ডি, জে হাইস্কুল, শেরপুর (১-৫০ নং ধাঁধার কথক)। সংগ্রহ তাং ১৮/০৬/১১ ইং।

২. মাহিলা (১৫), মহসিনা (১৪), মারজিনা (১৫), সাইদুল (১৪), রাজ্জাক (১৫) এরা সবাই নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র। সংগ্রহ স্থান- শালফা বিএম টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, শালফা, শেরপুর (৫১-১০২ নং ধাঁধার কথক)। সংগ্রহ তাং ০৬/১১/১১ ইং।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

আদমদিঘির প্রবাদ-প্রবচন

১. নাড়াক (মুসলমান) নেও সাথে
ঝাঁটা নেও হাতে।

২. যত কয় তত লয় (নয়)।

৩. হয় তোর একদিন, কি হামার একদিন।

৪. কিনা গরুর দাঁত দেখ্যা লাভ নাই।

৫. কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।

৬. শ্যাষ ভালো যার
সব ভালো তার।

৭. খুঁটার জোরে ভেড়া নাচে।

৮. মাছের ত্যালে (তেলে) মাছ ভাজা।

৯. টেকা আলার টেকা
আর মুরগি আলার ডিম।

১০. কারো পুষ (পৌষ) মাস
কারো সর্বনাশ।

১১. অতি চালাকের গলায় দড়ি।

১২. মাকাল ফল দেখতে ভালো
উপরে লাল তার ভিতরে কালো।

১৩. ঢাল নাই তরাল (তরোয়ার) নাই
নিধিরাম সদ্দার (সরদার)।

১৪. চুন খায়্যা মুখ পুড়া
দই দেকা (দেখা) করে ভয়।

১৫. পরবুদ্ধিতে আজা হওয়ার চাইতে
নিজ বুদ্ধিতে ফকির হওয়ায় ভালো।

১৬. ঘোড়া আলার ঘোড়া লয়
চ্যারাগ দারের ঘোড়া।

গাবতলীর প্রবাদ-প্রবচন

১. ভূতের হাতোত্ খোন্তা পড়া।

প্রসঙ্গ : যদি কোন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বেশি কথা বলে তাহলে অধৈর্য শ্রোতা তার বিরক্তি প্রকাশ করার জন্য উপর্যুক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকে।

www.pathagar.com

২. মাছির গোয়াত কাছি মারা।

প্রসঙ্গ : কষ্টসাধ্য কাজগুলোর একটি হলো মাছি ধরা বা মাছি মারা। অর্থাৎ দশদিক বিস্তৃত চোখওয়ালা পতঙ্গ মাছি খুব দ্রুততার সাথে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। ফলে মাছি মারা কাজটি অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। সেই মাছিকে ধরে তার গোয়াত কাছি লাগানো মানে মাছি বশে আনা। মোটেই সহজ কোন কাজ নয়। অত্যন্ত চালাক এবং ধুরন্ধর ব্যক্তিদের অসাধ্য তেমন কিছু থাকে না। তারা ছলে বলে কৌশলে তাদের কাজ হাসিল করে। এই সমস্ত চালাক লোকদের কাজের দক্ষতা বোঝানোর জন্য উপর্যুক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. মাচ খাও তো ফেচ্যা লাড়ো না।

পটভূমি : জসমত আলী নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলো। তার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও জমিজমা ছিল। কিন্তু জসমত আলীর মধ্যে সম্পদের অহংবোধ ছিল। জসমত আলী বাজারে গেলে বাজারের বড় মাছটা কিনে নিত। মাছ কিনে বাড়ি ফেরার সময় ব্যাগের মধ্যে মাছ সবসময় উল্টো দিকে রাখতো। অর্থাৎ মাছের মাথা ব্যাগের নিচের দিকে রেখে মাছের লেজ উপরের দিকে বের করে রাখত। ফিরতি পথে লোকজনদের লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে মাছ দেখাতো। এই জসমত আলী একসময় ধীরে ধীরে গরিব হতে থাকে। ছেলেরা ঠিকমত মানুষ হয় না। তারাও বাপের মতোই চাল চলনে ঠাঁটবাট বজায় রেখে চলতে শুরু করে। একসময় সব সম্পদ জমিজমা শেষ হয়ে যায়। ছেলেরা পরের জমিতে কামলা বেঁচে দিন কাটায়। আর বৃদ্ধ জসমত মানুষের বাড়ি বাড়ি চেয়েচিন্তে দিন কাটাতে থাকে। বড় অসহায় ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে। একসময়ের নাম করা জসমত আলী যে কিনা বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটি কিনে লেজ নাড়াতে নাড়াতে বাড়ি ফিরত সেই জসমত আলী বুড়ো বয়সে মারা গেল পরের বাড়ির চাওয়া খাবার খেয়ে। অনেকটা ভিক্ষা করে খাওয়ার মতো। এখান থেকে প্রবাদটির উৎপত্তি হয় "মাচ খাও তো ফেচ্যা লাড়ো না।"

৪. গোলাম মণ্ডল সব জানে।

প্রসঙ্গ : গাবতলী তখনো থানা হয় নি। গাবতলীতে রেলস্টেশন এবং ছোট্ট একটি বাজার ছাড়া এখানে আর কিছুই ছিল না। অন্যদিকে সোনাতলা এবং সুখানপুকুর গাবতলীর চেয়ে অনেক উন্নত। এখানে হাটবাজার এবং জনবসতিও অনেক বেশি। সুখানপুকুর অথবা সোনাতলাকে থানা ঘোষণা করার দাবি ওঠে। এই দুই জায়গার যে কোন একটিতে থানা হবে। এটি অত্র অঞ্চলের লোকজন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন গাবতলীর গোলাম রহমান নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি গাবতলী কে থানা ঘোষণার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি তোলে। কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য হয়। গোলাম রহমান হাল ছাড়েন না। যে কোন মূল্যেই হোক গাবতলীতে থানা হতেই হবে। এরপর বর্তমানে যেখানে থানা অফিস সেখানে গাছের ডালে সাতজন মানুষকে ঝুলে থাকতে দেখা গেল। এই মরা লোকগুলোকে কেউই শনাক্ত করতে পারে নি। প্রশাসনের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। চতুর্দিকে এত বড় ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মানুষ জন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এই ঘটনার ফলে গাবতলী ক্রাইম জোন হিসেবে প্রশাসনের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

আসে। এই ক্রাইম কমানোর জন্যই ব্রিটিশ সরকার তখন গাবতলীকে থানা ঘোষণা করেন। এই ঘটনার ফলেই 'গোলাম মণ্ডল সব জানে' কথাটি প্রবাদে রূপান্তরিত হয়।

৫. হাড্ডি কখনো হয় না গোস্ত
হেন্দু কোনদিন হয় না দোস্ত।

পটভূমি : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের ফলে উপর্যুক্ত প্রবাদটি উৎপত্তি হয়েছে। বগুড়ার এ অঞ্চলে যদিও সাম্প্রদায়িকতা নেই তবুও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে খুব বেশি বিশ্বস্ততার বন্ধন রয়েছে এ কথাও বলা যায় না। তাছাড়া বহু হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গেছে। এখনো বেশির ভাগ হিন্দুর বাড়ি জমিজমা আত্মীয়-স্বজন বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে বেশি। এরা ভারতে যাওয়ার আগের রাতে হয়ত মুসলমান প্রতিবেশি বা বন্ধুটির সাথে একসঙ্গে খাবার খেয়েছে অথচ সকাল বেলা চিরদিনের জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেল কিন্তু একটিবারের জন্যও বললো না। আবার এমনও হয়েছে যে পাশের বাড়ির লোকজন টের পেতে পারে তাই ধোকা দেওয়ার জন্য চুলায় রান্না চড়িয়ে দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্য চম্পট দিয়েছে। আবার কখনো কখনো জমিজমা একাধিকজনের কাছে বিক্রি করে এদের মধ্যে একটা ফ্যাকরা লাগিয়ে চলে গেছে। এ সমস্ত নানাবিধ কারণে হিন্দুদের কে বন্ধু বলে আর কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। এজন্য উপর্যুক্ত কথাটি প্রবাদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

দুপচাঁচিয়ার প্রবাদ-প্রবচন

১. নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

২. নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।

৩. চোরের দশ দিন, সাউদের (মালিক) একদিন।

৪. এক হাতে তালি বাজে না।

৫. চোরের বুদ্ধি গাঁট কাটা।

৬. অভাগা যেদিকি চায়
সাগর শুগা যায়।

৭. গাদা জল খায় ঘোলা করাই খায়।

৮. কুত্তার নেজত (লেজ) পাটা বান্দা দিলেও
সোজা হয় না।

৯. এক দুলালীর তিন ভাতার
তাও দুলালীর মন বেজার।

১০. ধান বানতে (ভানতে) শিবের গীত।

১১. যার জন্যে করনো চুরি
তাঁই কয় চোর।

www.pathagar.com

১২. আশা করো বড়
বাসা বাধো ছোট।
১৩. নাড়া ব্যাল (বেল) তলা এক বারই যায়।
১৪. আহার, নিদ্রা, মাতঙ্গ (মার্তণ্ড) ভয়
যত বাড়াবু ততই হয়।
১৫. চাচা আপন পান (প্রাণ) বাঁচা।
১৬. সাবধানের মার নাই
জাগির ঘরে চুরি নাই।
১৭. ছিড়া খ্যাতায় শুয়া থাক্যা
নাখ (লাখ) টেকার স্বপন।
১৮. যত বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কতা।
১৯. কলি কালের পোলাপান
বাপক (বাবা) বলে তামাক আন।

ধুনটের প্রবাদ-প্রবচন

১. ভাত খায় ভাতারের, গীত গায় নাঙের।
২. নিজের ধান পাকলে মামু কার শালা।
৩. ওঠে না ছোট বড়, ঠেটা-ঠেকির বাজনা বড়।
৪. মা'র নাম চুটকী বাঁকি, ছোল তার সুলতান শাহ গাজী।
৫. দুই দিনির বোরোগি ভাতকে কয় অন্ন।
৬. নিজ পায় না খাত্, শস্করেক করে সাথ।
৭. কুঁড়ার ছেড়ি বাগুন চেনে না।
৮. নামেত তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।
৯. মাথায় নাই চুল বগলে বাবরি।
১০. ভাত না দেয় ভাতারে, কিল মারে গোঁসাইয়ে।
১১. প্যাটেত নাই ভাত, কাঁটে ইন্দুর তাত্।
১২. ফ্যাকাম দেখে বাঁচিনা।
১৩. ভালো লোকের ভালো কতা, শাক-ঘাঁটুনির ভিন্ কতা।
১৪. বাপের নাই পুঁটকি, ছোল যায় ঝাড়ি লিয়ে ছুঁচতি।
১৫. লোতুন গুদে উইঠলো কাপড়, গুদ করে হামার ফাঁপোড়-ফাঁপোর।
১৬. কাঙালের ছোলের আবার পুকটিত্ রাগ।
১৭. এমনিই নাচুনি ছুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি।
১৮. প্যাটে করে চাই-চুই, হাত করে কাই-কুই।
১৯. বাঁচতে দিলো না পাছার কাপড়, মরলে দিবি গোরের কাপড়।
২০. সব রসুনের এক পুঁটকি।
২১. মাথায় মারে লাথি, পায় করে সালাম।

www.pathagar.com

২২. কামের বেলায় কাজি, কাম ফুরালে পাঁজি।
২৩. ভাতই ভাতার, ভাতার আর ভাতার না।
২৪. মার পোড়ে না মাসির পোড়ে, চাচি মাগির গুদ দিয়া ধুমা ওড়ে।
২৫. উঠলো বাই, দরগায় যাই।
২৬. হাগার আলসিত পাইদে শোধ দ্যায়।
২৭. সিয়ানা ঘুঘুর ছা, ফাঁদে না দ্যায় পা।
২৮. মাগি এতো কলা জানো, গাছের আগায় নাঙ থুয়ে ডাগ্যো ধরে টানো।
২৯. এ কথা সে কথা, দে না বু'এট্টু আলাপাতা।
৩০. ঢাক ঢাক লাউয়ের পাতা, তোমার ভাইয়ের গুণা-গাতা।
৩১. কলা ক্ষ্যাতে ক্যাড়া! আজই পয়লা।
৩২. লিজের বেলায় আঁটো-সাঁটো, পরের বেলায় চিম্‌টি কাটো।
৩৩. নাপিত দেখ্‌লে কেনি বাড়ে।
৩৪. বাঘের গালেও চুমা দ্যায়, সাপের গালেও চুমা দ্যায়।
৩৫. নামাজ নাই রুজা নাই, মুখেত চাপদাড়ি।
৩৬. দল দেখলে বল হোলো, ঠাপ দেখলে লাফ মারো।
৩৭. বস্‌পার দিলে শুবার চায়।
৩৮. ছোলের নাম করে পুয়াতির পুটকি ভরে।
৩৯. ভাতার থুয়ে নাং পোষে।
৪০. আর মাগির আর চিন্তা, বুড়ো মাগির ভাতারের চিন্তা।
৪১. গাং শুকালে লতি, বুড়ি হোলো সতী।
৪২. ভাতারের কোলে চড়ে নাঙের মুখে চুমো।
৪৩. না পায়্যা নাতি ভাতার, তাই লিয়ে গাঙে সাঁতার।
৪৪. ভালো ভালো করে আলাম কালোর মা'র কাছে, কালোর মা উঠে কয় হামার ছোলের সাথে।
৪৫. এ ছেড়ি তোর ভাবনা কি নাভির নীচে চেক রছে, তাই ভাঙাবি আর খাবি।
৪৬. নাং দেখ্যা মাং চাপে, গাং দেখ্যা মুত চাপে।
৪৭. নাঙের আশায় ভাতার মারলাম, নাং হামাক চোদে না।
৪৮. ভাসুর হামার বাঁড়া বোঝে, আন্দারে ভাত খায় চ্যারাগ লাগায় চোদে।
৪৯. খায়্যা হাগে নয়্যা মোতে, তাক্‌ দেখে যম কোঁতে।
৫০. একে তো নাচুনে বুড়ি, তার উপরে ঢোলে বাড়ি।
৫১. মাগির গোলাম না মুসো ভাকাম।
৫২. বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত কয় পাছি কাছে।
৫৩. মাথার ঘায় কুত্তা পাগল।
৫৪. সারা পথে দৌড়োদৌড়ি, খেওয়া ঘাটে গড়াগড়ি।
৫৫. ভিক্ষা চাই না, কুকুর ঠ্যাকা।
৫৬. চাষা বাঁড়া কি বোঝে জাফরানের কদর।
৫৭. বাবুরা কি সব বাঁড়া খায়, পাতে পান্তা দিল্যে ভাইস্যা যায়।

www.pathagar.com

৫৮. মানুষ ম'ল্যে হয় কথা, কাপড় ছিড়লে হয় খ্যাঁতা।
৫৯. কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে বাড়ে প্যাট।
৬০. এতো কাল না তেতো কাল, বিলেইর গুলি আলুর দল।
৬১. দুধ ভালো কালা গাই, মাগি ভালো বড় মাই।
৬২. যেমন দেবী, তেমন দেবা।
৬৩. মাছের মুদিন খয়রা, কুটুমির মুদিন ভায়রা, মাছের মুদিন লালন, শাগের মুদিন পালং।
৬৪. বউ লাচো-কোঁদো ক্যা, ছোট সরাভা ভাইঙ্গে গেছে, হাতের তাক তো ঠিকই আছে।
৬৫. পরের পিঠে খাতি মিঠে, পরেরা দ্যায় এ্যাকখেন পিঠে।
৬৬. বেগুনের চারা বুড়ো, পত্যার চারা গুড়ো।
৬৭. ফুটোয় চুয়োলি ঠিলেয় কুলোনো ভার।
৬৮. বাঁও পা-র কুটুম আলো রে, কুঁকড়ো জোবো করো রে।
৬৯. শনি সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন্‌কে দিন।
৭০. জ্যৈষ্ঠে খরা, ধানে ভরা।
৭১. মাঘের জাড়ে, মোষর শিং লড়ে।
৭২. কোলজার উপর বাঁশগাড়ি।
৭৩. চোদনের নাম কুষ্টা-কাটা।
৭৪. চোদে না ধিন্‌তা, চার পায়ে আলতা।
৭৫. নাচপার না জানলে, উঠ্যান ব্যাঁকা।
৭৬. জহুরি জহুর চেনে ভুমরায় চেনে মধু, ইস্টিমারের খালাসি চেনে চিংড়ি মাছ আর কদু।
৭৭. সুখি থাকতে ভূতে কিলায়।
৭৮. আমিও ফকির হলাম, গাঁয়েও আকাল লাগলো।
৭৯. আপনার পুটকি আপনি চুলকা, ঘা বানায়ে হোলদ্যা লাগা।
৮০. টাকায় করে কাম, হয় মর্দের নাম।
৮১. ভিক্ষার চাল, তাই আবার কাড়া আর আকাড়া।
৮২. চোরের মা'র বড়ো গলা।
৮৩. হাগা চাপ্‌লে বাঘা মানে না।
৮৪. ভাঙা কুলোর আদর হলো ছাই ফ্যালানের কালে।
৮৫. মান রাখতে বরজাই, হাতী বাঁধো দরজায়।
৮৬. পিরিতে মজিলে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।
৮৭. চোদনের নাম বাবাজি।
৮৮. শক্ত মাটিত্‌ বিলেয় হাগে না।
৮৯. বাউনে বচন পড়ে, পাঁঠা কয় আর হামার ন্যাওড়ায় শোনে।
৯০. আদ্দেখলার হলো ব্যাটা, নাড়ি থুয়ে চ্যাঁট কাটা।
৯১. হাইগে ছোঁচে না, পাইদে গলা পানি।
৯২. চোদে না বুড়ো মাই ডলে, ঘন ঘন হাই তোলে।

www.pathagar.com

৯৩. কুত্তা মাগি চুদানি, লিত্যি পিঠা বানাবি, মাচার সাম্‌লা তুই, ভাতারেক ক্যা কাঁদালি।
৯৪. এ্যাড়া ঘোড়া, ময়দানে খাড়া।
৯৫. যার ঘোড়া তার ঘোড়া না, চেরাগদারের ঘোড়া।
৯৬. ভালোর ভাল সর্বকাল
মন্দের ভাল আগে
আজকন্যে যায় বাপের বাড়ি
গরু খায় বাগে।
৯৭. যাদিল বরষে বোশেকে
আউশ ফলে দিগুনে।
৯৮. আচে গরু না বুয়ায় হাল
তার দুক্কু সর্বকাল।
৯৯. চিড়্যা বলো পিট্যা বলো
ভাতের মুতো না
খালা বলো ফুপু বলো
মায়ের মুতো না।
১০০. যকুন আচিলো দুই পাও
যিটি ইচ্চে সেটি যাও
যকুন হইলো চার পাও
তকুন কয় কুটি যাও
যকুন হইলো ছয় পাও
বাবা আমাক নিয়ে যাও।

নন্দীগ্রামের প্রবাদ-প্রবচন

১. ঘর ঢং ঢং বার ফুটানি।
২. বাপ জন্মে নাই ঘোড়া
লাগাম জোড়া জোড়া।
৩. নদীর জল ঘোলাও ভালো
জাতের মেয়ে কালোও ভালো।
৪. আচে গরু না বয় হাল
তার দুঃখ চিরকাল।
৫. নামে গগণ ফাটে
হাঁড়িপাল্লা (পাতিল) কুত্তায় চাটে।
৬. খোম নাই খোমার পুর যায়
মুখ নাই খই খায়।
৭. বারবারি জুতার ফটফটি
বাড়িত আঁটার কটকটি।
৮. উপড়ে ফিটফাট ভিতরে সদর ঘাট।

www.pathagar.com

৯. চোরের মায়ের ডাঙর গলা
আরো মাঙ্গে চাম্পার কলা।
১০. আচ (আজ) বুজবু না বুজবু কাল
গোয়া থাবরাবু আর পারবু গাল।
১১. আমবাস্বা (অমাবস্যা) পূর্ণিমায় বয় হাল
তার দুঃখ চিরকাল
তার বলদের হয় বাত
গৃহস্ত করে হাবা ধাবাত।
১২. আত্রিকালে যেজন গাছের ফল ছিরে খায়
সেজন এই কারণে গৃহস্থ গরিব হয়।
১৩. যে মোর ছুরত খান
তার নাম আবার নূরজাহান।
১৪. ভাত পায় না চা চোদায়
হাগতে বস্যা রেডিও বাজায়।
১৫. উপরে ফিটফাট
ভিতরে সদরঘাট।
১৬. ভাত খায় ভাতারের
আর গীত গায় নাঙের।
১৭. দ্যাশের কুত্তা ভাত পায় না
বিদেশি কুত্তার আমদানি।
১৮. গাছ পাকলে হয় সার
আর মানুষ পাকলে হয় অসার।
১৯. পুঁটকিত নাই চাম
হরেকৃষ্ট নাম।
২০. কান টানলে মাতা (মাথা) আসে।
২১. মায়ের প্যাটের ভাই
মারাও চাই, ফিরাও চাই।
২২. আপনের চাইতে পর ভালো
পরের চাইতে জঙ্গল ভালো।
২৩. চাচা আপন চাচি পর
তারি বিটিক (মেয়ে) বিয়া কর।
২৪. ফাটা পাল্লা (পাতিল) বাজে বেশি।

শিবগঞ্জের প্রবাদ-প্রবচন

১. যা করল কামাই সব খেল জামাই।
২. মানুষ পাকলে হয় তিতা আর আম পাকলে হয় মিঠা।
৩. যেমন গাছ তেমন বাতাস।

www.pathagar.com

৪. আগা হাল যেদিক যায় পাছা হালও সেদিক যায়।

৫. ধাউ কাউ করে জীবনের ক্ষয়
আল্লাহ দিলে অল্পেতে হয়।

৬. চাষা লয় ইষ্টি তিতল লয় মিষ্টি।

৭. উড়বাই পারে না চিল
পাছায় বান্দিছে দশসের সিল।

৮. গোয়াত নাই চাম
হরি খ্রিষ্টের নাম।

৯. কপালে আছে হার
কী করবে চাচা সাখিদার।

১০. গারস্থের আয় দেখে চোরে সাতভাড় সাজে।

সারিয়াকান্দির প্রবাদ-প্রবচন

১. শ্যাকালু খিলাবু তো গুসল করালু ক্যা?
শ্যাকালু বগুড়া অঞ্চলে এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় আলু। এটি পানসে হয়। দেখতে কিছুটা মূলার মত। রং তদ্রুপ। এখানে বলা হয়েছে ছোট কাজই যদি আয়োজন তবে গোসল করিয়ে এর গ্রহণযোগ্যতা কেন বাড়ানো। অর্থ্যৎ ছোট কাজের জন্য ব্যাপক আয়োজন।

২. লিজের লবণ ধার দিয়্যা
ঝিঙ্গা রানদে খার দিয়্যা
লিজের শব্দটি আঞ্চলিক। অর্থাৎ নিজের। এই প্রবাদটির অর্থ হল নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যের উপকারে দিয়ে নিজেই বিপদগ্রস্ত হওয়া।

৩. বাকির পর বাঁকি
তারপরে না ফাঁকি
অর্থাৎ দোকানে কোন ক্রয়কৃত পণ্যের নগদ মূল্য পরিশোধ না করলে তার পরিমাণ ধীরে বাড়তে থাকে। এতে দোকানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ব্যবসার পুঁজিতে টান পরে।

৪. কামেতে নাই টান
কোণাতে বিছান।
এই প্রবাদে অলস ব্যক্তিদের কথা বোঝানো হয়েছে। কাজকর্ম না করে অলস সময় কাটিয়ে ঘরের কোণায় বিছানা পেতে গড়িয়ে সময় কাটায়।

৫. খাওয়ার আগে
দরবারের পাছে।
প্রবাদটির অর্থ কোন অনুষ্ঠানে গিয়ে খাবারের প্রথম পর্বে খাবার খেয়ে নেয়া উচিত। এবং কোথাও সালিশ বসলে সেখানে কোন ব্যক্তির চক্ষুশূল না হয়ে বা পক্ষপাতিত্ব করার দায় এড়াতে সালিসের পেছন দিকে গিয়ে বসা।

www.pathagar.com

৬. জলমে (জন্মে) গোদার মাগ নাই
পুতের কিরা খায়।

এ প্রবাদটির অর্থ হলো নিজের কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্যকে বিশ্বাস করাতে পারে না। আবার ছেলের শপথ নিতে একটুও ভীত হয় না।

৭. ঘর ভেদী রাবণ নষ্ট
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

৮. বসতে জানলে মাটি পিঁড়া
খাতে (খেতে) জানলে চাউল চিড়্যা

এই প্রবাদটির অর্থ হলো কেউ যদি তার যোগ্যতায় কোথাও স্থান পায় তবে তার জন্য কোন কিছু আটকে থাকে না। সে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। তার জন্য মাটিতে বসা বা পিঁড়েতে বসা কিংবা চাউল খাওয়া বা চিড়া খাওয়া কোন বিষয় নয়।

৯. দুকনা ট্যাকার হাড়ি গেল
কুত্তা তো চেনা হল?
অর্থাৎ নিজের ক্ষতি হলেও সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিতে চেনা গেল মূল্য দিয়ে।

১০. ফেন (ভাতের মাড়) দিয়া ভাত খায়া গল্প মারে দই
মাটির হুকাতে তামাক খায়, গড়গড়াতে কই?

অর্থাৎ কোন চতুর ব্যক্তি নিজের দোষ ঢাকতে কিংবা নিজেকে বড় করতে মিথ্যা গল্প বানায়। ভাব দেখায় কিন্তু তার পরিবেশ পরিস্থিতি বা পোষাক-আচরণে তা প্রমাণিত হয় না।

১১. বোকাক (বেকুব ব্যাক্তি) বুঝ দিলি বুঝ নাই মানে
ঢেঁকিক বুদ্ধি দিলি নিত্তি ধান বানে।
বোকা লোককে কোন কিছু দিয়ে বোঝলে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, সে তার কাজই করে। অন্যদিকে ঢেঁকিতে যতই ধান ভানুক না কোন ঢেঁকি তার কাজ করে যায়।

১২. গলা নাই গান গায়
বউ মরলে শ্বশুর বাইত যায়
শাঁখা হাতে ঘুট্যা কুড়ায়
এই তিনজনে মুরবা জুয়ায়

যিনি নিজে যা না তা করলে লোকের কাছে পরিহাসের বস্তুতে পরিণত হতে হয়। এমনটাই বুঝায় এই প্রবাদে।

১৩. বউ লস্ট ঘাটেত্
বেটা লস্ট হাটেত্

১৪. মাছের খাও মাও
শাকের খাও ছাও

বড় মাছ খেলে ছোট পোনা মাছ রক্ষা পায়। প্রবাদে বলা হয়েছে পোনা মাছ না খেয়ে বড় মাছ বা মা মাছ খাও। অন্যদিকে শাক রান্নার সময় শাকের নরম আগা খাওয়া উচিত।

www.pathagar.com

১৫. হাজির বড় দানা
লিজে করে পাপ পরেক করে মানা
ছোলের ব্যাটা পাক্কা স্যেনা।
অর্থ : ধার্মিক ব্যক্তি যখন ভণ্ড হয় বা বক ধার্মিক হয় তখন সে বিভিন্ন জনকে পাপ বা অন্যায় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। আবার সেই চতুর ব্যক্তি নিজে সে অন্যায় করে বেড়ায়।

১৬. গাছের গাব, নায়ের তলী এটি মিল্যা গাবতলী।

১৭. ভ্যেলুর (এক ব্যক্তি) ভেড়া মাইল্যাম মোরলাম পাড়া, এইট্যা মিন্যা হয়। ভেলুর পাড়া।

সোনাতলার প্রবাদ-প্রবচন

১. জহুরি জহুর চেনে শুয়োর চেনে কচু।
রত্নকার রত্ন দেখেই চিনতে পারে কোনটা আসল, কোনটা নকল। এক্ষেত্রে মানুষকে সত্যিকার চেনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পাশাপাশি শুয়োর নামক প্রাণীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে যেমন সে তেমন করেই তার পছন্দের লক্ষ্যে পৌছায়।

২. লাপিত (নাপিত) দেখলে লোক (নখ) বাড়ে/বলে (বৃদ্ধি)।
কাউকে দেখে অপ্রয়োজনীয় কোন কাজের কথা মনে পড়ে যায়। আকাঙ্ক্ষা জাগে সেই জিনিসটি। মানে নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।

৩. হবি ছেলে ডাকপি বাপ, তারি আশায় বস্ থাক।
কখন ছেলে হবে, তারপর বাবা বলে ডাকবে, সেই আশায় বসে থাকা বা অপেক্ষা করার বিষয়ে কিছুটা শ্লেষ আছে প্রবাদটায়।

৪. উড়া (উড়ে) আ'লো (এল) পানা
তাঁই হলো গাঁয়ের স্যানা (সেয়ানা)।
হঠাৎ কোন ব্যাক্তি নতুন কোন জায়গায় নিজের অস্তিত্ব স্থায়ী করতে গেলে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। এটি উড়ে এসে জুড়ে বসা প্রবাদের সঙ্গে মিল রয়েছে।

৫. মাথাত লাত্তি (লাথি) মার্যা, পাওত্ (পায়ে) ছালাম।
বড় ধরনের অপরাধ করে সামান্য কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষমা চাওয়া অর্থে বোঝায়, এ প্রবাদটি।

৬. ঘোড়্যা লাও (নৌকা) লারী (নারী)
যার যখন তারই।
ঘোড়া, নৌকা ও নারী যখন যার কাছে থাকে, তখন তার দখল দায়িত্ব তারই। এমনটাই প্রবাদটি, বহুল প্রচলিত এ প্রবাদ।

৭. ব্যান্যার বিটি খাটত চড়ে
দুই ব্যাং তারি লড়ভড় করে।

www.pathagar.com

ব্যান্যা (ব্যবসায়ী অর্থে বোঝায় এক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণির মেয়ে অর্থে বোঝানো হয়েছে।) নিম্নঘরের মেয়ে খাটে কখনো চড়ে নি। খাটে কিভাবে উঠতে হবে বুঝতে পারছে না। তার পা দুটো কাঁপছে এ প্রবাদে এখানে শ্লেষ করে বোঝানো হয়েছে।

৮. যাঁই কয় আয়রে তারি সাঁত যায়রে।

এ প্রবাদটির অর্থ হলো কারও কোন ব্যক্তিত্ব না থাকলে বা নিজের ইচ্ছায় না চললে যে যা বলে তাই করে। অর্থাৎ নিজের লক্ষ্যে চলার চিন্তা না করে অন্যের কথায় এগোনো ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে।

৯. আদা খাবি যাই, ঝালেত মরবি তাই।

আদা যে খাবে, ঝালে মরবে সে। তাকেই ভুগতে হয়। অর্থাৎ যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে।

১০. ছোল বললে ছোল লয়।

সন্তান (ছেলে) মানুষ করতে অনেক কষ্ট হয়। এই কথাটিই প্রবাদটির মূল অর্থ। সন্তানকে তার পিতামাতা মানুষ করে কিন্তু একটা সময় সন্তানদের কাছে সেই কষ্ট সহিষ্ণু পিতামাতা দূরের হয়ে যায়।

১১. পায়না মুরগি হাচরে বেশি, সে মুরগির দাম বেশি।

যে মুরগি আঁচড় দেয় বেশি সেই মুরগির দাম বেশি বলেই গণ্য হয়। আমাদের সমাজে যে বেশি বড় কথা বলে তা যতই ফাঁপা হোক না কেন সমাজে তার মূল্যায়নই বেশি হয়।

১২. আর কামোত মাও তুমি লাউ কুটপ্যার বসিই হামি।

অন্যকাজে যাও তুমি, লাউ (তরকারি) কুটতে বসি আমি এখানে, সংসারে অনেকেই আছে যারা কাজে আলসেমি দেখায়, তার কাছে সব কাজই কঠিন, তখন সে অন্যকে কঠিন কাজ দিয়ে নিজে সহজ কাজ নেয়।

১৩. একনা হ'লে আলাই দুলাই আর একনা (এক) হ'লে ভাঙ্গা তালাই।

সংসারে প্রথম সন্তান এলে সে অত্যন্ত যত্নে প্রতিপালিত হয়। পরে যতই অন্য সন্তান পরিবারে আসুক না কেন সেরকম যত্ন পায় না। এখানে অবহেলায় থাকা সন্তান কে বোঝানো হয়েছে। তালাই অর্থে পাটি বা চাটাই যা মাটিতে বিছানো হয়।

১৪. মাও গুণে দাও আঁশট্যা গোন্দায় গাও।

মার মতোই সন্তান হয়। তার স্বভাব পেয়ে থাকে। আবার তার ভাল-মন্দ গুণের প্রভাবও সন্তানের উপর পরে। আঁশট্যা গন্ধ বলতে মন্দ বা দোষ অর্থে বোঝানো হয়েছে প্রবাদটিতে।

১৫. কিসের সাতে কি পান্তা ভাতে ঘি।

কোন কিছুর যথার্থ তুলনা না হলে এবং তুলনার অসামঞ্জস্যতা হলে এমন প্রবাদ বলা হয়।

www.pathagar.com

১৬. বান্যার বিটি তালেবরের (বড় অবস্থাপন্ন ঘর) ঘরত্ প'লো, কাপড়ে চোপড়ে বড় (পেঁচিয়ে) খায়্যা ম'লো প্যারা।

নিম্নঘরের মেয়ে অবস্থাপন্ন সংসারে বিয়ে হলে ভালো পরিধানের কাপড় (এখানে শাড়িকে বোঝানো হয়েছে) পড়তে গিয়ে পেঁচিয়ে পড়ে মারা যেতে পারে অনভ্যস্ত তার কারণে, এমন কথাই বোঝানো হয়েছে প্রবাদটিতে।

১৭. ইল্লত যায় ধুলে, খাসলত যায় না ম'লে।

স্বভাব সহজে যায় না মানুষের। মানুষ মরে গেলেও তা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে না। নিজস্ব কিছুদোষ তার থেকেই যায়।

১৮. আমে ধান, তেঁতুলে বান (বন্যা)।

গ্রাম্য প্রবাদে মনে করা হয় যে বছর আম উৎপাদন বেশি হয় সে বছর ধানের ফলন বেশি হয়। অপর দিকে তেঁতুল বেশি উৎপাদন হলে বন্যা হবার আশঙ্কা করা হয়।

১৯. আজারা্যা মদ্দা করে কি চ্যাট কাটে আর চিলিক পারে।

এই প্রবাদটির মর্মার্থ হল এক কাজ করতে গিয়ে সে কাজটি যথার্থ করতে না পারা। আবার এই কাজের যতটুকু প্রাপ্যতা তার চেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলা।

২০. ছোট নোক (লোক) বড় নোক হতে সাত পিড়ি (সাত পুরুষ) নাগে (লাগে), বড় নোক ছোট নোক হতে' সাত পিড়ি নাগে।

নিম্নশ্রেণির বা বংশের লোক বড়লোক হতে সাত পুরুষ বা বংশ পরোম্পরায় সাত বংশ লাগে, তেমনি বনেদিরও নিম্নস্তরে নামতে এবং ঐ পর্যায়ে যেতে তাদের সাতপুরুষ লাগবে।

২১. এত্তুকোণা খুঁটি ধানে আঁটে পুঁটি পুঁটি।

অর্থাৎ, ছোট গাছ কিন্তু তাতে ফলন বেশি, এখানে বোঝানো হয়েছে লেবুগাছ সাধারণত খুব বড় হয় না তাতে ফলন ভাল হয়। পাশাপাশি ধান গাছ ছোট আকৃতির হয় কিন্তু তাতে ধানের ছড়া হয় বেশি। এ প্রবাদটি ছোট পত্তার (মরিচ) ঝাল বেশি প্রবাদের সমার্থক।

২২. যার মনোত যা, নাপদে (লাফ দিয়ে) ওঠে তা।

প্রবাদে বলা হয়েছে, যে যেমন চিন্তা করে তেমনি তার মনে চলে। এটি চোরের মন পুলিশ পুলিশ প্রবাদটির অনুরূপ।

২৩. হাতি কাদোত প'লে চামচিক্যাও নাত্তি মারে।

সচ্ছল বা বনেদি কেউ বিপদে পড়লে, অচ্ছুত বা ভিরু বা সুযোগ সন্ধানী ব্যাক্তিও তাকে বিপদে ফেলার সুযোগ খোঁজে।

২৪. যে ধানের পেট তোয়াচি (পোয়াতি/গর্ভবতী নারীর সঙ্গে তুলনা)
সে ধানের বীজ ভাল হয় না।

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যে ধানটা প্রাকৃতিকভাবেই খোসার সাথে আটকে থাকে পুরুষ্ট হয় প্রকৃতিগতভাবে। মোটা সে দানায় পরিপক্কতা থাকে। সে ধানের বীজ পরবর্তীতে বপন করলে তাতে ভাল ফলন হয়। তেমনি পোয়াতি নারী সন্তান ধারনের পর শারীরিকভাবে ভারি থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর তার সন্তান ভূমিষ্ট হলে শারীরিক গঠন পরিবর্তিত হয়। এখানে তাই বলা হয়েছে যে ধান অপুষ্ট তার বীজে পরবর্তীতে ফলন ভাল হয় না।

২৫. দইয়ের অগ্র, ঘোলের শ্যাষ।

দই একটি পানপ্রিয় মিষ্টান্ন সবসময় দইয়ের উপরের অংশ মজাদার ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। আর ঘোলের পুষ্টিগুণ শেষদিকে।

২৬. উটে না খুঁটে চোঙা মুতে।

প্রবাদটির অর্থ, এখানে বা ওখানে যেখানেই হোক আগে-পিছে না ভেবে কাজ করা বোঝায়।

২৭. খায়ে দায়ে পাখিটি বনের দিকে আঁখিটি।

পাখিকে যতই পোষ মানানোর চেষ্টা করা হোক না কেন তাকে মানুষ ঘরে রাখতে চাইলেও পাখির চোখ সবসময় বনের দিকে থাকে। সে সুযোগ পেলেই উড়ে যেতে চায়। এবং উড়ে চলেও যায়।

২৮. হাগা নাই, পেরপেরি সার।

এটি বিদ্রূপাত্মক কথা। অর্থাৎ যে কোনো কিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ তার সে বিষয় নিয়ে কথা বলা দেখতে পাওয়া যায় না। যার অসম্পূর্ণতা, সেই এমন পাওয়ার আচরণ করে। এটি ফাঁপা কলসি বাজে বেশি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২৯. কোন কারে গিত্যান (গৃতকর্ত্রী) হমো (হবো)।

নুন দিয়ে বড়ি (বড়ই/কুল) খামো (খাব)।

শ্বশুর বাড়ি নয় এখানে বিয়ের পর নারী নিজস্ব একটি ভুবন চায়। যেখানে তার কর্তৃত্ব সর্বত্র থাকবে। পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।

৩০. আলু তো আলু, ওক্ ক্যা লে আলু।

আসলেই যদি তো আসলে, যাকে প্রত্যাশা করা হয় নি তাকে কেন নিয়ে আসা হল তা এই প্রবাদ।

৩১. না হওয়া লারীর (মেয়ে/নারী) একদোষ, হওয়া লারীর শতেক দোষ।

আমাদের সমাজে নারীর অনেক দোষ (যে নারীর সন্তান হয় না তারই যেমন সব দোষ, এক্ষেত্রে স্বামীর দোষ হয় না) তেমনি যার সন্তান রয়েছে তারও দোষের শেষ নেই। মূলত শ্বশুরবাড়িতে এমনটা দেখা যায়।

৩২. আগা হাল যেদিক যায় পাছা হাল সেদিক যায়।

পরিবারের প্রথম সন্তান যদি বিপক্ষে কখনো চলে যায়, তখন বিদ্রুপাত্মাক এ বাক্য ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

৩৩. কুয়ার পারের কাৎরা তাকি খায় হাঁচড়া হাঁচড়া।
মানুষ যখন তার স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তখন তার কর্মকাণ্ডে অসংলগ্নতা দেখা যায়। এ প্রবাদটিতে এরূপ সামলে অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

৩৪. বিয়ার এ্যাক কতা
লিকার (নিকা) লব্বই (নব্বই) কতা।
বিয়ের সময় এক কথায় অনেক সময় বিয়ে হয়ে যায় বলে অনেকে বিশ্বাস করে। কিন্তু নিকা বা দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের বেলায় বিভিন্ন কথা না উঠলেও নারীর দ্বিতীয় বিয়ের বেলায় নানা ধরনের কথা উঠে। এর মধ্যে নেতিবাচক কথাই বেশি থাকে প্রথম বিয়ে নিয়ে, তারপর বিয়েটা হয়।

৩৫. ঘোড়াক চিনি পায়েত
মানুষ চিনি রায়েত
গরু চিনি কানেত
তুমি যে খানস্যামার ব্যাটা
তোমাক চিনি দানেত।
ঘোড়াকে তার হাঁটার ধরন দেখে চেনা যায়, মানুষকে চেনা যায় তার কথাতে, গরুকে চিনতে হয় কান দেখে, আর মানুষ যে কত বড় হৃদয়ের, অভিজাত, ভাল বংশের তা বোঝা যায় তার দানের পরিমাণ ও উদারতা দেখে।

৩৬. চ্যাটত নাই চামক।
হরে কৃষ্ট, হরেকৃষ্ট নাম।
পেটে ভাত নাই, ঠিকমত খেতে পায় না, অথচ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অনেকে। তাই এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে

৩৭. সাজলে ওজলে লারী (নারী)
ল্যাপরে পুঁচলে বাড়ি।
মেয়েরা সাজগোজ করলে তাদের দেখতে ভাল লাগে। নারীর রূপ প্রকাশ পায়। সাজসজ্জাহীন নারীর সৌন্দর্য তেমন প্রস্ফুটিত হয় না। তেমনি ঘর বাড়ি লেপা-পোছা (গ্রামে বিশেষ করে বগুড়া জেলাসহ তার আশেপাশে মাটির ঘর দেখা যায়। প্রাচীন কালে মাটির ঘরই ছিল এদের বৈশিষ্ঠ্য)। নরম মাটি, পানি, খড় সহযোগে ঘর পরিষ্কার করা হয়। পরে লাল মাটি দিয়ে আলপনা, পাখি, ফুলের ছবি হাত দিয়ে নারীরা তাদের বাড়ি ঘরে আঁকে। সহিত নারীর সঙ্গে এভাবে বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৩৮. যেমন তোমার ভিউ (জমি/ক্ষেত) লিড়্যান (নিড়ানো) তেমনি হামার লাউ বির্যান।
গৃহকর্ত্রী তার স্বামীকে বিদ্রুপ করে এ কথা বলছে। অর্থাৎ যেমন তোমার জমি চাষ পদ্ধতি (এখানে স্বামীর আনাড়িপনার প্রসঙ্গ এসেছে) তেমনি আমার রান্না বা কাজ। অর্থাৎ তুমি তোমার যোগ্যতা অনুযায়ীই সমাদর পাবে।

www.pathagar.com

৩৯. মাও (মা) নাই য্যার
ভাও (মূল্য/দোষ) নাই ত্যার।

প্রবাদটিতে মাতৃহীন সন্তানের দুরবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। মা না থাকলে সন্তান-আত্মীয় পরিজনের কাছে অনাদর আর অবহেলা পেয়ে থাকে। 'মা'য়ের যে কত প্রয়োজন সন্তানের জন্য তা এ প্রবাটিতে স্পষ্ট বোঝানো হয়েছে।

৪০. দেকা দেকি শ্যাকা লড়ে
শ্যাকার পানি টপটপ পড়ে।

একজন লোক কোন কাজ করলে তার গুরুত্ব না বুঝেই অনেকে দেখাদেখি সেই ব্যক্তির মত কাজ করতে শুরু করে। বিবেচনাহীন এই কাজ হয়তো অনেকের ক্ষতি করে। এরূপ অর্থেই এই প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে।

৪১. আন্দারত শোতে, পানিত মুতে
ভাতত দ্যায় ওশ
তিন দেষে বান্দা মরে খোদাক দ্যায় দোষ।

অন্ধকারে শোয়া, পানিতে প্রস্রাব করা, আর ঢাকনা ছাড়া ভাত রাখলে মানুষ অসুস্থ হতে পারে এই তিন কারণে। অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ তখন নিজের দোষ না দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করে থাকে।

৪২. ঘোড়াক চিনি কানোত, মাণিক চিনি পানিত, নারী চিনি হাসিত, তুমি যে মুচেরের ব্যাটা, সেড়ে চিনি দানোত।

প্রবাদটিতে বলা হয়েছে ঘোড়াকে তার কানেতে চেনা যায়, রত্নকে চেনা যায় পানিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। নারীকে চেনা যায় হাসিতে এবং মানুষের ঐশ্বর্য বা আভিজাত্যে চেনা যায় সে কেমন। মুচির ছেলে বলতে নিচু শ্রেণির ব্যক্তির দান সম্পর্কে বলা হয়েছে। দান করাতেই বোঝা যায় মানুষের উদারতা কেমন।

৪৩. ক'লে মা মার খায়
না ক'লে বা, কুত্ত্যা খায়।
ব'লে (বললে) মা মার খাবে, আর না বললে বা (বাবা) কুত্তা/ কুকুর ভক্ষণ করবে।
অর্থাৎ গৃহকর্তা মাংস কিনে এনেছে। গৃহিণী তা রান্না ঘরের এক জায়গায় তা রেখে গেছে। এদিকে বাড়ির কুকুর সুযোগ পেয়ে মাংস খেয়ে চলে যায়। গৃহিণী এসে তা দেখে স্বামীর হাতে মার খাওয়ার ভয়ে সেই কুকুরটিকেই জবাই করে কেটে রান্না করেছে। গৃহস্থের ছেলে মাকে কুকুর কাটতে দেখেছে। সে বুঝতে পারছে সে এটা অন্যায়। তাই সে বলছে যদি একথা বলি তবে মা মার খায়, আর না বললে বাবা কুকুরের মাংস খাবে। সে দ্বিধার মধ্যে থাকে।

৪৪. লাইয়্যার এক লাও
নি ল্যাইয়্যার শতেক লাও

ল্যাইয়্যা (নৌকার মাঝি/ নৌকার মালিক)। এখানে বোঝানো হয়েছে, যার নৌকা আছে তার ঐ একটাই নৌকা। আর নি লাইয়্যার (অর্থাৎ যার কোন নৌকা নেই) নৌকার অভাব নেই। কারণ সে তার প্রয়োজন মত অনেক নৌকাই ব্যবহার করতে পারে।

www.pathagar.com

শব্দার্থ :

১. বাবু...। ধনাঢ্য ব্যক্তি

২. ভেজালি... – ভেজাল/নষ্ট মন মানসিকতার ব্যক্তি।

৩. পেয়াজি...- জেনারেল নিয়াজি।

৪৫. ইসে আর কিসে ধানে আর তুষে

এ প্রবাদটির সঙ্গে মিল রয়েছে কার সাথে কি পান্তাভাতে ঘি প্রবাদটির। অর্থাৎ কোন কিছুর সঙ্গে আসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে এ প্রসঙ্গটি চলে আসে।

তথ্যনির্দেশ : আদমদিঘি

১. মালতি রানি, স্বামী : গিরেন চন্দ্র দেবনাথ, বয়স : ৫০, শিক্ষা : ৪র্থ শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : আড়াইল, পো : চাঁপাপুর, থানা : আদমদিঘিম, সাক্ষাতের তাং : ০৩/০৩/১২।

২. ভারতি রানি, স্বামী : মৃত মণিগোপাল হালদার, বয়স : ৪০, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : কাঞ্চনপুর, পো : কাঞ্চনপুর, থানা : আদমদিঘি, সাক্ষাতের তাং: ০৩/০৩/১২।

তথ্যনির্দেশ : গাবতলী

২৪. আমিরুল মমিন মুক্তা, পিতা : মরহুম আফজাল হোসেন সরকার, বয়স : ৫৬ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এস.এস (সন্মান) এম.এস.এস, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : গোড়দহ, পোস্ট : গাবতলী, ইউনিয়ন : গাবতলী, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া

তথ্যনির্দেশ : দুপচাঁচিয়া

১. আবুল কাসেম, পিতা : মতিউর রহমান, বয়স : ২৫, শিক্ষা : ৮ম শ্রেনি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : খিয়াইল, পো : চৌমুহনী, থানা : দুপচাঁচিয়া, সংগ্রহের তাং : ০৪/০৪/১২।

২. নাম : সুবাস চন্দ্র বর্মন, পিতা : সুবল চন্দ্র বর্মন, বয়স : ২৮, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি, পেশাঃ দর্জি, গ্রাম : দামকুড়ি, পো : উনাহত সিংড়া, থানা : দুপচাঁচিয়া, সাক্ষাতের তাং: ০৪/০৪/১২।

তথ্যনির্দেশঃ ধুনট

১. মোঃ হাফিজার (৪২,গ্রাম : চালাপাড়া, ধুনট। পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা-অষ্টম শ্রেণি পাস,

২. শেফালি খাতুন (৩০), স্বামী- মোঃ হাফিজার, গ্রাম :চালাপাড়া। পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা-দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা।

www.pathagar.com

৩. মোঃ আজিজার রহমান (৫০), গ্রাম : পার ধুনট। পেশা : শিক্ষকতা, শিক্ষা- বি,এ পাশ। (২৮-৪২ পর্যন্ত কথক) সংগ্রহ তাং- ২৩-০৩-২০১১ ইং সময়-১২.০০

৪. মোঃ মাসুদ রানা (৪৩), গ্রাম : ভূতমারি, ভাণ্ডারবাড়ি, ধুনট। পেশা : অধ্যাপনা, শিক্ষা- এম.এ। (৪৩-৭৭ পর্যন্ত কথক)

৫. মোঃ আইয়ুব হোসেন (৩৫), গ্রাম : ভূতমারি, ভাণ্ডারবাড়ি, ধুনট। পেশা : কৃষিকাজ, শিক্ষা- এস,এস,সি পাশ। (৭৮-৯৫ পর্যন্ত কথক)।

৬. মোঃ জসিম উদ্দিন (৭০), গ্রাম : ভূতমারি, ভাণ্ডাবাড়ি, ধুনট, পেশা : কৃষি, শিক্ষা- নিরক্ষর। সংগ্রহ তাং- ২৮-০৯-২০১২ ইং। (৯৬-১০০ নং পর্যন্ত কথক)

তথ্যনির্দেশ : নন্দীগ্রাম

১. নাম : সুকুমার চন্দ্র প্রাং, পিতা : মৃত সুরেশ চন্দ্র প্রাং, বয়স : ৪২, শিক্ষা : ১০ম শ্রেণি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : মাটিহাঁস, পো : কুমড়া, থানা : নন্দীগ্রাম। সংগ্রহের তারিখ : ১০/০৩/১২। (১-১৩ নং ধাঁধার কথক)

২. নাম : হিরেন চন্দ্র বর্মন, পিতা : হৃদয় চন্দ্র বর্মন, বয়স : ৪৫, শিক্ষা : নিরক্ষর, পেশাঃ কৃষি, গ্রাম : হাজারকী, পো : পিংহাজারকী, থানা : নন্দীগ্রাম সংগ্রহের তাং : ০১/০৩/১২। (১৩-২৪ নং ধাঁধার কথক)

তথ্যনির্দেশ : শিবগঞ্জ

১. নাম : মোঃ গোলাম রব্বানী, পিতা : আহসান হাবীব, বয়স : ১৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগত্যা : এস. এস.সি পরীক্ষার্থী, গ্রাম : পালিকান্দা, পোস্ট : সিহালী হাট, ইউনিয়নঃ পিরব, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

তথ্যনির্দেশ : সারিয়াকান্দি

১. রেজিয়া বেগম, বয়সঃ ৪৫, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : ছাইহাটা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি।

২. মাহমুদুল হক মিঠু, বয়স : ৪৬, পেশা : ব্যবসা। গ্রাম : ছাইহাটা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি।

৩. আজিজার রহমান, বয়সঃ ৪২, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : ছাইহাটা, উপজেলা : সারিয়াকান্দি।

তথ্যনির্দেশ : সোনাতলা

১. জোতদার বাউল, বাদশ, আলেমা, নার্গিস, জাহানারা, রীনা খাতুন, গ্রাম : পাতিলাকুড়া, সোনাতলা, বগুড়া। সংগ্রহ তাং-০৮/১২/১১ইং।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

আদমদিঘির লোকবিশ্বাস

১. চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদের উচ্চতা অনুযায়ী দুটি পাটকাঠি মাপ দিয়ে কেটে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এতে এই দুই পাট কাঠিকে মহিলার প্রতিনিধি ধরা হয়।

২. ছেলে বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়ার জন্য রওনা হলে মা বাঁ পায়ের ধুলা ছেলের মাথায় দেয় এবং ছেলের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আলতো করে কামড়ে দেয়। আবার কোন কোন সময় চোখে মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়। এতে মনে করা হয় ছেলে কোন বিপদে পড়বে না।

৩. রাতের বেলা ঘরে বা বাড়িতে বাঁশি বাজানো নিষেধ। এতে মনে করা হয় বাড়িতে ইঁদুর লাগবে।

৪. রাতে বাড়িতে মুখ দিয়ে শিস বাজানো নিষেধ।

৫. কাঠের চেয়ারে বসে কাঠ বাজানো নিষেধ।

৬. রাতে বাঁশির সুর বা শব্দ শুনলে অনেক পরিবারে খাবার খাওয়া হয় না। বিশেষ করে এক্ষেত্রে যাদের এক পুত্র তারা এ নিয়মটি বেশি পালন করে। আর এ ধরনের নিয়ম হিন্দু সমাজের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

৭. কোন জায়গায় যাওয়ার আগে পিছন থেকে ডাক দিলে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৮. ভাদ্র মাসে নতুন বউকে শ্বশুর শাশুড়ির দেখা নিষেধ।

৯. খেতে খেতে বিষম উঠলে মনে করা হয় নিকটজন মনে করছে।

১০. শনিবারে, মঙ্গলবারে গর্ভবতী মহিলার নদী পার হয়ে যাওয়া নিষেধ।

১১. নব দম্পতির বিয়ের ৮ দিন না হলে নদী পার হয়ে যাওয়া নিষেধ।

১২. সন্তান জন্মের পর তার মুখে মধু দেয়া হয়, যেন তার কথা মিষ্ট হয়।

১৩. সন্তান প্রসবের পর আতুর ঘরে মাটির পাত্রে ঘুটার (গোরুর গোবর শুকিয়ে তৈরি জ্বালানি) ছাইয়ের আগুন তুলে রাখা হয়। একে স্থানীয় ভাষায় 'আলা' বলে। তাদের ধারণা এটি ঘরে থাকলে কোন অপশক্তি ঘরে ঢুকতে পারবে না।

১৪. সন্তান প্রসবের পর মার হাতে সব সময় একটা লোহার চাকু বা ছুরি থাকে। এতে ঐ নবজাতক বা প্রসূতি মায়ের কাছে অপশক্তি আসতে বা ছুঁতে পারবে না।

১৫. সন্তান প্রসবের এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ প্রসূতি মা ও সন্তানকে বাড়ির বাহিরে বের করা হয় না। কারণ এতে ভূত বা প্রেত তাদের উপর ভর করবে বলে তারা বিশ্বাস করবে।

www.pathagar.com

দুপচাঁচিয়ার লোকবিশ্বাস

১. প্রসূতি মা এবং সন্তানকে যখন তার বাবা বা নানা বাড়ি থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সাথে একটা নতুন হারিকেন জ্বালিয়ে দেওয়া। কারণ আগুন দেখলে কোন অপশক্তি কাছে আসতে পারবে না।

২. কোন রমণী সন্তান সম্ভবা হলে তার গোরুর গোয়ালে প্রবেশ নিষেধ।

৩. কোন মেয়ে চুল আঁচড়ানোর সময় যদি কারো শরীরে তার চুলের স্পর্শ লাগে তাহলে যার গায়ে তার বলতে হবে 'চুল না ফুল?'।

৪. যাত্রার সময় বাজা রমণীর মুখ দেখলে যাত্রা শুভ হয় না।

৫. গায়ে মাকড়সা উঠলে মনে করা হয় তার জন্য খুব তাড়াতাড়ি নতুন জামা বানানো হবে।

৬. শনিবারে, মঙ্গলবারে চুলা বানানো নিষেধ; এতে সংসারের ক্ষতি হয়।

৭. রবিবারে এবং বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ। কারণ এই দিনে বাঁশ কাটলে বাঁশের গায়ে জ্বর আসে।

৮. ভাসুরের সঙ্গে একই সঙ্গে একই বিছানায় বসা নিষেধ।

৯. হাটে যাওয়ার সময় পিছন থেকে কেউ যদি ডাক দেয় তাহলে যাত্রা শুভ হয় না।

১০. কাঠের কোন চেয়ার বা টেবিলে বসে সেটা বাজানো নিষেধ।

১১. সন্তান প্রসবের ৭ দিনের মধ্যে প্রসূতি মা যে ঘরে থাকে সে ঘরে প্রবেশের আগে ঝাড়ু দিয়ে হাতে পায়ে আঘাত করতে হয়। এতে বাহির থেকে শরীরের সাথে আসা দূষিত বাতাস বা ভূতপ্রেত ঐ সন্তানকে স্পর্শ করতে পারে না।

১২. প্রসূতি মায়ের ঘরে সন্তান জন্মের পর ৭ দিন তাকে একই ঘরে থাকতে হয়।

১৩. প্রসূতি মাকে এবং সন্তানকে যাতে কোনো দূষিত বাতাস বা ভূতপ্রেত স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য মা এবং সন্তানকে জালের মধ্যে রাখা হয়।

১৪. মা ও সন্তান যখন ঘর থেকে বের হয় তখন মায়ের হাতে লোহার চাকু বা কাস্তে দেওয়া হয়। এতে লোহার ভয়ে ভূতপ্রেত মা ও সন্তানকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এছাড়াও নন্দীগ্রাম, আদমদিঘি উপজেলায় যে লোকবিশ্বাসগুলো আলোচনা করা হয়েছে এ উপজেলার প্রত্যেক থানার মানুষের লোকবিশ্বাসের সাথে তার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নন্দীগ্রামের লোকবিশ্বাস

১. যাত্রার সময় ছাগল যদি কান নাড়ায় তাহলে যাত্রা শুভ হয় না।

২. যাত্রার সময় হাঁচি পড়লে যাত্রা শুভ নয়।

৩. যাত্রার সময় খালি কলস ভরতে যাওয়া দেখলে যাত্রা শুভ।

৪. যাত্রার সময় যদি পিছন থেকে মা ডাক দেয় তাহলে যাত্রা শুভ মনে করা হয়।

www.pathagar.com

৫. রাস্তায় চলার সময় শিয়াল যদি বাম দিক থেকে ডান দিকে যায় তাহলে যাত্রা শুভ আর যদি ডান থেকে বাম দিকে যায় তাহলে যাত্রা অশুভ মনে করা হয়।

৬. কথা বলার সময় টিকটিকি যদি ঠিকঠিক শব্দ করে তাহলে মনে করা হয় যে কথা বলা হচ্ছে তা সঠিক বা ঐ কথার সাক্ষি সে থাকে।

৭. যারা দোকান বা ব্যবসা করে তারা সকাল সন্ধ্যা সময় বাকি দেয় না। আবার বনি (দোকান খোলার শুরুতে টাকা দিয়ে প্রথম কোন জিনিস বিক্রি) হয়নি তখন জিনিস বাঁকি দেয় না।

৮. রাতের বেলা খাতা, হলুদ, ধুপ বিক্রি করা চলে না। এতে সংসারের অমঙ্গল হয়।

৯. রাতে চাল, হলুদ, আগরবাতি, চুন, দুধ কাউকে দেওয়া চলে না আবার খাওয়ার দুধ হলে দেওয়া চলে।

১০. বৃহস্পতিবারে চাল বিক্রি করা চলে না। কারণ বৃহস্পতিবারকে গুরুবার মনে করা হয়।

১১. শনিবারে এবং মঙ্গলবারে গোরুর গোবর দেওয়া চলে না।

১২. রবিবারে বাঁশ কাটা হয় না। কারণ ঐ দিন বাঁশের গায়ে জ্বর থাকে বলে মনে করা হয়। তাই ঐ দিন যদি কেউ বাঁশ কাটে তাহলে বাঁশের জ্বর তার গায়ে পার হয়ে যায় বলে মনে করা হয়।

১৩. গর্ভবতী মহিলা কে শনিবারে মঙ্গলবারে কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। এতে মনে করা হয় মহিলার উপর খারাপ আত্মার আছড় করতে পারে।

১৪. চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ কে কেন্দ্র করে এসব অঞ্চলে অনেক লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন যখন সূর্যগ্রহণ হয় অনেক এলাকায় ভাতের পাতিলে বরের কাঁটা দেওয়া হয়। এতে যে রাক্ষস সূর্যকে গ্রাস করে সে ঐ ভাত খেতে পারে না।

১৫. চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় পরিবারের কোন সদস্য খাবার খায় না। এ ধরনের নিয়ম বা বিধি নিষেধ হিন্দু সমাজের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

১৬. সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদের একদম খাবার দেওয়া হয় না। তারা মনে করে এ সময় কোন গর্ভবতী মহিলা খেলে তার পেটের সন্তান রাক্ষস হবে।

শাজাহানপুরের লোকবিশ্বাস

১. বের হওয়ার সময় হোঁচট খেলে একটু বসে যেতে হয়। না হলে যাত্রার অমঙ্গল হয়।

২. যাত্রাকালে ঝাড়ু ও কালো বিড়াল দেখলে যাত্রা অশুভ হয়।

৩. যাত্রাকালীন সময়ে কাউকে পেছন থেকে ডাকতে হয় না। ডাকলে অমঙ্গল হয়।

৪. যাত্রাকালে রিকশা বা সাইকেলের চেইন পড়ে গেলে যাত্রায় অমঙ্গল হয়। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. যে পোষাককে দুর্ভাগ্য মনে করা হয় সে পোষাক পরে পরীক্ষা দেয়া হয় না। প্রথম পরীক্ষাটা যে পোশাক পড়ে ভালো দেয়া হয়, সেই পোশাক পড়ে সব পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে হয়।

www.pathagar.com

৬. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার পূর্বে দোয়া পড়ে নিতে হয়। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর প্রশ্নকে সালাম ও চুমু দিয়ে চোখ বন্ধ করে দোয়া পড়ে তারপর প্রশ্ন দেখলে প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়।
৭. পরীক্ষার দিন ভিক্ষুক আসলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক না।
৮. পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বিধবা মহিলা দেখলে পরীক্ষা খারাপ হয়।
৯. পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে হোঁচট খেলে বা আঘাত পেলে মনে করা হয় যে, পরীক্ষা ভালো হবে না। এজন্য কিছু টাকা ভিক্ষুককে দান করতে হয়।
১০. পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে মানত করতে হয়। ফল যদি ভাল হয় তাহলে কোনো ভিক্ষুক বা মসজিদের উদ্দেশে কিছু দান করা দরকার। কেউ কেউ অবশ্য রোজা ও নফল নামাজ মানত করে।
১১. শুভ দিনে কালো কাপড় পরতে হয় না।
১২. রঙিন পোশাক বিশেষ করে লাল পোশাক পরলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।
১৩. জোড়া শালিক শুভ এবং একটা শালিক দেখলে অশুভ।
১৪. হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে অশুভ কোনো কিছুর ইঙ্গিত বোঝানো হয়।
১৫. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে ভাগ্য খারাপ হয়। এটি অশুভ।

মহাস্থানগড়ের মাযার সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস

মহাস্থান মাযারকে কেন্দ্র করে বগুড়া জেলা ও এর আশেপাশের জনগণের সাথে বেশ কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার চালু রয়েছে। এরা মনে করেন এখানে মানত করলে বা শিন্নি দিলে মনোকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় অথবা রোগ-বালাই বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সে কারণে প্রায় হাজার হাজার মানুষ মহাস্থান মাযারে আসেন। আসেন সাধারণত দু'ভাবে। কেউ ব্যক্তিগত কেউ একা একা কেউবা দলভিত্তিক। সাধারণত পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়-স্বজন মিলে দলগত আসেন। তারা এখানে রান্না করেন এবং রান্না করা খাবারের একভাগ মাযারের খাদেমের রক্ষিত ড্রামে দিয়ে বাকীটা নিজেরা খান। রান্না বলতে খিচুড়ি। মোরগ ও খাসিই সাধারণত মানত হয়ে থাকে। সুতরাং তার মাংস দিয়েই রান্না হয় খিচুড়ি। ড্রামে রক্ষিত খিচুড়ি মাযারের ফকির-মিসকিন বা আগত লোকজনতে খেতে দেয়া হয়। আমরা মহাস্থান মাযারকেন্দ্রিক বেশকিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার পেয়েছি। নিচে তা উপস্থাপিত হলো : "১০-১২ বছর আগে নিয়্যাত করছিলাম। অসুখ থেইক্যা যুদি বাইচ্যা উটি তাইলে ১টা খাসি আর ১৫ কে.জি চাউল দিয়া ভাত তরকারি রাইন্ধ্যা বাবার মাযারে দিমু। রোগ এখুন অনেকটাই ভালো। পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার জন্য এখুন মানত পুন্ন করিচ্ছি।"

এই দল ২৫ জন নারী পুরুষ সমন্বয়ে এসেছে। নারী পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান তবে নারী পাঁচ জন বেশি রয়েছে এবং শিশু আছে ৮ জন। মানতকারি রান্না করা খাবার কিছুই খান না। কিন্তু সবকিছু তিনি তদারকি করেন। মানতের জিনিস নিজে খেলে তার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয় না বলেই এরা বিশ্বাস করে। তবে একটা বিষয় দেখা গেল সঙ্গে যারা এসেছে এদের মধ্যেও অনেকেই এই সুযোগে বাবার মাযারে নিজেদের চাওয়া

www.pathagar.com

পাওয়ার বিষয়গুলো সেরে নিচ্ছেন। এখানে দলের প্রধানই সব খরচ বহন করে মাযারে নিয়ে আসে নিয়ে যায়। তবে রান্না করা খাবার আগে বাবার মাযারে ভাণ্ডার খানায় জমা দেওয়া হয় তারপর অন্যরা খাওয়া শুরু করে।

নাতনির মুখে ভাতের অনুষ্ঠান। ১টা বড় সাইজের খাসি, ৩০ কেজি চাল এবং মসলা পরিমাণ মতো নিয়ে এসেছে। মহাস্থানে রান্নাঘর ভাড়া নিয়ে প্রায় ১০০ জনের মতো মানুষ এসেছে। নারী পুরুষের অনুপাত প্রায় ৪০ ঃ ৬০ জন। বাবার মাযারে এসে নাতনির মুখে ভাত দিলে ভবিষ্যতে নাতনির মঙ্গল হবে। বাবার দোয়া সাথে থাকলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে। এখনো বাংলাদেশে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে অনেকেই নাখোশ হয় অথচ আপনি এসেছেন নাতনির মুখে ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠান করতে এত খরচ করে? মুখে চমৎকার প্রশান্তির হাসি হেসে বললেন- ভাই ছলমিয়ার তফাত এখন আর নাই।

মেয়ের মুখে ভাতের অনুষ্ঠান। ১টা খাসি এবং ১৬ কে.জি চাল, মসলা পরিমাণ মত নিয়ে এসেছে। লোক সংখ্যা প্রায় ৬০ জন। নারী পুরুষের অনুপাত ৩০ ঃ ৩০ জন। মেয়ের বাবা হতে পারায় খুশি হয়ে বাবার মাযারে এসে মেয়ের মুখে ভাতের অনুষ্ঠান করছে।

১৩-১৪ বছর আগে হারুন রশিদ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। বাবা জাবো মোল্লা ছেলের চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন। মাথায় পানি ঢাললেন কিন্তু পুত্র হারুনের জ্ঞান ফিরে না। আধাঘণ্টা পার হয়ে যায় কিংকর্তব্যমূঢ় অসহায় বাবা জাবো মোল্লা তখন বাবা মাহী সাওয়ারের স্মরণ নিলেন। ২টা খাসি এবং আধামণ চাল বাবার নামে মানত করলেন। বাবার কুদরতে তখন অলৌকিকভাবে হারুনের জ্ঞান ফেরে। এবং সে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাবা জাবো মোল্লা তাৎক্ষণিকভাবে তার সে মানত পূরণ করতে পারেন নি। মানতের ৮/৯ মাস পরে পুত্র হারুনের মত হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পুত্র হারুন নানা কারণে বাবার সেই মানত পূর্ণ করতে পারেন নি। কিন্তু আজ ১৩-১৪ বছর পরে বাবার সেই মানত পূর্ণ করার জন্য ২টা খাসি এবং ২০ কেজি চাল নিয়ে মাযারে এসেছে। সঙ্গে নারী পুরুষ সব মিলে ৩৫-৪০ জন রয়েছে। রান্নাঘর ভাড়া নিয়ে খিচুড়ি রান্না করে বাবার মাযারে দান করবেন এবং নিজেরা খাবেন।

প্রথমে মেয়ে হওয়ার পর পরের সন্তান ছেলে হওয়ার প্রত্যাশায় বাবা মাহী সওয়ারের নামে ২টা মোরগ ও ১০ কেজি চালের মানত করে। প্রত্যাশা অনুযায়ী বাবা তাকে ছেলে সন্তান দেওয়ায় খুশি হয়ে বাবার মাযারে ২টা মোরগ ও ১০ কে.জি চাল নিয়ে এসেছে। সাথে ১৫ জন নারী পুরুষ উভয়ই আছে। ঘর ভাড়া নিয়ে রান্না করে বাবার মাযারে শিন্নি দিতে এসেছেন।

নাতনি অসুস্থ হয়েছিল। তখন নাতনির আরোগ্য কামনা করে ২টা মোরগ আর ৭ কে.জি চালের পোলাও মানত। বছর দেড়েক আগে। বর্তমানে নাতনি সুস্থ তাই মানত পূর্ণ করতে এসেছে।

www.pathagar.com

অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য জোড়া মোরগ এবং ৫ কে.জি চালের পোলাও মানত করেছিল। বর্তমানে অনেকটা সুস্থ তবে পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আশায় মানত পূর্ণ করতে এসেছে।

গত তিন বছর ধরে জুম্মার নামাজ পড়তে আসেন। ১১ টা থেকে ১২টার মধ্যে এখানে উপস্থিত হন। জুম্মার নামাজ এবং আছর নামাজ পড়ে বিকেলের দিকে বাড়ি চলে যান। গত তিন বছরে দুই চার শুক্রবার মিস হয়ে থাকতে পারে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত আসেন। উদ্দেশ্য বড় জামাতে নামাজ পড়া। তবে মূল উদ্দেশ্য এখানে এসে জুম্মার নামাজ পড়লে ওলি বাবা খুশি হবেন। আর ওলি বাবা খুশি হলে জীবনে আর কোন সমস্যা থাকবে না।

দুই বছর ধরে প্রত্যেক শুক্রবার মাযারে আসেন। রোদ বৃষ্টি ঝড় সব কিছু উপেক্ষা করে। জুম্মা এবং আছর নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরে যান। উদ্দেশ্য বড় জামাতে নামাজ আদায় এবং বাবাকে খুশি করা।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সুলতান বাবার মাযারে যাতায়াত করেন। প্রতি শুক্রবার সকাল ১০-১১ টার মধ্যে মাযারে এসে আসন পেতে বসেন মাযারের সামনের পাকুড় গাছের তলে। প্লাস্টিকের বস্তা বিছিয়ে দেন নিজের এবং ভক্তদের জন্য। এভাবেই ২৫ বছর কাটালেন অসুস্থতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া প্রায় সব শুক্রবারই মাযারে এসেছেন। বাবার মাযারে এত দীর্ঘদিন আসা যাওয়ার কারণে নিজেদের একটা ভক্তশ্রেণি তৈরি হয়ে গেছে। তারাও বর্তমানে পিরের মর্যাদা পেয়ে থাকেন। তাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারটা ভক্তবৃন্দই দেখে থাকে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই পির হিসেবে পরিচিত। গ্রামের বাড়িতে প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভক্তদের নিয়ে আসর বসে। জিকির, মিলাদ ও গান বাজনা হয়ে থাকে।

সুলতান বাবার এই ভক্তদ্বয় বিশ্বাস করে যে, বাবার কাছে সে যা চাইবে বাবা তা দিতে বাধ্য থাকবে। মাঝে মধ্যে স্বপ্নে বাবার সাথে তার কথা হয়। তবে নিজেদের জন্য কিছুই চান না। গ্রামে মাত্র সোয়া দুই শতক জমির উপর ছোট্ট একটা বাড়িতে এক ভ্যান চালক ছেলেকে নিয়ে বাস করেন। মেয়ে একজন। তাকে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে জামাইও ভ্যানচালক।

পাকুড় গাছের তলেই দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বসতেন। তবে গত তিন সপ্তাহ ধরে মাযার থেকে একটু দূরে উত্তর দিকের চায়ের দোকান সংলগ্ন পাকুড় গাছের তলে চলে এসেছেন। কারণ মাযারের কাছে পাকুড় গাছের তলে বসতে গেলেই এক পাগলি লাঠি নিয়ে তাড়া করে। পাগলির হাতে লাঠি পেটা খাওয়ার ভয়ে দীর্ঘ ২৫ বছরের অবস্থান বদল করেছেন।

শেরপুরের লোকবিশ্বাস

১. বাড়িতে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য বাড়ির বাইরে অন্যকোনো বাড়িতে অথবা স্থানে পাঠাতে হলে ভালো করে ঢাকতে হবে। ঢাকনার উপরে পরিমাণমতো কয়লা, রসুন, পিঁয়াজ, লোহার টুকরো, শুকনো মরিচ দিয়ে দিতে হয়। এতে পথের বালা-মুসিবত, ভূত-প্রেত খাবার থেকে দূরে থাকে।

www.pathagar.com

২. শুকনো অথবা তেলে ভাজা জিনিস যেমন : মুড়ি, চাল ভাজা, পিঁয়াজু, চপ প্রভৃতি খেয়ে পানি পান না করে বাইরে গেলে জিন-ভূতে ধরে। তাই পানি পান করে ঘরের বাইরে যেতে হয়।
৩. মানত করলে তা অবশ্যই পালন করতে হয়। মানত পূর্ণ না করলে ক্ষতি হয়।
৪. সৎ/ভালো মনে কোনো আশা নিয়ে মানত করলে তা পূর্ণ হয়।
৫. মানতে নামাজের সংখ্যা অবশ্যই জোড় সংখ্যা হতে হবে।
৬. রোজা মানত করলে মানত পূর্ণ হবার পরের দিন থেকে রোজা আরম্ভ করতেই হবে। নইলে মানত বিফলে যাবে।
৭. পরীক্ষার আগের দিন রাতে মাথার বালিশের নিচে বই রেখে ঘুমালে পড়া স্মৃতিতে থাকে দীর্ঘ সময়।
৮. পরীক্ষায় রওনা দেওয়ার সময় হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে যদি মন খারাপ হয় তবে পরীক্ষার প্রশ্ন কমন না আসার সম্ভাবনা থাকে।
৯. পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম, কলা, মিষ্টি খাওয়া হয় না। আবার কেউ কেউ কচু, আলুও খায় না। এগুলো খেলে পরীক্ষার ফলাফলে গোল্লা বা শূন্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
১০. ডিম না খাওয়ার কারণ হিসেবে কারো কারো বক্তব্য হলো ডিম খেলে মাথা গরম হয়, পরীক্ষা ভালো হয় না।
১১. পরীক্ষার আগে ভালো খাবার খাওয়া দরকার। তাতে পরীক্ষা ভালো হয়।
১২. আজানের সময় মেয়েদের মাথায় কাপড় দিতে হয়। কারণ ঐ সময় জিন-ভূত চলাচল করে। মেয়েদের মাথায় কাপড় না থাকলে জিন-ভূত মাথায় প্রস্রাব করে দেয়।
১৩. সন্ধ্যার সময় চুল আঁচড়ানো ঠিক নয়, কারণ চুল আঁচড়ালে সূর্য দেবতার সান্ধ্য কালীন খাওয়া হয় না।
১৪. সন্ধ্যার সময় বাইরে কাপড় রাখতে নেই। রাখলে ভূতের বাতাস লাগে। আর সেই কাপড় শরীরে পড়লে অসুখ হয়।
১৫. মধ্য রাতে ঘরের বাইরে যেতে নেই। কেননা সে সময় ভূত-প্রেত ঘুরে বেড়ায়।
১৬. সন্ধ্যার পর চুল ছেড়ে বাইরে গেলে শয়তান মেয়েদের মাথায় ভর করে।

সারিয়াকান্দির লোকবিশ্বাস

১. কেউ আত্মহত্যা বা অপঘাতে মারা গেল ঐ বাড়িতে ভূত আসে। সে জন্য ঐ সময় রাতের বেলা একাকী চলাচল করতে নেই।
২. ডিম ভাজা বা তেলে ভাজা ইত্যাদি জাতীয় খাবার খেলে এবং এগুলো নিয়ে রাতে বের হলে ভূতের আছড় বা নজর লাগে। যদি বের হতে হয় তাহলে ভালো করে মুখ ধুয়ে এবং খাবারের পাশে একটু কয়লা বা লোহা জাতীয় কিছু নিয়ে বের হতে হবে। কেউ কেউ হলুদ-রসুন সঙ্গে নিলে ভূতে ধরে না বলে মত প্রকাশ করে।
৩. সন্ধ্যার সময় চুল ছেড়ে বাইরে গেলে ভূতের বাতাস লাগে। এজন্য চুল বেঁধে বের হতে হয়। আর যদি বের হতে হয় তাহলে হাতে লোহা জাতীয় কিছু রাখলে ভূতের বাতাস শরীরে লাগে না।

www.pathagar.com

৪. মেয়েরা মাসিকের নির্দিষ্ট সময়গুলোতে সন্ধা ও রাতে বের হওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। কারণ ঐ সময় ভূতের আছড় লাগার সম্ভাবনা থাকে।
৫. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আগে ডান পা দিয়ে বের হতে হবে। তাহলে যাত্রা শুভ হয়।
৬. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় 'যাই' না বলে 'আসি' বলতে হয়। না হলে রাস্তায় ক্ষতি হয়।
৭. গর্ভবতী নারীকে যাওয়ার সময় বলে যেত হয় না। তাকে না বলে চলে যাওয়া ভালো। না হলে এতে গর্ভবতীর ক্ষতি হয়।
৮. যাত্রা পথে হাঁচি আসলে যাত্রা অশুভ হয়।
৯. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যদি বাধা আসে তাহলে সেদিন যাত্রা বিরতি দেয়া ভালো।
১০. রাতের বেলায় কুকুরের কান্না অশুভ কিছু ঘটার ইঙ্গিত।
১১. শনিবারে যাত্রা বা পরীক্ষা শুভ নয়।
১২. মঙ্গলবারে যে কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা শুভ।
১৩. রবিবারে মাথায় শ্যাম্পু করা শুভ নয়।
১৪. দুপুর বেলায় মাথার উপর কাক কর্কশ সুরে ডাকাকাকি করা অশুভ।
১৫. শুভ-অশুভ ভয়ে তাদের আচরণ হলো অশুভ ব্যাপার থেকে দূরে বা বিরত থাকা এবং দোয়া-দরুদ পাঠ করার মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

তথ্যসূত্র : আদমদিঘি

১. নাম : ভারতী রাণী হালদার, স্বামী : মৃত মণিগোপাল হালদার, বয়স : ৪০, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : কাঞ্চনপুর, পো : কাঞ্চনপুর, থানা : আদমদিঘি, সাক্ষাতের তাং : ০৩/০৩/১২।

তথ্যসূত্র : দুঁপচাচিয়া

১. নাম : অঞ্জনা রাণী বর্মন, স্বামী : সুবাস চন্দ্র বর্মন, বয়স : ২৫, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : দামকুড়ি, পো : উনাহত সিংড়া, থানা : দুপচাঁচিয়া। সংগ্রহের তাং : ০৪/০৪/১২

২. নাম : আলপনা রাণী, স্বামী : গুপীনাথ বর্মন, বয়স : ৫০, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : খানপুর, পো : চৌমুহনী, থানা : দুপচাঁচিয়া, সংগ্রহের তাং : ০৪/০৪/১২

তথ্যসূত্র : নন্দীগ্রাম

১. নাম : অনিতা রাণী,স্বামী : সুকুমার চন্দ্র বর্মন, বয়স : ৩০, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, পেশা : গৃহিণী, গ্রাম : মাটিহাঁস, পো : কুমড়াপুন্ডিত পুকুর, থানা : নন্দীগ্রাম। সাক্ষাতের তাং : ১০/০৩/১২

তথ্যসূত্র : শাজাহানপুর

১. মোঃ নূরুল ইসলাম (৪৮), গ্রাম :আড়িয়া বাজার, শাজাহানপুর, পেশা : শিক্ষকতা। সংগ্রহ তাং- ১৪/০৫/১১ ইং

তথ্যসূত্র : মহাস্থানগড়

১. মোঃ আতিকুর রহমান, পিতা : মৃত লোকমান আলী পরামানিক, বয়স : ৩৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ. এস.সি পাশ, পেশা : চাকুরি, গ্রাম : জাতহালদা, পোস্ট : কদমতলি, ইউনিয়ন : নেপালতলি, উপজেলা : গাবতলী,জেলা : বগুড়া।

www.pathagar.com

২. মোঃ জয়নাল আবেদিন সরকার, পিতা : মৃত আব্বাস সরকার, বয়স : ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কৃষি, পোস্ট : মোকামতলা, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

৩. মোঃ সিদ্দিক হোসেন, পিতা : মৃত ওছির উদ্দিন, বয়স : ২৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৪র্থ শ্রেণি, পেশা : কৃষি, গ্রাম : বিনাহালি, পোস্ট : বিনাহালি, ইউনিয়ন : নওশাতপুর, উপজেলা : আদমদিঘি, জেলা : বগুড়া।

৪. মোঃ হারুন রশিদ, পিতা : মৃত জাবো মোল্লা, বয়স : ৩৫ বছর,শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস. এস. সি পাশ পেশা : চাকুরি, গ্রাম : চরহরিনা, পোস্ট : নারচি ইউনিয়ন : নারচি উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।

৫. নাম : মোঃ আলাওল, পিতা : মৃত কাশেম আলী, বয়স : ৩৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাশ, পেশা : কৃষি, বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত, মেয়ে : ১ জন, ছেলে : ১ জন, গ্রাম : গোন্দগোরপুর, পোস্ট : মিঠাপুর, ইউনিয়ন : মিঠাপুর, উপজেলা: বদলগাছি, জেলা : নওগাঁ।

৬. নাম : মোঃ আকরাম হোসেন, পিতা : মোঃ মোসলেম উদ্দিন, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর, পেশা : কৃষি, গ্রাম : বটিয়াভাঙ্গা, পোস্ট : দূর্গাহাটা, ইউনিয়ন : দূর্গাহাটা, উপজেলা : গাবতলী, জেলা : বগুড়া।

৭. মোঃ মিস্টার, পিতা : ভুলু মুন্সি, বয়স : ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর, পেশা: কৃষি, গ্রাম : হরিণা পো : হাটফুলবাড়ি, ইউনিয়ন : হাটফুলবাড়ি, উপজেলা : সারিয়াকান্দি, জেলা : বগুড়া।

৮. আব্দুল মান্নান, পিতা : মোঃ মোকসেদুর রহমান, বয়স : ৪৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচ. এস.সি, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : কে, এম, বি পাড়া, পোস্ট : পারগয়রা, ইউনিয়ন : সুনামগঞ্জ, উপজেলা : গোবিন্দগঞ্জ, জেল : গাইবান্ধা।

৯. মোঃ আব্দুস সামাদ মাস্টার, পিতা : মরহুম শরাফত আলী, বয়স : ৬৩ বছর, পেশা : শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত), গ্রাম : বনতেঘরিয়া পোস্ট : শিবগঞ্জ, ইউনিয়ন : শিবগঞ্জ, উপজেলা : শিবগঞ্জ, জেলা : বগুড়া।

১০. মোছাঃ মজিদে, স্বামী : দয়াল, বয়স : ৪৫ বছর, শিক্ষা : স্বাক্ষর, পেশা : পীরগীরি, গ্রাম : জাবারিপুর, পোস্ট : মোকামতলা, ইউনিয়ন : মোকামতলা, উপজেলা : শিবগঞ্জ জেলা : বগুড়া।

তথ্যসূত্র : শেরপুর

১. নাম : মো.কানু মিয়া, পিতা : মো. আমজাদ আলী মিয়া, পেশা : কৃষি, বয়স : ৫৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি পাস। ঠিকানা : খন্দকার পাড়া, ওয়ার্ড : ৯, পোষ্ট : শেরপুর, উপজেলা : শেরপুর, জেলা : বগুড়া।

তথ্যসূত্র : সরিয়াকান্দি

১. মিল্লাহ হোসেন (৪০), পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : ছাইহাটা, সারিয়াকান্দি। সংগ্রহ তাং: ১১/০৫/১২ ইং

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

ক. মাছ ধরার জাল

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা যমুনা ও বাঙ্গালি নদী বিধৌত বলে এই এলাকায় বর্ষার সময় ছাড়াও প্রায় সারা বছর লোকে নদীতে ও খালে বিলে মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ এলাকার জেলেরা নদীতে সাধারণত ব্যাড় (বেড়) জাল, পান্টি জাল, মইজাল, খড়া ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরে থাকে। আর সাধারণ মানুষের পেলা জাল, পলই, দারকি, ধিয়ার, চটকা জাল, ঝিটকি জাল ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরে থাকে।

১. বেড় জাল

এ জাল লম্বায় সাধারণত দেড় হাজার থেকে দু'হাজার ফুট আর চওড়া পনেরো থেকে বিশ ফুট হয়ে থাকে। সাধারণত যমুনা নদীতে বড় বড় মাছ ধরার ক্ষেত্রে এ জাল ব্যবহার করা হয়।

২. পান্টিজাল

এ জাল দৈর্ঘ্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফিট এবং চওড়ায় ৩/৪ ফিট হয়ে থাকে। জালের চওড়া অংশটি অর্ধবৃত্তাকার অবস্থায় ৩/৪ ফিট পর পর লাঠির সঙ্গে বাঁধা থাকে। জালের দু'মাথায় দু'জন ধরে টেনে মাছ ধরে।

৩. মইজাল

এ জাল দৈর্ঘ্যে প্রায় পনেরো থেকে বিশ ফুট এবং চওড়া ৮/১০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। মইয়ের মতো টেনে এ জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয়।

৪. তৌরেজাল

দশ-বারো ফুট দৈর্ঘ্যের এ জাল অনেকটা গোলাকার। পেছনের অংশটি লেজের মতো। সামনের অংশে অনেকগুলো লোহার কাঠিদ্বারা সংযুক্ত যেখানে জাল একটু ভাঁজ করা থাকে, যার ভেতর মাছ আটকে পড়ে। এর লেজের অংশে লম্বা দড়ি থাকে। এই দড়ি হাতের সঙ্গে পেছিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে একে জলে নিক্ষেপ করতে হয়।

৫. খারেজাল বা খরাজাল

সাধারণত খাল বা পানি প্রবাহের মুখে খরাজাল পেতে রাখা হয়। দেখতে অনেকটা পেলা জালের মতোই। কিন্তু আকারে পেলা জাল থেকে বেশ বড়। লম্বায় প্রায় ৭০/৮০ ফুট এবং প্রস্থ ২৫/৩০ ফুট হয়ে থাকে। এই জাল বাঁশের খুঁটির সঙ্গে এক জায়গায় স্থির করে পেতে রাখা হয়। ১০/১৫ মিনিট পর পর একবার তুলে মাছ ধরা হয়।

www.pathagar.com

খরা জাল

৬. পেলাজাল

ত্রিকোনাকৃতির এ জাল দৈর্ঘ্যে ৫/৬ ফুট এবং সম্মুখের অংশ চওড়া ৩/৪ ফুট হয়ে থাকে। বাঁশের লাঠির সঙ্গে এ জালের একটি টুন থাকে। হাতের সাহায্যে এ জাল সামনের দিকে ঠেলে মাছ ধরতে হয়।

পেলা জালি দিয়ে মাছ ধরা

www.pathagar.com

৬. ঝিটকি জাল

বর্গাকৃতির এ জাল বাঁশের খুঁটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর চারকোণা আড়াআড়িভাবে বাঁশের দু'টি বাতার সঙ্গে যুক্ত থাকে। পানির স্রোতের দিকে অর্থাৎ ভাটির দিক থেকে এ জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়।

খ. মাছ ধরার যন্ত্র

১. দারকি বা ধিয়ার

বাঁশের চিকন শলাকার সাহায্যে মাছ ধরার বিশেষ এ যন্ত্রটি তৈরি হয়। দারকি লম্বায় ৩/৪ ফুট এবং প্রস্থ ৮/১০ ইঞ্চি চওড়া। আর এ ধিয়ার এর থেকে আর একটু বড় হয়ে থাকে। দারকি ধিয়ার উভয়েরই দু'পাশে দু'টি করে মুখ থাকে। এ মুখ দিয়েই মাছ এর ভেতরে প্রবেশ করে আটকে পড়ে।

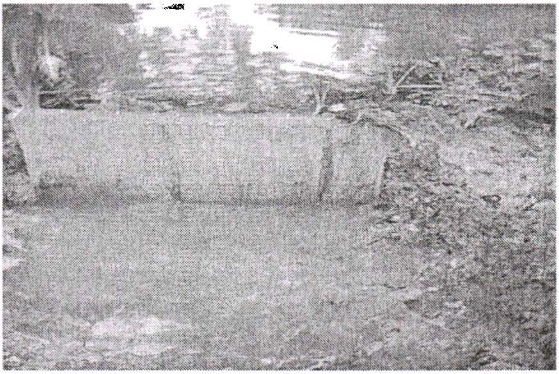

দারকি

২. খোলসেনি

বাঁশের শলাকার তৈরি ছোট মাছ ধরার মন্ত্রকে খোলসেনি বলে। জমির আইলে অথবা পানি প্রবাহের স্থলে এটি বসিয়ে মাছ ধরা হয়।

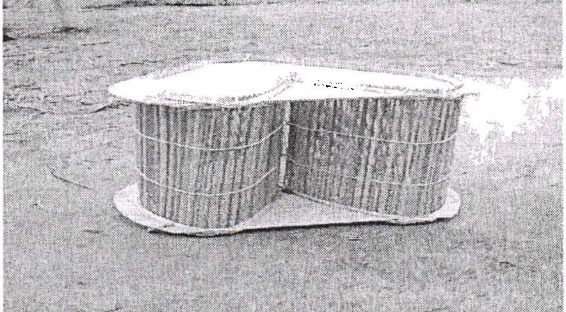

খোলসেনি

www.pathagar.com

৩. পলো বা পলি

বাঁশে শলাকার সাহায্যে তৈরি চারদিক গোলাকার মাঝখানটা ফাঁপা এর ওপরের অংশ ছয় ইঞ্চির মতো ব্যাসার্ধ আর নিচের অংশের ব্যাসার্ধ দু'ফুটের মতো। মাছের অবস্থান লক্ষ করে পলি দিয়ে ছাপ দেয়া হয়।

পলই মাছ ধরা

৪. বস

পাঁকা জাত লাউ এর খোল দিয়ে বস বানানো হয়। লাউয়ের গোড়ার অংশ এবং মাথার অংশ কেটে এ বস বানানো হয়। মাছের অবস্থান লক্ষ করে ছাপ দিয়ে বস দিয়ে, মাছ ধরা হয়।

৫. পাচা

একটি লম্বা বাঁশের লাঠির মাথায় চিকন লোহার শলাকা গেঁথে পাচা বানানো হয়। মাছের অবস্থান লক্ষ করে এটি ছুড়ে মেরে মাছ ধরা হয়।

গ. অন্যান্য লোকপ্রযুক্তি

১. হুকা

নারকেল খোলের সঙ্গে বাঁশের বা কাঠের ছিদ্রযুক্ত একটি ১ ফুটের মতো ডাট সংযুক্ত করে হুকা বানানো হয়। ডাটটির মাথায় একটি কলকি থাকে। নারকেলের খোলের ভেতর পানি দিয়ে কলকির তামাকে আগুন দিয়ে (একটি জলন্ত কয়লা) হুকা খাওয়া হয়।

২. ঢেঁকি

গাছের শক্ত গুড়ি দিয়ে ঢেঁকি বানানো হয়। ঢেঁকির দুটি কাতলা, একটি মৌনি ও একটি গোড়ে থাকে। ঢেঁকির পেছনের অংশে একটি আড়াআড়ি ছিদ্র করে তার ভেতর কাঠের শক্ত মোটা শলাকা থাকে। এই শলাকা ঢেঁকির দু'পাশে দুটি কাতলার ওপর বসানো থাকে। ঢেঁকির সম্মুখে ওপর নিচে একটি ছিদ্র করা হয় এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে কাঠের একটি শক্ত মোটা শলাকা বসানো হয়। ঢেঁকিতে পার দেয়ার সময় এর সাহায্যেই গোড়ের ভেতর ধান পালিশ হতে থাকে। একে মৌলি বলে। সাধারণত গাছের গুড়ি বা

www.pathagar.com

সিমেন্টের তৈরি গোড়ে ব্যবহৃত হয়। গোড়ে মাটির ভেতর (ঢেঁকির মৌনি বরাবর) পোঁতা থাকে। ধান ভানা, আটা কুটা প্রভৃতি কাজে বগুড়ায় এখানো ঢেঁকির ব্যবহার দেখা যায়।

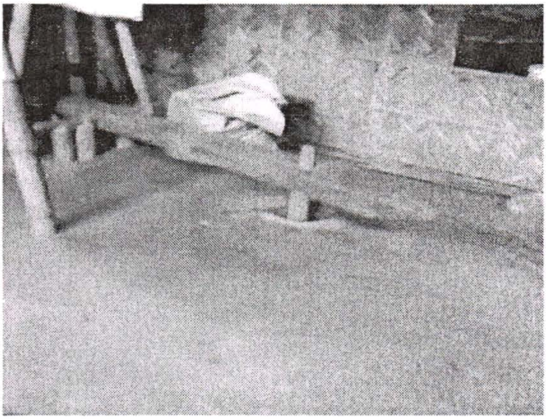

ঢেঁকি

৩. লাঙ্গল

লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ করা হয়। গাছের গুড়ি কেটে লাঙ্গল বানানো হয়। গাছের গুড়িকে একটু কোচা করে কেটে তার সঙ্গে নিচে ফাল এবং ওপরে বাঁশের ডাট লাগিয়ে লাঙ্গল বানানো হয়।

৪. নাংলে

বগুড়া জেলায় দু'ধরনের নাংলে দেখা যায়। একটি হাত নাংলে আরেকটি গোরু টানার নাংলে। হাত নাংলে ছোট আকৃতির হয়।

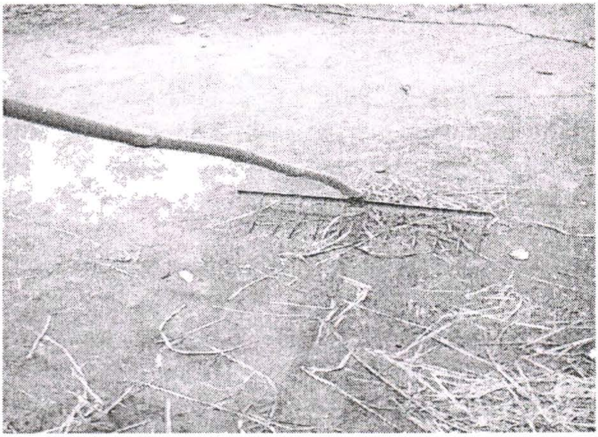

হাত নাংলে

www.pathagar.com

দু থেকে তিন ফুট পরিমাণ কাঠের সঙ্গে দু'ইঞ্চি পর পর লোহার শলাকা বসানো থাকে। কাঠের মাঝখানে একটি ছিদ্রে লম্বা একটি বাঁশের লাঠি সংযুক্ত থাকে। এই লাঠি হাতে ধরে নাংলের ব্যবহার হয়। সাধারণত ধান মাড়াই, মলন, শুকানো, বিছনের ক্ষেত, বেগুনের টাল, মরিচের পালান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাত নাংলের সাহায্যে নিড়ানি বা ঘাস-ময়লা ওপড়ানো হয়। গোরু টানার নাংলেকে মই নাংলে বলে। দুই গোরুর সাহায্যে যেভাবে জমিতে হাল চাষ বা মই দেয়া হয় সেভাবেই জমিতে নাংলে দেয়া হয়। মই নাংলে হাত নাংলের থেকে দুই তিনগুন বড় হয়। একটি বড় কাঠের চড়াটের সঙ্গে তিন/চার ইঞ্চি পর পর বাঁশের মোটা শলাকা লাগানো থাকে। এর মাঝখানে একটি ছিদ্রের সঙ্গে লম্বা বাঁশ সংযুক্ত থাকে-যা গোরুর ধানের ক্ষেত, মাষকালাইয়ের ক্ষেত ইত্যাদির ঘাস উপড়ানোর ক্ষেত্রে মই নাংলে ব্যবহৃত হয়।

৫. নৌকা

সারিয়াকান্দি, ধুনট ও সোনাতলা উপজেলা নদীবিধৌত বলে এ এলাকায় বর্ষাকালে প্রচুর নৌকা চলে। এ এলাকায় নানা ধরনের নৌকা দেখা যায়। পাট বহনের জন্য বড় বজরা নৌকা। এ ছাড়াও আছে জেলে নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, কোষা নৌকা, গয়নার নৌকা, বাইচের নৌকা ইত্যাদি। এক সময় এ এলাকায় পাল তোলা নৌকা দেখা গেলেও এখন শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নৌকাই বেশি দেখা যায়।

৬. মহিষের গাড়ি

পশ্চিম বগুড়ায় এক সময় প্রচুর মহিষের গাড়ি দেখা যেত। বর্তমানে পাকারাস্তা হওয়াতে এ এলাকায় মহিষের গাড়ি অনেকটাই কমে এসেছে। এ এলাকার মাটি বরেন্দ্র মাটি বলে গোরুর গাড়ির পরিবর্তে মহিষের গাড়িই প্রচলিত ছিল। বর্ষাকালে এখানকার মাটি কাদায় পূর্ণ হয়ে থাকে। এ কাদা মাটিতে গরুর পক্ষে গাড়ি টানা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলেই মহিষের গাড়ির প্রচলন।

৭. গোরুর গাড়ি

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের যাতায়াতের অন্যতম বাহন ছিল গোরুর গাড়ি। পূর্ব বগুড়া পলি অঞ্চল হওয়ায় পশ্চিম বগুড়ার তুলনায় এখানে অতোটা মহিষের গাড়ির প্রচলন নেই। এ এলাকায় তাই গোরুর গাড়ির প্রচলনই বেশি।

৮. ঘোড়ার গাড়ি

এই কিছুদিন আগেও (১৫/২০ বছর) পশ্চিম বগুড়ায় মানুষের যাতায়াতের অন্যতম বাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি। সারিয়াকান্দি ও ধুনটের চরাঞ্চলে এখনো ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায়। মটরগাড়ির চাকা এখানে ঘোড়ার গাড়ির চাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (৫০), গ্রাম : দুবলাগাড়ী, শেরপুর, বগুড়া। পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা- এস,এস,সি। সাক্ষাৎকার তাং-০৬/০৭/২০১২ ইং

www.pathagar.com

লোকভাষা

বগুড়ার ভাষা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন স্যার জর্জ গিয়ারসন। 'The Linguistic Sturvey of India' (Vol. 5 1903 : 152-156) গ্রন্থে গিয়ারসন বগুড়া অঞ্চলের উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বগুড়াকে দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের তথা কামরূপী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

প্রাকৃতিকভাবে বগুড়া জেলা করতোয়া নদী দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত বলে বগুড়ার দু'অঞ্চলের (পূর্ব ও পশ্চিম) পশ্চিম বগুড়ায় বরেন্দ্রী এবং পূর্ব বগুড়ায় কামরূপী ও বাঙ্গালি উপভাষার প্রভাবটি বেশি। এ দু'অঞ্চলের ভাষায় ভিন্ন উপভাষা প্রভাবের নেপথ্যে অঞ্চল দু'টির ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ নিহিত রয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে পূর্ব বগুড়ার ভূ-প্রকৃতি নব্যপ্লাবন ভূমির অন্তর্ভুক্ত। সেই সূত্রে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে পূর্ব বগুড়ার প্রতিবেশের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের কারণে এ অঞ্চলের (বিশেষ করে প্রান্ত অঞ্চলে) সাংস্কৃতিতে যেমন, তেমনি-এর ভাষাতেও বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের তথা বাঙালি উপভাষা'র একটি প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করা যায়। পূর্ব বগুড়ার ইতিহাসে জানা যায়, দীর্ঘদিন এ অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং প্রান্ত অঞ্চল হলেও এ অঞ্চলের ভাষায় কামরূপী উপভাষার প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। এ ছাড়াও বগুড়া জেলার অংশরূপে পূর্ব বগুড়ার ভাষায় বরেন্দ্রী উপভাষার প্রভাব তো রয়েছেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বরেন্দ্রী, কামরূপী ও বাঙালি এই তিন উপভাষা পরিবারের একটি মিশ্র প্রভাব পড়েছে পূর্ব বগুড়ার ভাষায়। পক্ষান্তরে পশ্চিম বগুড়া বরেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর ভাষায় বরেন্দ্রী প্রভাব লক্ষণীয়। নিচে পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হলো এবং কোন অঞ্চলের ভাষায় কোন উপভাষা পরিবারের কতখানি প্রভাব পড়েছে তা দেখানো হলো :

১। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. বরেন্দ্রী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন– ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ্,) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্যে ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্প প্রাণ হয়ে গেছে। (যেমন– বাঘ> বাগ ইত্যাদি)। এটি কামরূপী উপভাষারও একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। যেমন– বাঘ> বাগ, সাঁঝ> সাঁজ, সভা> সবা, তুফান>

www.pathagar.com

তুপান ইত্যাদি। এ ছাড়াও পূর্ব বগুড়ায় বর্গের দ্বিতীয় মহাপ্রাণ- ধ্বনির অল্পপ্রাণতা প্রাপ্তি দেখা যায়। যেমন- চোখ>চোক, দেখা> দেকা, গাছ> গাচ, মাছ> মাচ, গামছা> গামচা, কাঠ> কাট, পাঁঠ> পাঁট, পাথর> পাতর ইত্যাদি। কামরূপী উপভাষাতেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

খ. বরেন্দ্রী উপভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আদি'র' ধ্বনির লোপ। পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- রস> অস, রাজা> আজা, রাণি> আণী, রংপুর> অংপুর, রাস্তা> আস্তা, রাত> আত, রাজ্জাক> আজ্জাক ইত্যাদি। তবে পূর্ব বগুড়ায় 'র'-এর 'অ' ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি 'উ' এবং 'ও' ধ্বনিতেও রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন- রুটি> উটি, রুই> উই, রোজা> ওজা বা উজা, রসুন> ওসুন ইত্যাদি।

গ. পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই 'এ' ধ্বনি প্রায়ই 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন বস্যা পড় (বসে পড়), হাট্যা হাট্যা যাও (হেঁটে হেঁটে যাও), খ্যাতা গায়ে দে (খেতা (কাঁথা) গায়ে দে, আলু কতো কর্যা শ্যার (আলু কতো করে সের) ইত্যাদি। উপর্যুক্ত বাক্যগুলোতে লক্ষণীয় 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঘ. পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই অনেক সময় ধ্বনি স্থিতিপরিবৃত্তি (Metathesis) লক্ষ করা যায়। যেমন- বদনা> বন্‌দা, মুরগি> মুগ্‌রী, লোকসান> লোস্‌কান, বাক্স> বাস্ক ইত্যাদি।

ঙ. পশ্চিম বগুড়ায় শব্দের আদি 'ন' প্রায়ই 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন- নয়> লয়, নারী> লারী, নাও> লাও (নৌকা), নাক> লাক, নজর> লজর, নয়া> লয়া ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্য পূর্ব বগুড়ায় খুব একটা দেখা যায় না। তবে পূর্ব বগুড়ায় আদি 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন- লাল> নাল, লোহা> নোয়া, লাউ> নাউ, লবণ> নবন ইত্যাদি।

চ. পশ্চিম বগুড়ার তুলনায় পূর্ব বগুড়ায় 'ও' ধ্বনি অধিক পরিমাণে 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন- দোষ> দুষ, লোকা> নুকা, ওল> উল, হোল> হুল (পুরুষলিঙ্গ), খোল> খুল, কোলে> কুলে, তোমার> তুমার, কোন্> কুন ইত্যাদি। একটি কামরূপী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ছ. পশ্চিম বগুড়ায় উচ্চারিত ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্থ 'ই' ধ্বনি পূর্ব বগুড়ায় 'ও' এবং 'উ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন :

www.pathagar.com

পশ্চিম বগুড়া	পূর্ব বগুড়া
১. উই হামাক্ কি করবি?	উই আমাক/হামাক কি করবো?
২. উই ভাত খাবি না।	উই ভাত খাবো না।
৩. উই বলে ইস্কুলে যাবি না।	উই বলে ইস্কুলে যাবো না।
৪. ক্যারে মাচ ধরব্যার যাবি?	ক্যারে মাচ ধরব্যার যাবু?
৫. তুই পড়বি না?	তুই পড়বু না?

উপর্যুক্ত বাক্যগুলোর ক্রিয়াপদে লক্ষণীয় পশ্চিম বগুড়ার 'ই' ধ্বনি পূর্ব বগুড়ায় 'ও' (১-৩ বাক্য) এবং 'উ' (৪-৫ বাক্য) ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

জ) পশ্চিম বগুড়ায় শব্দ অন্ত্যধ্বনির ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ স্বর বা টান লক্ষ করা যায়। যেমন যাবি-ই-নে, খাবি-ই-নে ইত্যাদি। পূর্ব বগুড়ার ভাষার এ ধরনের দীর্ঘস্বর দেখা যায় না।

২। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. বরেন্দ্রী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ। বাঙ্গালী কামরূপীতেও এই বৈশিষ্ট্য কিছুটা পরিলক্ষিত হয় পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। যেমন– ঘরে> ঘরত্, বাড়ি> বাড়িত্ বা বা'ত, হাটে> হাটোত্, বগুড়া> বোগড়েত্ ইত্যাদি।

খ. কামরূপী উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো সম্বন্ধপদ ও গৌণ কর্মে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার। পশ্চিম বগুড়ার তুলনায় পূর্ব বগুড়ায় এই বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন– আমাক্ বা হামাক্, দাদাক্, নানাক্, বাপক ইত্যাদি। কখনো কখনো বিভক্তির পরিবর্তে 'এক; ও 'ইক' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন– ভায়েক, মায়েক, বাপেক, ভাবিক, দাদিক, নানিক ইত্যাদি।

গ. উত্তম পুরুষে এক বচনে 'হামি' (আ এর স্থলে হা) এবং বহুবচনে 'হামরা'; সম্বন্ধপদে একবচনে 'হামার' এবং বহুবচনে 'হামাকেরে বা হামাগেরে' কর্মকারকে এক বচনে 'হামাক' এবং বহুবচনে 'হামাকোরক বা গোরক' ইত্যাদি পশ্চিম বগুড়ার ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পূর্ব বগুড়ায় উত্তম পুরুষে 'হামি' ও 'আমি' উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায়। সম্বন্ধ ও কর্মে 'হাংগে বা হাংগেরে এবং আংগে বা আংগেরে'র (যেমন– আংগে মত্তেপাড়া, আংগে মামুগে বা'ত গ্যাচিলাম) ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

ঘ. পশ্চিম বগুড়ায় 'এখন' স্থলে 'হিনি' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, যামো হিনি, খামো হিনি, করমো হিনি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে পূর্ব বগুড়ায় 'হিনি' শব্দের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'নি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, যামুনি, খামুনি, করমুনি ইত্যাদি।

ঙ. সম্বোধনবাচক শব্দে পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়া উভয় অঞ্চলেই 'ক্যা বারে, ক্যা রে বা রে এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'রো'- এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ক্যা রে কি করোস? ক্যা বারে তুমাক যে ডাক্ল্যাম তা তো শুনলে না? ক্যা রো ছকিনা কি করোস্ ইত্যাদি।

চ. পশ্চিম বগুড়ায় সাধারণত উত্তম পুরুষে সামান্য অতীত বুঝাতে কনু, গেনু, খানু ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব বগুড়ায় এদের পরিবর্তে যথাক্রমে কোল্যাম, গ্যালাম, খাল্যাম ইত্যাদির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালি উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হলো 'লাম'। যেমন– আমি খেলাম বা খাইলাম, আমি গেলাম ইত্যাদি। পূর্ব বগুড়ার ভাষায় বাঙ্গালির এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ছ. বাঙ্গালি উপভাষার উত্তম পুরুষের সাধারণত ভবিষ্যতকালের বিভক্তি হলো 'উম' ও 'ম'। যেমন– যামু, ধরমু, করমু, মারমু ইত্যাদি। পূর্ব বগুড়ায় এ বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন :

১. আমি ভাত খামু;
২. আমি মাচ ধরব্যার যামু।
৩. আমি গুসুল করমু;
৪. তক্ ধর্যা মারমু;
৫. তক্ ধর্যা করমু ইত্যাদি।

পূর্ব ও পশ্চিম বগুড়ায় প্রচলিত কিছু শব্দের উদাহরণ :

সাধারণ শব্দ	পশ্চিম বগুড়া	পূর্ব বগুড়া
বাড়িতে	বাড়িত	বা'ত
নৌকা	লাউ	নাও/নাউ
বল্লাম	কনু	কোল্যাম
খেলাম	খানু	খাল্যাম
করবো'নি	করমো'হিনি	করমুনি
যাবোনি	যামো হিনি	যামুনি

www.pathagar.com

আমি	হামি	হামি/আমি
আমার	হামার	হামার/আংগে/হাংগে
শোনবো	শুনমো	শুনমু
যাবে	যাবি	যাবো
খাবে	খাবি	খাবু
কোথায়	কুনটি	কুটি
পাবো না	পামো না	পামুনা
অভিমান	কোদ্দ	কুদ্দ
নাক	লাক	নাক/লাক
নারী	লারী	নারি
লাউ	লাভ	নাউ/লাউ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি